শক্তিপদ রাজগুরু

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ·· কলিকাতা-৬

সাড়ে টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

প্রচ্ছদপরিকল্পনা :

শ্রীপূর্ণজ্যোতি ভট্টাচার্য

প্রথম প্রকাশ :

চৈত্র—১৩৬৬

শিল্পীবন্ধু দেবব্রত মুখোপাধ্যায়কে—

এই লেখকের

মণিবেগম (২য় সং)
কাজল গাঁয়ের কাহিনী
অমৃতের স্বাদ
শেষ নাগ
স্বপ্নময়ী
অবাক পৃথিবী
পথ বয়ে যায় (২য় সং)
মায়াদিগন্ত
বনমাধবী
কুমারী মন
শালপিয়ালের বন
মনের মানুষ
দেবাংশী
মেঘে ঢাকা তারা

ভূমিকা দেওয়া বাহুল্য তবু এই প্রসঙ্গে দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন বোধ করছি। কয়লাখনি অঞ্চলে যাতায়াত করেছি বহুদিন—বহুক্ষেত্রে। দেশটাকে ভালো লেগেছিল—ভালো লেগেছিল এখানের উদ্দাম মুক্ত জীবনযাত্রা। অজ্ঞাতেই আমার মনে একটা জীবন্ত ছবি আঁকা হয়ে গিয়েছিল—তারই প্রকাশ পরবর্তীকালে এই উপন্যাসের মাধ্যমে।

সেই ঘোরাফেরা—ভাল করে দেশটাকে চেনাজানায় ব্যাপারে অনেকের কাছে আমি ঋণী। যাঁরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাকে মাটির দেড় হাজার-দু-হাজার ফিট নীচে নিয়ে গিয়ে সেই রহস্যান্ধকারময় জীবন-যাত্রার সঙ্গে বহুবার পরিচিত হবার সুযোগ দিয়েছেন, আশ্রয় দিয়েছিলেন স্বল্প পরিচিত একটি মানুষকে, তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে ইঞ্জিনিয়ার মিঃ বোস, মিঃ দে, দাস সাহেব, বাল্যবন্ধু গৌর চ্যাটার্জি—আরও কত অজানা কুলী, মালকাটা—তাঁদের সকলের কাছে আমার ঋণ অপরিসীম।

'চিনতোড়' বলে কোন জায়গা আছে কিনা আমার জানা নেই, কোথাও কোন পরিবেশের সঙ্গে বাস্তব জগতে হয়তো এর মিল আনা যেতে পারে, কিন্তু সেটা নিছক কাল্পনিক প্রচেষ্টা মাত্র। কোন বাস্তব চরিত্র বা প্রকৃত ঘটনাকে জড়িয়ে ইতিহাস বা বিবরণী এ নয়, বিস্তৃত খনি অঞ্চলের জীবনযাত্রার পটভূমিকায় রচিত একখানি উপন্যাস মাত্র। বিভিন্ন আঙ্গিকের দিক থেকে তাকে সর্বাঙ্গসুন্দর করবার চেষ্টা করেছি নানা ঘটনার মাধ্যমে।

সার্থকতার বিচার করবেন সুধী পাঠক-সমাজ।

গোপবান্দী,

বাঁকুড়া।

কেউ ফেরে নাই

That Man had not remained one species, but had differentiated into two distinct animals : that my graceful children of the upper world were not the sole descendants of our generation, but that this bleached, obscene, nocturnal Thing, which had flashed before me, was also heir to all the ages.

—H. G. Wells.

চওড়া মসৃণ পিচ ঢালা রাস্তা—দুপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে দু চারটে অশ্বত্থ-শিশু-সেগুন গাছের প্রহরা। আসানসোল, বরাকর, ডিসের গড়, জামুড়িয়ার দিকে এঁকে বেঁকে গেছে রাস্তা।

কন্ডাক্টার হাঁকে—ব্রবাক্কর, বেগুনিয়া, চিত্তরঞ্জন—নেয়াৎপুর, জামতা-আ! কুল্‌তি।

চড়াই এর উপর দু চারটে ঝুপড়ির মত ঘর, নীচু মাটির দেওয়াল, উপরে খোলার ছাউনি, মরা তেঁতুল অর্জুন গাছ রুক্ষ মাটির বুকে ধুঁকছে। যতদূর চোখ যায় ঢেউখেলানো কঠিন মাটি, মাঝে মাঝে কালো ধূলো—আর কয়লার বিবর্ণ-কালিমা, দু একটা পিট হেডগিয়ার ঘুরছে থেকে থেকে। তামাটে আকাশ ল্যাঙ্কাশায়ার বয়লারের বুক থেকে জ্বালা নিয়ে ধোঁয়া ছাড়ে, বাতাসে ভেসে ভেসে যায় তারই আভাষ।

শাহী শড়ক। শত শত বছরের ভাঙ্গা গড়ার, ইতিহাসের নীরব সাক্ষী। এর বুক দিয়ে বাদশাহী কামান, লাখো পদাতিক গেছে জয়গর্জনে এর আকাশ বাতাস মুখর করে, দু পাশের গাছ-গাছালিতে পাখ পকুড়ি ডানা মেলে ঝটপট শব্দে পালিয়েছে। কত রাজা, বাদশা, কেউ বা পরাজিত হয়ে রাতের অন্ধকারে চুপিসারে পালিয়েছে। কেউ বা গেছে বিজয়ী বীরের মত মাথা তুলে। হাজারো তীর্থযাত্রী গেছে উটের গাড়ীতে, পায়ে হেঁটে; ডাকাত-ঠ্যাঙ্গাড়ের লাঠিতে কেউ পড়েছে লুটিয়ে, শেষ নিঃশ্বাস নিয়েছে ওরই একপাশে।

পায়ের দাগে আবার রক্তের চিহ্ন মিলিয়ে গেছে।

আজও সেই চিরন্তন স্রোত বয়ে চলেছে। জীবনের স্রোত।

বহু বিচিত্র এ স্রোত। রূপান্তর ঘটেছে মাত্র সেই স্রোতের। মালবোঝাই

বড় বড় ডিজেলের গাড়ীগুলো আসছে দিল্লী, কানপুর থেকে ; শাহী শড়ক ! শাহী শহর !! রকমারি কারবারি ফন্দী ফিকির করা এই কুচকাওয়াজ। যাত্রীবাহী বাসগুলোও অগুনতি। তারপর আছে কয়লাবোঝাই ট্রাক ; ট্যাক্সির ভিড়ও কম নয়। কমেছে পায়ে চলা যাত্রীদল। মাঝে মাঝে দু একজন লোক চাষের গরুর দড়ি ধরে তাকে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে। বাসে ওঠানো সম্ভব নয়, নইলে তারাও হেঁটে অনর্থক সময় নষ্ট করত না।

শাহী শড়ক চুপ করে পড়ে আছে, এক দিগন্ত থেকে অন্য দিগন্ত ছুঁয়ে। অতীত থেকে বর্তমানে এসেছে পরিবর্তনের ধারা স্রোত বয়ে, চলেছে ভবিষ্যতের দিকে। যুগ যাত্রী শাহী শড়ক।

একটা ঘণ্টি।

বাসখানা ব্রেক করতে করতে পাঁচ হাত এগিয়ে গেল। উৎরাই এর মুখ, ভারি বাসখানা ব্রেকের বাঁধন মানে না। তাছাড়া যুদ্ধের বাজারে পানাগড় ডিপোয় অক্লেশে কেনা বাস, ঝড়ঝড়ে বডি আর কুচকি কণ্ঠায় ঠাসা যাত্রী। সরকারী আইন অমান্য করেই তারা গাড়ীর ভিতর টানছে কাঁচা শালপাতার চুটি ; বিশ্রী উৎকট গন্ধে বাতাস যেন জমাট বেঁধে গেছে গাড়ীর মধ্যে ; বাইরের হাওয়া সেই জমাট পাঁচিল ভাঙ্গতে সাহস পায় না ; আশপাশ ছুঁয়ে যায় মাত্র।

কোন রকমে নামল দু'একজন যাত্রী, হাত পা বের করে ভিড়ের মধ্য থেকে টেনে টুনে।

বাসখানা ঘণ্টি বাজিয়ে আবার নেমে চলে মসৃণ গতিতে উৎরাই এর দিকে। এদের সঙ্গে তার আর কোনো সম্বন্ধ নেই।

এখানের লোক দেখলেই চেনা যায় ; মাটিতে এর কালো কষ, ধূলোয় তারই নিবিড় আঁধার রং, নীল আকাশ ছেঁড়া কালো মেঘের কালিমায় ঢাকা, দূরে বিরাট দৈত্যের শরীরের মত দাঁড়িয়ে আছে বার্ণপুর লোহা কারখানা, মেঘ ভাঙ্গা রোদে ঝকঝক করছে ওর ইস্পাতের নাড়ী ভুঁড়িগুলো, বিশাল গেলাশকটা যেন উপুড় করে রেখেছে, সারি সারি কয়েকটাই। ব্লাষ্ট ফার্নেসের ধোঁয়া আগুনের আভা দিনের আলোয় দেখা যায় না। মনে হয় যেন দৈত্যপুরী ময়দানবের রাজ্যি।

সরু রাস্তাটা শাহী শড়ক থেকে বেঁকে গেছে মাঠের দিকে। সেই দিকে

চেয়ে থাকে যাত্রীটি। পরনে তেল কালি মাখা প্যান্ট, জুতোটায় বেশ কিছুদিন কালি পালিশ পড়ে নি, যাযাবর জীবনের চিহ্ন আঁকা ওতে। ওর মতই শ্রীহীন; দাড়িগুলো ক'দিন না কামানোর জন্য বুনো আগাছার মত গজিয়ে উঠেছে। কাঁধের হ্যাভারসকটা ঝুলিয়ে কি ভেবে এগিয়ে চলল রাস্তা দিয়ে; দু চারটে নীচু খোলার চালের ঘর; তারই পাশে কাঠের নড়বড়ে বেঞ্চি বসানো; উনুনে কাঁচা কয়লার আঁচে কালে জমাট কালি লাগা কেটলিতে জল ফুটছে—একপাশে তেপায়ায় কয়েকটা ছোট গ্লাশ। রং-ওঠা লিলিবার্লির কৌটায় চা আর চিনি রাখা, ছোট তাকে সাজান বিড়ি—আর লণ্ডন, প্যাসিংশো সিগারেট কয়েক বাক্স; ও পাশে ছোট ছোট পাত্রে মাটির সরায় মুদিখানার কিছু মালপত্র; গত বৎসরের দু একটা ঠাকুর মার্কা ক্যালেণ্ডার, বহুদিন ধোঁয়া আর ধুলোতে বিবর্ণ।

—চিনতোড় কোন দিকে যাবো ভাই?

দোকানদার বিড়ি বাঁধছিল, একটা ছোটকুলোর গোড়ার দিকে রাখা বিড়ির মশলা। ভিজে চটে জড়ানো ছকে কাটা বিড়ির পাতা, মাঝে মাঝে আঙ্গুল শুখনো রাখবার জন্য খড়ির ছোট চাপে আঙ্গুল ঘসে দুহাতে মশলা সমেত পাতাটা পাকিয়ে নেয়—দুলছে ওর সমস্ত শরীর তালে তালে।

আগন্তুকের কথাটা প্রথমে কানে যায় না, আর একবার প্রশ্ন করতে মুখ তুলে চেয়ে থাকে যাত্রীর দিকে।

--চিনতোড়? এহি রাস্তামে সিধা চলা যাইয়ে।

খাড়া চিড়চিড়ে রোদ। বসতি ছাড়িয়ে রাস্তাটা একটা পড়ো খাদের পাশ দিয়ে চলেছে। ঢিবিতে এখনও কয়লার দাগ, খাদের মুখের চারিপাশে পাথরের বুকে চূর্ণ মৃত্তিকা কণায় জন্মেছে সাবুই ঘাস—মাথা তুলেছে কয়েকটা কাদাজামের গাছ। বর্ষার প্রথম বৃষ্টিতে ওই সবুজ টুকুই জেঁকে উঠেছে। ডালে ডালে ছোট কালো অসংখ্য বিন্দুর মত জাম পেকেছে; ওদিকে যাবার উপায় নেই—পরিত্যক্ত খাদ; ভস্‌কা মাটি, কে জানে ওই গহ্বর কতশো ফুট অতল অন্ধকারে গিয়ে থেমেছে; ওর ফল ঝরে পড়ে গহ্বরেই; অতীতে চালু কলিয়ারী ছিল, মালিক যা পেরেছে লুটপাট করে নিয়ে মাটির বুকে অসংখ্য ক্ষত চিহ্ন রেখে চলে গেছে, মদ্যপ লম্পট যেমন করে রাত্রিশেষে বেশ্যাপল্লী ছেড়ে যায়।

চড়াইএর মাথায় এসে দাঁড়াল। দূরে কাছে কয়েকটা ছোট কলিয়ারী। রাস্তার ধারে কে স্তূপ করে রেখেছে কয়লার উপরের স্তরের বাজে পাথুরে কালোমাটি; ভবিষ্যতে কয়লাতেই পরিণত হতো, কিন্তু তার জন্য একালের মানুষ অপেক্ষা করতে পারে না।

ধূপরোদে ঘেমে নেয়ে উঠেছে সাওতাল কামিন, নিটোল পুরুষ্ট দেহ, ছোট কাপড়খানা আঁট করে গায়ে জড়ান, ট্রলি লাইনের টব ঠেলে চলেছে। একটা সাইকেল রিক্সা সোয়ারী নিয়ে বের হয়ে গেল পাশ দিয়ে—কলিয়ারীর কোন বাবু সস্ত্রীক চলেছে শহরে।

আগন্তুক পাশে দাঁড়াল রাস্তার; টবঠেলা কামিন আবার গাড়ী ঠেলে আনছে, মরদটা এগিয়ে গিয়ে কাৎ করে দেয়—দুজনে ধরে টিবিং ওয়াগনটা। সশব্দে কালো পাথুরে মাটি পড়ছে টব থেকে।

এগিয়ে চলে যাত্রী।

কয়েকটা সাইডিং লাইন। সানটিং এঞ্জিন যাতায়াত করছে কয়লা বোঝাই গাড়ী নিয়ে; এ জগতের কেউ সে নয়; চলমান জীবন স্রোতে সে খড়কুটার মত ভেসে চলেছে। একটু দূরেই দেখা যায় দামোদরের বালিপড়া বুক; গেরুয়া জল বয়ে চলেছে। সমস্ত কোলাহল, অর্থলিপ্সা, লোভী লুণ্ঠনকারীর পাতাল রাজ্য জয় করার উদ্ধত জয়ধ্বনির ঘোষণা এখানে এসে শেষ হয়েছে। ওপারে মানভূমের শান্ত নিবিড় ছায়াঘন শাল পলাশ মহুয়ার বনরেখা—ক্রমশ উঠে গিয়ে ধ্যানমগ্ন পঞ্চকোট পাহাড়ের স্তব্ধতায় বিলীন।

প্রকৃতি যেন বেড়া আর প্রহরা দিয়ে থামিয়েছে এদের, ওপারের শ্যামছায়াঘন নীল নির্জনে এদের প্রবেশ নিষেধ।

পিচের রাস্তার পাশে একটা বোর্ড খাড়া করা. 'চিনতোড়'। বাঁ হাতে চাইতেই দেখতে পায় গাছ-গাছালির মাথায় দুটো হেডগিয়ারের চাকা ঘুরছে বনবন শব্দে; ষ্টিলরোপ লিপ্টটাকে নিয়ে চলেছে পাতালরাজ্যে আলোর দেশের মানুষকে।

ছোট্ট বসতি; জন্ম পরিচিত দারিদ্র্য আর বঞ্চনায় গড়ে ওঠা জীবন; উঠোনেই বড় বড় কালো পাথর মাটি ফুঁড়ে উঠেছে—কেউ শুকোতে দিয়েছে

চাষি ধান, মকাই। এককালে ক্ষেতি গৃহস্থ ছিল আর তার চিহ্ন ঠেকেছে ওইটুকুতেই। ছোট ফালি ফালি ক্ষেতে জোয়ারের চারা সবুজ হয়ে উঠেছে বৃষ্টির জলে।

রাস্তাটা উঁচু পাহাড়ীর বুক চিরে গেছে, তুপাশে খাড়া পাথরের স্তর; মাঝে মাঝে তু চারটে পুরোনো জাঙ্গল গাছ মাথা তুলে আছে। কোথাও বাসক গাছের ঝোপ—মাঝে মাঝে সাদা ফুলের একফালি হাসি। ক্বচিৎ কদাচিৎ। হেঁড়ে গলায় গর্জন করে ওঠে কে ওপাশ থেকে।

—হল্ট!

বিজাতীয় শব্দ শুনে থমকে দাঁড়াল যাত্রী, টিলার উপরে রাস্তায় একটা বন্ধ ফটক, পাশের ঘুমটি ঘর থেকে গুর্খা পাহারাদার সঙ্গে নিয়ে বের হয়ে এল তুজন লোক।

পরনে খাঁকি পোশাক, পায়ে আড়াইসের ওজনি লোহার নাল বাঁধানো বুট জুতো, কোমরে ঝুলছে ওয়াচ ক্লক, পাহারাদার যাতে না ঘুমোয় তারই ব্যবস্থা, চললে তবেই ঘড়িতে উঠবে, নইলে বসে থাকলেই বন্ধ হয়ে যাবে। পাহারাদারের উপর পাহারা—চোরের উপর বাটপাড়ি।

সঙ্গের মোটা গালকাটা লোকটা জুতোর শব্দ তুলে এগিয়ে আসে, —কাঁহা জায়েগা?

বিনা এত্তেলায় এ মুলুকে ঢোকা নিষেধ। কঠিন পাহারা, কাঁটাতারের বেড়াঘেরা সীমানা। যাত্রী আধপোড়া সস্তা সিগারেটটা মুখ থেকে না নামিয়েই জবাব দেয়—অপিসমে।

হঠাৎ একটা অতর্কিত ধাক্কাতে কে যেন ছিটকে ফেলে দেয় সিগারেটটা ওর মুখ থেকে।

কানুন নেহি জানতা?

সিগারেট মুখে দিয়ে এখানে জবাব দেওয়া অপরাধ। পাহারাদারের কড়া নজর, ছিটকে ফেলে দিয়ে জুতো দিয়ে মাড়িয়ে দেয় সিগারেটটা।

সঙ্গের জুড়িদার এতটার জন্য তৈরী ছিল না, খাচ্ছে খাক গোছের, তবে তার মতলব অন্য। যাত্রীর পকেট হাতড়ে সিগারেটের বাক্স, দেশলাই আর কয়েকটা বিড়ি বের করে নিয়ে বলে ওঠে—এসব নিয়ে যাওয়া চলবে না। রেখে যেতে হবে।

যাত্রী কি বলতে গিয়ে থেমে গেল, চারিদিকে একনজর বুলিয়ে নিয়ে চুপ করে থাকে, প্রতিবাদ করা সমীচীন হবে না। ওর মতামতের অপেক্ষা না করেই বের করে বেমালুম নিজের পকেটেই সেগুলোকে পুরে বাবু আবার স্বাভাবিক চলনে গুমটির ভিতর গিয়ে টুল দখল করে বসলো। ঠায় দাঁড়িয়ে আছে যাত্রী; ঘামে জামা সেঁটে গেছে গায়ের সঙ্গে। পিট পিট করছে। তেষ্টাও পেয়েছে এই রোদে এতখানি পথ হেঁটে এসে। দামোদরের গেরুয়া জলই আঁজলা আঁজলা করে খেতে ইচ্ছে করে, কিন্তু অনেক নীচে, খাড়া পাথর ভেঙ্গে সেখানে পৌঁছবার পথ নেই।

—এ্যাই ক্যা দেখতা হ্যায়? যাও—

পাহারাদারের হুমকিতে তার চটকা ভাঙ্গে; ফটকটা একটু তুলেছে মাত্র, কোনরকমে গুড়ি হয়ে পার হওয়া যায়। মাথা নীচু করেই এখানে চলবার রেওয়াজ। ভুলেও কেউ মাথা সোজা করে না।

ভিতরের সড়কে এসে পড়ল যাত্রী।

এ যেন অন্য কোন জগৎ। রাস্তার দুদিকে চারা সোদাল গাছে হলদে ফুলের স্তবক, বাতাসে নড়ছে ওর পাতা ফুল। চারা নিমগাছে হলদে থোকা থোকা ফলগুলোয় ঠোকরাচ্ছে টুনটুনি পাখী, দামোদর আরও কাছে এসে ঠেকেছে, কানে আসে ওর জলস্রোতের শব্দ—সুর।

রাস্তার ধারের কল থেকে জল পড়ছে। এগিয়ে গিয়ে দুহাতের আঁজলায় জল নিয়ে মুখে কাঁধে চোখে নিতে থাকে। মালকাটাদের কেউ কেউ উঠে আসছে খাদ থেকে, কোমরের বেল্টে ব্যাটারি থেকে তার গিয়ে উঠেছে মাথায় বাঁধা বাল্বের সঙ্গে, চোখে মুখে কাপড়ে জমাট কয়লার ধূলো ঘামের সঙ্গে চিটিয়ে বসেছে। একদল চলেছে ওরা বাতিঘরের দিকে—দুজনের কাঁধে গাঁইতি, দুজনের ঘাড়ে বেলচা—দু, তিন জন খালি হাতে; কেউ কয়লা কাটে—কেউ টব বোঝাই করে, দু তিন জন টব ঠেলে নিয়ে যায়, এই নিয়ে তাদের এক একটি দল।

কম বয়সী একজন ছেলে চেয়ে থাকে যাত্রীর দিকে।

এমনি করেই ঘর পালিয়ে সব হারিয়ে পথ ভুলে ওরাও এসেছিল অন্যকোন পথে রুটির সন্ধান না পেয়ে। তারপর স্তরে স্তরে কালো ধূলো আর মাটি তাদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। এখান থেকে ফেরবার পথ তারাও পায়নি।

—নোতুন এল বোধ হয়!

—মনে লছে বটে।

বুড়ো ফকির বিশ বছর কলিয়ারীতে কাজ করছে, এমন আসা যাওয়া অনেক দেখেছে। তবুও ফিরতে পারেনি নিজে। ওদের কথায় বলে ওঠে;

—মনে লয় বাবু টাবু হবে।

ছেলেটা হেসে ফেলে—উউঁহু! কাবু হয়ে পড়েছে।

লোকটি কথা কইল না, কানে আসে ওদের মশকরার শব্দ গুলো। চুপ করে অপিসের দিকে এগিয়ে যায়।

এ অঞ্চলের সিলেক্টেড কলিয়ারী; কর্তৃপক্ষ সদর্পে ঘোষণা করে তাদের বহু কলিয়ারীর মধ্যে এইটিই অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং আধুনিক।

এ অঞ্চলের অন্যতম আদি প্রতিষ্ঠান, বর্ধমান—বিহার—সিংভূমের বহু জমি এরা নকড়া ছকড়ায় নিয়েছে; না হয় স্বত্ব স্বামিত্ব, ভূগর্ভস্থ স্বত্ব নিয়েছে পঞ্চকোট—ঝরিয়ারাজ—স্থানীয় পত্তনিদারদের কাছ থেকেও।

চিনতোড় তাদেরই একটি প্রতিষ্ঠান। দেশ বিদেশে তাদের ব্যবসা; এখানকার কয়লা পৃথিবীর অন্যতম সেরা লোহা কারখানায় চাহিদা মিটিয়ে উঠতে পারছে না; চারিদিকে সেই কর্মব্যস্ততার সাড়া।

প্রশস্ত সবুজ ঘাসে ঢাকা ময়দান, চারিপাশে ক্যামেলিয়া বোগেনভিলা পাতাবাহারের গাছ; যত্ন আর হুসিয়ারীর চিহ্ন ওদের সর্বাঙ্গে; কলিয়ারীর নীচেকার জল পাম্পহাউস থেকে এনে বাগানে দেবার জন্য পাইপ বসান হয়েছে।

তিরতির করে জল ঝরছে হোস পাইপের মুখ থেকে ঘাসের উপর—নইলে এই কঠিন মাটিতে আর পাথর ফাটানো তাপে ঘাসও জন্মাবে না একগাছি। চারিপাশে গজিয়ে উঠেছে লকলকে সেগুন চারা, ঢোলা হাতিকান পাতায় দুপুরের রোদ পিছলে পড়ে। শোঁ শোঁ ঝড় বইছে গাছ গাছালির মাথায়।

লম্বা টানা বারান্দা দিয়ে এগিয়ে গেল আগন্তুক। ছোট ছোট বোর্ড আঁটা দরজা, কাচের জানালা—ঝকঝকে তকতকে মেজে। ম্যানেজার, একাউন্টেণ্ট, ক্যাস, অফিস, ওদিকে টানা দোতলা বাড়ির গায়ে লেখা পিট-হেড বাথ, ক্রেসে, ওদিকে কলিয়ারীর অন্যতম প্রধান অপিস বাতিঘর, ক্যান-টিন। পাশেই দোতলা বিল্ডিং-এর নীচে ইনক্লাইণ্ড পিটে নামবার সুড়ি পথ।

জানলার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় লম্বা টানা হল—সারি সারি র‍্যাকে ওল্ডামস্ মাইনার্স ল্যাম্প সাজান। বেল্টের সঙ্গে বাঁধা ব্যাটারি—তারটা গিয়ে শেষ হয়েছে মাথায় বাঁধবার ফোকাসিং আলোর ভিতরে। ব্যাটারি চার্জ করা হচ্ছে কারেন্টে, পরের শিপ্‌টের লোকজনের জন্য।

—কি চাই ?

ওকে উকি ঝুকি মারতে দেখে তেড়ে আসে বাতিবাবু, পাকান বিড়ালের ল্যাজের মত গোঁফ জোড়া, গলার স্বরও ওই জাতের—তবে মাদী বিড়ালের মত মিনমিনে নয়, হুলোর মত গুরু গম্ভীর আর ভরাটি ; বারান্দায় এদিক ওদিকে কয়েকজন মালকাটা ঝুড়ি গাঁইতি নামিয়ে বসে দাদ চুলকোচ্ছে আর গালাগাল পাড়ছে বাতিবাবুকে, দেরী করে এসেছে তাই খাদে নামতে বাতি পাবে না।

—ই কোই ভদ্দরলোক কা বাত হ্যায় ?

—থাম। কোথায় মদ মেরে পড়ে থাকবে, আসবে খোঁয়াড়ি ভাঙ্গলে ; তোর জন্যে কি ঘড়ি বন্ধ করে বসে থাকবো ? সাহেব আসছেন খাদে নামতে।

লোকটা গজগজ করতে থাকে ; অনেকেই কি বলাবলি করছে। হঠাৎ তাদের মধ্যে অপরিচিত নোতুন লোককে দেখে একটু চুপ করে যায়।

লোকটি এগিয়ে এসে বলে—কাজ কম্মো পাওয়া যাবে ?

বাতিবাবু দাগটানা খাতায় যোগ দিয়ে বাতির হিসাব মিলচ্ছিল, যোগ-বিয়োগ করা তার কাছে ঝকমারি, বিদ্যেতে কুলোয় না। তার উপর এই সময় বাধা পেতেই মেজাজ তেলে বেগুনে জলে ওঠে।

—চাকরি ? মালকাটার চাকরি পারবে ? দেখেতো মনে হয় নাড়ু-গোপাল। দুধ সর নবনী খাওয়া গতর। পারো তবে যাও ওদিকে—সাহেব সুবোদের এলাকায়, এ বাবা কুলির পাড়া। তিন সাত দশ দুই বারো।

—কোন দিকে ? আগন্তুক ঠিক ওর পাড়া দেখানোর ইঙ্গিতটা বোঝেনি।

বারুদের স্তুপে আগুন লেগেছে—দপ্ করে জলে ওঠে বাতিবাবু। হাতের পেন্সিল নামিয়ে লাফ দিয়ে টুল ছেড়ে উঠে গর্জন করতে থাকে,

জানি না বাবা। ডোণ্ট নো। ক্লিয়ার ? একে যোগ মেলে না, তার উপর ক্যাচ ক্যাচ। চাকরি ! বাঙ্গালীর চাকরি না হলে চলবে না। করতে চাস—

যা না বাবা কুলটি বার্ণপুরে ; লোহা কাটবি তা নয়, আসবে এই মাটির নীচে পরান হাতে নিয়ে কয়লা কাটতে। এখানে খুব মধু বুঝি? সাত চার এগারো।

আবার যোগে মন দেয়, পট্ করে পেন্সিলের শিষটাই ভেঙে গেল এবার। চোখ পাকিয়ে তাকাল—সেই ছোকরা ততক্ষণে তার সামনে থেকে চলে গেছে। রাগটা পড়ে সামনের কুলিদের ওপর,

দোব না বলেছি বাতি—ব্যস, চলে যা, এখানে কি বাবা পাতাল ফোঁড় শিব উঠেছে যে হাঁ করে দেখছিস ?

—শোন ?

আগন্তুক ফিরে দাঁড়াল একটা বাচ্চা সেগুন গাছের ছায়ায়, এগিয়ে আসে লোকটা। নাকের খাঁজে চোখের কোলে জমাট কয়লার আবছা দাগ, বহুদিন ধরে ওখানে কায়েমী হয়ে বসে আছে। পায়ে কোম্পানীর দেওয়া ভারি বুট।

—চাকরি করতে পারবেন ? বড় কঠিন কষ্টের চাকরি এ ?

—পারতেই হবে। ছোট্ট করে জবাব দেয় সে।

—এসো, দেখি বলে কয়ে।

প্রৌঢ় লোকটা তার দিকে কি যেন সন্ধানী দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

সঙ্গে করে লেবার অফিসারের ঘরে গিয়ে ঢুকলো সে, একটা চেনা পরিচয়, একটু সহযোগিতা নাহলে চাকরি এখানে দেয় না। মালকাটাদের একদলে ছজন থেকে আট জন থাকে, একজনই তাদের মধ্যে প্রধান। মাখন কলিয়ারীতে এসেছে প্রায় বিশ বছর, নানা কলিয়ারীতে কাজ করেছে—হুশিয়ার সর্দার। ছোকরাকে দেখে কেমন যেন ভাল লাগে তার।

—কি নাম বটে ?

যাত্রী জবাব দেয়—বসন্ত।

বাইরে ঝড় বইছে। পঞ্চকোট পাহাড়—বিশাল বিস্তৃত শাল মহুয়ার ডাঙা থেকে বর্ষার সজলগন্ধ মাখা সোঁদা বাতাস দামোদরের জলস্নাত হয়ে আসছে এপারে। মাটির স্নিগ্ধ গন্ধভরা বাতাস একটু প্রীতি কারুণ্যের স্পর্শ নিয়ে লাল

মাটির দেশ থেকে আনে প্রকৃতির আশীর্বাদ—এই কালামাটির অতলে বন্দী জীবদের জন্য।

কিন্তু তা ভোগ করবার অধিকার এদের নেই। ধাওড়া বলতে খুমটি ঘর, জানলা নেই। একটা মাত্র দরজা, পাশেই বেড়া দেওয়া রান্নার জায়গা, মাথার উপর একটা ঘুলঘুলি, একটু আলো নির্লজ্জের মত উঁকি দেয়। এই আস্তানা-টুকু যোগাড় করতে বসন্তকে বেশ বেগ পেতে হয়েছে, নগদ পাঁচটাকা নজরানা লেগেছে কোম্পানীর কর্মচারীদিকে।

কলিয়ারীর সীমানায় ঢোকবার সময় টাকা কটা পকেটে না রেখে বেল্টের নীচে একটা ছোট্ট ঘড়ির পকেটের ভিতর রেখেছিল বলেই পাহারাদারের তীক্ষ্ণ নজর এড়াতে পেরেছে।

মাখন বলে উঠে—টাকায় সব হয় গো ইখানে। টাকা মাটিতে ছড়ানো। টাকা ছাড়া কথা শোনেনা কেউ এখানে।

ওইই সন্ধান করে যোগাড় করে দিয়েছে ঘরখানা। স্যাতসেঁতে ঘর, মাটিতে অনেকেই খড় বিছিয়ে শোবার জায়গা করেছে। বসন্ত দেখে শুনে বলে ওঠে—

—একটা চারপাই দরকার।

হাসে মাখন—তিনটাকা দাম, তাও পল্‌কা কেঁদ কাঠের আর বাবুই দড়ির বুনোনি। শাল রোলার পাশান।

—সে যে মড়ার খাট, কলকাতায়—

কথাটা চেপে গেল বসন্ত, মনে পড়ে বৌবাজার-আমহার্ষ্ট স্ট্রীটের ওদিকে কিনতে পাওয়া যায়, শিয়ালদহের আশে পাশেও। মড়া বইবার খাটিয়া;

মাখন বলে ওঠে—এখানে সবাই মুর্দা, জিন্দা হয়ে আছি নসীবের জোরে। বসন্ত ওরদিকে চেয়ে থাকে, মৃত্যুর অন্ধকার পুরীর প্রহরী ওরা। মাখম কথাটা ঠিকই বলেছে।

তবু স্যাতসেঁতে মেজেতে মড়ার খাটেই শয্যা পেতেছে বসন্ত, ধাওড়ার অনেকেরই চোখে এটা বিলাস; আড়ালে দু চারজন মুঙ্গেরী কুলি ফোড়ন কাটে—বাঙ্গালীবাবু হ্যায় না, উস্ লিয়ে এইসা চাল। খাট পালংক কা বাত।

কে জবাব দেয়—সব চালবাজী খতম হো যায়েগা ইয়ার, দেখো দু চার মাহিনা। পিছু গঙ্গা যমুনা মায়িকা পানিকা তব্ একই মালুম পড়েগা।

জ্বালানির সমস্যাও এই কলিয়ারী মলুকে আছে। সমুদ্রের জলের মাঝে যেমন খাবার জল মেলে না, এখানেও তেমনি। বাছাই করা কয়লা, বাজারে এর দাম অনেক। কোকচুল্লীতে চলে যায় এর প্রতিটি দানা, লোহা গালাই, তামা গালাই এ লাগে। তাছাড়া গ্যাস তো আছেই। বাকি পড়ে থাকে গুড়ো ঝুরো কুচি—তাও ভালো দামে ওয়াগন বন্দী হয়ে চালান যায়।

জ্বালবার জন্য কয়লা খুঁজতে যায় ধাওড়ার ছেলে মেয়েরা ঝুড়ি বগলে রেলের সাইডিংএ—না হয় আধা পাথর আধা কয়লার বাতিল করা স্তূপের উপরে আঙ্গুল দিয়ে আঁচড়ে আঁচড়ে কয়লার দানা সংগ্রহ করে মুরগীর খাদ্যের দানা সংগ্রহের মতই। প্রাণান্তকর এই চেষ্টা।

বসন্ত অবাক হয়ে যায়—এত কয়লা তবুও ?

হাসে পাশের ধাওড়ার মদন, ছেলেমেয়ে দুটো যোগাড় করে এনেছে দু ঝুড়ি কুচো কয়লা।

—ওসব বড়বাবু, ছোটবাবু আর সাহেবদের জন্যে, তোমার আমার জন্যে সেই পয়সা দিয়ে কেনো, না হয়, চুরি করে আনো। তাও যে পাহারা—ছুঁচ গলবে না বাবা।

একথা বসন্তও আজ জানে, দূর থেকে পাহারাদারদের দেখে এড়িয়ে যায় সে। কাছে গেলেই বিপদ।

প্রাচুর্য থাকলেও সর্বত্র তা নেই।

বিরাট ফাঁকা মাঠ, চড়াই উৎরাই পড়ে আছে চারিপাশে। আলো হাওয়ার প্রাচুর্য ; কিন্তু এতবড় মুক্ত উদার পরিবেশ, তার কাছে কোন স্বাদ নেই। মালিক কোলিয়ারী কোম্পানীর চাপে পিষে চেপ্টা হয়ে এরা বিস্তৃত জমির মাত্র একাংশের কোণে হুমড়ি খাওয়া ঘরের মধ্যে এসে আশ্রয় নিয়েছে ; হাওয়া আলোর যোগানও সীমিত। দুঃখ আর কান্না, পাওয়া আর চাওয়া, জীবন আর মৃত্যুর সীমাঘেরা ব্যর্থ বঞ্চিত জীবন ! জন্ম এখানে আনে দুঃস্থ জীবনের আর একজন ভাগীদারকে, মৃত্যু আনে স্তব্ধ প্রশান্তির মাঝে মুক্তির সংবাদ।

বুকযোড়া বঞ্চনা আর ব্যর্থতার অন্ধকার নামে রাতের আঁধারে মিশে গাঢ়তর হয়ে ; মাটিতে অধিকার হারানো ক'টি জীবের জড়াজড়ি করে পড়ে থাকা সংসার, সারাদিনের ক্লান্তি ঘুমের অচেতন অসাড়তায় ডুবে যায় প্রাগ্‌ঐতিহাসিক তমসাচ্ছন্ন জীবন ; হিংস্র মৃত্যুগর্জনে ভরে তোলে রাতের

আকাশ কলিয়ারীর জাগ্রত পাম্প একজষ্ট ফ্যান—টারবাইনের সম্মিলিত গর্জনধ্বনি।

কলিয়ারীর নীচে রাতপালির কাজ চলে পুরোদমে। তারাই জেগে আছে বিনিদ্র প্রহরীর মত। হাজার হাজার টন কয়লা তুলছে।

তাতেও অধিকার নেই মাত্র ওই দিনমজুরী ছাড়া।

একটি দানাও আনবার উপায় নেই, বিস্তৃত প্রান্তরে এত ঠাঁই তবু তার ঘরের সীমানা ওই চারহাত; এত কয়লা, তবু তার মাগ ছেলেকে বেরুতে হয় আবছা অন্ধকারে কলিয়ারীর পথে পথে কয়লা কুড়োতে। মাঝে মাঝে দামও দিতে হয়েছে তাদের ইজ্জৎ।

অবশ্য ওই পদার্থটা যে তাদের কিছু আছে এটা তারা নিজেরাই ভুলে যায় অনেক সময়। নগদ কিছুর লোভে ওই মূলধন ভাঙ্গিয়ে বাণিজ্য করতে সুযোগ পেলেই তার সদ্ব্যবহার করে।

সারা জীবন ঘিরে তমসার ঘন ছায়া; আলোর কোন নিশানা কোথাও নেই।

হঠাৎ কিসের শব্দে একটু চমকে ওঠে বসন্ত। ফালি ফালি ঘর; আব্রু সম্মান বলতে কিছুই নেই; কে একটি মেয়ে তার দিকে চেয়ে আছে।

বসন্ত মুখ তুলে চাইল, সরে গেল না মেয়েটি।

আঁধারে ঠিক ঠাওর করা যায় না ওর মুখের আদল, গড়ন। চোখের ম্লান দীপ্তিটুকুই জেগে আছে দূর আকাশের ম্লান তারার মত।

কৌতূহলী দৃষ্টিতে মেয়েটি তার দিকে চেয়ে থাকে; আস্তে আস্তে চলে গেল ঘরের ভিতর। কে যেন জড়িত কণ্ঠে হুঙ্কার ছাড়ে ভিতর থেকে।

—এ্যাই কি করছিস বাইরে? ভিতরে আসতে ডর লাগছে? আয়, কিচ্ছুটি বলবো না, মাইরী।

মেয়েটি লজ্জায় সরে গেল তার সামনে থেকে।

দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে শুয়ে পড়ে বসন্ত। রাত কত জানে না। তারা দেখেও হিসাব করতে পারে না, ভূতের চোখের মত জলজ্বল করছে দূরে কলিয়ারীর পিটের কয়েকটা বাতি; রাস্তার উপর পড়েছে সার্চ লাইট;

রাতের অন্ধকারে যাতে কেউ কয়লা না চুরি করে তার জন্য এই প্রহরা আলোর ব্যবস্থা।

এক ফালি বাতাস এদিকে ওদিকে ঘা খেয়ে ছোট্ট জানলাটার মধ্য দিয়ে ঢুকে সারা গায়ে স্পর্শ বোলায় ; হাত পা গুলো টন টন করছে।

ঘুম জড়িয়ে আসে চোখে।

চিনতোড় এ অঞ্চলের গভীরতম কলিয়ারী। মাটির নীচে ছড়িয়ে আছে তিন চারটে কয়লার স্তর। কোনটা তিনশো—কোনটা পাঁচশো, কেউ বা এগারোশো, সর্বনিম্ন স্তর প্রায় সতেরোশো ফিট নীচে। স্তর গুলো কোনটা চল্লিশ ফুট থেকে একশো ফুট পর্য্যন্ত চওড়া হয়ে ক্রমশ নীচের দিকে নেমে গেছে ক্রমনিম্ন হয়ে। ঢালু স্তর ছইঞ্চিতে এক ইঞ্চি খাড়াই। অর্থাৎ ছয় ইঞ্চি পা বাড়ালেই এক ইঞ্চি নীচে নামতে হবে। বিভিন্ন স্তরে কয়লা তোলবার জন্য চিনতোড় এলাকায় কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন জায়গায় সোজা গর্ত খুঁড়ে লিপট নামিয়েছে, কলিয়ারীর ভাষায় এই কুয়োজাতীয় গর্তকে বলে 'স্যাপ্ট'; স্তর হিসেবে কোনটা তিনশ, কেউ বারোশো—কেউ বা স:েরশ' ফিট সোজা নেমে গেছে পাতালে বড় কুয়োর মত। ভিতরের গরম হাওয়া উঠে আসছে হু হু গতিতে, ঢুকছে বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস, জীবনধারণের জন্য এই পাতালপুরীতে ওই একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু। অন্যদিকে একটা একজষ্ট ফ্যান বসিয়ে ভিতরের বাতাস টেনে এনে কিছু বাইরের বাতাস ঢোকাবার চেষ্টা করা হয়েছে।

চিনতোড় পাঁচ নম্বর পিট সবচেয়ে নীচুস্তরের কয়লা তোলবার জন্য নেমেছে সতেরোশ' ফিট নীচে। তারপরই পদযাত্রা। ঢালু কয়লার স্তর চলেছে আরও নীচের দিকে, থেমেছে প্রায় বাইশশো ফিট নীচে জমাট কয়লার স্তরের প্রান্তে।

বসন্ত অবাক হয়ে চেয়ে থাকে ; সারি সারি ক'জন মালকাটা বাতিঘরের সামনে দাঁড়িয়ে কোমরে বেল্ট বাঁধছে। ময়লা নেংটির মত কাপড় পরা, ঝুড়ি গাঁইতি নামানো। আবছা অন্ধকার তখনও মুছে যায় নি। নদীর ওপারের বনে ডাকছে ঘুম ভাঙ্গা পাখী, পথের মার্কারি ভেপারের আলো গুলো জ্বলছে ; চুপকরে ওরা বাতি নিয়ে এগিয়ে যায় পিটে নামবার উচু প্লাটফরমের উপর।

ক্লিপক্রেকের বিরাট পিটহেড গিয়ারের বাইশ ফুট ডায়ামেটারের চাকাটা ঘুরছে-মসৃণ গতিতে, গ্রিজ মাখানো ষ্টিলরোপ নেমে চলেছে অতলের দিকে।

দুটো লিপট ঠিক লোহার ডুলি বা খাঁচা জাতীয়। কোলিয়ারীর আইনে দুটো দুরকম পাওয়ারে চলে। একটা ষ্টিম বয়লারের অন্যটা ইলেকট্রিকের। যদি একটা খারাপ হয়ে যায় বিশেষ কোন কারণে, অন্যটা হয়তো চালু থাকবে।

—বাতি, দেশলাই মৎ লেনা।

হুসিয়ারী হাঁক পাড়ে পিট ওভারম্যান।

একটা গরম হাওয়ার স্রোত ঠেলে উঠে আসছে সশব্দে, বসন্ত চমকে পিছনে সরে আসে। পাতাল থেকে এসে ডুলিটা থামলো পিট হেডে। ক'জন কালিমাখা অবস্থায় নেমে এল। টিম টিম করে জ্বলছে আলো। অপরের মুখ আবছা দেখা যায়।

— চলো।

মাখনের ডাকে বসন্ত গিয়ে উঠল ওদের সঙ্গে ডুলিতে।

তেল কালি আর বৃষ্টির জলমাখা লিপ্টটা, ও যেন এ জগতের কেউ নয়, অতল অন্ধকারের বাসিন্দা, ওদের নিয়ে যেতে উপরে এসেছে মাত্র।

একটা টিনের পাতে লাল রং দিয়ে হাতে লেখা রয়েছে—'বারোজন উঠিবেক'।

ওটা আছে মাত্র, যে কজন ছিল ঢুকে পড়ল খাঁচায়। ঢোকবার পথটা বন্ধ করল একটা ছোট শিক দিয়ে—মাথার উপর একটু ছাদ মত করা লোহার চাদর।

তিনটে ঘন্টি মারলো পিট ম্যান।

কয়েকটি মুহূর্ত! কোন অদৃশ্য জগৎ থেকে সাড়া আসে কিনা তাই শুনছে কান পেতে। যেন পৃথিবী থেকে মঙ্গল গ্রহে রকেট ছাড়বার জন্য প্রতীক্ষা করছে কারা এই কটি প্রাণীকে তার মধ্যে বন্দী করে।

একটু ক্ষীণ শব্দ ভেসে আসে।

নড়ে উঠল খাঁচাটা—তীব্র একটা ঝাঁকুনিতে।

অতল অন্ধকার হিংস্র নেকড়ের মত ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে ওই খাঁচার উপর, তার বিশাল মুখগহ্বরে সাপটে পুরে নিয়ে চলেছে ভিতরের দিকে মসৃণ গতিতে।

খাঁচার মধ্য দিয়ে মাথার আলোর ঝলকে দেখা যায় জমাট পাথরের স্তর এবড়ো খেবড়ো, যেন দাঁত বের করে রয়েছে। মাটির অন্তরে একটির পর একটি পাথর, কয়লা আর জলের স্তর। সিমেন্ট দিয়ে প্লাস করা সত্ত্বেও স্তরে স্তরে সঞ্চিত জলরাশি চুইয়ে পড়ছে ঝর ঝর শব্দে, খাঁচার উপর বৃষ্টি ধারা নেমেছে। অবিরত অবিরাম এ বর্ষণ। কোনদিনই থামবে না, পাথরের গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে জলধারা, দ্রুত গতিতে নেমে চলেছে ডুলিটা—আলোর রেখা পিছলে আসে ওর শেওলা জমা গা থেকে। কতক্ষণ চলেছিল জানে না; চোখের সামনে হেডলাইটের আভায় ঝলসে ওঠা জমাট ওই স্তর পার হয়ে চলেছে তারা। একটা ঘণ্টা।

লিফটের গতিবেগ কমে এসেছে। নীচে থেকে আবছা আলো দেখা দেয়। ধীরে ধীরে এসে ডুলি থামল পাতাল পুরীতে।

বসন্ত ওদের সঙ্গে নামল 'সাপ্ট' থেকে; ঊর্ধ্বে দৃষ্টি যায় না, জমাট অন্ধকারের বুকে একটা ছোট্ট চকচকে সিকির মত দেখায় আকাশ, আলো হাওয়ার জগৎ, মানুষের পৃথিবীর সামান্যতম নিশানা।

পৃথিবী এখান থেকে বহু দূর। আকাশ ছোঁয়া কোন গ্রহলোক।

—ভয় লাগছে?

আবছা অন্ধকার—ঠিক ওর দিকে চেয়ে ঠাওর করতে পারে না বসন্ত; কেবল চকচকে চোখ দুটা দেখা যায়, চেয়ে আছে বসন্তের দিকে।

বসন্ত জবাব দেয় না।

তবু কণ্ঠস্বর যেন কেমন ক্ষীণ হয়ে আসে। ভয়জড়ানো কণ্ঠস্বর।

—বাতিটা জ্বালতে জান না?

বয়স অল্পই হবে ওর। কণ্ঠস্বর ঠিক ভারি ভরাট নয়, কলিয়ারীর কঠিন পরিশ্রমে ওর দেহের মতই গলার স্বরটাও ক্ষীণ।

বসন্ত মাথার আলোটার সুইচ ঘুরিয়ে নিয়ে আলোটা জ্বালল। ভারি জুতার শব্দ তুলে চলেছে ওরা অভ্যস্ত পায়ে।

—আয় মালু, তিন নম্বরে যেতে হবে।

মাখন হাঁক দেয় পিছনের ছেলেটিকে।

—যাচ্ছি!

অনেকের পায়ে জুতো নেই। মাথায় লোহার হেলমেটও নেই।

মালু হেসে ফেলে বসন্তকে দেখে—মাথা নীচু করে যাবারই নিয়ম। মাথা তুললেই বিপদ।

এগিয়ে চলেছে ওরা, কুলিদের ট্রলি লাইনের মাথায় মেসিন চলেছে। স্পার্ক প্রুফ মেসিন, একটু গোলমাল হলেই ওই মেসিন বন্ধ করতে হবে।

সোজা ঢালু নেমে গেছে লাইনটা—মাঝে মাঝে আলো জ্বালা রয়েছে কনডুইড পাইপের মধ্যে কেবল চালিয়ে। আবছা আলো আঁধার ঘেরা বীভৎস মূর্তির এই জগৎ।

পাশেই বোর্ডে লাগান নিষেধ বাণী—'এই পথে সাধারণের যাতায়াত নিষেধ'। সারি সারি টিবিং ওয়াগন টেনে আনা হচ্ছে পাঁচশো ফিট নীচ থেকে। নামবার সময় ওয়াগনগুলো কয়লার কাটা সুড়ঙ্গ বেয়ে বিদ্যুৎগতিতে নামছে, সামনে কোন বাধা পড়লে চুরমার করে দেবে, কোন মানুষ পড়লে দুআধখানা হয়ে যাবে। না হয়, বেলাইন হয়ে ছিটকে গিয়ে পাশের কোন লোককে সুড়ঙ্গের দেওয়ালের সঙ্গে চেপটে পিষে দেবে।

তাই এদিকে যাওয়া নিষেধ। এ বিপদ এখানে প্রায়ই ঘটে ; ওই টানবার ষ্টিলরোপ ছেঁড়াও সহজ ব্যাপার। ছিঁড়ে গেলেই টবগুলো এ ওর ঘাড়ে মাথায় ছিটকে পড়ে। মানুষ থাকলে তারাও থেঁতলে যায়। ওর ধার পাশে যাওয়া বিপদ।

মালু নিপুণ মালকাটার লব্ধ জ্ঞানটুকু বসন্তকে দেবার জন্য উস্‌খুস করছে। জমাট পাথরের দেওয়ালের গায়ে সাদা রং করা লোহার দরজা, তিন ফুট বাই তিন ফুট, উপরে বোর্ড লেখা—'ট্রাভলিং রোড'।

সজোরে দরজাটা পিছনের দিকে ঠেলতে খোলে। কে যেন তাদের গুপ্ত ধনাগারের প্রকাণ্ড সিন্দুকের মধ্যে পুরে দিয়েছে ঠেলে। একটা বন্ধ কুঠরী—জমাট আদিম অন্ধকার এখানে বাসা বেঁধেছে। হেডলাইটের আলো জমাট কালো দেওয়ালে গিয়ে হারিয়ে গেছে। ওপাশে দেখা যায় আর একটা তেমনি ছোট দরজা। সেটা টেনে খুলে তারা পায়ে চলা রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

এয়ার লক্‌ করা দরজা, মেইন স্যাফট থেকে হাওয়া হলেজের পথ দিয়ে চলে যাচ্ছে কলিয়ারীর ভিতর, অন্ধি সন্ধি ঘুরে সেই বাতাস অন্য পথ ধরে কয়েক মাইল দূরে বসানো একট্রা ফ্যান দিয়ে বাইরে যাচ্ছে।

এতক্ষণে কোলিয়ারীর অন্তরে এসে ঢুকেছে তারা।

বদ্ধ বাতাস, ক্ষীণতম তার সঞ্চরণ ; জমাট গরম, আর নিবিড় অন্ধকার। কল কল শব্দে রাস্তার পাশের নালায় জল বয়ে চলেছে নীচের দিকে।

গ্যালারির চাল থেকে টিপ টিপ করে জল নামছে। গায়ে পড়ে সেই অফুরান বৃষ্টির ধারা।

পিছল পথ, পাথরগুলোর অল্প শেওলা জমেছে। কয়লার ক্রমনিম্ন স্তরের সঙ্গে তারাও নেমে চলেছে ছয় ইঞ্চিতে এক ইঞ্চি গ্রেড ঢালু পথ দিয়ে। দুচোখের দৃষ্টি বার বার জমাট অন্ধকারে বাধা পেয়ে ঘুরে আসে। একফালি আলো তীক্ষ্ণধার ছুরির ফলার মত গেঁথে বসেছে অন্ধকারের বুকে।

আলোটা জ্বলছে একক পথিকের মত অতল অন্ধকারের রাজ্যে। কানে আসে জলধারার কল কল শব্দ ; পাম্পিং স্টেশনের দিকে চলেছে জলস্রোত।

—কষ্ট হচ্ছে ?

মালু এগিয়ে আসে।

বিচিত্র জগতে এসে বসন্তের সমস্ত চিন্তাশক্তি স্তব্ধ হয়ে গেছে নীরব আতঙ্কে। কথাও হারিয়ে যায় এখানে। কথা কইতে ভয় হয়, যেন কোন দৈত্যপুরীর অখণ্ড স্তব্ধতা ভেঙ্গে যাবে তার কথায়। নিজের কণ্ঠস্বর নিজের কাছেই অপরিচিত, অজানা বলে মনে হয় ; নিজের হাত পর্যন্ত দেখা যায় না। নিজের সমস্ত সত্তার নিঃশেষ অবলুপ্তি।

—আস্তে নামো ; মাথা নীচু করে।

—কতদূর যেতে হবে ? বসন্ত সাবধানে নীচের দিকে পা ফেলতে ফেলতে বলে। এ যাত্রার শেষ হলে যেন বাঁচে সে।

মালু জবাব দেয়—এইতো শুরু। যেখানে কয়লা কাটাই হচ্ছে সে আরও পাঁচশো ফিট নীচে। দামোদরের তলে। তা প্রায় পনেরো বিশ মিনিট লাগবে যেতে।

একটা স্মৃতি! রৌদ্রউজ্জ্বল প্যানচোত পাহাড়, লালপ্রান্তরে এখন হয়তো প্রথম সূর্য্যের আবীর রোদের মাখামাখি, জনারের খেতে লকলকে সবুজ গাছ-গুলো মাথা নাড়ছে সকালের বাতাসে। গেরুয়া জলভরা দামোদরের ঘাটে খেয়ানৌকার পাড়ি শুরু হয়েছে। মাছি মেঝেন চলেছে আনাজপত্র মুরগী নিয়ে পাশের গাঁয়ের হাটে।

—এসো। ওরা চলে গেল যে।

বসন্ত একা এই অন্ধকার পুরীতে থাকতে চায় না। সমস্ত শক্তি একত্রিত করে সেও ওদের সামিল হতে চায়। জোরে পা ফেলতেই কেমন যেন পাটা হড়কে যায়। নীচের দিকে নামছে। একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে বসন্ত; মুহূর্তের জন্য অসতর্ক হওয়ার ফল হাতে হাতে পেয়েছে। পরক্ষণেই কার দুটো হাত তাকে জড়িয়ে ধরে পাশে টেনে নেয়; দেওয়ালের বুকে ভর পেয়ে সামলে নিল বসন্ত। চমকে ওঠে নরম নিবিড় স্পর্শে!

কিন্তু কোলিয়ারীর নীচে তা কি করে সম্ভব হয়! হেডলাইটের একঝলক আলো পড়েছে ওর মুখে, মালুও অপ্রস্তুত হয়ে সরে দাঁড়াল। চোখেমুখে ওর সলজ্জ একটা অনুভূতি! নিজের মনের ঝড় চাপবার চেষ্টা করছে। প্রকৃত পরিচয়টা কাউকেই জানতে দিতে চায় না সে। প্রকাশ হলেই বিপদ। কি এক নিবিড় আতঙ্কের ছায়া ওর মুখে, থর থর করে কাঁপছে সে। বসন্ত চমকে উঠেছে।

বসন্তের মনে তখনও একটা বিচিত্র অনুভূতির অনুরণন। নরম নিটোল একটা স্পর্শ! সারা শরীরে কাঁপন ধরিয়েছে। এক মুহূর্তেই বিচিত্র একটা রহস্যের সন্ধান পেয়েছে সে।

—চলো।

বসন্ত চুপ করে চলতে থাকে। মালু বলে ওঠে ফিস ফিস করে,

—জানতে পারলেই চাকরী যাবে। মেয়েছেলের খাদে নামার নিয়ম নাই।···কিন্তু খেতে দেবে কে বলো?

বসন্তকে নিজের সমস্ত পরিচয় দিতে যেন তার কোন লজ্জা ভয় আর নেই। বসন্ত এগিয়ে চলেছে। পাথরের স্তর শেষ হয়ে কয়লার স্তরে নেমেছে তারা; বালি ঢাকা পথটা, কোথায় পিলার কাটিং করে বালি পুরছে, জলধারার সঙ্গে মিশে আসছে সেই বালি।

পথ চলা সহজ লাগছে বসন্তের। ক্রমশঃ এই অন্ধকার পুরীর জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। মালু সাবলীলগতিতে চলেছে। একবার চোখাচোখি হতেই মুখ নামিয়ে নেয়, কেমন যেন একটু হাসির আভা ফুটে ওঠে ওর মুখে।

—আঃ আলোটা সরাও না। মালুর মুখে বসন্তের মাথার আলো পড়েছে। বসন্ত অপ্রস্তুত হয়ে উঠে আলোটা সরিয়ে নিল অন্য দিকে।

ফড়িং সরকার কয়েক বছর আগে এসেছিল চিমতোড় কোলিয়ারীতে। বাঁকুড়া মুলুকের লোক। মাটির গুণেই কঠিন টং টংএ কঠোর, আর বেশ হুঁশিয়ার। সামনেই দুটো চোখ শুধু নেই, পিছনেও আছে দুটো। বাতাসে লম্বা নাক দিয়ে শোঁক শোঁক করে শুঁকে আগামী বিপদ বা লাভের হদিস পায়। কোম্পানীতে মাল সরকারী কাজ নিয়ে ভর্তি হয়েছিল। উঠতি টবের হিসাব রাখার চাকরী; দাঁড়িয়ে টবগুনতি করা পিটের মুখে, টব পিছু তিন পয়সা রেট।

খেলতে জানলে কানা কড়িতেই কী বাজীর দান মেলে—একথাটা ফড়িং সরকার হাতে নাতে প্রমাণ করে দেয় পাঁচনম্বর পিটের ম্যানেজার মিঃ ফস্টারকে।

মাসের শেষে হিসাব মত প্রায় দেড় হাজার দুহাজার টব উধাও কাগজপত্র থেকে, অবশ্য মালটা পাশের গাদায় থাকে; দেড় দুহাজার টন কয়লা। ফড়িং সেদিন ফস্টারকে একলা পেয়ে নৈবেদ্যর মত নিবেদন করে দেয় ওই কয়লার স্তূপ।

—টেক ইট সাহেব। বাট আই এ পুওর ম্যান। বুঝেছো দেবতা?

থোক দেড় হাজার টাকার আমদানী; ফস্টার 'হাঁ' করে চেয়ে থাকে মোটা কালো কয়লার রংধরা বাবুর দিকে। পাইপটা নামিয়ে বিস্ময় চাপবার চেষ্টা করে বলে ওঠে,

—সি মি এট দি অফিস।

ফস্টার সটান বাংলোয় যায়; এসব ব্যাপারে বেশি কথা কাটাকাটি করতে নেই। সায়লেণ্ট ওয়ার্কার সে।

গরীব মালকাটার হিসাব থেকেই এই কয়লা কাটার রেট খরচা হয়ে গেছে। কোম্পানীর লোকসান নেই, কয়লার হিসাবও নেই। সুতরাং দুদিক থেকে লাভ।

এ হেন রত্ন শ্রীমান ফড়িং সরকারের প্রমোশন হতে দেরী হয় না। মাল সরকার থেকে মুন্সী। এখানে নিজেই কিছু ম্যানেজ করতে পারবে।

উপরে তবু খোলা হাওয়া আলো মেলে। এখানে তার চিহ্নমাত্র নেই। বাতাস যদিও আসে এক আধটু ঠেলে ঠুলে, কিন্তু আলো বলতে ওই হেড-লাইট; ওল্ডহ্যাম কোম্পানীর বাতি। আর বিড়ি সিগারেট? এ মুলুকে ওর প্রবেশ নিষেধ। সুতরাং ফড়িং সরকার নিখরচার বাবাজী হয়ে ঢুকেছে পিটের

মধ্যে। বলে—অন্নের সুখে অরণ্যে বাস। পেটে খেলে পিঠে সয়, হুঁ হুঁ বাব্বাঃ।

জমাট অন্ধকারে সারি সারি চোখ জ্বলছে, এক চোখো দৈত্যের অনুচর দল কাজ করছে। এখানে এখনও লাইট আসেনি, নতুন কোলফেসে কয়লা কাটাই সুরু হয়েছে। বেশি রেজিং না হলে হিসেবে ডান হাত বাঁ হাত করা যাবে না। এদিকে মালকাটাদের তখনও দেখা নেই। গজ গজ করছে ফড়িং আপন মনেই।

উপরের দিকে কয়েকটা আলো, টুকরো কথাবার্তার শব্দ শুনে হুঙ্কার দিয়ে ওঠে ফড়িং ;

—আয় বাবা সকল ; বলি কাজে হাত দিবি, না মাগনাতেই কোম্পানী পয়সা দেবে ? না দিলেই কোম্পানীর দোষ। কম্মো ধম্মোঘট।

দলবল সমেত এসে দাঁড়াল সামনে ; কাঁধ থেকে ঝুড়ি গাঁইতি নামিয়ে জিরুতে থাকে তারা।

—কই কাজ দাও মুন্সীবাবু।

ফড়িং খিঁচিয়ে ওঠে— গাছের ফল কিনা, মুন্সীবাবু টপ্ করে পেড়ে হাতে তুলে দেবে রে ? যত সব ফাজিল কাণ্ড। কই খৈনি দেখি।

কোলিয়ারীর নিরাপদ নেশা, আগুন পানির বালাই নেই। চুন দিয়ে রগড়াও আর ঝেড়ে ঝুড়ে ঠোঁটে পোর, মিটে গেল ঝামেলা। আর ওটা পরের খরচাতেই চলে সহজে। তুচ্ছ জিনিস ;

মাখন খানিকটা জটাপাকানো তামাকপাতা ওর হাতে তুলে দেয়। মহাদেবকে যেন প্রণামী দিচ্ছে। প্রণাম করেই বর প্রার্থনা।

—একটা নরম জায়গা দেখে দাও বাবু, সঙ্গে অজানা লোক, আকামা সাপ। কি কখন করে বসে বলা যায় না।

ফড়িং সরকার বাতির আলোয় নিবিষ্ট মনে খৈনি রগড়াচ্ছে, কথাটা তখন ঠিক কানে ঢোকায় নি ; ইচ্ছে করেই বোধ হয়।

ওভারম্যান শরণ সিং পাতাল পুরীর জ্যান্ত দেবতা ; লম্বা বলিষ্ঠ দেহ, প্রতিটি মাংসপেশী সুগঠিত। অন্ধকারে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আন্দাজ আঠারো ঘণ্টা থাকার ফলে চোখের তারা দুটি থেকে পিঙ্গল একটা দীপ্তি বের হয়। মাথায় কালো হেলমেটের সঙ্গে লাগানো কেব্‌লবাতি।

একহাতে ঝুলছে ডেভিস ল্যাম্প, অন্য হাতে লোহার নাল বাঁধানো লাঠি ; কোলিয়ারীর মাথার চালে অভ্যাস মত ঠুকে চলে—ঠুক ঠুক ঠুক।

কান পেতে শোনে আওয়াজটা, সুরেলা জমাট ছন্দবদ্ধ শব্দ। স্তরে স্তরে ঘা খেয়ে ফিরে আসছে ওই নিটোল শব্দ, কানে বাজে।

—ক্যা মাংতা ? ওদের কাছে এসে দাঁড়াল শরণ সিং।

জবাব দেয় ফড়িং সরকার—আবার কি ? কাঁচা কয়লার চাল চাই ; পদ্ম হাতে গাঁইতি ছোঁয়াবে আর ঝরঝর করে পুষ্পবৃষ্টির মত কয়লা পড়বে, উনি কুড়িয়ে নিয়ে টবে পুরবেন।

সন্ধানী চোখ শরণ সিং-এর, মাথার আলোটা বসন্তের মুখে এসে পড়েছে। পিছনে ওর সন্ধানী দৃষ্টি। চেনামুখগুলো পার হয়ে আলোর রেখা তির্যক গতিতে তার মুখের উপর পড়ে স্থির হল। জেরার স্বরে প্রশ্ন করে অন্ধকারের তল হতে।

—নয়া আদমী ?

—হ্যাঁ! এগিয়ে যায় বসন্ত। আবছা অন্ধকারে মালু ওকে চিমটি কেটে কি ইশারা করে। ঠিক বুঝতে পারে না বসন্ত। শরণ সিং ঝাঁঝালো কণ্ঠে হেঁকে ওঠে

—সেলাম করো।

—কিউ ? বসন্ত অবাক হয়ে যায়।

—কানুন নেহি জানতা ? শরণ সিং বোমা ফাটার মত আওয়াজ করে।

ফড়িং সরকারের চটকা ঘুম এসেছিল ; হাঁকাড়ির চোটে ঘুম ভেঙে যায়, গজগজ করতে থাকে

—লে বাবা, পাঁইয়ার মাথা গরম হয়ে উঠেছে খাদের গুমোটে।

বসন্ত ওর হুকুম মতই হাত ওঠালো নেহাৎ তাচ্ছিল্য ভরে। শরণ সিংও টের পায় ব্যাপারটা, সর্দারকে হুকুম দেয়

—তিন নম্বরমে দেও !

—জমাট পাথর যে উখানে ? মাখন বলে ওঠে।

কথাটা শরণ সিং কানে তোলে না। এগিয়ে গেল ডেভিস ল্যাম্পটা তুলে চাল ঠুকতে ঠুকতে। জজ সাহেব যেন মৃত্যু দণ্ডের পরোয়ানায় সই করে উঠে গেলেন এজলাশ হতে যন্ত্রচালিতের মত।

ফড়িং সরকার এগিয়ে আসে। সাপ হয়ে ঝাড়ে রোজা হয়ে ফোঁকে। ফিসফিসিয়ে ওঠে সে

—তু টব ছাড়ান দে মাখনা, ভাল জায়গা পাবি। বলে কয়ে ঠাণ্ডা করি পাঁইয়াকে।

কি যেন ভেবে মাখন শক্ত কণ্ঠে জবাব দেয়—না। চলরে তিন নম্বরে।

ফড়িং সরকার খৈনিতে চুন ডলতে ডলতে মুখ বিকৃত করে বলে ওঠে

—যা, কাটগে জমাট পাথরের আস্তর, সুখে থাকতে ভূতে কিলোয় তোদের।

রাগের বশেই ফড়িং সরকার হাতের চুন ডলা খৈনিতে জোর জোর থাপ্পড় কসতে থাকে।

ব্যাপারটা কি ঘটল এবং আপোশের শর্তটা ঠিক বুঝতে পারে না বসন্ত; তবে বেশ বুঝতে পারে শরণ সিং তাকে আদৌ ভালো চোখে দেখে নি; তাই বোধ হয় এই শাস্তির বিধান। মাখনও তাই মেনে নিয়েছে।

—সর্দার! বসন্ত কি বলতে গিয়ে মাখনের গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে গেল। লোকটার চোখে মুখে একটা দৃঢ়তা, উঁচু চোয়ালের হাড় দুটো প্রকট হয়ে উঠেছে।

আগুনের হু হু তাপমাখা বাতাস, গলি খুঁজি সুড়ঙ্গ সুঁদ পার হয়ে আসতে আসতে সর্বাঙ্গ তেতে ওঠে। গা দিয়ে দর দর করে ঘাম ঝরছে, চালের উপর থেকে তির তির ঝরছে চোঁয়ান জল, হিম কণার মত ঠাণ্ডা। সারি সারি আলো জ্বলছে রাতের আঁধারে মিট মিটে বিড়ালের চোখ জ্বলার মত, উৎস মূলেই আলোর গতি স্তব্ধ হয়ে গেছে। ধুলো, পাথর আর কয়লার চূর্ণ কণায় নাক চোখ বন্ধ হয়ে আসে। বাতাস আচ্ছন্ন করে তুলেছে কয়লার ধুলো।

—কে বাবা? তুমি এয়েছো কিস্‌কে?

মানভূমি টাঁড় ভাষায় সম্বোধন। লোকটাকে চেনা যায় না, হাতে ছিনি হাতুড়ি। ব্লাষ্টিং করবার জন্য জমাট পাথরের বুকে গর্ত খুঁড়ছে। মুখে একপুরু কয়লার স্তর; চোখের পাতার ভিতরে লালচে আভা, মুখে ঠোঁটের লালচে আভাস কালো মুখে বীভৎসতা এনেছে। চোখদুটো ঢ্যালার মত বের হয়ে আসছে।

গজরাচ্ছে নেংটি পরা লোকটা

—শালা লোহা বরাবর, এর তলে কয়লা আছে বলে কুন শালা?

মাখন স্তব্ধ হয়ে এসে দাঁড়াল। এই পাথর কেটে তারপর কয়লা বেরুলে কি-ই বা পাবে কে জানে। একা রোজগেরে, ঘরে চারজন খেতে, বসন্তও ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে। একা বসন্তের জন্যই যেন ওদের এই বিড়ম্বনা!

বসন্ত বলে ওঠে—মুন্সীর কথাই শোনো ওস্তাদ, দু টব কি চাইছিল?

মাখন শক্ত কণ্ঠে জবাব দেয়—একদিন কোলিয়ারীতে নেমেই এখানকার ধাত শিখে গেছো? বককে বিল দেখাতে নাই, এদের পয়সার ফাঁক দেখাই দিলে সব পয়সাই খেয়ে লেবে ওরা।

কঠিন স্বরে বলে ওঠে—উঁহু, ওতে আমি নাই। লারবো। বসন্ত চুপ করে যায়, নিজেই একটা অপরাধ করেছে ওকে ওই আপোশের কথা বলে।

মাখন কয়লার স্তর খুঁজতে থাকে—বাঁ পাশে গাঁইতি চালা। হুঁশিয়ার, যেন ফিনকি না ছোটে। জলে ভিজিয়ে নে জায়গাটা।

বসন্ত পাশের নয়ানজুলি থেকে আঁজলা আঁজলা জল তুলে ছিটিয়ে দিতে থাকে কয়লার জমাট পাঁচিলে। গড়িয়ে পড়ছে জলধারা। খাদের সঙ্গে মিশে যায় জলকণা।

···ঘড় ঘড় শব্দ।

মুন্সী ফড়িং সরকার এক ব্যাচ টব হলেজ স্টেশনে ডেসপ্যাচ করে কয়লার চ্যাঙড়ের উপরই আড় হয়ে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে। টিবিং ওয়াগন আসবার গুরু গুরু শব্দ ও দূর থেকেই শুনতে পায়, চটকা ভেঙ্গে উঠে বসে। নরককে ছয় করবার জন্য দুবার তুড়ি দিয়ে হরিনাম করে খাতা পেন্সিল হাতে এগিয়ে যায়।

কোথায় ব্লাস্টিং হচ্ছে···গুরু গুরু কাঁপছে অন্ধকার পুরী, চাল থেকে ছিটকে পড়ে কয়লার আলগা কুচি। শব্দটা তখনও মিলোয় নি।

মালকাটাদের কেউ গজ গজ করে—লাগে একবার লাগ ভেলকি, উসব হরিনাম ফরিনাম বার হয়ে যাবেক। মাটির ওপরের দেবতার বাবারও সাধ্যি নাই এই অহিরাবণের ব্যাটা মহীরাবণের রাজ্যিতে এসে টঁ্যা ফুঁ করবার। একেবারে ইঁদুর চাপা।

—কে রে? কুন সমন্ধী বটে?

ফড়িং এর বাঁকড়ী বাখান ঠোঁটের ডগে উসখুস করছে। জবাব পেলেই ঝরে পড়বে ঝরাপাতার মত।

অন্ধকারে বক্তা কখন গা ঢাকা দিয়েছে।

টব শুনছে ফড়িং সরকার—তিন, চার, পাঁচ—

একদমে চারকে তিনে লঘুকরণ করে ফেলেছে ততক্ষণে।

ঘেমে নেয়ে উঠেছে ওরা, গাঁইতির ঘায়ে ঝুর ঝুর করে পাশ থেকে খসে পড়ে চ্যাঙড় কয়লা, আড়াআড়ি চোট মারলে গাঁইতি বসবে না, ঠিক্‌রে ফিরে আসবে বুমেরং-এর মত। দুমুখো গাঁইতি, দুই দিকেই ওর বিপদ। স্তরের চিড় বুঝে গাঁইতি চালালেই কয়লা খসবে মাপমত। অসতর্ক চোটে বিরাট স্তূপই ধ্বসে পড়বে, পিষে ফেলবে ওদের গুষ্ঠী শুদ্ধ নির্মম প্রাণঘাতী নিষ্পেষণে।

জোরে গাঁইতি মারাও বিপদ, গ্যাস জমে থাকলে এই সামান্য ফিন্‌কিতেই অগ্নিকাণ্ড, বিস্ফোরণও ঘটে যাবে। ঘামে ভিজে নেয়ে উঠেছে। সামনেই নয়ানজুলিতে গিয়ে ঠাণ্ডা হিম গলা জল গায়ে মাথায় ছিটিয়ে আবার এসে গাঁইতি ধরে। দেহের ভিতরের অসহ্য গরম আর বাইরের ঠাণ্ডায় একটা অদ্ভুত মেশামেশি। তবুও সয়ে গেছে তাদের। কাশে, সর্দিতোলে, কালো কয়লার ধুলো রং-এর সর্দি। আর একবার গাঁইতি ধরে কাশির রোখ সামলে।

—হুঁশিয়ার। এই হারামজাদা।

নরম কয়লার স্তর পেয়ে বেশি মাল কাটবার লোভ ছাড়া মাইনারের পক্ষে অসম্ভব। টব বোঝাই হিসাবে পয়সা, জ্ঞান হারিয়ে সে টব বোঝাই-এর স্বপ্নে বেমাপে কয়লা কেটে সুড়ঙ্গকেই অযথা চওড়া করে তুলে ধ্বসে পড়বার কাৎটা এগিয়ে দেবে।

হুঁশিয়ারী নজর রাখে সর্দার, ওভারম্যান সকলেই।

কয়লা কেটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে গ্যালারিতে তুনপলস্তারা হয়ে চলেছে, চারিদিকের দেওয়ালের কয়লার কালো নগ্ন আবরণটা একটু সেই সাদা আস্তরে ঢেকে গেলে আলোও একটু বোঝা যাবে, আর মালকাটার পক্ষে এসেই চুরি করে কয়লা কেটে টব বোঝাই করার ফিকিরও বন্ধ হবে। মাপা সাতফিট চওড়া চার ফিট উঁচু সুড়ঙ্গ চলবে, নইলে একুশ শো ফিট জমাট পাথরের স্তর যে কোন মুহূর্তে ধ্বসে পড়ে ওদের পথ রুদ্ধ করে দেবে, সামান্য হাওয়া যাবার রন্ধ্রটুকুও। কোন বিপদ ঘটলে হাওয়াশূন্য বোতলে বন্ধ ইন্দুরের মত ছটফট করে দম ফেটে মরবে মাটির নীচে সব কটি প্রাণীই।

তবু সহজে টাকা রোজগার করতে গিয়ে ওরা নিজের, অন্যের প্রাণটা ওরা পাশার ছকে এড়ে দিতে পারে।

বসন্তের সারা শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা, কয়লার স্তূপ তুলে টব বোঝাই করে দুজনে ঠেলে আনছে হলেজের কাছে। মুন্সী পিটপিটে চোখ খুলে দেখে,

—এলি বাবা? ওই, ইযে পুস্প বোঝাই হইছে গো, কয়লাতো লয় ময়রার দুকানের বারকোসে জিবে গজা সাজানো। টুসকি দিলেই নাই। লে বাবা, কোম্পানীর মাল দরিয়ামে ডাল। একটু চুড় দিয়ে বোঝাই কর বাবাধন।

বসন্ত ওর খাতার দিকে চেয়ে থাকে, পেন্সিলটা একবার দাগা বুলিয়ে ছেড়ে দিল মাত্র, নোতুন কোন হিসাবই পড়ল না খাতায়; ঘামে দগদগে পিঠ পেন্সিলের উলটো দিক দিয়ে খসখস খুসকোতে থাকে ফড়িং সরকার। হুকুম জানায়,

—লে, ঠেলে হুরু কর। হইছে।

—কই লিখলেন না? বসন্ত সোজা ওই হুকুম অগ্রাহ্য করে বসে।

ফোঁস করে ওঠে ফড়িং—বাঁশের চেয়ে কঞ্চিও দড়। লিখিনি মানে? ওইতো লিখলাম হে?

বসন্ত বলে ওঠে—লেখেন নি, দাগা বুলিয়ে ছেড়েছেন। কই নোতুন অঙ্ক কিছুই বসেনি, সরকারের হিসাবে। ছ'টব গেছে, লিখেছেন পাঁচটা। ওই তো!

চারিদিক থেকে জলন্ত আলোগুলো একচোখো দৈত্যের মত এসে জমেছে; ঘিরে ধরেছে ফড়িং সরকারকে ওই অশরীরী আলেয়ার দল। ওরা অনেকেই সারাদিনের পরিশ্রমের পর ঘর্মাক্ত কলেবরে একমাইল পথ হেঁটে পিটবটাম থেকে উপরে এসে হিসাব দেখে গুমরে ওঠে। অন্যদিনও এটা ঘটতো। মাথন সর্দার ঠিক করতে পারে না। নিজেরাই বলাবলি করতো।

—এত কমতি কিসকে, ল টব দিইছি, হ্যাঁরে বুধন, কটো বটে হে?

বুধন কাঁধ থেকে টাঙ্গানোটা নামিয়ে বিজ্ঞের মত জবাব দেয় চোখ পিট পিট করে

—হবে বটে গোটা কতক! তা মন্দ লয়; এক গণ্ডা, দু গণ্ডা, কে জানে কটো!

বুধন ফকিরও ঠাওর করতে পারত না। শুধু ওর দলেই নয়, অন্য দলেরও হিসাব ঠিক হচ্ছে না।

এ প্রশ্নের কোন মীমাংসাই হয় নি, চুপ করে গেছে তারা। আজ হাতে নাতে ধরা পড়েছে ফড়িং সরকার ওই নোতুন ছোকরার সামনে।

কে যেন হেঁকে ওঠে—ওহে সরকার বাবু, রোজই কি দাগা বুলোয় আসতা ?

বসন্ত ঠায় দাঁড়িয়ে আছে, অন্যান্য মালকাটারাও এসে ঘিরে ধরেছে।

—ই কি ধর্ম্মের কাজ গো ? ওরে-বাবা। রক্ত জল করা পয়সা গাব করছে হজবল ?

সরকার বাবু ঘেমে উঠেছে অজানা ভয়ে, তথনকার মত ব্যাপারটা চাপা দেবার জন্য ধমকে ওঠে

—এই দেখ কেন্নে, লিখলম তো ন'টব।

ফকির বলে ওঠে—তা তুমি আগে লিখ নাই কেনে হে ? গেঁদোটা কুথাকায় ?

শরণ সিং কোলিয়ারীর দেওয়ালে যেন সর্বদাই কানপেতে আছে। এক প্রান্তের কয়লার চোটের শব্দ তার কান এড়ায় না, হঠাৎ এতগুলো গাঁইতির আওয়াজ শব্দ থেমে যেতেই ডুনম্বর ফেসের দেওয়ালে কান রেখে কি শুনতে থাকে।

না, কোন শব্দই শোনা যায় না। ভূগর্ভস্থ স্তরে কোন আঘাতই কেউ করে নি আর।

কি ভেবে নিমেষের মধ্যে ডেভিস ল্যাম্পটা হাতে তুলে নিয়ে দৌড়তে থাকে ঢালু পথ বেয়ে অভ্যস্ত পদক্ষেপে। কে জানে কি গণ্ডগোল ঘটছে।

ইনক্লাইণ্ড যেখানে শেষ হয়েছে সেইখানে এসেই জটলাটা শুনতে পায়, রন্ধ্রে রন্ধ্রে কথাগুলো ধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলে এগিয়ে আসছে।

কোলপিটের এই দৃশ্য তার কাছে নোতুন নয়, কিন্তু এ কোলিয়ারীতে এসে দশবছরে এমনি ঘটনা ঘটতে দেখেনি, কর্তৃপক্ষের শাসন ওখানে কড়া।

—এই ক্যা হুয়া ? এই শালা লোগ ? তেরি—

এগিয়ে যায় শরণ সিং যেন এসবের কিছুই জানে না।

মৌচাকে ঢিল পড়েছে, লম্বা চেহারা আর ও বাজখাই গলার পাঁইয়া টান শুনে অন্ধকারের মধ্যে আলোগুলোর একটা চাঞ্চল্য দেখা দেয়, ক্রমশ ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় তারা।

মাখন এতক্ষণ বেশ জোরেই চিৎকার করছিল, সেও থেমে গেছে। বেশ

বুঝে ফেলেছে সে এই অন্যায়ের পিছনে একা ফড়িং সরকারই নেই, আরও অনেক ঊর্দ্ধতন কর্মচারীও আছে, যারা দরকার হলে পিষে মেরে ফেলবে ওদের। কোন বিচারই হবে না। নিস্ফল আক্রোশে মনে মনে গজরাচ্ছে মাখন।

সবাই সরে যায় যে যার কাজে। ফড়িং সরকার আঁধারের মধ্যে কার যেন খোঁজ করছে, শরণ সিংকে দেখে ভরসা পায়।

—বল রে, কই এগিয়ে এসে বল কি বলছিলি? বলে কিনা টবের হিসাব ঠিক লেখনি? ভারি আমার লিখনেওয়ালা আইছে রে? তা যা কেনে আপিসে কাজ করগা। এই অন্ধ নরকে পচতে আইচিস কেনে? ফড়িং সরকার এমন ছ্যাঁচড়ামি করে না। বাপের বেটা হস্ তো এগিয়ে এসে বল— কি বলেছিলি। আয় শালা বেজন্মা।

অন্ধকার পুরীতে অখণ্ড স্তব্ধতা নামে, তারই মাঝে ফড়িং-এর কথাগুলো সুড়ঙ্গের ভিতর পাক খেয়ে ফুলে উঠছে সাপের মত; বসন্ত এগিয়ে যাবে, হঠাৎ মালু হাতটা ধরে ফেলে।

—যেও না! ফিস ফিস করে বলে ওঠে সাবধানী কণ্ঠে। বসন্ত ওর দিকে চোখ তোলে, রাগে জ্বলছে বসন্তের সারা শরীর, চোখে মুখে সেই জ্বালার প্রকাশ।

—এ জগতের কানুন আলাদা, ওপরের নিয়ম এখানে অচল। আলোয় কিছু লুকোন যায় না, আঁধারের বুকেই সমস্ত জানোয়ার ছাড়া পেয়ে গর্জে বেড়ায়। এখন থাক। মালু দৃঢ় চাপা স্বরে বলে ওঠে।

কি ভেবে বসন্ত থামল।

শরণ সিং ধমক দিতে থাকে—যাও, কামমে যাও। কাওয়ালীকা আসর নেহি হ্যায়।

ব্যাপারটা তখনকার মত চাপা পড়ল। ফড়িং সরকার আবছা অন্ধকারে প্রথম কে কথাটা বলেছিল তারই মুখ, দীর্ঘ চেহারাটা স্মরণ করবার চেষ্টা করে; কিন্তু আলো আঁধারিতে এখানের কয়লামাখা সব মূর্তিই একাকার, কোন স্বাতন্ত্র্যই নেই।

তবু মনে মনে খুব অসন্তুষ্ট হয়, এবার থেকে নয়কে কথায় কথায় ছয় করা যাবে না।

লাইনে টব আসছে, উঠে গিয়ে ফড়িং গুনতে থাকে।

—রাম দুই তিন। বাতিল, কয়লা না লিগনাইট পাথর তুলেছিস বাবা? হুঁ হুঁ সিলেক্টেড কোলিয়ারীর কয়লা—লোহা গলবে। এতে কি ফড়িং সরকার গলে? চার, পাঁচ—বোঝাই আধা।

হাতে না মেরে ভাতে মারবার চেষ্টা করছে ফড়িং সরকার। মুন্সীর পিছনে লাগার মজাটা বুঝিয়ে দেবে এইবার। পুরো বোঝাই চাই, কয়লার তরি তফাৎও নজরে আসে।

ঘড়ি ঘণ্টা কিছুই নেই, অতল অখণ্ড অন্ধকার ঢাকা মহাকাল। তাকে এখানে খণ্ডিত করবার কোন আয়োজনই নেই। সকালের সূর্য্য ওঠে না রাতের শেষ ছোঁয়া মেখে; সন্ধ্যার বিষণ্ণতায় ঢাকে না এই জগৎ। নিবিড় আঁধারের সমুদ্রে ভেসে চলেছে এর কাল—দণ্ড—প্রহর। জীবনের স্রোত কালের অসীম নিস্তরঙ্গ সমুদ্রে এসে হারিয়ে গেছে।

মাথায় বাঁধা বাতির আলো লালচে, ক্ষীণ হয়ে আসে। শরীর যেন আর নাড়ানো যায় না; কয়লার স্তরে গাঁইতির ঘা বসছে না; এদের নিঃশেষিত শক্তি তখন চেতনা আনে, বোধ হয় আট ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। না হয় নোতুন সিপ্টের লোকজনকে আসতে দেখে এরা কাজ গুছিয়ে উঠে আসবার আয়োজন করে।

কয়লা একস্তূপ তখনও কাটা পড়ে আছে। টব আসেনি খালাস হয়ে। টব না গেলে কয়লা আগলে বসে থাকতে হবে, বোঝাই দিলে তবে পয়সা।

মাখন একটা পাথরের উপর বসে মুখে চোখে আঁজলা আঁজলা জল দেয়; আজকের ছোট্ট প্রতিবাদের কথা ভোলে নি। ঠিকই ধরেছে বসন্ত, টবের হিসাব চুরি করে ওরা; কিন্তু বলতে যাওয়া মানে কোলিয়ারীর চালে মাথা ঠুকে বাইশ শো ফিট গ্রানাইট পাথর সরানোর বৃথা প্রাণঘাতী চেষ্টা করা; চাল সরবে না এক চুলও, উল্টে হুড়মুড় করে ঘাড়ে পড়বে কখন।

বসন্ত নালার ধারে বসে টুপ টাপ করে পাথর কুচি ছুড়ছে জলে, পাম্পের শব্দ ভেসে আসে, একটা গুরুগর্জন; কাঁপছে ভূগর্ভস্থ জগৎ ঝর ঝর শব্দে। ছুটে চলেছে জলধারা পাতাল থেকে আলোর দেশে যাবার আকুল আগ্রহে।

—তুমি চলে যাও উপরে, টব বোঝাই দিয়ে আমরা যাচ্ছি।

মাখন ওকে একটু যেন শ্রদ্ধার চোখে দেখে, তাদের চেয়ে অনেক উঁচু

স্তরের, বাবু শ্রেণীর। কেন যে কোলিয়ারীতে এসেছে এই কাজে বুঝতে পারে না। মনে হয় চাকরির বাজারে আগুন লেগেছে। তাই বোধ হয় বাবুরাও আলো ছেড়ে আঁধারে আসছে এইবার। বসন্ত বলে ওঠে—না, না, এক সঙ্গেই যাবো।

—দেরী হয়ে যাবেক তুমার। মুন্সী আজ চটে আছে। ইচ্ছে করেই টব দেবে না সকাল সকাল, কে জানে এ পালিতে পাবো কিনা ?

অর্থাৎ এ সিপ্টেও টব না পেলে কয়লা পাহারা দিয়ে বসে থাকতে হবে। নইলে অন্য কোন হুঁশিয়ার মালকাটা ওই কাটা কয়লা নিজের টবে পুরে তার হিসাবে চালিয়ে নেবে, মুন্সীকে কিছু ভাগ বখরা দিয়ে।

বসন্ত অবাক হয়ে যায়—এ পালিতে তো দাম পাবে না, উঠে গিয়ে ফিরে এসে পরের সিপ্টে কাজ করতেও পারবে না ; কামাই ; তাহলে একরোজের মজুরী মারা যাবে ?

মাথা নাড়ে মাখন। ফড়িং সরকার পালি শেষ করে উঠে যাবার আয়োজন করছে। আড়চোখে চায় ওদের দিকে। মাখন একা নয়, আরও ক'জন মালকাটারই এই অবস্থা হয়ে উঠেছে। বেশ বুঝতে পারে অলক্ষ্যে কোথায় কলকাঠি নড়ছে।

শরণ সিং ঘুর ঘুর করছে আশেপাশে।

কোলিয়ারীর প্রথম পালি শেষ হয়ে দোসরা পালিতে পড়েছে। মালকাটা-দের সঙ্গে ফিরতি মুখে বসন্ত চলেছে ঢালু পথ ভেঙ্গে সাফটের দিকে ; ক'জন নীচে রইল, বাকী উঠে আসছে। নামবার সময় ঠিক বুঝতে পারেনি, ওঠবার সময় ওই ক্রমঊর্ধ চড়াই ভাঙ্গতে বুক পিঠে টান ধরে হাঁপাচ্ছে।

মালুর কথায় বসন্ত ফিরে চাইল, মালু বলে চলেছে।

—এ নিয়ে কোন কথা বাড়িয়ো না ; এসব এখানের সহজ ব্যাপার। দু-চার টাকা ধরে দেবে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। সওয়া অভ্যাস আছে এদের। প্রথম কিনা, তাই তুমি গজরাচ্ছ। দু চারদিন যাক, খেজুর গাছ তেল পারা হয়ে যাবে। কুঁদের মুখে বাঁক থাকে না।

মালু এখানের মর্ম খানিকটা বুঝেছে। চুপ করে সয়ে যাওয়া ছাড়া পথ এখানে নেই।

বসন্ত কথা বলে না, কোন গোলমাল বাধুকও চায় না। মালুর কারণ

আছে, দুর্বলতা আছে। কিন্তু এরা, এই কয়েক হাজার মালকাটা চুপ করে এই ব্যবহার সয়ে যায় কেন? এটা ভেবে উঠতে পারে না বসন্ত।

গুমরে ওঠা বিক্ষোভ শুধু জমছে, কোন দিনই কি ফেটে পড়বে না?

ভোরের বেলা নেমেছিল। পৃথিবীতে যখন উঠে এল, তখন আবার সেই অন্ধকারের যবনিকা নেমেছে। পিটহেডে জ্বলছে বাতিগুলো; এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া সজোরে তার মুখে গায়ে এসে আদরে জড়িয়ে ধরে মায়ের সোহাগের মত। চোখ বুজে এই স্পর্শটুকু অনুভব করবার স্বপ্ন দেখে বসন্ত। প্রকৃতির মধুস্পর্শ সারা শরীরে শিহরণ তোলে।

ইয়াকুব শেখ পাঁচওয়াক্ত নামাজ পড়ে কাবা শরিফের দিকে মুখ করে। কাঁচা পাকা দাড়িতে ফুর ফুরে হাওয়া মেহেদীর রংএ তুফান তোলে। এ অঞ্চলের মধ্যে নামকরা লোক। চালু কারবারী, বার্ণপুর, সুন্দরচক, ডিসেরগড়, বরাকর, জামুড়িয়ায় তার দিশী মদের ফলাও ব্যবসা।

মালপত্র একটি প্রধান কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন জায়গায় সরবরাহ হয়। কারবারে কয়েকখানা গাড়ি ছোটে হরদম। এ ছাড়াও অন্ধকারের আড়ালে অন্য ব্যবসা আছে। লোহা কারখানা আর কয়লাকুঠীর দেশে তার হাঁকডাক প্রতাপ সর্বজনবিদিত। অলক্ষ্য ক্ষমতা আরও উপরের সমাজেও ছড়িয়ে রয়েছে। ধ্বসে পড়া জমিদার গোষ্ঠীর বয়ে যাওয়া সন্তানরাও তার হাতে পুতুল।

তালকুই এর চৌধুরী বাড়ির মেজবাবু এসেছেন ওঁর গাড়িখানা বিক্রীর জন্য। ইয়াকুব সাহেব বিনয়ে গলে পড়ে,

—এ চাকলাইতো আপনাদের জমিদারী ছিল। ভূমিস্বত্ব, নিম্নস্বত্ব সবকিছু। রাজা লোক। তবে কি জানেন সবই নছিব!

আঙুলের টোকা মারে কপালে ইয়াকুব সাহেব।

মেজবাবুর টাকার দরকার, ইয়াকুব শেখের গদিতেই প্রায় হাজার খানেক টাকা বিলেত পড়েছে। ক্ষীণ প্যাকাটির মত লোকটার দিকে চেয়ে থাকে মেজবাবু অনঙ্গ চৌধুরী।

টেবিলের উপর রাখা একটা ড্রাইজিনের বোতল, প্লেটে ক'খানা পাপড় পোড়া ও কয়েকটা গরম পেঁয়াজ বড়া।

—নিন! ইয়াকুব শেখই ঢেলে দেয় গ্লাশে।

—আপনার? অনঙ্গ চৌধুরীর কথায় ইয়াকুব শেখ দু কান স্পর্শ করে জিব কেটে বলে ওঠে—হারাম। আমাদের শাস্ত্রে গোনাহ হয় এতে।

ময়রা নাকি রসগোল্লা খায় না। ইয়াকুব শেখ নিজেই এবার ডিষ্টিলারী খোলবার চেষ্টায় আছে। এবারের ইলেকশনে জিতিয়ে দিতে পারলে এই সুবিধা সে পাবে এ ভরসা কর্তৃপক্ষ দিয়েছে। জানলার বাইরে কালো রং-এর শেভ্রলেট খানার দিকে চেয়ে থাকে ইয়াকুব। ছ সিলিণ্ডারের মজবুত ঝকঝকে গাড়ি।

কয়েকবৎসর আগে কিনেছিল; লোভ হয়, তবু গলা নামিয়ে বলে ওঠে মিঞা—আপনারা রাজা লোক, ও গাড়ি চড়া কি আমাদের মানায়? ওষে বান্দার গোস্তাকী! দেখুন না কোন কোলিয়ারীর ম্যানেজারকে যদি গছাতে পারেন। অবশ্য যদি আমাকে বলেন, খদ্দেরও দেখে দিতে পারি। জানেন কি; খোদার ফজলে বিষয় এস্তকের উপর লোভ করা ছেড়েছি। কবে এন্তেকাল হয়—

মৃত্যুর কল্পনায় হঠাৎ মদের ব্যাপারীও ধার্মিক হয়ে উঠেছে।

কোলিয়ারীর আইন কানুন বদলে তার কারবার ফেঁপে উঠেছে। এই তো কয়েক বৎসর আগে পর্যন্ত ইয়াকুব অনঙ্গ চৌধুরী বড় তরফের নায়েব ছিল, বাতাসে এখানের মাটি ওখানে গিয়ে জমা হয়েছে। অবশ্য তার জন্য ইয়াকুব সাহেবও কম খরচা করেনি। প্রতিটি মেম্বার থেকে কোলবোর্ডের আপিস পিয়নকে পর্যন্ত সে খুশি করে আজও। সেলাম! বেয়ারা থেকে অফিসারকে পর্যন্ত সেলাম জানায় ইয়াকুব শেখ, মুখের হাসি কোনদিনই মোছেনি।

কোলিয়ারীতে মেয়ে মজুর নীচে কায করতে পারবে না। তাতে নাকি নৈতিক চরিত্র খারাপ হয় মালকাটার। অন্ধকারে ছাড়া জানোয়ার-গুলোর চরিত্র শোধরাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে অনেকে, মেয়েদের স্বাস্থ্যও টেকে না ওই আস্বাস্থ্যকর পরিবেশে, হয়তো আংশিক সত্যি। কিন্তু ওদের কায বন্ধ হবার পরই ধাওড়ায় ধাওড়ায় কেমন যেন সব জীবন যাত্রা ওলট পালট হয়ে যায়।

ওদের মদের বিক্রীও বাড়তে থাকে হু হু শব্দে। ফেঁপে ওঠে ইয়াকুবের দল, গজিয়ে ওঠে চোরাভাঁটি, আনুসঙ্গিক অনেক ব্যবসাই। আসানসোলের

ধারপাশে দেখ দেখ করে বেশ কিছু ব্যবসা গড়ে তুললো ইয়াকুব শেখ। রাতের অন্ধকারে সেখানে বেসাতি চলে ; অবশ্য শেখ ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

ইয়াকুব তামাক টানা বন্ধ করে, অম্বুরী তামাকের গন্ধে ঘর ভরে উঠেছে। হালকা নীল ডিসটেম্পার করা ঘরে ম্লান আলো ছিটিয়ে পড়েছে। অনঙ্গ চৌধুরীর বিবর্ণ চেহারায় লালচে চোখদুটো অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। দম বন্ধ হয়ে যাবার আগে যেমন শেষ বারের মত ছটফট করে, তেমনিভাবে অনঙ্গ চৌধুরী দর হাঁকে।

—পাঁচ হাজার টাকা হলে ছাড়তে পারি। অসহায় সেই কণ্ঠস্বর। ইয়াকুব দাড়ি চুমরে কাঁদুনি গাইতে থাকে—বুঝলেন কিনা রাজাবাবু, সরকার এবার কাজ কারবার তুলে দেবে আমাদের। লোক যদি লিখাপড়া শেখে, সব সুযোগ সুবিধা পায়, তালে আমাদের দরজায় আসবে কেন? জ্বালা থাকলে তবে তো ভুলতে আসবে?

আসল কথার দিক দিয়ে যায় না মিঞা, অনঙ্গ চৌধুরী অস্থির হয়ে ওঠে, উসখুস করে।

—তাহলে কাল আসছেন?

মিঞা ন্যাজে খেলছে, একটু দম ধরে থাকলে পাঁচ থেকে চারে আসবে। ওদিকে সুন্দরচক কোলিয়ারীর ম্যানেজার আট হাজার দাম দিয়েছে তাকে, ফাঁকা চার হাজার টাকা মুনাফা আসবে হাতবদল করে। ইয়াকুব জানলার বাইরের দিকে চেয়ে নিরাসক্ত কণ্ঠে জবাব দেয়,

—দেখি, ফোন করে জানাবো কাল।

ইয়াকুব সাহেব এগিয়ে দিয়ে যায় রাজাবাবুকে গেট অবধি, ছুটো আলসেশিয়ান কুকুর গজরাচ্ছে। বাতাসে কোথায় মেহেদী ফুলের চাপা সৌরভ।

—ভিখু!

পাশের ঘর থেকে পায়জামা পরা লোকটা এগিয়ে আসে, দাঁতগুলো পানের কসে তরমুজের বীচির মত মিশকালো, চোখের নীচে একটা আব ; পাঞ্জাবীর ফাঁক দিয়ে দেখা যায় গলায় কালো কার বাঁধা একটা তাবিজ ঝুলছে।

—গাড়ি বের কর, তেল নে গ্যালন পাঁচেক।

ভিখু কম কথার লোক, এক পায়ে খাড়া। এগিয়ে গিয়ে গ্যারেজ খুলে গাড়ি বের করবার আয়োজন করে, মালিক সোঁদে বেরুবে। সারাদিনমান ঘরে

ঘুমোয়, বড় জোর আসানসোল কোর্ট কাছারিতে যায় দরকার পড়লে ; আসল ব্যবসার কর্ম শুরু হয় রাত্রি সাতটা থেকে। ইঞ্জিনটা বারকতক গোঁ গোঁ শব্দে একটানা গর্জন করছে। টেল ল্যাম্পের লালাভ দীপ্তিতে ভরে ওঠে গ্যারেজ ঘর।

চড়াই-এর মাথায় কয়েকটা অর্জুন, বট গাছের জটলা। তারই একপাশে মাটির দেওয়াল ঘেরা খানিকটা জায়গা, ওপাশে একটা কুয়ো, জল অনেক নীচুতে। কুয়োর প্রথম খানিকটা বাঁধানো, তারপর নীচের দিকে জমাট পাথরের স্তর নেমে গেছে—সোজা। ঘড়ঘড়ি লাগানো একটা কাঠ থেকে বালতি নেমে চলেছে ; ওপাশে ধুঁকছে ছুটো আধ মরা আম কাঁঠালের গাছ ন্যাড়া ডাঙ্গার উপর।

মালকাটাদের ভিড় জমেছে মদশালের চারিদিকে, ইয়াকুব শেখের অন্যতম কেন্দ্র ; চোলাই-দিশী, মায় ধেনো পর্যন্ত কিছুরই অভাব নেই। চালার পাশে একটু জায়গাতে ময়লা তেল চিটে ডালায় কিছু ঝালবড়া, বাসি বেগুনী, তেলের পকৌড়ি আর কিছু কাঁচা লঙ্কা মুড়ি নিয়ে বসে আছে পা গোদা একটা লোক।

একপাশে গাদা করা কাঁচা শাল পলাশের পাতা। তাতেই মুড়ে বেসাতি দিচ্ছে। বাতাসে ধেনো মদের তীব্র ঝাঁঝালো টক গন্ধ ; রাতের আঁধারেও ছু-একটা মাছি উড়ছে।

বুড়ো ফকির মাঝি বটগাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে ঝিমুচ্ছে।

মাথার চুলগুলো পেকে উঠেছে,মুখের রেখাগুলো কুঞ্চিত, বহুদিনের সুখ দুঃখের স্মৃতি জড়ানো ওতে। হঠাৎ কানে যায় কার কথা, চোখ মেলে চাইবার চেষ্টা করে।

—ছ আনার দিবা কিন্তু। একসের কাঁচি।

—কালী মার্কা? দোকানী বলে ওঠে।

বুধন এক লোট কলাই সিদ্ধ চিবুতে চিবুতে বলে ওঠে—উঁহু, কালী বোতা খাবেক কি গো? আগুনপারা। উই ধেনো দাও কেন্নে।

হাঁড়িটায় মাপমত মদ ঢেলে এগিয়ে আসে লোকটা। বুধন হাঁ করে

মুখ খুলে বসে, একটু দূরে দাঁড়িয়ে কলসীর গায়ের ছিদ্রমুখ থেকে একজন আঙুলটা সরিয়ে নেয়। ফিন্‌কি দিয়ে পড়ছে ঘোলা ফ্যানের মত সাদা ঝাঁঝালো টক গন্ধময় পানীয় একেবারে বুধনের মুখে; কোঁৎ কোঁৎ করে গিলে চলেছে সেও। অভ্যাসের কাজ, বহুদিনের পাকা খোর।

ফকির মাঝি দেখে একটু চমকে ওঠে। তারই জাতের বৈশিষ্ট্যময় এ কায়দা। প্যানচোত পাহাড়ের ধারে ডুংরীতে মহুয়া ঝরে মাটি ঢেকে, তার থেকেই তৈরী করে মদ।

কেমন যেন হারানো সেই খোসবু ফিরে আসে। লাল গেরুয়া ডাঙায় চাঁদের ঢল নামা সন্ধ্যা, মাদলের শব্দ আর বাঁশীর সুর ভরা ফুল গন্ধময় কোন জগৎ।

ফকির উঠে বসেছে। মনটা আনচান করে তার।

—কে, কুথা ঘর বটে হে? ফকির এগিয়ে এসে শুধোল।

মাথায় জড়ানো ময়লা কাপড়ের একটা পাগড়ির মত, কানে ঝুলছে রূপোর কানবালা, মাথার চুলগুলো টংরা মাটির বুকে বন খেজুর গাছের মত জট পাকানো, বন বরার রোমের মত বেশ খাড়া। গায়ে মাটির গন্ধ।

বুধন পাগড়ির খুঁট দিয়ে মুখ মুছে কানের খাঁজ থেকে শালপাতার চুটি ধরাচ্ছিল, ওর কথায় চাইল ফকিরের দিকে। একটু থেমে জবাব দেয়,

—হাঁস পাহাড়ীর ডুংরীতে বটে! তুমোর?

হাসে ফকির, বুড়ো দাঁতপড়া লালচে মাড়ি বের হয়ে আসে। মলিন বিবর্ণ সে হাসি, ঘরের ঠিকানা হারিয়ে গেছে তার। মনে পড়ে দামোদরের ওপারেই ওই ছায়ান্ধকার পাহাড়, শাল পিয়ালের বন; মহুয়া ঝরা ডাঙা। অতীতে সেখানে বাতাসে ভাসতো কার বাঁশীর সুর। আজ ফকির সেই দামাল ছেলেটাকে ভুলে গেছে। জবাব দেয়,

—হোই ধাওড়ায় বটে, সাতলম্বর শূয়োর খুপরিতে।

নিজের রসিকতাতে নিজেই হাসতে থাকে ঘরের ঠিকানা হারানো ফকির।

দাঁড়াল না বুধন, কোমর থেকে ছোট্ট বেউড় বাঁশের বাঁশীটা বের করে ফুঁ দিয়ে সুর তুলতে তুলতে নেমে গেল আলপথ দিয়ে।

হাসছে ফকির; হঠাৎ মদের নেশা চাগিয়ে ওঠে, এক ভাঁড় নিয়ে বসলো। মনটা কোন সুদূরে হারিয়ে যায়।

তার জীবনও এমনিই ছিল একদিন। চোখের সামনে ভেসে ওঠে দিনগুলো।

তরঙ্গ আর সে। ঘর পালানো দুটি নারী পুরুষ। মহুয়া ডাঙা ছেড়ে এসেছিল, দুজনে দুজনকে পেতে। জুটেছিল এই চিনকুঠীর দেশে।

—কাজ করবি দুজনে ?

লোকের কদর ছিল তখন ; দামোদরের ঘাটের এপারে এসে উঠতেই আড়-কাঠির লোক ধরে, দালালের চেলা।

—কাজ ? কি কাজ বটে ?

—মাল কাটবি, দুজনে একটাকা পাবি রোজ ; থাকতে ঘর পাবি।

—একটাকা ?

বালির উপরই দাঁড়িয়ে কর গুনতে থাকে ফকির, অবাক হয়ে নদীর ধারের চিমনীগুলোর দিকে চেয়ে থাকে তরি ; ধোঁয়া বেরুচ্ছে ওদের মুখ দিয়ে, চাপ চাপ কালো জমাট ধোঁয়া। বন্ বন্ ঘুরছে বিরাট চাকাটা আশমানের মাথায়।

—উটো কি বটেরে ? অয় বাপ্।

দালালের লোক হাঁ করে চেয়ে দেখছে তরির যৌবন পুষ্ট নিটোল দেহের পানে। খাটো কাপড়টা শালকাঠপোড়া খার দিয়ে কাচা। হাঁটুর কাছে এসে থেমেছে, নিটোল পুরুষ্ট বাঁধনে ওই অফুরান যৌবন বাঁধা মানে না।

তরঙ্গের কথায় বিরক্ত হয়ে ওঠে ফকির, সব গোনাগুনি গুলিয়ে যায়। একটা টাকা! একটু চিন্তিত মনে বলে ওঠে—কতকের পয়সা বটে হে ?

—তা ঢের, ধর তিন কুড়ি পয়সা।

তরঙ্গ চমকে ওঠে, মিত পয়সার (একপয়সা) জন্য এক পণ জাম, না হয় দু-কুড়ি পিয়াল, না হয় দুমালা বৈঁচী ফল, নিদেন এক কুড়ি কুড়কি ছাতু তুলতে হয়, বনে বাদাড়ে ঘুরতে লাগে ঢের সময়, জলখাকি বেলাতক। এখানে ?

—হ্যায় বাপ্।

স্বপ্ন দেখছে তরি, ফকিরও যেন নোতুন দেশে এসে পড়েছে। পয়সা, ঘরবাড়ি, পরনের রঙ্গীন ডুরে শাড়ি, রূপোর কানবালা পৈঁছে!

স্বর্ণ মৃগের পিছনে ছুটে চলেছে তারা। দুজন এসে ঢুকলো ধাওড়ার ঘরে। পাথরের বাঁধানো ঘর ; বাতাসের ঢুকতে মানা ; খাদের নীচে খোলা

কুপি হাতে কাজ করতে নামে, কেরোসিন তেলের ডিবরি, তাই জেলে কয়লা কাটা।

দেদার কয়লা, কাট যেখান থেকে পারিস, টবের হিসেব নেই, রোজ ঠিকে। মালিক চায় চেঁছে পুছে তুলে নেবে মাটির অতল থেকে কয়লা। মাল-কাটার রোজ মাইনে। কয়লা বেশি তুললেই মালিকের লাভ। পুরুষ দশ আনা, মেয়ে কামিন ছ'আনা রেট।

বিশ, পঁচিশ বছর আগেকার কথা। গুটি কয়েক পরিবার একসঙ্গে নীড় বেঁধেছিল উৎরাই এর নীচে ঝর্ণার ধারে। কোলিয়ারীয় জল ঝরে চলেছে তির তির করে কালো পাথরে ঘা খেয়ে, ঠাণ্ডা মাটিতে কয়েকটা অশ্বত্থ গাছ বেড়ে উঠেছে। ছোট ছোট ঢালু জমিতে ওরা লাগায় বেগুন চারা—পালং শাক, লাউ-এর গাছ। ছাগল দু চারটাও পোষে। তাই নিয়ে মাঝে মাঝে ঝগড়াও বাধে নিজেদের মধ্যে সন্ধ্যাবেলায় খাদ থেকে কাজ করে ফিরে।

কোনদিন বসে অশ্বত্থ তলায় মদের আসর। যে যার ঘর থেকে ধেনো মদ আর মাংস—না হয় ভাত আনে। পঞ্চকোট পাহাড়ের বেউড় বাঁশের বাঁশী বাজে তুরু তুরু স্বরে, মাদলে ঘা পড়ে।

চিড়িক্ চিড়িক্ ধাকুম তাক্। ধাকুম্ তাক্।

ফকির যেন স্বপ্ন দেখছে। টক টক লাগছে এক ঢোক মদ, জলো বিশ্রী এর স্বাদ। হারানো দিনের সঙ্গে সব যেন বদলে গেছে। আকাশে ফুটে ওঠে পুরোনো রাতের তারাগুলো।

ফকির চুপ করে চেয়ে থাকে ; হু হু ঝড় বইছে মনে। সব তার কাছে ফাঁকা, অর্থহীন বোঝার মত ভারি ঠেকে।

—এ্যাই ধাওড়াকে যাবি না ?

ফকির পাঁচু নিকিরির ডাকে চোখ মেলে, কি এক স্বপ্ন দেখছিল সে। তরঙ্গের নিটোল দেহটার স্বপ্ন, হারানো তরঙ্গ। তবু বার বার মনে পড়ে তাকে।

ভাঁড়ের বাকিটুকু মুখে ঢেলে, উঠে দাঁড়াল। পা দুটো টলছে, ফকির কাকের বাসার মত উস্কোখুস্কো একমাথা চুল পাগড়ি দিয়ে সামলে নিয়ে এগোয়।

—এ্যাই ! চল !

পাঁচুরও একা চলবার মত অবস্থা নেই। ফকিরেরও তাই। দুজনে

দুজনকে ধরে টলতে টলতে চলে যেন বহু কালের বন্ধু। পাঁচু গান ধরেছে জড়িত কণ্ঠে।

—কালো জাম ফলেছে এ···

ঝুমুরি মাগীদের কাছে শোনা গান। কেমন যেন মনটা উদাস হয়ে ওঠে। পা দুটো ক্রমনিম্ন পথে টেনে টেনে চলেছে তারা!

—শনিবারের রাতে দুটো টাকা দাও কেন্নে! পাঁচু নিকিরি গদ গদ কণ্ঠে বলে ওঠে ফকিরকে।

পাঁচু বলে ওঠে,

—ঘর যাবি? মাগের কাছে?

—ধ্যাৎ; দুটাকায় মাগের কাছে যেয়ে একরাত কাঁদুনি শুনতে লারবো। হেনা নাই, তেনা নাই, ঢেঁক নাই তুষকো নাই। ধ্যুৎ শালা। তার চেয়ে আসানসোলে যেয়ে পড়ে থাকবো। ঝামেলা নাই, ফেলো কড়ি মাখো তেল তুমি কি আমার পর। রাত পুইলে গুটি গুটি পা পা করে চলে আসবো বাবা। ফিরেও তাকাতে হবেক নাই সে শালীর দিকে।

ফকিরের নেশা লাগা মনে হঠাৎ যেন দমকা হাওয়া বয়; কেঁপে ওঠে ঝড়ো পাতার মত সারা দেহমন। কারা যেন দল বেঁধে সেখানে আছে। একবার খুঁজে দেখবে কোথায় সে আছে। ভয়ে ভয়ে বলে,

—লিয়ে যাবি আমাকে সিখানে?

পাঁচু আচমকা ফকিরের কথাটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না; একটু সামলে নিয়ে বলে ওঠে,

—তুমি যাবা? ভ্যালা মন দাদারে। কোলে করে লিয়ে যাবো দাদা। ফুর্তি আর্তি করো, দুনিয়ায় চোখ বুজলে কে কার? জানতো রেখে দিয়েছি খাদের তলে। এই আছে—এই নাই! ব্যস!

জড়িয়ে ধরে রাস্তার মধ্যেই ওর দাঁড়ি গোঁফ ভরা কয়লার কস মাথা গালে চটাস করে চুমু খায় সশব্দে!

একটু অবাক হয়ে যায় পাঁচু, নোনতা আস্বাদ। বুড়োর চোখ দিয়ে জল ঝরছে। লোনা জল। পাঁচু সান্ত্বনা দেয়,

—ধ্যাৎ মাইরী, মাগীর মত প্যান প্যান করে কেঁদোনা ইয়ার। দুভাঁড় মদ খেলেই কান্না। হ্যাঁ, পেঁচি হয়ে রইলা আজম্মোকালটা।

খাদ ফেরতা নদীতেই স্নান সেরে বসন্ত এসে হাত পা ছড়িয়ে পড়েছে ঘরের বাইরে চারপাইটা টেনে।

জনহীন ধাওড়া ; মেয়েছেলে বিশেষ কেউ নেই। মেয়েদের কোলিয়ারীতে কাজ বন্ধ করার কানুন চালু হবার পর থেকে অনেকেই ফিরে গেছে ডুংরীতে, অনেকে এই জগতের আনন্দ প্রাচুর্য ভুলতে পারেনি, দামোদরের পারে ছায়া-ঘন বন্য জীবন তাদের কাছে বিস্বাদ ঠেকেছে। তাদের কেউ কেউ টিকে আছে এখানে ওখানে কাজ নিয়ে ; না হয় একজনের রোজকারে একবেলা একমুঠো খেয়ে শূয়োর পালের মত বাচ্চার জন্ম দিয়ে চলে। অনেকে আবার অন্য বৃত্তি নিতে বাধ্য হয়েছে। তাদের কাউকে এখানের পথে ঘাটে সন্ধ্যার অন্ধকারে দেখা যায়, মৃত প্রেতাত্মার মত জীর্ণ অত্যাচার জড়িত চেহারা, গাছের ছায়ায় পানের দোকানের ধারে না হয় এখানে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে খদ্দেরের সন্ধানে, চোখে মুখে কি অসীম ব্যাকুলতা!

মকাই-এর দানা ভাজা, কিছু চিড়ে আর গুড়। তাই দিয়েই রাতের খাওয়া সেরে নিয়েছে বসন্ত। খিদেতে নাড়ীগুলো পাক দিচ্ছিল, মকাই-এর দানা চিবিয়ে বেশ হজম করার কথা কল্পনাও করেনি। কিন্তু এই পাথর কাটার পরিশ্রমে হজম করে ফেলবে যেন।

হাতদুটো টনটন করছে ; আবছা আলোয় দেখতে পায় ঠাঁই ঠাঁই ছড়ে গেছে। ভারি লাগছে নিজেরই সারা শরীর। ঠাণ্ডা হাওয়ায় কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল জানে না।

ফকির মদ্যপ কণ্ঠে হাঁক পাড়ে টলটলায়মান অবস্থায়।

—এ্যাই! তামাম ময়দান পড়া হ্যায় শালালোগ হম্‌কো শূয়ার খুপরিমে ঘুঁসায়া! চল বে ম্যানেজারকে বাংলোমে জায়েগা, শালা পংখা চালাতা হ্যায়, বিজলী রেডিও মারাতা হ্যায়!

ওপাশে পাঁচু নিকিরি ধরা গলায় সায় দেয়—জরুর। শালার একে মাগ তার উপর শালী। কারো দিন যায় এমনি, শালার মাগের উপর ঢেমনি।

মদের টক টক গন্ধে আবহাওয়া ভরে ওঠে। ঘুম ভেঙ্গে উঠে বসেছে বসন্ত। সারারাত মাতলামি করে ভোর বেলাতেই বেহুস হয়ে পড়বে। আবার উঠে খানিকটা তাড়ি ধেনো গিলে খোয়াড়ী ভেঙ্গে গিয়ে খাদে নামবে ওরা।

বাঁধন হারা বেবশ জীবন যাত্রা। কোনই দায়িত্ব নেই, বসন্ত ওদের দেখে বলে ওঠে,

—একটা চিঠি এসেছিল তোমার।

পাঁচুর দিকে এগিয়ে দেয় ময়লা কালিমাখা পোস্টকার্ডটা, ধাওড়ার বাইরে অশ্বথ গাছের খোঁড়লে পিওন নামিয়ে দিয়ে যায় চিঠি চাপাটি। পাঁচুর নেশা ছুটে যায়।

—চিঠি! কে লিখেছে বল দিকিন?

বসন্ত চিঠিখানা দেখে বলে—জগদ্ধাত্রী! সে তোমার কে হয়?

মুখভেংচে ওঠে পাঁচু—আমার দবনকত্তা, জগধাত্তী লয় বাবু, জগঝম্প। ইয়া মোটা, আর বাত্তি কি? শুনলে ধাত ছেড়ে যাবেক। খেয়ে দেয়ে কাজ নাই, পত্তর নিখেছে। নিকুচি করে তোর 'পিরিয়তমের'। ধ্যাৎ।

বসন্তের হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে ছিঁড়ে ফেলল কুচি কুচি করে। বলে চলেছে পাঁচু,

—মাইনে পাই আঠারো টাকা হপ্তা, ও মাগীও এখানে থাকতে পেতো পনেরো টাকা, দুজনে বেশ ছিলাম। উয়ার চাকরি জবাব হল। ঘরেই পাঠালাম। কিন্তু সেখানেই বা খাবেক কি? আর আমিই ইখানে ওই মাগীকে কি খাওয়াই বলেন? খাওয়াতো কুম্ভকন্নের আহার।

বসন্ত চেয়ে থাকে ওর দিকে—জবাব হল কেন?

—আর কেনে? সাহেবরা বললেক সরকারকে মেয়ে মানুষ খাদের নীচে থাকলে তাদের চরিত্তির খারাপ হয়ে যাবেক, পুরুষমানুষেও বখে যাবেক। তাই বন্ধ করে দিলেক। বাবু, মাগভাতার, ভালবাসার লোকের সঙ্গে মেয়ে মানুষ যদি থাকে আর পাঁচজনে কি তাকে খারাপ করতে পারে? আর শরীর খারাপ হবে খাদের নীচে কাজ করলে? তাহলে জগঝম্পকে নিশ্চয় দেখোনি, এইসা হয়ে উঠেছিল মাগী খাদের নীচে গুমোট হাওয়ায়।

পাঁচুর নেশা ছুটে গেছে। চুপ করে থেকে বলে ওঠে,

—পেটে খিদে থাকলে স্বভাব চরিত্তরও ঠিক থাকে না। ওদের প্যাটে

না খেতে দিয়ে চরিত্তর ঠিক রাখতে বলে কোম্পানীর আইনে। সবই উলটো কানুন।

পাঁচু চুপ করে থেকে এগিয়ে আসে, চাপা গলায় বলে—আছে দু এক ঢোক?

বসন্ত মাথা নাড়ে—উহুঁ। ওসব চলে না।

পাঁচুর মেজাজ বিগড়ে ওঠে—ধ্যাৎ, তালে এখানে এয়েছো কেন? খামোকাই পাঁচসিকি বরবাদ।

জমাটি নেশাটা ঘরের চিন্তায় একেবারে ছারখার হয়ে গেছে। শুক্রবার, কাল শনিবার, কালই ওই ফকিরকে নিয়ে যাবে রাত্রে।

একটা রক্ত মাতানো স্বাদ, ঝিম ঝিম করছে সমস্ত শরীর। তৃষ্ণা! বুক ফাটা অতৃপ্তি জেগে উঠছে পাথরের নীচে তরতরিয়ে ওঠা জলধারার মত। শূন্য ঘরে একা ময়লা তেলচিটে কাঁথার উপর পড়ে ছট ফট করছে পাঁচু।

একা পাঁচুই নয়, ধাওড়ার অনেকেরই মনে এমনি ঘুমন্ত সরীসৃপ মদের ঝোঁকে জেগে ওঠে—পাক খুলে কেঁপে কেঁপে ওঠে তীব্র বিষের হিংস্র গর্জনে। রাত শেষ হয়! একটির পর একটি বিনিদ্র, নেশাভরা রাত; আবার সেই খাদের অন্ধকার গ্রাস করে তাদের। দিনের আলোর চিহ্ন মুছে গেছে। খাদের অতল অন্ধকার আর উপরে হতাশার অন্ধকার মিলে জীবনের সব চলার পথ গ্রাস করেছে এখানে।

মিঃ মিত্র পাঁচ বছর প্রায় ম্যানেজারি পাশ করে এখানের সিপ্‌ট চার্জে এসেছেন। চিনতোড়েই চারজন ম্যানেজার। একজন এজেণ্ট। বিভিন্ন নম্বরের চার্জে এক এক জন ম্যানেজার।

মিঃ ব্লেজার, আর মিঃ ফস্টার—তার পরেই মিত্র। এজেণ্টের প্রতাপে সকলেই তটস্থ। মালিকদের দেখা পাওয়া ভার; এখান থেকে শতাধিক মাইল দূরে কলকাতার বুকে তাদের প্রকাণ্ড আপিস।

লণ্ডন আমেরিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, দিল্লী তাদের নখদর্পণে। কোলিয়ারীর ক্ষেত্রে ওদের নাম ডাক গুডউইল যথেষ্ট।

কোলিয়ারী, লোহার কারখানা থেকে শুরু করে 'চেইন অব বিজিনেস'।

তাদের মতামতের দাম অনেক। অদৃশ্য জগৎ থেকে তাদের নির্দেশ আসে, এরা পুতুলের মত কায করে। বিদেশ থেকে ভারতে এসেছিল বহুকাল আগে, ভারতবর্ষকে শোষণ করবার সমস্ত রকম জাল বিস্তার করেছে। চালিয়েছে তাদের শোষণ এবং শাসন। দিন শেষ হয়ে আসছে। বোধ হয় এবার যে টুকু পারে, যতটুকু পায় মাটির বুকের সম্পদ আহরণ করে নিয়ে অন্তঃসার শূন্য ফোপরা করে দিতে চায়। যাতে তারা চলে যাবার পর আর কেউ কিছু নিতে না পারে।

মিঃ ফস্টার অপিসে বসে কাগজপত্রগুলো উলটে চলেছে। এয়ার কুলার লাগানো অপিস, গ্রীষ্মকালে বাইরের টেম্পারেচার ওঠে একশো ষোল, আঠারো ছাড়িয়ে কুড়ির মাথায়। এত গরমে কাজ করা ইংরেজের অভ্যাস নেই। ঝকঝকে অপিস, কাঁচের দরজার ওপাশে পি-এ কাম ষ্টেনোর ঘর থেকে টাইপরাইটারের শব্দ ভেসে আসে। ওভ্যালসেপড বার্মাটিক-এর টেবিলে কয়েকটা টেলিফোন, কোম্পানীর কলকাতার অপিস থেকে নিজেদের টেলিপ্রিণ্টার লাইন রয়েছে, অটোমেটিক সিস্টেম। আপনাহতেই নির্দেশ নামা টাইপ হয়ে বেরুচ্ছে। কাকপক্ষীতেও টের পাবে না। তাছাড়া আছে স্পেশাল ম্যাসেঞ্জার সিস্টেম। রোজ ভোর বেলায় এখান থেকে গাড়ি যায় আসানসোল স্টেশনে—কেরিয়ারের বগলে চামড়ার শিলকরা ব্যাগে চিঠিপত্র, কলকাতার অপিসে পৌঁছবে বেলা দশটার আগেই, আবার ফিরে আসবে সে বৈকালের ট্রেনে, গাড়ি থাকবে আধঘণ্টার মধ্যে এজেণ্টের বাংলোয় ডাক পৌঁছে দেবার জন্য।

মিঃ ফস্টার কাগজ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে জানলার দিকে চেয়ে থাকে; সেকেণ্ড সিপ্‌টের কায শুরু হয়েছে; সেকেণ্ড ম্যানেজার মিঃ মিত্র এগিয়ে আসছে এই দিকে, মাথায় সাদা রং করা কিলবার্ণের মাইনিং হেলমেটে বাতিটা ক্লিপে আটকানো, হাতে ছোট্ট নাল বাঁধানো লাঠি দিয়ে মাটি ঠুকছে আনমনে। কালো বাঙ্গালী কলেজে পাশ করে চাকরি কেরানীগিরি না করে এইবার এই পথে আসছে।

ফস্টার পাইপটা নামিয়ে রাখল টেবিলে; হোম থেকে চিঠি এসেছে—তাই পড়ছিল। একজন ইঞ্জিনিয়ারের বিজ্ঞাপন দিয়েছে কোম্পানীর লণ্ডনের কাগজে, তারই জন্য দরখাস্ত করেছে তার এক কাজিন ব্রাদার; এখানেও

ফস্টারকে একটু তদ্বির করতে বলেছে। আর সব খবর ভালই, একমাত্র বাগড়া দিয়েছে এই দেশের কয়েকজন শ্রমিক নেতা। এই নিয়েই কাগজেও ফলাও করে লিখছে তারা।

এদেশের ধনসম্পদ তো লুট করছে এতকাল, বিদেশী পোষণ করেও বহু টাকা বাইরে চলে যাচ্ছে, তাদের মাইনে পেনসন হিসাবে।

হ্যাং ইওর রটন্ পার্টি বিজনেস। কিছু করবার মুরোদ নেই, পিছনে লাগবে তবুও।

—গুড ইভনিং স্যার!

ফস্টার হঠাৎ গভীর কাযের চাপে ডুবে যায়। কাগজগুলো সই করছে নিবিষ্ট মনে, মিত্রকে যেন দেখতেই পায় না। ইচ্ছে করেই নিজেকে হঠাৎ খুব কাযের মানুষ করে তোলে।

—ইয়েস?

মিত্র চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, বসতেও বলে না ফস্টার, এটা তার দৃষ্টি এড়ায় নি।

সাড়া দিয়ে ওর পানে চাইল সাহেব।

মিত্র রুটিন মাফিক বলে চলে—আই বেগ টু রিপোর্ট নম্বর ফোর কোলফেস এ্যাট লায়েকডি সিম—

একেবারে ছাঁকা অফিসিয়াল কথা; এবং শেষ করে রিপোর্ট এগিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

পিটের ফার্স্ট ম্যানেজার ওই মিঃ জনসন ফস্টারকে রোজকার কাজের ইন্‌স্‌পেকশন রিপোর্ট এবং প্রোগ্রেস রিপোর্ট দিয়ে বের হয়ে আসে।

—মিঃ মিট্র।

ঘুরে দাঁড়াল মিত্র ওর কথায়; কেন জানে না ওই উদ্ধত ইংরেজকে সহ্য করতে পারে না মিঃ মিত্র। কোয়ালিফিকেশন যোগ্যতার দিক থেকে মিত্র ওদের থেকে কোন অংশে কম নয়, সেও বি, এস, সি, এবং গ্লাসগোর বি-ই। এখানকার একজন নামকরা কৃতী ছাত্র; বিদ্যা বুদ্ধিতে ওদের চেয়ে উঁচুতে, এ কথা ফস্টারও জানে, তাই পদাধিকার বলে যতটুকু ওকে দাবিয়ে রাখা দরকার তাইই রাখে।

—ইয়েস স্যার।

ফস্টার ওর রিপোর্টখানা পড়ে চলেছে। মাইন-এ গ্যাস হচ্ছে প্রায়ই; এর জন্য বাতাস আরও ঢোকান দরকার; অন্য একটা স্যাফট দরকার হলে ব্লাস্ট করতে হবে; না হলে এই মাইনে বিপদ হওয়ার খুব সম্ভাবনা।

—ইট ইজ ভেরি এক্সপেন্সিভ। মিঃ ফস্টার এক কথায় ওই রিপোর্ট নাকচ করতে চায়।

কোল ডাস্ট জমে আছে, তাদের আর্টিফিশিয়াল স্টোন পাউডার দিয়ে ট্রিট করা দরকার; খরচ এতে অনেক কম, মাইনিং রেগুলেশান মাফিক কাজও করা হবে। এটা সমর্থন করে—কোম্পানী ক্যান কনসিডার দিস।

ফস্টার ঘাড় নেড়ে কথাটা বলে মিত্রকে। যেন তাকেই কৃতজ্ঞ করছে। লাল পেন্সিল দিয়ে কাগজখানা দাগ মেরে চলেছে। লেবাররা একোমোডেশনের জন্য দাবী জানিয়েছে; তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুল চাই।

এতক্ষণে একটা মস্ত ভুল যেন বের করেছে ফস্টার ওর রিপোর্টে; একগাল হেসে বেশ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে যেন রহস্য করে সাহেব।

—নাও ইউ সি মিঃ মিত্র; তুমি একজন ইঞ্জিনিয়ার, দিস্ রিলেটস্ টু লেবার অফিসারস্ ডিপার্টমেণ্ট।

মিঃ মিত্র কোন কথা না বলে বের হয়ে আসে। সারাদিনের ক্লান্তির পর পিট থেকে উঠে এসে রিপোর্ট দিয়ে ফেরবার মুখে আর কথা বাড়াতে তার প্রবৃত্তি নেই।

—সেলাম সাব!

একদল মালকাটা ফিরছিল খাদ থেকে, ওকে দেখে সরে দাঁড়াল সসম্ভ্রমে।

মিঃ মিত্র মাথা নোয়াল একটু।

—এত দেরী তোদের?

—টবে উঠাই দিয়ে এলম কিনা। সময়ে টব দেয় না সাব।

—কোন ধাওড়ায় থাকিস তোরা?

—হ পাঁচ নম্বরে; লদীর গাভায়। দেখেন হুজুর আগে চার নম্বরে ছিলম, ঘর পাইলম উথানেই। ফের লিয়ে এল ই খাদে বাকী ঘর দিলেক নাই। বলে ইখানে এলে ভাড়া দিতে হবেক দু টাকা। বলেন কি করে দিই? আঠারো টাকা হপ্তা পাই, চারটো প্যাট!

মিঃ মিত্র এ অভিযোগের কি করতে পারে? নিতান্তই অসহায় সে। ওরা জানে না সঠিক ওর অবস্থা। একটা দুর্নিবার চক্র বসেছে, কর্তৃপক্ষ কয়েক জনকে রেখেছে শোষণ এবং শাসন চালিয়ে যেতে, বাকী দু চার জন বোকা খাটিয়ে লোক আছে যারা তাদের বুদ্ধি বিদ্যা দিয়ে এই যন্ত্রটাকে খাড়া রাখে, চালু করে রাখে; ওদের মুনাফা এবং শোষণ চালাবার টাউট হিসেবে। মিত্র ওই দ্বিতীয় পর্যায়েরই একজন।

ওর নিজের জন্য কোম্পানী কোন অভাব অভিযোগের অবকাশ রাখে নি।

কিন্তু এদের দিকে চাইলে মনে হয় যে, ওই কথাটা পরম অলিখিত সত্য।

রাস্তার পাশেই খেলার মাঠ; বাবুদের ছেলে মেয়েরা তখনও হৈচৈ করছে, একটু বড়র দল ফুটবল খেলার পর এখানে ওখানে বসে জটলা করছে। ওদের টুকরো কথার শব্দ ভেসে আসে কানে।

বাঁ দিকে ওর বাংলোর রাস্তাটা চলে গেছে বড় রাস্তা থেকে নেমে।

নেমে গেল মিঃ মিত্র। ছোট পথে আলোর আভা; দু পাশে কেরানীবাবু, মালবাবু, ডাক্তারবাবুর বাসা; পদমর্যাদা হিসেবে এখানের থাকার ব্যবস্থা। বাবুদের টানা ঘর, মাঝে মাঝে পার্টিশান করা, সামনে রুক্ষ টংরা মাটিতে একটু বাগানের মত। পাইকারী বাগানের বেড়া, নিজের নিজের গতর খাটিয়ে পারো তবে পাতা বাহার, বেল দু একটা, রজনীগন্ধা লাগাও।

তার চেয়ে উপরের পর্যায়ে ডাক্তারবাবু, এ্যাসিস্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার, লেবার অফিসার ইত্যাদি। এদের জন্য দিশী বাংলোর বরাদ্দ।

তার উপর শ্রেণী অর্থাৎ প্রভু পর্যায়ের যারা; তাদের বাংলোর স্বাতন্ত্র্য আছে। গঠন প্রক্রিয়া, বাগান, বেড়া, এমনি রীতিতে গড়া যে তাতে আমন্ত্রণের স্বাভাবিকতা নেই। আতিথেয়তার চিহ্ন সেখানে ফুটে ওঠেনি। যে বাড়ির গেটে হাঁক পাড়ে বিদেশী কুকুর, সেখানে অতিথিদের বাইরে থেকে বিদায় নেওয়াই রীতি। বন্ধু বান্ধব বাড়ির মালিকের সঙ্গেই যায়, কিন্তু অতিথির আসার দিন ক্ষণ নেই। তারা বাধা পায় প্রথম তাই কুকুরের ডাকে। বিদেশী পেডিগ্রীওয়ালা কুকুর, তাদের আভিজাত্য অনস্বীকার্য।

বাবু পাড়ার বাইরে ছোট টিলার উপর মিত্র সাহেবের কোয়ার্টার। কোম্পানী থেকে ছোট মরিস গাড়ি একখানা পেয়েছে পদাধিকার বলে।

সেটা বিশেষ দরকার না হলে বাড়িতেই থাকে, পায়ে হেঁটে যাতায়াতই পছন্দ করে মিঃ মিত্র।

বাগানের মধ্যে একটু বাঁধানো চাতাল। চারিপাশে তার পাতাবাহারের গাছ। কয়েকটা রজনীগন্ধার ঝাড় স্নিগ্ধ শুভ্র চাহনিতে চেয়ে আছে রাতের তারার দিকে।

কয়েকজন ছেলেমেয়ে বসে আছে। মিঃ মিত্র ওদের দেখে এগিয়ে যায়।

—তোমরা? কি খবর নরেন?

বাতিঘরের চার্জম্যান শান্তিবাবুর ছেলে; ফুটফুটে ফর্সা, লেখাপড়ায় ভালো। কলোনীর মধ্যে সকলেই ওকে চেনে।

—ফুটবল ক্লাবের ব্যাপারে এসেছিলাম আপনার কাছে।

বাঙ্গালী কর্মচারীদের মধ্যে মিঃ মিত্রই সবচেয়ে উঁচুতে। আরও দু একজন আছেন কিন্তু তাঁরা ওই সাধারণ লোকদের ছোঁয়া সযত্নে বাঁচিয়ে চলেছেন। কর্তৃপক্ষ উর্দ্ধতন কর্মচারীদের সকলের সঙ্গে অবাধ মেলামেশাটা পছন্দ করে না।

মিঃ মিত্র এটা ঠিক মানে না। তার বাংলোর অবারিত দ্বার! মানসীও স্বামীর এতখানি মেলামেশা পছন্দ করে না। প্রকাশ্যে কিছু বলতে সাহস করে না, তবে আকার ইঙ্গিতে সে বেশই বোঝায় তার বিরুদ্ধ মনোভাব।

—তোমরা বস, স্নান করে আসছি। মিঃ মিত্র বাংলোর দিকে এগিয়ে গেল।

মানসী ড্রইং রুম থেকে বাইরের চাতালের ওদের দিকে চেয়ে থাকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে।

ছেলেরা বসে আছে বাইরে; ঘরের ভিতর থেকে শোনা যায় দামী রেডিওতে ভারি গলার স্বর ভেসে আসে। অনেকেরই বাবা দাদারও কেনবার সঙ্গতি নেই। অনেকে একজন ম্যানেজারের বাংলোর হাতায় এসে বসে আছে—তাদের সঙ্গে কথা কয়েছেন তিনি, এই সৌভাগ্যেই গর্বিত। নরেন, আরো কয়েকজন আলোচনা-করছে।

লেবার অফিসারকেও ধরবে তারা, এ সম্বন্ধে যদি কিছু আদায় করা যায়। চিনতোড় কোলিয়ারীতে ফুটবল ক্লাব, লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা কেন হবে না? সাহেবদের জন্য এত ঢালাও ব্যবস্থা, ক্লাব, গলফ্ কোর্স, ঘোড়ায় চড়ার

ব্যবস্থা সব আছে। তারা এত ছেলে মেয়ে, তাদের জন্যও একটা ব্যবস্থা কিছু করা দরকার।

কি ভাবে মিঃ মিত্রকে এ সম্বন্ধে অবহিত করে তোলা যায় তারই আলোচনা চলছে।

—ওকে প্রেসিডেণ্ট কর।

কে যেন বলে ওঠে—তার চেয়ে মিসেস মিত্রকে প্রেসিডেণ্ট করবার চেষ্টা কর, এক ঢিলে দুই পাখি বধ হবে।

নরেন বক্তার দিকে চেয়ে থাকে, মুন্সী ফড়িংবাবুর ছেলে ভক্তি পিঠের দাদ চুলকোতে চুলকোতে কথাটা সহজভাবেই বলে চলেছে। অনেকেই এ কথাটা মেনে নেয়। চুপ করে থাকে নরেন।

লেবার অফিসার মিঃ নারকুলিয়ার চাকরিটাই একটু বিশেষ ধরনের। দুমুখো ঢাক। একদিকে বাজে গড়ের বাদ্যি, অন্যদিকে বাজে আরতির বোল। দু কাঠি সামলে বাজাতে হয়।

মজুর, মালকাটারা আড়ালে বলে—শালা, বেটিচোত্ মাদাড়ি।

অন্যদিকে ফস্টার, ব্লেজারের দল মুখ গম্ভীর করে রায় দেয়—ট্যাক্টলেস।

অর্থাৎ ফাঁক ফিকির দিয়ে ঠিক ম্যানেজ করতে পারে নি ব্যাপারটা।

ছুটি দিতে হবে লেবার দিকে, এসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজারের সই করিয়ে এলে তবে লেবার অফিসার মঞ্জুরী দেবে।

নারকুলিয়া মুখ ভার করে অপিসে বসে আছে। ওদিকে বসে কয়েকজন লোক; শ্রমিক সেবা-সমিতির পাণ্ডা রামকিঙ্কর প্রধান হাত পা নেড়ে চলেছে,

—ওই ঘরে লোক থাকতে পারে? আটঘণ্টা মাটির নীচ থেকে উঠে এসে যদি অমনি শূয়োর খুপরিতেই বন্দী থাকতে হয়, বাঁচবে ক'দিন ওরা?

নারকুলিয়া জবাব দেয়,—অসুখ করলে দাবাই ডাক্তারও রেখেছে কোম্পানী। ওই ঘর ছাড়া নোতুন ঘরও তৈরী হচ্ছে। সেখানেই ঠাঁই পাবে ওরা।

প্রধান ওর জবাবে খুশি হয় না—ওকথা বহুদিন থেকে শুনছি।

সঙ্গে দুজন লোকও মাথা নাড়ে, ওরা নিজেরাই মালকাটা। মাথনও এসেছে প্রধানের সঙ্গে, অন্যতম প্রবীণ মজুর হিসাবে অনেকেই ওকে মানে গণে।

চুপ করে বসে আছে নারকুলিয়া। জাতিতে তেলেঙ্গী খৃস্টান। দুপুরুষ বাংলার জলে মানুষ। বাংলাতেই কথা বলে। কালো মিশ্‌কে পাকানো চেহারা, তিড়বিড় করে নড়ছে, হঠাৎ যেন বাধা পেয়ে থমকে উঠেছে। চুপ করে থেকে বেশ দৃঢ়কণ্ঠে বলে ওঠে—আমি কোম্পানীকে জানিয়েছি মিঃ প্রধান। কিছুদিন পরেই এর সঠিক জবাব দিতে পারবো।

এ ছাড়াও আছে মাইনস্ ইন্‌স্‌পেক্টারের হামলা। যখন তখন এসে চাইবে লিভ রেকর্ড, প্রত্যেক কর্মচারীকে ঠিকমত ছুটি দেওয়া হয় কিনা, এটেনডেন্স রেজিস্টার, হেলথ রিপোর্ট, হেনা তেনা কত কি।

কাযের চেয়ে অকাযই বেশি। একজন মাত্র ক্লার্ক আর নারকুলিয়া খাতাপত্র আর তিন তরফের হুমকি সামলাতে জান লবে জান হয়ে ওঠে। রমেশ তফাদার ওর টাইপিস্ট ক্লার্ক। ফাঁক পেলেই বলে ওঠে,

—ফর্ম ভর্তি করতে করতে গেলাম যে স্যার। একেবারে তাড়াবন্দী কাগজ বাড়ি নিয়ে যাই, দাগা বুলিয়ে রাখবো মাস ছয়েকের জন্য। মাসে মাসে একখানা করে ছাড়বো।

হঠাৎ ছেলের দলকে অফিসে হানা দিতে দেখে একটু বিস্মিত হয় নারকুলিয়া।

এ যেন নোতুন বিভ্রাট, মজুরদের মালিক দেখিয়ে দুদিন সবুর করানো যায়; ইনস্‌পেক্টার অব মাইনসের কর্মচারীদিকেও কাগজপত্র দুরস্ত রাখলে শান্ত করা যায়। বাকীটুকু সামলাবে বড় সাহেব, এজেন্টদের চ্যালারা, পাব বা অন্যত্র কোনখানে বসিয়ে ককটেল পার্টি দিয়ে।

কিন্তু এ বড় কঠিন ঠাঁই। একপাল ছেলে হুড় মুড় করে ঢুকে পড়ে ছোট্ট ঘরখানায়, কেউ বা দরজার কাছ থেকে উঁকি মারে। এগিয়ে আসে নরেন, দরখাস্তখানা এগিয়ে দেয়।

—পড়ে দেখুন স্যার। একটা লাইব্রেরি ক্লাব করতে চাই।

—বেশতো। কিন্তু আমি কি করতে পারি?

—কোম্পানী থেকে কিছু টাকা, একখানা ঘর চাই। আর মাঠটা এমনিই পড়ে আছে, ওটার জন্য পারমিশান করিয়ে দিতে হবে।

নারকুলিয়াই যেন মালিক সব কিছুর, এমনি ভাব নিয়ে বলে ওঠে,

—তার অপেক্ষা তোমরা রাখনি, প্রায়ই তো দেখি বল পিটতে।

—দ্বারোয়ানরা বাধা দেয়, গালাগাল করে ; তাই লিখিত অনুমতি চাই।

নারকুলিয়া কি ভাবছে। এমনিতে কোম্পানীর ওয়েলফেয়ারের এলাকায় এসব ঠিক পড়ে না। কিন্তু নিজের সম্মানও থাকবে না ওদের কাছে। এমনিতেই পথে ঘাটে টিটকারী শোনে পিছনে—নারকেল মালা।

কোন চালু ছেলে আবার নারকুলিয়ার মাতৃভাষা আউড়ে দেয় বেশ তোড়ে,

—এ্যান্টা কুড়্ কড়্ প্যাণ্টালু প্যাটাণ্ডু পাডুসহুডুর।

এতদিন ওটা পিছনেই ঘটত, এইবার ওই শব্দভেদী বাণ আসলেই তাক করে ছুড়বে তারা। নারকুলিয়া চিন্তিতমনে জবাব দেয়,

—আমি বড় সাহেবকে পেশ করবো তোমাদের দরখাস্ত, রেকমেণ্ড করে দিতে আমার বাধা নেই। হলে খুশি হবো।

—কবে খবর নেবো ?

কে উৎসাহী ছেলে বলে ওঠে—দরকার হয় বড় সাহেবকেই ধরবো একদিন।

বাধা দিয়ে ওঠে নারকুলিয়া, তার চাকরি ধরেই যেন টানতে চায় ওরা। শশব্যস্ত হয়ে ওঠে সে—না, না। কোন দরকার নেই। লেট মি ট্রাই ফাস্ট´।

ছেলের দল চলে যেতেই যেন ফেটে পড়ে নারকুলিয়া।

—বুঝলে তফাদার, তোমাদের বাঙ্গালীর এই দোষ। দশজন এক জায়গায় রইলো—ব্যস, গড়ে তোলে লাইব্রেরি, ক্লাব। কেন ? পড়াশোনা কর, পাশ করে চাকরি দেখো ; পরীক্ষা দাও। ওভারম্যান থেকে ম্যানেজার হতে হবে। তা নয়, বাজে হুল্লোড়-এ পড়াশোনা নষ্ট করা। আই সে, এরাই আন্দোলন করে বেশি। ডিসটার্বিং এলিমেণ্ট।

তফাদার হাসতে হাসতে বলে—কথাগুলো ওদের শোনাবো ?

চমকে ওঠে লেবার অফিসার—হোয়াট ! দে উইল স্টোন মি টু ডেথ। ইট পাথর ছুড়ে ঘায়েল করে দেবে তফাদার। লিটল ডেভিলস।

বাবা, দাদা সারাদিন মাটির নীচে, না হয় অপিসে বন্দী। কাছাকাছি স্কুল

নেই। কোম্পানী একটা প্রাইমারি স্কুল খুলেই সব দায়িত্ব চুকিয়ে দিয়েছে। ওদের চারটা পিটের কয়েকশো কর্মীর ছেলেগুলোকে মেয়েদের বাসে করে বাইরের স্কুলে যেতে হয়; তাই ওরা প্রথম থেকেই স্বাধীন, একটু বেপরোয়া।

কোম্পানীর কাছে ওরা অবাঞ্ছিত জঞ্জাল। তাদের কর্মীদের একটানা কায করবার ক্ষমতায় ওরা যেন এক একটি জীবন্ত বাধা। ওদের এড়িয়ে চলে কোম্পানী।

—ছুটি দিতে হবে সাহেব।

জানালার ফাঁক দিয়ে একটা কয়লামাখা রোমশ হাত বাড়িয়ে দেয় একটা দরখাস্ত।

নোতুন ছাঁদে লেখা।

—ছুটি কাঁহাসে দেগা? ম্যানেজার সাব রেকমেণ্ড কিয়া?

—জী সাব। সাদী। হমরা।

কালো কয়রাঙ্গানো মুখে একটু লজ্জার আভা খেলে যায়। ওর মনে কদিন কয়লা খাদের বন্দী জীবন থেকে পালিয়ে আলোর জগতে বাস করার স্বপ্ন। বাঁচবার আহ্বান।

নারকুলিয়া দরখাস্তটা পড়ছে। বিচিত্র ছাঁদে লেখা, সন্ধানী দৃষ্টি এড়ায় না।

—কোন লিখা এ দরখাস্ত?

লোকটা জবাব দেয়—পাঁচ নম্বরকা নয়া এক আদমী। নীচু ধাওড়ামে রতা হ্যায়।

—ক্যা? ঠিক যেন কথাটা ওর বিশ্বাস করতে পারে না।

কি ভেবে দরখাস্তখানা সাবধানে ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রাখলো। কি ভাবছে নারকুলিয়া, ঠিক যেন ঠাওর করতে পারে না।

—স্যার!

লোকটা তখনও দাঁড়িয়ে আছে। নারকুলিয়ার চমক ভাঙ্গে ওর ডাকে। চিন্তার জালে বাধা পড়তে মনে মনে চটে ওঠে।

—যাও, ঠিক হ্যায়। ছুটি মঞ্জুর।

লোকটাও অবাক হয়, দরখাস্ত লেখার সঙ্গে যেন ছুটি মঞ্জুরির একটা নিবিড় সম্বন্ধ আছে। মনে মনে পাঁচ নম্বরের নোতুন ছোকরা মালকাটার সম্বন্ধে শ্রদ্ধা করতে শেখে সে-ও।

—সেলাম সাব।

লোকটা পালাতে পারলে যেন বাঁচে। যে কোন মুহূর্তে সাহেবের মর্জি বদলে যাবে, নাকচ করে দেবে ছুটি।

আবার সেই অন্ধকারে নরক যন্ত্রণা! সুরতিয়ার পুরুষ্ট ডাগর দেহের নেশা তাকে পেয়ে বসে। বাঁচবার আমন্ত্রণ।

কদিন কালো মাটির নীচের বীভৎসতা থেকে বেঁচে গেল সে।

এডমণ্ড ব্লেজার বাংলোর বাগানে পায়চারি করছে। ছোট পাহাড়ীর মত উঁচু টিলার গায়ে বাংলো ; উপর থেকে সমস্ত উপত্যকায় দৃষ্টি চলে। এবড়ো খেবড়ো ডাঙ্গা জমি, মাঝে মাঝে কালো সুতোর মত পিচের রাস্তার দুপাশে সেগুন, শিশু, কাদাজাম গাছের সারি বাতাসে মাথা নাড়ছে। বাকি কোথাও শ্যামসজীবতার চিহ্ন মাত্র নেই। লাল আর কালো মাটির সংমিশ্রণ ; বার্নপুরের ব্লাস্ট ফার্নেসের বিরাট অবয়বে অজগর সাপের মত পাকে পাকে জড়িয়েছে পাইপগুলো। কেঁপে কেঁপে উঠছে বাতাস, কারখানার ভোঁ বাজছে। দূরাগত ধ্বনি ক্ষীণতর হয়ে এসে পৌছায় যেন কোন সুদূর অন্য জগতের ডাক বন্ধপুরীর পাঁচিলে ঘা মেরে ফিরে যাচ্ছে ব্যর্থ হয়ে।

টিলার পিছনেই ঢালু পাহাড়ীর কোলে বয়ে চলেছে দামোদর। বর্ষার যৌবনবতী নদী, ফেঁপে ফুলে উঠেছে কূলে কূলে। ওপারে ধ্যানমগ্ন প্যানচোত পাহাড়ের গায়ে বর্ষার কালো ছেঁড়া মেঘ ঠেকে বৃষ্টি নামে, চূর্ণ জলকণা মেলেছে সাদা বৃষ্টির আবরণ।

ব্লেজারের ভোরে ওঠা অভ্যাস। বর্ষার জল পেয়ে গোলাপ গাছগুলো লকলকে হয়ে উঠেছে। রকমারি গোলাপ আর কুকুর পোষা তার বাতিক। খরচ!

এ খরচের হিসাব নেই।

অফুরান কয়লা। বিলেতে এত কয়লার সঞ্চয় নেই। ওভারম্যান হিসেবে নিউক্যাসলের কয়লা খাদে বেশ কয়েক বছর কাটিয়ে—কোনরকমে সেকেণ্ড-ক্লাশ ম্যানেজারী পাশ করেছিল সে। সেই দুঃখের দিন গুলো ভোলেনি।

দু হাজার-তিন হাজার ফিট নীচে কয়লার স্তর, এক একটা পাঁচ ফিট সাত ফিট মাত্র কোল ডিপজিট। গুঁড়ি হয়ে, হামাগুড়ি দিয়ে কয়লা কাটে সেখানে

ওইটুকু জায়গায় ; তার তুলনায় ভারতবর্ষ সোনার দেশ। এর মাটিতে সোনা ফলে, মাটির নীচে অফুরান সম্পদ।

এখানে কয়লার স্তর তিরিশ ফিটের নীচে নয়, তিরিশ থেকে একশ ফিট পর্যন্ত এক একটা স্তর। কয়লা কেটে শেষ করা যাবে না।

ব্লেজার মনে মনে শিউরে ওঠে ; যেভাবে কয়লা কেটে তুলছে তারা, কোন আইনে তাকে স্বীকার করা যায় না। অর্ধেক অতি সহজে যা কাটা যায় তাই কম খরচে কেটে আনছে। বাকি যা পড়ে রইল তার পরিমাণও কম নয়, কিন্তু ফাঁকা খাদে নেমে দশ বিশ বছর পর আর তা তুলে আনা যাবে না ; কোন বিজ্ঞানই সেই মৃত্যু পুরীর বিপদ জয় করতে পারবে না। অর্ধেক সম্পদ মাটির নীচেই থেকে যাবে, উপরের উর্বর মাটির স্তরও ধ্বসে যাবে অতলে। কোথায় গড়ে উঠবে পুকুর-খাদ, বন্ধুর উপত্যকা। কোনখানে উপরের চাল পাঁচ সাতশো ফিট নীচে ধ্বসে কলরোডা গ্রাণ্ড ক্যানিয়ন হয়ে উঠবে।

যেমনি গভীর তেমনি অতলস্পর্শী খাদ। ধ্বসে পড়বে কোলাহল মুখর লোকালয়, গ্রাম, শহর, রাস্তা। ফসলও ফলবে না কোনদিন ও মাটিতে, ভিতর বাইরের সব সম্পদ লুণ্ঠন করে নিল তারা।

সেদিন লুণ্ঠনকারী ইংরেজকে ক্ষমা করবে না ভারতবাসী। তাদের ধনসম্পদ লুঠ করে, শাসন করেছে। যাবার আগে ওদের প্রধান সম্পদ সেই নৈতিক চরিত্রকেও ভেঙ্গে দিয়ে যাবে। চোর, লোভী, মিথ্যাবাদী করে তুলে দিয়ে যাবে, যার পরে আর নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে না পারে কোন দিনই। পদে পদেই হোঁচট খাবে, ছিটকে পড়বে অতল পাঁকে মেরুদণ্ডবিহীন একটা জাত।

—গুড মর্নিং বস !

ফস্টার টিলার উপরের রাস্তায় গাড়িখানা এনে দাঁড় করাল। বরাবর টপ গিয়ারে এসেছে, বাতাসে পেট্রল পোড়া গন্ধ।

—মর্নিং ফস্টার।

ফস্টার খুব ভোরে উঠে গলফ্ খেলতে যায়, হাতে গলফ্ ষ্টিক, পিছনে একজন চাকরের ঘাড়ে মস্ত ব্যাগে একগাদা বিভিন্ন সাইজের গলফ ষ্টিক, বল। হাফ প্যাণ্ট আর সিল্ক টুইলের হাফসার্ট, মোজাটা গোড়ালির উপর গোটানো।

খেলার চেয়ে কৌতূহলী পথিক, মালকাটাদের সামনে একটা পুঞ্জীভূত

বিস্ময়ের মত ঘুরে বেড়ায় মাঠময়, সাদা একটা বলকে সজোরে আঘাত করার কৃতিত্বের চেয়ে ওদের চোখের পার্থক্যময় দূর সম্ভ্রমটাই তাকে বেশি আনন্দ দেয়।

ব্লেজারও জানে এটা; কোন কোন দিন কোলিয়ারির খরচে সন্থ কেনা ওয়েলার ঘোড়ায় চড়ে আশ পাশের রাস্তায় দাবড়িয়ে বেড়ায় গলদ ঘর্ম অবস্থায়।

—বডি ফিট রাখার দরকার তো ইনডোর এক্সারসাইজ করলেই পারো?

ব্লেজারের কথায় ফস্টার না হেসে পারে না। হাসিতেই কারণটা ফুটে। আমরা ইংরেজ এদেশে এসেছি শাসন-শোষণ করতে। সেই শক্তির যদি অকারণ বাহ্যিক প্রকাশ না হয়—এরা আমাদের প্রাধান্য মানবে কেন?

ব্লেজার কথাটায় সায় দিতে পারে না, মাথা নাড়ে।

—তুমি জান না ফস্টার; এরা বনের ভিতর পাহাড়ের গুহায় সাধনা করে। একদিন সেই গোপন সঞ্চিত শক্তি নিয়ে আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বেই, সেদিন ইংরেজকে যেতেই হবে। আই এম এ্যাফ্রেড, সে দিনের আর দেরি নেই। গেট রেডি।

ফস্টার হা হা করে হাসতে থাকে; হাতের বলিষ্ঠ বাইসেপস্ শক্ত হয়ে ওঠে, কটাসে চোখের তারা ছুটোয় নীল জ্বলন্ত একটা আভা।

এদেশ ছেড়ে যাওয়ার আগে এই মাটিতেই হাড় কখানা রেখে যাবে, এই প্রভুত্ব, অর্থ, প্রতিপত্তি আর শাসন অন্যত্র অচল।

ঘোড়ার চাবুক দিয়ে পাশের লোককে এক আঘাতে আহত করা অন্যত্র চলবে না। ঘোড়া মানুষ এখানে একশ্রেণীর। ভারতেই তা সম্ভব।

ফস্টার এসেছে আজ হোমের সেই কাজিনের জন্য তদারক করতে, এ সময় ব্লেজারকে চটানো নিরাপদ নয়। ব্লেজারই পাচটা পিটের লোক্যাল এজেন্ট; তার মতামতের দাম সবচেয়ে বেশি। শুনে টুনে ব্লেজার মন্তব্য করে,

—এনাদার গেম?

অর্থাৎ আর একজনকে আমদানী করা হবে। আড়াই হাজার টাকা মাইনে, ফার্নিসড বাংলো; গাড়ি; হোম এলাউন্স। অর্থাৎ তিনহাজারী মনসবদার; বছরে তিনটে বোনাস, দু বছর অন্তর হোমে যাবার ফার্স্ট ক্লাশ প্যাসেজ, তিন মাস ফুল পে লিভ। বেশ কিছু গ্রাচুইটি এবং পেনসেন।

বেশ কিছু অর্থাৎ বিলেতে আরও কয়েক লক্ষ টাকা সরানো গেল।

—কোয়ালিফিকেশন? এনি ডিগ্রি? ব্লেজার প্রশ্ন করে ওঠে। হাসে ফস্টার সেই অবজ্ঞার হাসি।

ডিগ্রি ইণ্ডিয়ানদের চাকরিতে দরকার; সাহেব, খাস বিলেতী সাহেব কোন কারখানায় বছর পাঁচেক কাজ করেছে এই তার সবচেয়ে বড় কোয়ালিফিকেশন।

মিঃ ব্লেজার ভাবনায় পড়েছে। একা ফস্টারের প্রশ্ন নয়, ওকে ফেরালে পরদিন আশপাশের পঁচিশটা বিদেশী কোলিয়ারি ম্যানেজারের কানে উঠবে কথাটা, ক্লাবেও শুনতে হবে নানা কথা; কোন ইণ্ডিয়ানকে ওই চাকরি দিলে তো কথাই নেই। যতই তার যোগ্যতা থাকুক না কেন, এ পদের অযোগ্য সে। একটা ডেলিকেট পজিসন! ভাবছে ব্লেজার।

নোতুন অনেক ভারতীয়কে দেখেছে ধানবাদ মাইনিং কলেজে। যে কোন দিক থেকে তারা বহুগুণে যোগ্য, কিন্তু নানা অজুহাতে তাদের ঠেকিয়ে রাখা হয়; ভাল চান্স তারা পায় না, কম পায়।

ফস্টার ঘড়ির দিকে চাইতে থাকে, দামী রেডিয়াম ডায়াল রোলেক্সের ঘড়ি, সকপ্রুফ, ওয়াটার, ডাস্টপ্রুফ ঘড়ি। পিট হেডএ এই সময় সে হাজির থাকে, থরো রুটিন চেক করা দরকার। বয়লারের লোক—বিজলীর পাওয়ার ম্যান দুটো লিফট চালু করে, লিফটের ষ্টিলরোপ, হেডগিয়ার, অন্যান্য সরঞ্জাম, পাম্প চেক করা হয়। তারাই দেখে শোনে, ম্যানেজার দাঁড়িয়ে থাকে মালকাটাদের, কর্মচারীদের সেলাম নেবার জন্য।

—মিঃ ব্লেজার। আই স্যাল বি লেট।

এর মধ্যে ওর মতামতটা শুনতে চায় ফস্টার।

ব্লেজার চুপ করে থেকে জবাব দেয়—অল রাইট, আই স্যাল ট্রাই ফর ইউ।

—ভেরি কাইণ্ড অব ইউ স্যার।

ফস্টার এইটুকুর জন্যই অপেক্ষা করছিল। ব্লেজার সাহায্য করুক না করুক, বাধা যেন সে না দেয়। বাকি সব দিক একাই সামলাবে সে। ইউনিয়ন–কাগজওয়ালাদের কি করে ঠেকাতে হয় তা সে জানে।

পাহাড়ের গা থেকে মেঘ ক'খানা সরে গেছে। সূর্যের আলোয় ছেয়ে গেছে দূর শালবন ; ব্রেজার বারান্দায় উঠে গিয়ে বড় ম্যাপ বিছানো রেক্সিনে মোড়া টেবিলটার দিকে চেয়ে থাকে।

পাঁচটা পিট থেকে কয়লা উঠছে। নীল কাগজের বুকে ছোট ছোট চৌকো দাগ, কোলিয়ারির আণ্ডার গ্রাউণ্ড ম্যাপ। এখন শুধু গ্যালারি অর্থাৎ সুঁদ কেটে চলেছে তারা ; ছোট ছোট দেড়শ ফিট জমাট কয়লার থামের উপর দাঁড়িয়ে আছে এই এলাকা।

ক্রমশ ওই থামগুলোর কয়লা কাটিং হবে। শূন্যে ঝুলবে সমস্ত অঞ্চল, বাইশশো ফিট নীচে ঠাঁই ঠাঁই বালি প্যাকিং-এর প্রহসন চলবে। তারপর দশ বিশ, পঞ্চাশ বছর পর ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যান ধ্বসে পড়বে নীচে, চুরমার হয়ে ফেটে যাবে শ্যামলা ধরিত্রী। যায় যাক! লাখোটাকা, কোটি টাকার লোভ ছাড়া তবু যায় না।

ফোনটা বেজে ওঠে।

—ইয়েস!

এক্সচেঞ্জ থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে আসে—ট্রাঙ্ককল ফ্রম ক্যালকাটা! মিঃ ব্রেজার প্লিজ!

—স্পিকিং।

হেড অপিস থেকে কোন জরুরি খবর আসছে।

ফড়িং সরকার ভোর বেলাতে উঠেই শীত গ্রীষ্ম বর্ষা নেই হুড় হুড় করে জল ঢেলে স্নান করবে। স্নান করাটার বিশেষত্ব আছে। তেল মাখে না কনখও সে। থলথলে মেদ বহুল শরীর এমনিই চর্বিতে চুকচুকে, ; তার উপর তেল মাখলে ওই কালো গা থেকে কয়লার কস্ মিশিয়ে চুঁইয়ে পড়া ঘামবিন্দু-গুলোকে মনে হয় গলন্ত আলকাতরা টোপ টোপ ঝরছে ওর গা দিয়ে।

কোলিয়ারির খানদানি কর্মচারী ওরা, এই কায করবার জন্যই তৈরী। মুখের লাগাম নেই, চোখের চামড়া মাছের মত উলটেই রয়েছে। নাকটা থেবড়ানো, গোঁফের ডগে কালচে একটু আস্তরণ।

ভোর বেলাতেই উঠে পড় পড় শব্দে তামাক খায় আর কাসে খক্ খক শব্দে।

—উঠলি র‍্যা? এ্যাই ভক্তে, ওরে আদু, তোদের মাকে ডাক।

নিজের মা নয়, সৎ মা। প্রথম পক্ষের ছেলে মেয়ে ওই ভক্তি আর আদু। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী মঞ্জরী, এখন মঞ্জরীই, ফলের সম্ভাবনা নেই। মঞ্জরীর হাঁক ডাকে বাবু কলোনি মুখিয়ে থাকে। তবে সেই ডাক উঠতে বেশ সময় লাগে, দিনের রোদের মত ক্রমশ তেজ বাড়ে তার—বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। বিশাল দেহ, বয়সের অনুপাতে লম্বা চওড়া একখানি লাশ। বেশ মৃদু মন্দ সুরে তখনও নাক ডাকছে। ওকে ঘাঁটাবার সাহস নেই, গজগজ করতে থাকে ফড়িং।

—হুঁ, যত সব অলক্ষণ, মেয়েছেলের নাক ডাকা! উড়ে পুড়ে যাবেক সব।

নাকের বাঁশি যতক্ষণ থাকে গজগজানি ততক্ষণ চলা নিরাপদ, থামলেই ও থামবে।

ভক্তি উঠে পড়ে নিজেই। কাঁথা কম্বল গুটিয়ে তাকের উপর তুলে রাখে, আদরিণী কয়লার উনুনটা ধরিয়ে আঁচ ওঠার অপেক্ষা করছে, তখনও নাক ডাকছে মায়ের।

বহু কষ্ট সহ্য করে ফড়িং এসেছিল এই মুলুকে, এই চিনতোড় তাকে নোতুন জীবনের সন্ধান দিয়েছে।

ভক্তির মা যখন মারা যায় ফড়িং তখন বাঁকুড়ার অন্ধ অজ পাড়াগাঁয়ে পড়েছিল। কয়েক বিঘে ধান জমি, যৌথ সংসার। মুনিষ মাহিন্দারের সঙ্গে সকালে মাঠে গিয়ে কোদাল পাড়তো, গাঁয়ের রেওয়াজই ছিল ওই। পরের চাকরি করবে কুনশালা, বাপুতি জমি আছে কাদা ঘেঁটে খাবো। একটা স্বাধীন ভাব ছিল।

ভক্তি তখন ছোট, গাঁয়ের পাঠশালে যেতো বইদপ্তর বেঁধে হাতে দোয়াত ঝুলিয়ে। যেতো ওই পর্যন্ত, সন্ধ্যাবেলাতেই কোনরকমে ভাত আর মহুয়ার ফল কঁচড়ার চচ্চড়ি তিল দিয়ে, না হয় ঝিঙে খাড়ার তরকারি আর একটু পোস্ত দিয়ে গিলেই যে যার শুয়ে পড়তো। গ্রাম নিশুতি।

মা সরস্বতী লক্ষ্মী দুজনেরই প্রবেশ নিষেধ।

বড় ভাই পোকা সরকার জাঁহাবাজ লোক, ফড়িংকে না দেখিয়েই ধান চাল বেচতো বড় গিন্নী। গরুর দুধের ঘি যা থাকতো সেটুকু গিয়ে পড়তো নিজের ছেলেদের পাতে।

ভক্তির মা-ও পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, ওই নিয়ে বাধতো তুমুল ঝগড়া, অসুস্থ

শরীর, ঘুসঘুসে জ্বর লেগেই আছে তার। বড়বৌ একদিন সাফ শুনিয়েই দেয় ফড়িংকে।

—শিবের অসাধ্যি রোগ, আমার ঘরে থাকতে দোব না বাপু, তুমি অন্য বেবস্থা করো। শেষমেষ গুষ্টিশুদ্ধ যজাবে।

গ্রামে যক্ষ্মার অভাব ছিল না, একটু জ্বর কাশি থাকলেই ধরে নেওয়া হতো তার যাবার ডাক এসেছে। ফড়িংও সেই কথা শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে। এতকাল জনমজুরের মত খেটেছে, বিনিময়ে পেয়েছে শুধু দুমুঠো ভাত, আর আটহাতি তাঁত কাছা কাপড়।

আজ হঠাৎ সামনে যেন অন্ধকার দেখে।

—কি হবে ভাজবৌ ?

ভাজবৌ একমুখ দোক্তার পিচ্ অবজ্ঞাভরে ছিটিয়ে ফেলে জবাব দেয়,—কি আর হবে ? ভাগ্যিমানের বৌ মরে, অভাগার গরু মরে। আবার ডাগর বৌ নিয়ে আসবো।

ফড়িংএর মুখ শুকিয়ে আসে। রসিকতায় শিউরে ওঠে সে।

খামারের বাইরে একখানা চালায় পড়ে থাকে সৌদামিনী, অসুখে যত না হোক, না খেয়ে আর বিনা চিকিৎসায় তার দিন ঘনিয়ে আসছে।

ভক্তি দূর থেকে মায়ের কঙ্কালসার দেহটাকে দেখে, ভয় হয়। কে জানে মা না অন্য কেউ। আদু বিনা যত্নে পড়ে থাকে, দয়া করে কেউ তেল মাখিয়ে চান করিয়ে দেয়, একমুঠো ভাত ধরে দেয় সামনে।

—আয়, কাছে আয়। সদুর কান্না ভরা কণ্ঠস্বর ভেসে ওঠে।

পালাল ভক্তি। আদু হামা টেনে এগিয়ে আসে মায়ের দিকে। বড় বৌ ওকে হাতটা ধরে টেনে সরিয়ে দেয়—মরবি হারামজাদী। যম ডাকছে তোকে ?

সবাই ওকে ছেড়ে গেছে। কাশির সঙ্গে মাঝে মাঝে ওঠে রক্তের ছিটে। ফড়িং জোর করেই সেদিন দাদাকে কথাটা বলে।

—ধান না থাক, আমার ভাগের দুবিঘে জমি বিচবো। চিকিচ্ছেতো করতে হবেক। এমনিই ঠাঁয় পড়ে থাকবেক ?

পোকা সরকার মোড়ায় বসে শনের দড়ি পাকাচ্ছিল। বর্ষা আসছে, লাঙল দড়ি, গরুর জন্য যোতের দড়ি চাই। ভাইএর কথায় দাঁড়িয়ে ওঠে—বড়বৌ

উঠোনে ধান মেলছিল, সেও ধানমেলা বন্ধ করে এগিয়ে আসে। ওদের দুজনের সামনে যেন বোমা ফেটেছে।

—কি বললে? জমি বিচবো! ওই ঘাটের মড়ার জন্যে চিকিচ্ছে করিয়ে কি হবে? খামোকাই যাবে জমি দুবিঘে।

ফড়িং গর্জন করে—সে আমি বুঝবো। যায় আমার যাবে।

বড়গিন্নী ফোঁস করে ওঠে—জমি আমার বাবার দেওয়া, গায়ের রাংরতি ঘুচিয়ে বুক দিয়ে জমি করেছি আমি। আজ বলে—ভাগ দাও। কি ছিল রে তোদের? তিলক করতে মিত্তিকা ছিল না।

ফড়িংএর চোখের সামনে অতল খাদ, চোখ বুজে লাফ মারে সে মরিয়া হয়ে।

—এতদিন তালে খাটলাম কেনে? এত ধান আয্যালাম?

—তোর মাগ ছেলের পেট ভরাতে। নিজের কাঁড় যোগাবে কে? বড়বৌ মহড়া নিয়েছে।

—তালে মান্দের খাটলাম এতদিন তুমার সংসারে? ফড়িং কোণঠাসা হয়ে আসছে।

চোখের সামনে অন্ধকার। সৌদামিনীর কালো শীর্ণ মুখখানা মনে পড়ে, হাতে একটি পয়সা নাই, গোবিন্দ ডাক্তার ফর্দ দিয়েছে।

ইনজেকশন চাই। দুধ ঘি খাওয়াতে হবে ওকে।

ভক্তির পাঠশালা থেকে নাম কেটে দিয়েছে। মাইনে পত্র বাকি, সারাদিন এর ওর গাড়িতে মাঠে সার বয়, নদীর ধারে ছিপ হাতে বসে থাকে পুঁটি মাছের সন্ধানে।

সেদিন বেলা করে বাড়ি ফিরতেই বড়বৌ হাঁকিয়ে দেয়।

—যা, কাঁড় যোগাতে পারবো না। খাটবি খাবি, মাঠে গিয়ে কোদাল পাড়গা।

ফড়িংএর দুঃখ যেন শেষ হয়ে আসে। তাকে নিষ্কৃতি দিয়ে যায় সৌদামিনী, কয়েকদিন পর কাশতে কাশতে হঠাৎ রক্ত পড়তে শুরু হয়। যতটুকু জীবনী-শক্তি ছিল তার নিঃশেষিত প্রায় হয়ে আসে।

দূর থেকে ভিড় করে যেন মজা দেখছে অন্যান্য বৌ ঝিরা। বড়বৌ গজরায়, —মরেও না। তবু চিঁ চিঁ করছে। যেন কাছিমের পরান।

ফড়িং শেষ পন্থা ধরছে। একটু মিছরির সরবৎ অর্জুন ছালের সঙ্গে দিতে পারলে হয়তো খানিকটা সুস্থ হবে ; কিন্তু মিছরি কেনবার পয়সা! বড়বৌ ঘরে নেই, এই ফাঁকে চালের পুঁড়োটা ফাঁসিয়ে চাল বের করছে ফড়িং, আঁচলে পড়ছে ঝরঝরে চালগুলো, পুঁটুলি বেঁধে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে কমলের দোকানে যাবে, হঠাৎ দরজার কাছে পাহারাওলার মত বড়বৌকে দেখে থমকে দাঁড়াল।

—ওগুলো কি? দেখি!

বুক কাঁপছে যোয়ান মরদ ফড়িং-এর ; হাত পা ঠাণ্ডা হিম হয়ে আসে। বড়বৌ টপ করে আঁচলের মুঠ ধরে গিঁটটা খুলে দিতেই মেজেতে ছিটিয়ে পড়ে চালগুলো।

জলন্ত আগুনে ঘি পড়ার মত দপ্ করে জ্বলে ওঠে বড়বৌ।

—এই চলছে বুঝি ; তাই দেখি মা লক্ষ্মীর আটন নড়ছে। চুরি করে পরের ধান নিতে লাজ হয় না? সোমত্ত যোয়ান কোদাল পাড়লে চার সের ধান পাবি মাইনে। খেটে খাওয়াগে ; যা না ঝরের কয়লা খাদে গাঁইতি মারবি, বারো আনা পয়সা। গোদা গতরটা লিয়ে চুরি করে মাগের চিকিচ্ছে করাবেক? চোন্না কোথাকার!

ফড়িং-এর কালো মুখ ঝোঁয়ানি হয়ে ওঠে। শূন্য হাতে ফিরে এল।

সে দিনগুলো এখনও ভোলেনি ফড়িং, অভাব, অপমান আর কষ্টের দিন। পয়সা এমনি জিনিস। চরম দুঃখে অপমানে সে পয়সা চিনেছে।

সদু তাকে মুক্তি দিয়ে গেছে ; নোতুন শিক্ষা পেয়েছে সে ; যেমন করেই হোক টাকা তার চাই। অনেক টাকা। আজও সেই ব্রত যেন পালন করে চলেছে।

মাথায় জল ঢালছে, এক ফালি বাথরুমের মত ঘেরা, ঠাণ্ডা জল হুড় হুড় করে ঢেলে চলেছে। সূর্যদেবের তখনও দেখা নেই, পূর্বদিকটা একটু ফরসা, লালচে হয়েছে মাত্র। দুহাত তুলে প্রণাম করে—জবাকুসুমসঙ্কাশং।

দু অক্ষর শিখে ছিল বলেই 'জয় মা' বলে বের হয়ে পড়েছিল সদু মারা যাবার পর। এসে জুটেছে চিনকুঠী মুলুকে। এ ঘাট ও ঘাট ঘুরে শেষ পর্যন্ত জুটেছে চিনতোড়ে, সে আজ বছর কুড়ি হয়ে গেল। আবছা মনে পড়ে…

…ছোট্ট একটা ঘর, ভক্তি জুটেছিল ; আদুকে নিয়ে এল।

বাড়িতে তার তিলক কাটবার মৃত্তিকাও নেই ; নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। ভক্তিকে স্কুলে ভর্তি করে দেয়, কিন্তু ভাতজলের ব্যবস্থাতো চাই। অসময়ে ডিউটি।

পর বছরই আসানসোলের রেল পারে বিয়ে করে দ্বিতীয় পক্ষে। মামা রেলে কাজ করে, ভাগ্নীকে বিদেয় করতে পারলে বাঁচে। বয়সের গাছ পাথর নেই, তেমনি দশা-সই চেহারা। ফড়িংকে পেয়ে তারা বর্তে যায়। মঞ্জরীও অবাক হয়ে স্বামীর দিকে চেয়ে থাকে, হঠাৎ বলে ওঠে—সত্যি এত কালো তুমি, না কোলিয়ারির ধুলো লেগে এমনি হয়েছো ?

—মানে ? ফড়িং অবাক হয়ে যায় শহুরে বৌএর মুখে প্রথম সম্ভাষণের নমুনা দেখে।

মঞ্জরী মুখে কাপড় দিয়ে হাসতে থাকে—মানে বর্ণ টা কাঁচা না পাকা ?

ফড়িং বৌএর দিকে চেয়ে থাকে, রূপ না থাক যৌবন আছে। আর আছে চোখের তারায় হাসির ঝিলিক।

ফড়িং কোলিয়ারিতে দুটো পয়সাও রোজকার করছে। খাবার, পরবার দুর্ভাবনা আর নেই। পাড়াগাঁয়ের সেই অভাব অভিযোগ আর কষ্টের বেড়া টপকে এসেছে—এখানের পথে ঘাটেও সেই নগ্ন দারিদ্র্যের প্রকাশ নেই।

মঞ্জরী তাকে ভিন্ন জগতের সন্ধান দেয় ; ওই হাসির ধারায় যেন ভেসে যায় ফড়িং, এ এক অনাস্বাদিতপূর্ব অনুভূতি।

ক'দিনেই বাসার হাল ফিরিয়ে ফেলে মঞ্জরী। ভক্তি অবাক হয়ে চেয়ে থাকে নোতুন শাড়ি পরা মেয়েটির দিকে। চোখে মুখে নীরব একটা প্রশ্ন। আদু সহজেই ওকে মেনে নেয়। ফড়িং বলে ওঠে ভক্তিকে—তোর মা, নতুন মা হয়, প্রণাম কর।

প্রণাম করা ভক্তির অভ্যাস নেই। তাছাড়া ওকে মা বলে মানতেও পারে না। কেমন বিশ্রী ঠেকে। নিজের মাকে মনে পড়ে, রোগজীর্ণ দেহ,

চোখদুটো কোটরে ঢুকে গেছে। কাশির সঙ্গে উঠে আসে রক্ত। ছেলে-বেলার প্রথম স্মৃতি! মা! তার মা এমন ছিল না।

হঠাৎ চোখ ফেটে জল বের হয়ে আসে। কত দুঃখ কষ্টে না খাইয়ে মাকে মেরেছে ওরা সে কথা ভক্তি আজও ভোলেনি। আজ এই প্রাচুর্য তার কাছে বিসদৃশ ঠেকে। মনে মনে জেগে ওঠে চাপা বিক্ষোভ। ফড়িং-এর ধৈর্য সীমা ছাড়িয়ে যায়, নোতুন স্ত্রীর সামনে তার ছেলেও কিনা অমান্য করে তার হুকুম। তার কানটা ধরে বিনামশ্রেনের লুচির মত চটকাতে থাকে ফড়িং।

—হতচ্ছাড়া কোথাকার, কথা কানে গেল না?

মঞ্জরীই বাধা দেয়—থাক। ছোট ছেলে ওকে মেরে কি হবে?

—জান না তুমি। বড্ড বেয়াড়া হচ্ছে দিন দিন।

ভক্তি গোঁজের মত অনড় দাঁড়িয়ে থাকে।

প্রথম দিন থেকেই তার কেমন অসহ্য ঠেকছে এটা।

ভক্তি প্রায় বাইরে বাইরেই থাকে। যাত্রা থিয়েটার খেলাধূলার ব্যাপারেই ব্যস্ত। ফড়িং সরকার থাকে কোল পিটে, পয়সা তার নেশা। ভক্তি স্বাধীনভাবেই বেড়ে চলেছে। স্কুলে যায় বাসে চেপে ওই পর্যন্তই।

বাবা ছেলের মধ্যে দেখা হয় কম।

ফড়িংও সারাদিন পিটের মধ্য থেকে উঠে এসে সন্ধ্যায় স্নান সেরে বসে দাওয়াতে। আদু ঘুমিয়ে পড়েছে। নির্জন সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে বসে ফড়িং; বাইরে কোথায় ফুল ফুটেছে, আকাশে বাতাসে তারই চাপা মিষ্টি সৌরভ।

—কই গো, হল তোমার কায কম্মো! সারাদিন কি এতো করো?

মঞ্জরী ওই বিকট লোকটার পাশে নির্জন সন্ধ্যায় বসে বিশ্রম্ভালাপ করতে ঠিক পছন্দ করে না। সেই এক কথা, ফস্টার কি বললো; ব্লেজারের বৌএর সঙ্গে ফস্টারের লটঘটি, কোন মালকাটাকে আজ টাইট দিয়েছে। পুরানো লাগে মঞ্জরীর, জবাব দেয়—যাচ্ছি।

একটু নিবিড় স্পর্শ পেতে চায় ফড়িং সরকার। হারানো যৌবনের স্বপ্ন দেখে। মঞ্জরীর নিটোল বলিষ্ঠ দেহটাকে টেনে এনে পিষে ফেলতে চায়; ওর চোখের তারায় তারায় হারিয়ে ফেলতে চায় নিজেকে।

হঠাৎ ভক্তিকে দরজা খুলে বাড়ি ঢুকতে দেখে হতাশ বিরক্তি ফুটে ওঠে মুখে। মঞ্জরীর দিকে চেয়ে উঠে পড়ে ফড়িং গজগজ করতে করতে।

জীবনের সামান্যতম একটু পাওয়ার স্বাদ থেকে ওই অপদার্থ ভক্তিটাই যেন পদে পদে বঞ্চিত করেছে তাকে। শান্তির পথে কাঁটার মত বাধা হয়ে রয়েছে।

দাঁত খিঁচিয়ে ওঠে ফড়িং—কোথা ছিলে হে এতক্ষণ ?

হাতের বইগুলো দেখিয়ে ভক্তি জবাব দেয়—পড়তে গিইছিলাম। নরেনদের বাড়িতে।

—হ্যাঁ, তাই যেয়ো। তা এত সকাল সকাল পড়া হয়ে গেলো ?

—একটু সকালেই এলাম আজ।

ভক্তি ওপাশে খুপরি ঘরে গিয়ে ঢুকলো। মঞ্জরী হাসছে মুখ টিপে।

ফড়িং সরকারের কালো দেহ থেকে ঘাম আর কয়লা মিশে তেল চিটে গন্ধ ছাড়ছে একটা।

ফড়িং কেন জানে না বিরক্ত হয়ে উঠেছে।

—হল রে! সকালের স্নান সেরে হাঁক পাড়ে ফড়িং।

—হ্যাঁ।

আঁচ উঠেছে। গনগনে আঁচ! ওই আঁচে একটি ছোট পিতলের ঘটিতে ফড়িং গামছা পরে বসিয়ে দেয় খানিকটা আতপ চাল, দুকুচি কাঁচকলা, পটল-আলু। এক পাকে সেদ্ধ হবে, তাতে খানিকটা ঘি ঢেলে নুন দিয়ে খেয়ে নেবে। গুরুদেবের কাছে দীক্ষা নেবার পর থেকে স্বপাকই খাচ্ছে, এতে নাকি শরীর ভাল থাকে। আর খরচও কম। ওগুলো চাপিয়ে দিয়ে, আসন টেনে বসল। নাক টিপে ধরে ইষ্ট মন্ত্র জপ করে চলেছে, মিটি মিটি চোখ বুজে আসে।

মঞ্জরীর তখনও নাকের বাঁশি থামে নি। উঠবে স্বামী বের হয়ে গেলে তবে। ফড়িংও ও নিয়ে মাথা ঘামায় না।

বাবার হাফ প্যাণ্ট, ঘামের কয়লার কষ লাগানো হাফসার্ট বের করে দিয়ে এসে দাঁড়াল আদু—খরচের টাকা!

—টাকা! ফোঁস করে নিজ মূর্তি ধরে ফড়িং। ওটাই চিনেছে সবাই। স্ত্রী ছেলেমেয়ে বল, সম্বন্ধ ওইটুকুতেই। আদু বলে ওঠে—মা বলেছে আজ আসানসোল যাবে।

নিদ্রিত মৈনাকের দিকে চেয়ে একবার দেখে নিয়ে বেশ পঞ্চমে গলা তুলে বলে ওঠে—যেতে মানা করবি। এত পয়সা আমার নাই।

—বেশ! আদু চুপ করে যায়। ইস্কুলে পড়ছে—বাবার এই গেঁয়ো মেজাজটা সহ্য করতে পারে না। ফড়িং হাতের কব্জি অবধি ভাতে ডুবিয়ে চটকাচ্ছে। মুখ তুলে বলে ওঠে—বালিশের তলায় কালকের পাঁচটা টাকা আছে নে গা যা। তোর মাকে এ সবের কিছু বলিস না, বুঝলি?

মৈনাক নড়ে ওঠে, বিছানায় উঠে বসে মঞ্জরী। চোখমুখে ঘুমের জড়তা।

—কি বললে? আমি বেশি খরচ করি?

ফড়িং চুপ করে ভাতের দলা মুখে পুরতে থাকে। কোন রকমে উঠে প্যাণ্ট জামা পরে বের হয়ে যেতে পারলে যেন বাঁচে।

কিন্তু কমলী ছাড়বার পাত্রী নয়।

—কই, কথা কইছ না যে? চা হয়েছে লা? ও আদু। এত বেলা অবধি চা হয় না একটু?

আদু চায়ের কেটলি—গোটা দুই কাপ এনে বিছানায় রাখলো, সকালে উঠেই এক কাপ চা না হলে মঞ্জরীর মাথা ধরে যায়। আজ মঞ্জরী কেটলিটা দুম করে সরিয়ে দিয়ে বলে ওঠে—চা খাইতো পিণ্ডি খাই। নিয়ে যা সরিয়ে। খরচ করি আমি?

—আহা হা! তাই বললাম নাকি? ফড়িং আমতা আমতা করে।

—একশো বার বলেছো। ঢেস্‌না দিয়ে সোহাগের মেয়েকে শোনান হয়। ঝিকে মেরে বৌকে শেখান বুঝি না কিছু? গ্যাকা।

বিছানাতে ঝেড়ে ঝুড়ে উঠছে মঞ্জরী।

ফড়িং সরকার যেন তাড়া খেয়ে দৌড়চ্ছে। কোম্পানীর দেওয়া জুতোর ফিতেটা আবার তিন হাত লম্বা, পণখানেক ফাঁকের মধ্য দিয়ে গলাতে হয়, সময়ও লাগে তেমনি। জুতো মোজা হাতে করে কোন রকমে যেন প্রাণ নিয়ে বের হয়ে আসছে ওর আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্য, মাঠের ধারে সাঁকোর উপর বসে ধীরে সুস্থে বাঁধা যাবে।

মঞ্জরী ধমক দিয়ে ওঠে মেয়েকে—কই দে চা-টা। জুড়িয়ে তেঁতো করে দিবি নাকি? মাজনটা আন; পরোটাগুলো যেন গরম থাকে বাপু। সে গোঁয়ারটা গেল কোথায়?

ভক্তি সকালে উঠেই মাঠে আসে, নোতুন ফুটবল পড়েছে, প্রাকটিস করে। তাছাড়া বাবা কাজে বেরুবার সময় রোজই প্রায় এক এক দৃশ্যের অবতারণা হয়, সেটা দেখতেও বিশেষ ভালো লাগে না।

কোলিয়ারির ভোঁ বাজছে! একটা···দুটো···অনেক। পুব পশ্চিম-দক্ষিণে; উত্তরে শুধু বাজে না। দামোদর, তার পরেই শাল বনের সীমানা, স্তব্ধ নীল নির্জন এ জগৎ ঘড়ির কাঁটামাপা ব্যস্ততার নাগালের বাইরে ধ্যান-মগ্ন হয়ে আছে।

বর্ধমান জেলার শেষ সীমানা। চিনতোড় মাইনস্ কর্পোরেশনের প্রাইভেট একটা রাস্তা সদর রাস্তা থেকে এসে কোলিয়ারির সীমানায় ঢুকে ফুরিয়ে গেছে। ওমাথা দিয়ে বেরুবার কোন পথ নেই। যে আসে সে আর বেরোয় না। এর বিশাল কর্মব্যস্ত জীবনে, মাটির অতলের অন্ধকার জগতে সে হারিয়ে ফেলে তার সত্বা—অস্তিত্ব। চিনতোড়ের পিটহেডের ঘূর্ণায়মান গিয়ারের পাকে পাকে সে মিশে যায়।

তবু এর থেকে ছিটকে রয়েছে দুচার জন নিজেদের জীবনের কক্ষপথে; এখানে থেকেও এই জগতের লোকের চেয়ে অনেক চতুর, সাবধানী। দামোদরের নীচু কোল ঘেঁসে সারি সারি কয়েকটা ধাওড়া; পিছনেই নদী। জলের ব্যবস্থা করে কোম্পানীকে খরচান্ত হতে হয় নি।

বাবু পাড়ার ধারেই খেলার মাঠ থেকে একটা রাস্তা টিলার গা বেয়ে ঘুর পাক দিয়ে নেমে গেছে পাথরের গা কেটে। ধাওড়ার বাইরেই লালাজীর দোকান। কোলিয়ারির পিট খোঁড়বার সময় লালাজী এসেছিল পাথর কাটতে আরও পাঁচজনের মত। কিন্তু পাথর কাটা ছেড়ে লালাজী পাথরের ফাঁকে শিকড় ঢোকাল, তারপর ক্রমশ সেই রস শুষে আজ ডালপালা ঢাকা মহীরুহে পরিণত হয়েছে।

সারা কোলিয়ারিতে তার কারবার, চাল ডাল মুদিখানা থেকে শুরু করে,

মহাজনী কারবারে ফেঁপে উঠেছে। খানকয়েক লরীও চলছে, মাল বওয়ার কাজে।

পাশেই খানিকটা জায়গায়-বটগাছের নীচে একটা বাঁশের ধ্বজার সঙ্গে লাল পতাকা বেঁধে ব্রজরঙ্গীর থান বাঁধিয়ে দিয়েছে মহাভক্তি পরায়ণ ওই পরমেশ্বরী প্রসাদ লালা।

সন্ধ্যে সকালে দামোদরের বুকজলে দাঁড়িয়ে আধ ঘণ্টা ধরে কুলোর মত ইয়া দুই হাত এক করে পিতৃ তর্পণ করবে।

মাখন সর্দার বলে—লালাজী আধঘণ্টা ধরে ডুবেলা যা সিনি ছেঁচ নদীর জলে পিতাজীর শেষ মেয সর্দি শ্লেষা না হয়ে যায়।

লাল চন্দনের তিলক আঁকা কপাল, গলা; হা হা করে কলাগাছের মত পুরুষ্ট উরুৎ চাপড়ে হাসে ওর রসিকতায়। পরক্ষণেই যেন অন্য মানুষ। হেঁড়ে গলায় চীৎকার করে—এ্যাই ব্রিজমোহন! লোরী আজ রাণীগঞ্জো যাবে মোদনলালের মোকামে। ডুলরী চাবল আছে, আউর ইয়াকুব সাবকো কোঠিমে এক লরী ভেজ দেও। পুরোনো পচা ধান ইয়াকুব শেখ কেনে মদের চোলাই-এর ব্যাপারে।

মোহড়া আগলে বসে আছে লালাজী; এদিকে কোলিয়ারি—অন্যদিকে নদীর পারে মানভূমের টাঁড় অঞ্চল। ধান চাল, লাহা বেচতে আসে কাড়ার গাড়িতে করে নদীর বালু পেরিয়ে। ধান চাল বিক্রী করে তারা নিয়ে যায় তেল নুন মশলা ডাল কাপড়, গাড়ির জন্য হাল, ফাল, লালাজীর গুদামে তাই হরেক চিজ জমা করা থাকে।

চিনতোড়ের এলাকায় ও নিজের জগৎ বানিয়ে নিয়েছে। দামোদরের বালি ছিটিয়ে ঢেকে রেখেছে কালো কয়লার দাগ।

—এ পাঁচু!

পাঁচু নিকিরি একটা ঝুলি হাতে চাল নিতে এসেছে বাকিতে। তেলের শিশিটা দড়ির সঙ্গে বাঁধা, ঝুলোন রয়েছে হাতে।

- টাকা অনেক পড়ে গেছে বিলেত।

—এ হপ্তাহে বিলকুল মিটিয়ে দোব লালাজী।

—নেহি। দেগা—তব মিলেগা।

এক কথা, পাথরের চেয়ে শক্ত ওর মন। পাথর গলবে তবু ওর মন গলবে

না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে পাঁচু। একা পেট তাও চলে না, ফতুয়ার পকেটে তখনও কড় কড় করছে বৌ-এর গতরাত্রের ছেঁড়া পোস্টকার্ডটা। কি ভাবছে! হঠাৎ চোখের সামনে পথ পায়, উপবাস, এই দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির পথ; জগদ্ধাত্রীও বাঁচবে। অনাহারে শুকিয়ে মরতে হবে না তাকে। আজ অসহায় পাঁচু বলে ওঠে—লালাজী!

লালা উঠে গেল কাঠের গাদার দিকে। নদী পারের বন থেকে রাতারাতি চোরাকাটাই-এর শাল কাঠ আসে। কোলিয়ারিতে যোগান দেয়—প্রপ, টিবিং ওয়াগন পাতবার স্লিপার হয় মাপ মত কেটে। পাঁচু পিছু পিছু সেইখানেই গিয়ে হাজির হয়। অপেক্ষাকৃত নির্জন ঠাঁই। লোকজন বড় একটা কেউ আসে না এদিকে।

পাঁচু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, একটু কাছে এগিয়ে গিয়ে বলে,

হায় লালাজী। একটা আছে সন্ধানে। চিজ দেখে নিও তুমি।

লালাজী পিট পিট করে ওর দিকে চাইছে, লোকটা ঘুঘু; বহু খোঁজ খবর রাখে। কি ভেবে লালা বলে ওঠে—নেহি বাবা।

গভীর জলের মাছ ওদিকে জালে পড়তে চায় না।

পাঁচু হাসবার চেষ্টা করে—দর কমালে চলবে না দাদা। দাম যেমন দেবে তেমনি জিনিসও দেখে নেবে।

গলা খাটো করে বলে—তবে গাড়ি ভাড়া দিতে হবে। বাইরে থেকে আসবে কিনা। বুঝলে।

লালা বলে ওঠে—পরে আসিস। শোচ বুঝ করে দেখবো।

পাথর গলছে; স্যাৎ করে বলে ওঠে পাঁচু—তালে চাল কিছু দাও, ওবেলায় এসে কথা বার্তা হবে। চাকরিটা বজায় করে আসি। আঁত কত্তালে গাঁইতি চলবে কি করে। বলো?

—চাল?

লালা যেন আকাশ থেকে পড়ে—আচ্ছা লে যাও একসের; ব্যস আউর কুছ নেহি।

লালাজীর কারবারে সবদিক বজায় রাখতে গেলে নানা জায়গায় নানান রকম নজর ভেট দিতে হয়। সব খরচ করে লাভ যা থাকে মন্দ নয়। তবে অনেক ফৈজৎ।

দিনদিন এটা যেন বেড়ে চলেছে।

এ ভাবে চললে লাভের গুড় পিঁপড়েতেই মেরে দেবে। তবু লালাজীর এ পথে না চলে উপায় নেই। পাঁচু নিকিরি শুধু চালই নিয়ে যাবে না, এরপর কিছু টাকাও চাইবে তা জানে।

বসন্ত খাদের জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। মাথায় আর ঠোক্কর খায় না গ্যালারির চালে। ভিজে পাথরে পা দিয়ে সহজ ভাবেই টপকে চলে। শ্যাফ্‌ট থেকে প্রায় কয়েকশো ফিট ঢালু পথ দিয়ে আনাগোনা করে অভ্যাস হয়ে উঠেছে তার। মেইন গ্যালারি, ব্রাঞ্চ বাইফারকেশন, ট্রলি লাইন—কোনখানে প্যাম্প কেবিন সবই জেনেছে সে।

একা সেই নয়—ওদের শিপটের শরণ সিং, ফড়িং সরকারও চিনেছে তাকে। লেখাপড়া জানা বাঙ্গালী, মাল কাটার কাজে এসেছে। ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারে না ওকে।

মাখন বলে ওঠে—টবের হিসাব যেন একটু বেড়েছে বলে মনে লাগে।

—সিদিন টব গুনতে গিয়ে কি ব্যাগড়াই না বাধল? চোর ব্যাটা।

—শালা মুনসী মহা হারামী। দেগা কোই রোজ হলেজ লাইনমে এক ধাক্কা, একদম পাতাল চলা যায় গা।

ভাপসা গরমে ওরা গ্যালারির সামনে ঘেঁসে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। এখানে এতদিন লাইট আসে নি। 'কনডুইড কেবল' টাঙ্গাচ্ছে মিস্ত্রীরা, কোলফেস এগিয়ে চলেছে, ওরা চলেছে সেই সঙ্গে। ওদেরও এখানের কাজ ফুরোল। মালকাটার দল এগিয়ে যাবে আবার আদিম অন্ধকারের রাজ্যে।

সরু গ্যালারিতে ট্রিপড স্ট্যাণ্ড রেখে সার্ভে হচ্ছে, কোন জায়গায় নোতুন গ্যালারি এগোতে হবে। উপরে ঘর বাড়ি, পথ ঘাট দেখে চিনে নাও—কোথায় আছি। এখানে সবই জমাট অন্ধকার, পুব না পশ্চিম, উত্তর না দক্ষিণ, কোন হদিস মিলবে না। সম্বল ওই ম্যাপ—তার উপর চৌকো দাগ, এক একটা পিলার; তার ফাঁক দিয়ে সরু ছ ফিট চওড়া—পাঁচ ফিট উঁচু রন্ধ্রটুকু।

থিয়েডোলাইট দিয়ে লাইন করছে কম্পাসবাবু।

—এইখানে চুনের দাগ দে।

জমাট পাথরে আবার নিশানা পড়ল। ঠিক তারই সমান্তরাল করে দেড়শ ফুট দূরে আবার একটা দাগ। একসঙ্গে দুটো পথ চলবে; দেড়শ ফুট গিয়ে স্কোয়ার হয়ে থাকবে আর একটা পিলার; সেই জমাট কয়লা—পাথরের স্তর মাটির উপর বাইশ শো ফুট ওজন বইবে।

কোলিয়ারির স্বত্বের সময় যখন পূর্ণ হয়ে আসবে, কোম্পানী ওই থামগুলোও কেটে নেবে, লাখো টাকার কয়লা আসবে ওইগুলো থেকে।

বসন্ত নিবিষ্ট মনে ভাবছে। নোতুন উদ্যমে মালকাটারা গাঁইতি বসাচ্ছে জল দিয়ে ভেজান কয়লার স্তরে। একটুও যেন ফিন্‌কি না ওঠে।

আদিম কুমারী স্তর। সেকেণ্ড ম্যানেজার মিত্র সাহেবও দাঁড়িয়ে আছে; সাদা হেলমেটটা দেখা যায় কয়লার স্তরের পাশেই।

বসন্ত গুঁড়ি হয়ে কাটা কয়লা সরাচ্ছে; ভুসভুসে কয়লা। অল্প আয়াসেই খসে পড়ছে চাপ চাপ।

ফস্টারের সাদা টুইলের সার্টে কয়লার গুঁড়োর দাগ; সারা গ্যালারিতে উড়ছে সূক্ষ্মতম মিহি কয়লার গুঁড়ো, এখানের বাতাস ভরে আছে তারই চূর্ণতম অণু পরমাণুতে; টিপ্ টিপ্ জল ঝরছে। মালকাটারা মাঝে মাঝে চেয়ে দেখে ছাদে জলকণার চিহ্ন রয়েছে কিনা; চূর্ণ সূক্ষ্মকণার ঘর্ষণে আর গ্যালারির গুমোট তাপে কখন ওই অদৃশ্য কয়লার পরমাণুতে অগ্নিকাণ্ড না বাধে। কোলডাস্ট, গ্যাস এবং উত্তাপ—তিনের সংমিশ্রণে কখন সর্বনাশ ঘটে তার ঠিক নেই।

—হুশিয়ার!

কর্তাদের সামনে ওভারম্যান শরণ সিং অন্য মানুষ। মালকাটার হাত থেকে গাঁইতি নিয়ে নিজেই দেখাতে থাকে—এইসা মারো।

অন্য সময় হলে খিস্তী করতো পাঞ্জাবী পুঙ্গব।

মিত্র সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কি দেখছে। নিস্তব্ধ নীরব গ্যালারি। কিসের ইঙ্গিতে যেন থেমে গেছে সবাই, রুদ্ধ নিঃশ্বাসে কি শুনছে কান পেতে।

অন্ধকার রাজ্যে হাজারো ফণার ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা যায়। হুস্-স্। ফিস্-স্!

কয়লার স্তর থেকে গ্যাস বেরুচ্ছে। বিষাক্ত 'মিথিন' গ্যাস।

কয়লার স্তর যেদিন থেকে গড়ে উঠেছে সেই স্মরণাতীত প্রাগ্ঐতিহাসিক যুগ থেকেই ওরা জমে আছে মাটির নীচে বন্দী জলের মত। কোথাও কম, কোথাও বেশি পরিমাণে। কয়লা কাটার সঙ্গে সঙ্গেই সেই গ্যাস বের হয়ে আসে তোড়ে। কয়লার আদিম সর্ব নিম্নস্তরে ওরা আঘাত করেছে। প্রাগ্-ঐতিহাসিক সত্তাকে আঘাত হানছে নিষ্ঠুর বর্তমান। কোথায় চলেছে সেই সর্বনাশা প্রতিরোধ!

—এনি ব্লোয়ার? চারিদিকে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে দেখছে ওরা।' ঝপ্ ঝপ্ চলেছে নিষ্ঠুর গাঁইতির চোট। ফস্টার প্রশ্ন করে। ফিনকি দিয়ে জলের মত তোড়ে কোনখান থেকে অত্যন্ত বেশি পরিমাণ গ্যাস বের হচ্ছে কিনা তাই দেখছেন মিত্র সাহেব।

অসহ্য গরম। মুক্ত বাতাস এখানে এসে পৌছেনি। যা রয়েছে তাও গুমোট—ভাপসা।

মিত্র সাহেব উত্তর দেয়, মিথিনোমিটারের দিকে চোখ রেখে—না।

বাতাসের চেয়ে হালকা গ্যাস সামান্য পরিমাণে গ্যালারির উপরিভাগে জমে রয়েছে। মিত্র সাহেব বলে ওঠে,

—বাট ভেন্টিলেশন মাস্ট বি ডান।

বাতাসের বেগে এক জায়গা থেকে সর্বত্র ছড়িয়ে গেলে গ্যাসের পরিমাণ কমে যাবে। শতকরা পাঁচভাগের উপরে উঠলেই বিপদ।

ফস্টার কয়লার নরম স্তরের দিকে চেয়ে উৎফুল্ল হয়েছে। গ্যাসও সামান্য। কম খরচে বহু কয়লা উঠবে তাড়াতাড়ি। এত মালকাটাকে বখরা দিতে হবে না। বলে ওঠে—ইউজ কোল কাটিং মেসিন হিয়ার।

যন্ত্রে কয়লা কাটা হবে, কনভেয়ার বেল্টে করে উঠে যাবে কয়লা। এত লেবার, মাল বইবার কুলীর খরচ বাঁচবে। ফস্টার হিসাব করছে মোটা মুনাফার।

কথাটা শুনে থেমে যায় ওদের গাঁইতি; আলোগুলো জলছে অসহ্য জ্বালায়। মাখন, পাঁচু, বুধন আর সকলেই চমকে ওঠে। এখানে কয়লা তুলতে পারলে কিছু রোজকার হবে, কিন্তু তাতেও বাদ সাধবে ওরা। মালু সরে গেছে এক কোণে, ওদের আলোর সামনে থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। কয়লার ধুলোতে মুখ চোখ বিবর্ণ; গায়ের জামাটাও কালো হয়ে মিশিয়ে গেছে

কয়লার স্তরের রংএ। সকলের মুখের অন্ন ঘুচিয়ে দেবে, ওরা কেড়ে নেবে ক্ষুধার বৃত্তির সামান্য মাত্র উপকরণ।

এগিয়ে আসে কে একজন এইদিকে। পরিষ্কার সতেজ কণ্ঠে বলে ওঠে,

—হাইলি গ্যাসী মাইন স্যার, কোলকাটিং মেসিন মে হ্যাভ স্পার্কস। ইট উইল বি ফেটাল।

আলোগুলো নড়াচড়া করে। একটি মুহূর্ত! ওরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে আছে জমাট আতঙ্কে।

—হোয়াট! হু উ? ফস্টারের কণ্ঠস্বর গর্জে ওঠে আঁধারে।

মালকাটারা চমকে ওঠে। এগিয়ে এসে রুখে দাঁড়াল শরণ সিং। সকলের আলোটা ওর মুখে; কালিমাখা একটা মুখ, চোখের পাতাগুলো ছেয়ে গেছে কালির দাগে। অন্য মালকাটার সঙ্গে কোন পার্থক্য নেই। সাধারণ একটি লোক।

মিত্র সাহেব কথাটা আগেই ভেবেছিল, এত বিপজ্জনক গ্যাসের মধ্যে কোলকাটিং মেসিন আইনত বসান যায় না। একজন সাধারণ মালকাটা ইংরাজিতে সেই কথাটাই স্মরণ করিয়ে দেয় পরিষ্কারভাবে দৃঢ়কণ্ঠে।

—মালকাটা হ্যায়? ফস্টার ইচ্ছে করেই যেন পবিত্র ইংরাজি ভাষায় একজন মালকাটার সঙ্গে কথা বলতে লজ্জা বোধ করে। মাতৃভাষাতে কথা কইবে সমানে সমানে, মালকাটার মত জীবের সঙ্গে নয়।

—জী সাব। হিন্দিতেই জবাব দেয় বসন্ত।

ফস্টার কথা বলে না।

গোলমাল দেখে ফড়িংও ভিড়ের মধ্যে এগিয়ে আসে। সেইদিনকার সেই ছোঁড়াটা আজ বড় সাহেবের মুখোমুখি তক্কো করছে ইংরাজিতে। আইনের তক্কো।

ফস্টার কি ভেবে মিত্র সাহেবের দিকে চেয়ে বলে ওঠে—ইয়েস মিঃ মিত্র। লেট আস গো।

শরণ সিং জুতোর হিল ঠুকে মিলিটারি কায়দায় স্যালুট করে দাঁড়াল নির্দেশের অপেক্ষায়, ফস্টার বলে ওঠে—কাম চালাও।

ফস্টার যেন একটা ঠোক্কর খেয়েছে কোথাও। যেতে যেতেই কথাটা

যেন ছুঁড়ে দিয়ে গেল এদের দিকে। কুকুরের পানে অবজ্ঞাভরে এক টুকরো বিস্কুট ছুড়ে দিচ্ছে যেন।

ফড়িং সরকার কানের পেন্সিল হাতে নিয়ে ধুলো মাখা কালো লোডিং ফর্ম বের করে হাঁক ডাক করে—লাইন ক্লিয়ার করো! টব লাও, এই গিধ্বোড় কাঁহকা।

—ক্যা বোলা? মালকাটা একজন নূতন উদ্যমে রুখে ওঠে।

ইনক্লাইও দিয়ে উঠে গেল সাহেবরা, এক মোড়ের বাঁকেই অদৃশ্য হয়ে গেল ওদের বাতির আভা। ঠেকাবার কেউ নেই, বাধ্য হয়েই ফড়িং সরকার চেপে গেল।

—সাবাস ভাই! মালকাটাদের মধ্য থেকে গুঞ্জরণ ওঠে।

—এক ইংরাজিতেই কাৎ।

মাখন গাঁইতি তুলে কোপ মারতে মারতে বলে—আজ তোর ছুটি রে বসন্ত।

ওদের নীরব চাহনিতে ফুটে ওঠে কৃতজ্ঞতা, ভালবাসার ছায়া। এতগুলো লোকের কায কদিন বন্ধই করে দিত কোম্পানী। না হয় এমন জায়গায় দিত, যেখানে গিয়ে কাযই হতো না। বসন্ত কথা বলে না।

চুপিসারে মালু এগিয়ে আসে। কয়লা বোঝাই করবার ফাঁকে ওর হাতটা ধরে। কালি মাখা কর্কশ ফাটা হাত; জীবনের কোন শ্যাম পেলবতার স্পর্শ সেখানে নেই। ব্যর্থ জীবনের নিদারুণ অভিশাপ বয়ে চলেছে ওই নাম পরিচয়হীন একটি সত্তা।

বসন্ত চেয়ে থাকে ওর দিকে।

মালু ফিস্ ফিস্ করে বলে—কেন বলতে গেলে ও কথা?

সবার সঙ্গে জীবনের স্থর মেশে না। কঠিন কঠোর বাস্তব জীবনের নগ্ন নীচতা ও দেখেছে পদে পদে; দেখেছে প্রীতি আন্তরিকতার দাম কতটুকু। প্রতিবাদের তেজ চেপেই রেখেছে আর হতাশ হয়েছে।

তাই কঠিন নীরস কণ্ঠে বলে ওই কথা।

—কেন? বসন্ত প্রশ্ন করে।

—ওরা তোমাকে চিনে রাখছে। মালুর কথায় ভয়ের চিহ্ন।

একটা আলোর ঝলক এগিয়ে আসে, মুহূর্তে বদলে যায় মালু। কয়লার ঝুড়িটা টবে ঢেলে ফিস ফিসিয়ে ওঠে প্রচণ্ড শব্দের মধ্যে।

—কায করো ; কে আসছে।

গুঁড়ি হয়ে টবটা ঠেলে নিয়ে যায় লাইনের উপর, বেঁকে গেছে শির-দাঁড়াটা। শরণ সিং ওর পাশে এসে দাঁড়ালো। বসন্ত কয়লার স্তূপগুলো চারিয়ে দিচ্ছে টবের মাথায় ; মিনিটটেক দাঁড়িয়ে থেকে শরণ সিং চলে গেল অন্য দিকে।

বসন্ত যেন টেরই পায় নি ; আপন মনে কায করে চলেছে। তবু বেশ বোঝে একটা সন্ধানী দৃষ্টি তাকে ঘিরে রয়েছে।

ফকির চুপ করে পড়ে আছে ধাওড়ার বাইরে ছেঁড়া চারপাই-এ। একটুও হাওয়া নেই, গুমোট ভাপসা গরম। আকাশের দিকে নজর চলে না। চারি দিকের ধোঁয়া ধুলোতে সব ছেয়ে গেছে। সারা মাঠ জুড়ে পাঁচিল, ঘর, রেল-লাইন আর সবুজ মাঠের বাকি অধিকাংশ ছেয়ে গেছে কয়লার উপরের পাথুরে মাটির কাল্চে স্তূপে।

কয়েক বছর থাকলে ওগুলোও কয়লা হতো, কিন্তু কর্তাদের সময় নেই, যা পারো, যত পারো কয়লা তুলে আনো। টাকা চাই, রেজিং বাড়াতে হবে।

বাতাস চলাচলের পথটুকুও বন্ধ হয়ে গেছে ওদের চাপে।

ফকির আবছা অন্ধকারে পড়ে পড়ে ভাবছে। অতীতের দিকে দৃষ্টি চলে যায়, বর্তমান তার কাছে হাহাকার আর নৈরাশ্যে ভরা।

সেদিনগুলো ছিল ভালো, পয়সা যেটুকু পেত সে আর তরঙ্গ মিলে বেশই চলে যেত। ধাওড়ার মাঠে আনাজ-লাউশাক-মকাইও হত কিছু।

এখন এক চিলতে ঠাঁই নেই। সাহেবদের বাগান উঠেছে, হয়েছে গলফ্ খেলার সবুজ মাঠ।

আইন বদলালো, মেয়েরা খাদে নামতে পারবে না। গুঞ্জরণ ওঠে। হাট-তলার মাঠে লাল নিশান উড়ল। দলে দলে মেয়েরা বের হল পথে, দরবার করতে। আসানসোল-কলকাতা থেকে বাবুরা এলেন। গরম গরম বক্তৃতা হল।

তরি বলে—নোকরি দেবে না মানে কেঁদ পাকাটি হইছে ? খাবো কি ?

কে যেন ভিড়ের মধ্য থেকে বলে ওঠে—তুর আবার ভাবনা কি গো ? আমি রইছি।

—আয় না মিনষে, ছামুতে আয় মামেগো। তরঙ্গের মুখের আড় থাকে না রাগলে।

সাহেবদের কাছে মেয়েরা দরবার করে—অন্য চাকরি দাও ; ভাত কাপড় পাবো কুথাকে ?

বাগদী বাউরী সাঁওতালের ঘরের মেয়েছেলে। নিটোল অটুট স্বাস্থ্য। পুরুষের সমান কাজ করে। কিন্তু কাজের চেয়ে লোক বেশি। মেয়েদের রোজকারের পথ বন্ধ করবার জন্য পুরুষের অভাব হয় না।

ঝিমিয়ে আসে আন্দোলন। বাবুরাও কেমন পিছিয়ে যায়। তালরুইএর মেজবাবু, ইয়াকুব ; ইয়াকুব শেখও চুপ করে গেল। একটা কোথায় গোপন কলকাঠি নড়ে উঠেছে। ফেঁপে ওঠে ইয়াকুবের কারবার, লালাজীর গদিও বেড়ে যায়।

ফকির সেদিনের কথাগুলো ভোলে নি। লালাজীর দোকান তখন ছোট, মাথায় করে জিনিস আনে, ঘুরে ঘুরে খদ্দের যোগায়। হঠাৎ কেমন যেন বাবুদের সঙ্গে এঁটুলীর মত এঁটে গেল। পরনে পায়জামা, একটা পাঞ্জাবী ; মাথার চুলে তেল নাই, যেন কাকের বাসা। কোলিয়ারির লেবার সাহেব নারকেলওয়ালার সঙ্গে রাতবিরেতে এখানে ওখানে দেখা যায়।

বাবুরাও মিটিং করে ওর দোকানে যায় চা জল খেতে, সলা হয়।

ক্রমশ লালার ওখান থেকেই কথাটা রটে গেল।

মেয়েদের চাকরি দেওয়া হবে, উপরে কাজ করবে তারা। ছেলে-পুলেদের আগলাবার জন্য দিদিমণি আসবে। মেয়েদের কাজ যাবে না। তারা উপরে কাজ করবে সবাই।

কথাটা রটে গেল। কে রটাল, কোনখান থেকে রটল কেউ জানে না। লালাজী এখানে ওখানে ফলাও করে বলে।

—জরুর কাম দেগা।

দুচারজন কাযে লাগলো। কিন্তু কঠিন পরিশ্রমের কাজ, পিছনে কঠিন পাহারা, ফাঁকি দেবার উপায় নেই। কয়লা তুলতে হবে গাড়িতে ঝাড়া আটঘণ্টা। বুকে পিঠে টান ধরে। সরে গেলেই হাঁক পাড়ে সর্দার।

—কোথায় যাচ্ছিস রে ?

—ছেলেটোকে দেখতে হবেক নাই ? মেয়েটি জবাব দেয়।

সর্দার বলে ওঠে—দিদিমণি আছে কেনে বিবিকরচে ? সেই দেখবেক গো ছেলেটাকে।

কাজ ছেড়ে এক পা যাবার কায়দা নেই। মেয়েটাও তেমনি ফাজিল। বলে ওঠে,

—বিবিকারের বাঁজাদিদিমণি ছেলেটোকে মাই দিবেক নাকি রে ? হেসে ফেলে সকলেই।

ক্রমশ ব্যাপারটা প্রকাশ পায় ; বেশি কাজের লোভে ওরা পুরুষ মজুরই চায়। মেয়েরা ক্রমশ সরে যাচ্ছে চিনকুঠী থেকে। নোতুন করে আর চাকরিও কেউ পায় না। একটা অতর্কিত আঘাতে ভেঙ্গে পড়েছে ওদের জীবনযাত্রা।

তরঙ্গ একা নয়। ধাওড়াতে ফুলী, মধুর মাসী, লবঙ্গ, বাসিনী, পদ্ম—সকলেরই প্রায় চাকরি গেছে।

সৌরভী বলে—গতর খাটিয়েও খেতে পাবি না তবে ছিনেলিপনা করে খাবি নাকি ?

ফকির চুপ করে মাথায় হাত দিয়ে বসে ; হপ্তাহে পনের টাকা মাত্র মাইনে, তাতে দুটো পেট চলে না। তরঙ্গ বলে,

—চাল না এনে মকাই আন তুই।

—ক্ষেতের মকাইও নাই। ফকির বলে ওঠে।

ক্ষেতের শেষ ফসলটুকুও ফুরিয়ে গেছে, কোনদিনই ও মাটিতে আর পা দিতে পারবে না তারা। ওয়ার্কশপ হবে কোলিয়ারির, পাঁচিল উঠছে চারিপাশে। আট বছর ওই জমি তাদের খোরাক যুগিয়েছে, আজ থেকে পর হয়ে গেল। চোখের দেখাও মিলবে না ওই মাটির। কনক্রিটের দেওয়াল উঠছে ওর চারিদিকে।

অভাব অভিযোগ! সারাদিন খেটে এসে যদি ভরপেট খাওয়া না জোটে মেজাজ ঠিক থাকে না, পরের দিনও খাটতে হবে খালি পেটে। শরীরের সমস্ত কোষগুলো শুকিয়ে দড়ির মত হয়ে যায়।

মেয়েরা দল বেঁধে কয়লাকুচির সন্ধানে যায়, যে কয়লা একদিন পা দিয়ে মাড়িয়েছে, ফেলেছে, পুড়িয়েছে ইচ্ছেমত, আজ এত কয়লার মাঝেও তা সোনার মত দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে তাদের কাছে। কঠিন প্রহরা। কয়লা আনবার উপায় নেই। ঝুড়ি সমেত ঘেরাও করে তাদের।

—এ্যাই মাগী। ধমকে ওঠে ভোজপুরী, লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ওদের দিকে।

তরঙ্গ চেনে ওই চাহনির অর্থ।

—খাড়া রও! মেয়েগুলো ভয়ে বিবর্ণ হয়ে ওঠে। কেউ কেউ হাসছে খিল খিল করে।

ভোজপুরী পাহারাদার এগিয়ে এসে ঝুড়ি উলটে দেয়, ঝুড়ি উল্টে দেবার ভান করে কেউ বা প্রকাশ্য দিনের আলোতেই গায়ে হাত দিয়ে ফেলে। কদর্য ইঙ্গিত ভরা হাসি হাসে ওরা দল বেঁধে। ওদের বহু কষ্টের কুড়োন কয়লাগুলো ঝড় ঝড়িয়ে পড়ে রাস্তায়।

—মুখপোড়া! তরঙ্গ একদিন একজন পাহারাদারের মুখে একটা কয়লার চাঁই ছুঁড়ে রক্তগঙ্গা করে দৌড় দিয়েছিল। কয়লা নয়—আরও কিছু চায় সে।

হীন কদর্য ইঙ্গিত। প্রতিবাদ করেছিল সে মাত্র। সে এক হুলস্থুল কাণ্ড। পাহারাদারের দল ক্ষেপে ওঠে।

ফকির সারাদিনের কাযের পর পিট থেকে উঠে আসছে। সারাগায়ে ঘাম আর কয়লার ধুলো—নাক দিয়ে শিকনি গড়াচ্ছে কালো কালির মত।

ওদের ডাকে থমকে দাঁড়াল—শুনে যা। পাহারাদাররা ডাকছে। ফকির এগিয়ে যেতেই একজন এসে ওর গালে এক চড় বসিয়ে দেয়, ছিটকে পড়ে গড়িয়ে একদিকে, পরমুহূর্তে অন্যজন এসে লাফ দিয়ে পড়ে ক্লান্ত শরীরটার উপর, কিল চড় বৃষ্টি চলতে থাকে অবিশ্রান্ত গতিতে। পাশে দাঁড়িয়ে দেখে আর সবাই।

কোন রকমে নিষ্কৃতি পেয়ে উঠে দাঁড়াল সে। তার বৌ নাকি কয়লা চুরি করতে আসে; ছোটবাবু ধমক দেন—তোর চাকরিই চলে যাবে এইবার। দূর কর ওই নষ্টা মেয়েটাকে।

কথা বলে না ফকির, রাগে দুঃখে অপমানে চোখ ফেটে জল আসে। অন্য মালকাটারা দাঁড়িয়ে দেখল মাত্র, একটি কথা বলবার সাধ্য কারও নেই। বললেই তাদের অবস্থাও তার মতই হবে। কেউ বাঁচাতে পারবে না।

পালোয়ান সিং-এর দল কোলিয়ারির একচ্ছত্র শান্তিরক্ষার মালিক। তাদের আইন আলাদা।

সমস্ত পথটা ফুলতে ফুলতে আসছে ফকির নিষ্ফল আক্রোশে।

ফকিরের রোজগারে একবেলা চলে কোন মতে, তরঙ্গ রাধানগরের হাটে ওই কয়লা বিক্রির দুচার পয়সা পায়, চাল না হয় মকাই আনে, তাই সেদ্ধ করে চলে একবেলা। আজ তাও বন্ধ—একা তার জন্য ধাওড়ার অন্য মেয়েরাও পালিয়ে এসেছে। তাদের অবস্থাও তেমনি। সমস্ত অঘটনের জন্য তারা দায়ী করে তরঙ্গকে।

কুচী গাল দেয়—সতী হইছে। জন্মো গেল ছেলে খেতে আজ হোল 'ডান'। না হয় গায়েই হাত দিছিল তুর ; গাটো ক্ষয়ে গেছে তুর ? চুপমেরে থাকলেই কয়লাতো পেতিস। তা লয় মাগী গেলো মারধোর করতে! লে বাবা এইবার ঠ্যালা।

সতীগিরির ব্যাখ্যানা উঠছে। কবে কোন মালকাটার ঘরে কে গিইছিল, কবার লতা পাতা জরি বুটি দিয়ে গা খসিয়েছে তারই হিসাব চলেছে। চুপ করে ঠায় বসে রয়েছে তরি ; হঠাৎ ফকিরকে ঢুকতে দেখে ওর দিকে চেয়ে থাকে। ফকিরের নাকে তখনও রক্তের দাগ, কয়লার গুঁড়োর সঙ্গে মিশে জমাট বেঁধে রয়েছে।

হাতের ঝুড়িটা ফেলে দিয়ে এগিয়ে আসে ফকির।

—কি করে এসেছিস ? বলি তুর চাকরিতো খেয়েছিস, এইবার আমারটাও খাবি হারামজাদী ? তরঙ্গ কিছু বলবার আগেই ঠাস্ করে এক চড় মেরে বসে তরঙ্গকে। কাঁপছে সে।

অবাক হয়ে যায় তরঙ্গ—মারলি তুই !

—একশোবার মারবো। আলবৎ মারবো।

এত অভাব অভিযোগেও কোনদিন গায়ে হাত তোলে নি ফকির, মাতাল হয়েও মারেনি ওকে। আজ যেন সব বাঁধন ছিঁড়ে গেছে। তরঙ্গও অসহ্য অপমানে ক্ষেপে উঠেছে। চিৎকার করে বলে,

—তাহলে মিনসেকে ঘরে এনেই বসাবো বল ? নিজের রোজগারে যদি মাগকে খেতে দিতে না পারিস—তাই-ই করবো ইবার। ভাত দেবার ভাতার লয় কিল মারবার গোঁসাই।

—যত বড় মুখ লয় তত বড় কথা ?

ফকির দপ্ করে জ্বলে উঠে, ওর ঘাড়টা ধরে পড় পড় টেনে ঘরের বাইরে এনে হাজির করে। চারিদিকে ভিড় জমে গেছে, অন্যান্য ক্ষুব্ধ মেয়েরাও মনে মনে খুশি হয়। ফোড়ন কাটে চারিদিক থেকে,

—বড় বেড়েছে রে, ফকির। ছুঁড়িটার বড় ত্যাল হইছে। ছিনেলিপনা করে তু গেলেই, আবার সতী সাজে। ত্যাল বেঁধেছে।

—ত্যাল ভাঙ্গছি দেখ কেন্নে। ফকির গর্জন করছে।

তরঙ্গ একটি কথাও বলেনি। বললে ফকিরও শুনতো না। ফকির এক তরফা পিটিয়ে যায়, লাথি মেরে ছিটকে ফেলে তাকে মাটিতে। চিৎকার করে—চলে যা তুই। যিথানে খুশি চলে যা। তুকে ছেড়ে দিলম—দিলম—দিলম। তিন সত্যি করছি। যাকে লিয়ে থাকবি থাকগা। হিয়া খোলসায় তোকে ছাড়ান দিলাম।

কাঁদছে তরঙ্গ, ব্যাকুল তুটো চোখ মেলে। প্রথম নিদারুণ আঘাত পেয়েছে সে।

ফকির বের হয়ে গেল সেই অবস্থাতেই। ফেরে অনেক রাত্রে, মদের নেশায় চুর হয়ে; কিন্তু তরঙ্গ আর ফেরেনি। আজও ফেরেনি, ফেরার—উধাও হয়েছে সে।

রাত নেমেছে। চড়াই উৎরাই-এব খাঁজে খাঁজে জ্বলছে আলোর মালা। বার্নপুরের লোহা কারখানার দিকটায় চোখ রাখা যায় না—লালে লাল। ওরই একটু কোণ ঘেঁসে আসানসোল শহর।

কোথায় যেন তরঙ্গ আছে বস্তির ঘরে। রাতে কত লোক আসে। কাপড় চোপড় গহনা কত কি পরে সে।

অন্ধকারে ডাকছে পাঁচু,

—ফকির দাদা, ও দাদা।

—এঁ্যা! ফকির চোখ মেলে চাইল। পাঁচু ঠিক কথা রেখেছে। চান করেই বের হয়েছে। গায়ে লাল পবলিনের পাঞ্জাবী, পায়ে কেডস্ জুতো। চুলগুলো জোর করে উজিয়ে দিয়েছে।

—যাবা নাই ; সেই যে বলেছিলা।

—কুথাকে ? ফকিরের মনে নেই। চিন্তায় ডুবেছিল এতক্ষণ। মনটা কেমন ভার।

—সেই যে গো, আসানসোল। নামো বস্তিতে। উয়াকে দেখবা নাই। মাইরী, দেখতে যা হইছে। আহা! চিনতেই পারবা না তোমার তরঙ্গকে।

পাঁচুর জিব দিয়ে লালা গড়াচ্ছে।

ফকিরের পকেটে হপ্তার টাকা কটা রয়েছে। লালাজীর দেনা দিতে হবে দশ টাকা। বাকি আট টাকা থেকে গোটা দুই টাকা ওকে দেয়।

—তুই যা, খপরটা লিয়ে আসবি কিন্তু।

—তুমি? পাঁচু টাকা দুটো হাতিয়ে নিয়ে আপ্যায়ন করে—গেলেই তুমার কথা শুধোবে।

—শুধোয় আমার কথা? হ্যাঁ রে?

ফকিরের গলার স্বর থমথমে হয়ে আসে, সেই রাতে কুকুরের মত মেরেছিল ওকে। রাগ দুঃখ অভিমানে সে চলেই গেল শেষ কালে। না গেলে আরও দুঃখ পেত। অনেকেই গেছে—ফুলি, বাসিনী, পদ্ম সকলেই ও পথেই গেছে এখানকার চাকরি হারিয়ে। যারা টিকে আছে তাদের দশাও তেমনি করুণ। বার বার মনে পড়ে তরঙ্গকে। যেতে সাহস হয় না। একটা লজ্জা তার মন ছেয়ে আসে; মুখ দেখাতে পারবে না সে তরঙ্গর কাছে। কাপুরুষ সে।

—না! তুই যা বাপু। শরীলটা ভালো নাই আমার।

পাঁচু উঠে পড়ল—আচ্ছা চলি তালে।

কথা কইল না ফকির; চুপ করে একা পড়ে থাকে আঁধারেই। বুক ভরা আঁধার। ঘরে বাইরে অমনি অন্ধকার। আলোর ইশারা নেই। একটু ইশারার মত জেগে থাকে তরঙ্গের হাসিভরা মুখখানা—সে আজ পর হয়ে গেছে।

কি করে মানুষ পর হয়—এতকালের চেনা ভালবাসা ভুলে যায় জানে না ফকির। কই, সে তো তাকে ভোলেনি।

হু হু বাতাস বইছে। চমকে ওঠে ফকির! চোখের কোল বেয়ে জল নামছে, উঠে বসল খাটিয়ায়! বাতাসে শালফুলের গন্ধ, কুর্চির সৌরভ মিশে মিঠে হয়ে উঠেছে। রাতের অন্ধকারে পাঞ্চেত পাহাড়ের বন থেকে ভেসে আসছে হারানো দিনের স্মৃতিসৌরভ, একটি মিষ্টি স্পর্শভরা দেহস্মৃতি। উঠে দাঁড়াল। সুরটা এই হিংস্র নিষ্ঠুর জগতে যেন ব্যর্থ কান্নার মত পথ হারিয়ে গুমরে ফেরে রাতের অন্ধকারে।

বাঁশি বাজছে। তুরু তুরু সুরে। 'লাগড়ে সিড়িং'এর সুর। কেঁপে কেঁপে উঠছে সুরটা। বয়লারের গর্জন থেমে গেছে। ঢেকে গেছে কয়লার ধুলো, আকাশ ভরা তারা, বাঁশির সুর আর ফুল গন্ধ মাখা বাতাস হাতছানি দিয়ে ডাকে তাকে।

এগিয়ে যায় উঠে বাঁশির সুর ধরে।

কোলিয়ারির জল ঝরানি খাদের মুখটা গিয়ে পড়েছে দামোদরে। কালো পাথরের উপর বসে বাঁশি বাজাচ্ছে সেই সন্ধ্যার সাঁওতাল ছেলেটা। বুধন বাঁশি ফুঁকছে—বেউড় বাঁশের বাঁশি, বাতাসে ওর পাহাড়িয়া সুর।

ফিস ফিসিয়ে বলে ওঠে ফকির—তুই এখানে থাকিস না বুধন। ওপারে পালা। বনে ফল আছে, ঝরনার জল আছে। আর আছে সুরয বংহা—মাদনা ঠাকুর। ক্ষেতি গেরস্থি করগা।

হাসে বুধন ওর কথায়, মুখ থেকে বাঁশিটা নামিয়ে চাইল ওর দিকে।

— কি বলছিস? ঠিক বুঝতে পারেনি কথাগুলো ওঁর।

ফকির আবছা তারাজ্বলা আঁধারে ওর দিকে চেয়ে চুপ করল।

একথা কেউ শুনবে না। যেদিন বুঝতে পারবে সেদিন ফেরবার পথও ভুলে যাবে।

—কিছু না। ফকির চুপ করে ভাবছে।

মায়াবী দেশ,···আলোর নেশায় ছুটে আসা পতঙ্গের মত ছটফটিয়ে মরবে, তবু সরে যাবে না। বুধন আবার বাঁশিতে ফুঁ দিচ্ছে মনমাতানো সুরে। কেন জানে না ফকিরও বসল একটু দূরে। চোখ ছাপিয়ে জল আসে।

কে জানে পাঞ্চেতের বনে এখন বোধ হয় রাত নেমেছে—ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে গাছগুলো। শিরশিরিয়ে কুর্চি ফুল ঝরে থেকে থেকে।

ছেলেরা মিত্র সাহেবকে ধরে করে ক্লাবের কায এগিয়ে চলেছে। নারকুলিয়াকেও ইতিমধ্যে তাগাদা দিয়েছে।

—কি হল স্যার?

—হোবে। আশ্বাস দিয়েছে মাত্র। কাযে বেশি দূর এগোতে পারে নি।

ফস্টার কাগজখানা হাতে নিয়ে টেবিলের উপর চাপা দিয়ে রেখেছে মাত্র। চোখ বুলোবার সময় হয় নি।

—আর্জেণ্ট স্যার। নারকুলিয়া একটু কি মিনমিন স্বরে বলবার চেষ্টা করে। গলার কাছে ইচ্ছে করেই ক্রশটা বের করে রাখে। যীশুখ্রীস্টের এক সু-সন্তান ফস্টার রেজিং-এর খাতায় কি করে সারপ্লাস কয়লার জন্য বেশি বোনাস আদায় করা যায় তার হিসাব করছিল, ওর কথায় বাধা পেয়ে একটু বিরক্ত হয়ে মুখ তুলল ; কথা কইল না, চুপ করে তির্যক দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে থাকে, খৃস্টের দ্বিতীয় সুসন্তান ওই তেলেঙ্গীর দিকে। লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার নিজের ওয়েল ফেয়ারের কথা ভেবে তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করে।

ব্যাপারটা সেইখানেই চাপা পড়েছিল। হঠাৎ নোতুন করে ছেলেদের তাড়া খেয়ে সাহেব দো টানায় পড়ে।

—কি করি বলতো রমেশ ! এগোলেও বিপদ, পিছলেও ওই বালসেনার দল। কার কার ছেলে বলো ত ? দু'একটা পাণ্ডার নাম করো—দেখি ঠাণ্ডা করা যায় কিনা।

নারকেলের বিপদ বুঝতে পেরে মনে মনে হাসে রমেশ। বলে ওঠে,

—কিছু ডোনেশন দিয়ে ওদের মেম্বর হয়ে যান স্যার। তাহলে কিছুদিন রক্ষে থাকবে।

—চাঁদা দিতে হবে ? এর চেয়ে মরতেও রাজি আছে নারকুলিয়া। দৃঢ় কণ্ঠে বলে ওঠে—নো ! নেভার।

—তবে যা খুশি করো গে। কথাটা বলতে গিয়ে থেমে গেল রমেশ। একমনে টাইপ করে চলেছে। ওর ভাবনা ওই ভাবুক।

ধূর্ত মাদ্রাজী, ঠিক ভেবে চিন্তে কর্তাকে ভজনা করবার পথ বের করবেই। তার জন্য আর কাউকে লাগবে না। এই করেই টাইপিস্ট থেকে নারকুলিয়া আজ লেবার অফিসার হয়েছে। বিশেষ করে কায থেকে মেয়েদের হটাবার ব্যাপারে ওর তেজী বুদ্ধির যা পরিচয় দিয়েছিল—তাতে বিন্দুমাত্র ঘূণ ধরেনি। বরং আরও বালিশান পড়েছে।

—মিঃ মিত্র ওদের প্রেসিডেণ্ট হতে চেয়েছেন না? নারকুলিয়া প্রশ্ন করে রমেশকে। রমেশ স্রেফ জবাব দেয়—কই শুনিনি তো?

—ইয়েস! আমি শুনেছি।

রমেশ বেশ বুঝতে পারে নারকুলিয়ার চোখ মুখে একটা শয়তানির কালো ছায়া। ওর পিটপিটে চোখের চাহনিতে সাপের মত নিষ্ঠুর একটা ভাব।

পাঁচু এতদিনে পথ খুঁজে পেয়েছে। বাঁচবার পথ। শীর্ণ প্যাকাটির মত লোকটা ক'দিনেই বেশ চতুর চালাক হয়ে উঠেছে। এতদিন শুধু অভাব অভিযোগের সঙ্গেই যুদ্ধ করেছে বাঁচবার চেষ্টায়। হঠাৎ পাশার দান কেমন উল্টে পড়েছে।

জগদ্ধাত্রী এদিক ওদিক দেখে; ঠিক ধাওড়া নয়। লালাজী বাড়িটা মেরামত করাচ্ছে; তারই একখানা ঘরে উঠেছে পাঁচু।

—ঠিক আছো তো পাঁচু? কি গো?

জগদ্ধাত্রী লোক চেনে। চেয়ে আছে বিশালাকার ওই জাম্বুমানের দিকে!···লোকটার দু চোখে অতৃপ্ত একটা নেশা। পাঁচু দাঁত বের করে কৃতজ্ঞতায় গলে ওঠে— আপনার কায চৌরস আজ্ঞে।

—তবে ভাড়া পাঁচ টাকা মাসে, সমঝা?

জগদ্ধাত্রীকে কথাটা শুনিয়ে বলে লালাজী।

পাঁচুকে যেন নিজের তাঁবেই রাখতে চায়। চতুর সাবধানী লোক। ওকে দিয়ে কায হবে। লালাজীর হিসাবে কিছুই ফেলা যায় না। ম্যানেজার ফস্টার থেকে পাঁচু, পালোয়ান সিং পর্যন্ত সমান দামী।

—হুশিয়ার থেকো পাঁচু। কোলিয়ারি বহুত ডেঞ্জার জায়গা আছে। সমঝা?

পাঁচু সমঝেছে।

জগদ্ধাত্রীও বুঝেছে লালাজীর ওই দৃষ্টির মর্ম।

পাড়াগাঁয়ের দুঃখ কষ্টের দিনগুলো মনে করলে শিউরে ওঠে। পাঁচুকে স্বামীত্বে বরণ করে পেয়েছে শুধু জ্বালা আর উপবাস। পাঁচুকে তাই পরোয়া করে না জগদ্ধাত্রী।

—একটা শাড়ি চাই বাপু!

পাঁচু ফোঁস করে ওঠে—হ্যাঁ, শাড়ি, জামা, জুতো, পমেটম, পাউডার আরও কত কি বলবি ইবার! ভ্যালো বেপদ রে বাপু। বসতে পেলে শুতে চায়। খেতে পাচ্ছিস ওই ঢের, আবার ফলনা—ঢ্যাক তুস্কো?

জগদ্ধাত্রী গর্জন করে ওঠে—তবে কি আমি ওজকার করে আনবো রে মিনিমুখো ছোঁড়া?

পাঁচু নিরাপদ দূরত্ব থেকে বলে ওঠে—তার আমি কি জানি?

পাঁচু হন হন করে বের হয়ে গেল। নানা কায তার। যমকাকের মত বর্ণ…লিকলিকে দেহ, বাতাসের বেগে আশেপাশের সমস্ত ধাওড়াগুলো ঘুরে আসে; সব খবরাখবর সংগ্রহ করে।

—তামাক খেয়ে যাও হে। ও পাঁচু দা।

রোদ পড়তি বেলা। গেরুয়া রোদ স্তরে স্তরে উঠে যাওয়া চড়াইএর উচ্চ সীমায় ম্যানেজারের বাংলোর বাগানে ঘন সবুজ রং লাগিয়েছে। কালো জাম, জারুল গাছের পাতায় উছলে পড়ে প্রথম বর্ষার মেঘ ভাঙ্গা রোদ। পাখি ডাকছে করুণ উদাস সুরে।

পাঁচু কেষ্টর ডাকে এগিয়ে যায়; কেষ্ট মিস্ত্রী আরো কে কে বসে আছে ধাওড়ার পাশে তিরোল গাছের ছায়ায়।

—আজকাল ঘর সংসার পেতে বেশ আরামেই আছো পাঁচু দা?

পাঁচু ফোঁস করে ওঠে—ঘর সংসার! খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে, বেপদ হল এঁড়ে গরু কিনে। তাই হইছে ভাই। উ কায ভদ্দর লোকেরই মানায়; টানা ছেঁড়ার সংসারে বৌ একটা জালা, বুঝলা কেষ্ট।

কেষ্ট মিস্ত্রী কথা বলে না। মনে মনে গজরাতে থাকে।

ফকির চেয়ে আছে পাঁচুর দিকে; ঘর সংসার করছে। দেহমনে একটা শান্তির ছাপ।

—তামুক খাও।

পাঁচু সকলকে অবাক করে দিয়ে বিড়ি বের করে এক বাণ্ডিল। দাতা কর্ণের মত বিলোতে থাকে লালাজীর দোকান থেকে সাফাই করা বিড়িগুলো।

—লাও হে। শিবাজী বিড়ি বটে। ধরাও।

নিজেই ধরিয়ে টানতে থাকে ঘাসের উপর উপু হয়ে বসে। বসন্তও বের

হয়ে আসে। পাঁচু লোকটাকে কেমন দেখতে পারে না। সোজা তির্যক চাহনি ; ওর চোখের সামনে থেকে ফাঁকি দেওয়া যায় না কিছু।

ধাওড়ার ঘর ছেড়ে চিনতোড় গাঁয়ে বাসা ভাড়া নিয়েছে পাঁচুর মত বাউণ্ডুলে, এটাতেই বিস্মিত হয়েছে অনেকে। তারপর দমকা এই বিড়ি বৃষ্টি!

—শালা ওভারম্যান কি বলছিল দাদা? একেবারে টিট!

পাঁচুই সেদিনের কথাটা তোলে। মাখন কিছু বলবার আগেই বসন্ত বলে ওঠে—তোমরা যদি রাজী না হও, ওরা কায করাতে পারে না। নিজেদের সামান্য সুবিধা খুঁজতে গেলে কষ্ট পাবে বৈকি।

পাঁচু মাথা নাড়ে—হক্ কথা। একদিন দোব শালার মাথা ফাটিয়ে খচ্চর ম্যানেজারটার। কি বল?

ক্ষুদে চোখ মেলে চেয়ে আছে ওর দিকে। মাখন উঠে পড়ে। বসন্ত কথা বাড়াল না। ইচ্ছে করেই যেন পাঁচুর এই রক্ত গরম করা রাজনীতিকে এড়িয়ে গেল বসন্ত। চুপ করে যায় পাঁচু।

কেষ্টর বৌকে কল থেকে জল তুলে আনতে দেখে চমকে ওঠে।

মেয়েটা হঠাৎ কোনদিন এত ডাগর সুন্দর হয়ে উঠলো জানে না পাঁচু, তার নজর চারিদিকে, তাকে ফাঁকি দিয়ে এত বড় অঘটনটা ঘটে গেল। পাঁচু কেষ্টর গা টেপে,—কি রে বিয়োবে টিয়োবে নাকি?

কেষ্ট ফোঁস করে ওঠে—প্যাটে ভাত নাই জলে কর্পূর। আর ওতে কায নাই।

কেষ্টর মনে অসহ্য জ্বালা, একটু চুপ করে থেকে বলে ওঠে—দে কেন্নে ওই দিকে একটা খুপরি, চলে যাই ইথান থেকে।

পাঁচু অর্থপুর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তার দিকে।

পথের উপর ধরেছে ফকির। ওখানে ওদের সামনে কথাটা ঠিক বলতে সাহস করে না। ফাঁকায় এসে দাঁড়িয়েছিল। পাঁচুকে দেখে এগিয়ে আসে। চোখে মুখে ওর নীরব ব্যাকুলতা। ঘর বসত করছে অনেকেই। মাখনকে দেখেছে—শান্তির সংসার। একবেলা খেয়েও সুখে আছে; কেষ্টর লক্ষ্মী বৌটার জন্যই কেষ্টা এখনও পথে বসে নি। পাঁচুর মত বাউণ্ডুলেও ঘর করে।

হাহাকার করে ফকিরের মন অসীম শূন্যতায়।

—সেদিন গিইছিলি ?

ফকিরকে দেখে পাঁচুর মুখের আদল বদলে যায় ; আগেকার সেই শয়তান ফেরেব্বাজ লোকটা যেন এ নয় ; হাসিতে ফেটে পড়ে।

—যাই নি মানে! গিয়ে চা সিঙ্গাড়া খেয়ে এলাম। তোমার কথা শুধোল।

—কি বললি ?

—ভাল আছে। বার বার তোমার নাম করে ভাজ বৌ, ফকিরদা তুমার লেগে পাগল। আসবো আসবো করেও আসতে পারল না। শেষ মেষ বাপু মাথার দিব্যি দিয়ে বলেছে আমাকে—একদিন লিয়ে যেতেই হবে।

ফকিরের ভাঁজ পড়া জীর্ণ মুখে তৃপ্তির আভা, বয়সটা যেন অজান্তেই অনেক পিছিয়ে গেছে। বিজ্ঞের মত মাথা নাড়ে ফকির।

—তুই বললি না কেন যে যাই বল্লেই কি যাওয়া যায় ? এক দিন যাবো ঠিক।

পাঁচু চেয়ে আছে ওর দিকে। হঠাৎ তালরুই-এর মেজবাবুকে সাইকেল হাঁকিয়ে যেতে দেখে তেড়ে মেড়ে রাস্তার উপর উঠে হাত যোড় করে বলে ওঠে —নমস্কার স্যার। এই দিকেই বের হয়েছেন বুঝি ?

অনঙ্গ চৌধুরী এ অঞ্চলে গ্রাম গ্রামান্তরে, এ কোলিয়ারি সেই কোলিয়ারিতে অকারণেই ঘুরে বেড়ায় ; বিনা এত্তেলায় এর ওর সালিশীতে মাথা গলায়, এ হেন লোক হঠাৎ পাঁচুকে যেচে এসে নমস্কার করতে দেখে সাইকেল থেকে নামল।

—লালাজীর নোতুন গদী কোন দিকে হে ?

পাঁচু একপায়ে খাড়া—আজ্ঞে আমিই যাচ্ছি ওদিকে, চলুন।

অনঙ্গ চৌধুরীর নীলরক্ত হঠাৎ চাড়া দিয়ে ওঠে, হুকুম করে—এ্যাই সাইকেলটা ধরে নিয়ে চল তালে।

পাঁচু সাইকেল ঠেলে নিয়ে চলেছে, পিছু পিছু চলেছে মেজবাবু, শীর্ণ গোঁফ সম্বল একটা শয়তানের ছাপমারা মানুষ, চোখ দুটো বাজপাখির মত পিট পিট করছে রোদের আভায়।

মিঃ ব্লেজার টের পাচ্ছে খানিকটা ব্যাপার। তার চিন্তা সত্য হচ্ছে। এতকাল নির্বিবাদে লুঠ করে এসেছে মাটির নীচে থেকে এই সম্পদ। কুলির দরকার হয়েছে, সস্তায় পেয়েছে মিশনারি ফাদারদের দৌলতে; অবশ্য তার জন্য বেশ কিছু টাকা গেছে। তাতেও জলেই হাত পড়েছে, দুধে হাত পড়েনি। নিজেদের সরকার; মাথা থেকে পা পর্যন্ত তাদের অবাধ অধিকার; কোন গণ্ডগোল হয়েছে, কলকাতার চেম্বার অব কমার্স থেকে চাপ গেছে, অনুরোধ গেছে উর্ধতন মহলে; দরকার হয়নি আইন কানুনের। তারা যা করেছে সরকার তাতে প্রতিবাদ বিশেষ করেনি।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শেষ বংশধর; ব্যবসার জন্য রাজপাট। ব্যবসায়ের কোন ক্ষতি তারা হতে দেয়নি। কিন্তু সেই ভিত্তিতে কোথায় ফাটল ধরেছে। তাদের লুণ্ঠনের যুগ শেষ হয়ে আসছে। যুদ্ধ গেছে—হু হু পয়সা লুঠেছে দুহাতে। এজেণ্ট মিঃ ব্লেজার লাখোপতি কেন কোটিপতি হয়ে উঠেছে। ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ডের পাশবই-এ কয়েক লক্ষ ষ্টার্লিং, লয়েডস-এ যা আছে তাতেই সারাজীবন কেটে যাবে নরফোকশায়ারের ভিলায় হাত গুটিয়ে বসে থাকলেও।

তবু নেশা কমেনি। অর্থের নেশা। এমনি সময় বৃটিশের কাঠামোয় চিড় খেল। দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছে মিঃ ব্লেজার এবার এই কোম্পানীর অন্যতম প্রধান শরিকান হয়ে আসবে দিশী কোন প্রতিষ্ঠান। ইংরেজ সরকার বিদায় নিয়েছে এই সর্তে যে তার কিছু মূলধন মাত্র থাকবে।

সিগারটার ছাই ঝাড়তে ভুলে গেছে। প্রায় পঞ্চাশবিঘে টিলার উপর সাদা প্রাচীর ঘেরা বাংলো, অনেকগুলো শিরীষ, সেগুন গাছ ঘন ছায়ায় ভরে রেখেছে মাঠটা; প্রশস্ত রুবল ঢাকা রাস্তার দুপাশে দামী গোলাবের চারা; গেটের ওদিকে আউট হাউস, একপাল সহিস, চাকর, বেয়ারা, বাবুর্চির সংসার। তারের বেড়ার ফাঁক দিয়ে সতেজ লেগহর্ন রোড আইল্যাণ্ড। মুরগীর দল ব্যগ্র হয়ে চেয়ে রয়েছে তার দিকে।

ওরাও যেন টের পেয়েছে এই কঠিন সমস্যার।

টেবিলের উপর একরাশি বিলেতী মাইনিং জার্নাল। বাতাসে পাতাগুলো উড়ছে। এয়ার মেইলে আসে ওগুলো; পাতলা পৃষ্ঠা, মাখনের মত মসৃণ।

পি-এ-কে ডেকে পাঠায় ব্লেজার। দুহাতের আঙুলগুলো দিয়ে টেবিলে

ঘা মারছে। মনে একরাশ চিন্তার জাল যখনই জট পাকায় তখনই এমনি চাঞ্চল্য, অস্থিরতা তাকে পেয়ে বসে।

—ইয়েস স্যার।

ইশারায় নোট নিতে বলে চোখ বুজে গড় গড় করে আউড়ে যায় কতকগুলো ফার্মের নাম।

বিভিন্ন দামী দামী যন্ত্রপাতি আনবার অর্ডার দিচ্ছে সাহেব। কয়েক লক্ষ টাকার। পি-এ দূতের সামিল। অবোধ্য বার্তার গুরুত্ব তার জানবার কথা নয়, চুপ করে লিখে যায় মাত্র। এত দামী দামী মেসিন কিনে কি হবে ঠিক অনুমান করতে পারে না পি-এ। কয়েকটা কোলিয়ারির অর্ডারের দাম একত্রে কোটি টাকার কাছাকাছি যাবে।

নিজের মনেই সান্ত্বনা পাবার জন্য ব্লেজার বলে ওঠে—তোমাদের দেশের কোলিয়ারিকে একেবারে ফুল মেকানাইজড করে যাবো। দেখো কত রেজিং বেড়ে যায়।

পি-এ চুপ করে থাকে। নোটগুলো নিয়ে মেসিনে দামী লেটার হেডে চাপিয়ে টাইপ করতে থাকে। এ চিঠি ডাকে যাবে না, যাবে স্পেশাল ম্যাসেঞ্জারের ব্যাগে কন্‌ফিডেনশাল হিসেবে।

ব্লেজার কিছুটা যেন নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে। এতগুলো টাকাও তবু এ মুলুক থেকে সরাতে পেয়েছে নিজের হোমে। অর্ডার দেওয়া হয়েছে তারই স্বার্থজড়িত একটা প্রতিষ্ঠানকে।

সকালের গেরুয়া রোদ অভ্র রং ধরেছে। দূর থেকে দেখা যায় পিট হেডগিয়ারের ঘূর্ণায়মান চাকাগুলো। নীচে, টিলার বহু নীচে পাক দিয়ে চলেছে ঘোলা জল ; বন্যা নেমেছে দামোদরে। আকাশের কোলে স্তরে স্তরে সাজান কালো মেঘপুঞ্জে বর্ষার সজল আহ্বান।

এই দেশকে তবু যেন কেমন ভালোবেসে ফেলেছে ব্লেজার। শান্ত নির্মল আলো ভরা এদেশ, তাদেরও ক্ষুধার অন্ন জুটিয়েছে। সর্বংসহা মৃত্তিকা তাদের অত্যাচার আজও সহ্য করে চলেছে মুখ বুজে।

বসন্তকে দেখে ফকির একটু সরে যাবার চেষ্টা করে। পাঁচুর সঙ্গে এত কি ঘনিষ্ঠ কথা থাকতে পারে জানে না বসন্ত।

—কি বলছিল ?

ফকির হাসছে। মাখন বলে ওঠে—তরঙ্গের কথা ?

মাথা নাড়ে ফকির—হাঁ! আসানসোলে আছে রে।

—পাঁচু দেখে এসেছে ? বসন্ত বলে ওঠে।

সায় দেয় ফকির, দুচোখে তার আশার আলো। ঘরের নেশা। মাখন গজ গজ করে—আছে তো যা কেনে, তা লয় দিনরাত কেবল ওই এককথা।

এখানের কি মায়ায় যেন আটকে পড়েছে ফকির; বহু দিনের মায়া। ফকির হাসছে—যাবো একদিন। সিদিন আর ফিরবো না। বুঝলি।

মাখন চুপ করে কি ভাবছে। অনেকেই ওকথা বলে। এ মাটি থেকে পালাতে পারলে যেন বাঁচে, কিন্তু পালাতে কেউই পারে না। একবার এই এলাকায় ঢুকেছে, যে সে আর ফিরে যায় না কোনদিন। ব্যর্থ স্বপ্নভরা মন নিয়ে শেষ দিন গোণে; এই প্রাগ্‌ঐতিহাসিক মৃত্তিকা কণার সঙ্গে মিশিয়ে যায় তার দেহাবশেষ। মহাদৈত্য এদের বাঁচিয়ে রেখেছে, সে কোনদিন তার অতল তিমির গহ্বরে নিঃশেষ অবলুপ্তি ঘটাবে তার স্থিরতা নেই। একদিকে জীবন অন্যদিকে নিশ্চিত মৃত্যু।

মাঝখানে কটা আলো আঁধারির জাল বোনা দিন।

মালু ব্যর্থ স্বপ্ন দেখে; মালু, ফকির, মাখন, কেষ্ট-মিস্ত্রী, গৌরী, ফড়িং সরকার—আরও কত জীবনের ভিড়! জীবন কাব্যের এক একটি ছন্দ।

—কই গো আছো নাকি বাপু; লাও তুমার পটল আর কপি।

ধাওড়ার সৌরভীকে বসন্তের ওখানে আসতে দেখে কানাকানি পড়ে; নীল আকাশী রং এর শাড়ির আঁচল উড়ছে, মাথার চুলে পাতা কেটে খোঁপা বাঁধা; নিটোল কালো গড়ন, চলছে যেন বর্ষার দামোদরে ঢেউ জেগেছে।

বসন্ত ওকে দেখে একটু অবাক হয়; হাটতলার সেই তরকারিওয়ালী। যেচে দিতে এসেছে ওগুলো, অপ্রস্তুতে পড়ে—কিন্তু বাপু পয়সা কই আজ ?

হাসে সৌরভী—নাই বা দিলে পয়সা। এমনিই খেতে দিলাম তোমাকে।

—কিন্তু! বসন্তের বাধে ওর দান নিতে।

হাসছে সৌরভী—আর কিন্তু করো না বাবু। আমারও তো কাজ থাকতে পারে।

বসন্ত ওর দিকে চাইল; গেরুয়া রোদ ম্লান আভায় ভরে তুলেছে চারিদিক। আকাশ-বাতাস পাখির ডাকে ভরে উঠেছে। দামোদরের ওপারের বনে নেমেছে রক্ত সন্ধ্যা। দিনের খেয়া এপার থেকে ওপারে চলে গেল; পার ঘাটে অপেক্ষা করছে দু চার জন যাত্রী; আলোর শেষ অবলুপ্তির আগেই ওপারের বনের আড়ালে তারাও হারিয়ে যাবে।

সেমিজের ভিতর থেকে হাত পুরে একখানা মলিন বিবর্ণ খাম বের করে এগিয়ে দেয় সৌরভী; ইংরাজিতে ঠিকানা লেখা—জন ফ্রেডরিক লিস্টার; নর্থ ব্রক, নরফোকশায়ার। ইংল্যাণ্ড।

—একখানা চিঠি লিখে দিতে হবে ওই ঠিকানায়, গুছিয়ে লিখে দাও। কেমন আছে শুধু জানাবে সে। এতদিন খপরই বা দেয় নি কেনে?

বসন্ত অবাক হয়ে চেয়ে থাকে স্তব্ধ ওই মেয়েটির দিকে; লাস্যময়ী স্বৈরিণী এ নয়, অন্য কোন নারী, মনের গভীর তল থেকে নীরব ব্যথা বেদনার জোয়ার উঠেছে। তারই কলরব ওর মনে, চাঞ্চল্য দু চোখের দীপ্তিতে, তৃষ্ণা ওর বুক জুড়ে।

—ইখানের ম্যানেজার ছিল গো, বড় ভাল লোক।

ভালবাসা জাতি বয়স সংস্কার কোন কিছুই মানে না। শুক্র দেবতার এক চোখ অন্ধ; একপথেই সে চলে, সোজা পথ। তাই বোধ হয় স্বৈরিণী সৌরভীর বুকে আজও নীরব জ্বালা।

বসন্ত লিখে চলেছে চিঠিখানা; সৌরভী বলে ওঠে—টাকার যদি দরকার থাকে যেন লিখে পাঠায়।

বসন্ত ওর কথাগুলো গুছিয়ে লিখছে।

আবছা সন্ধ্যার অন্ধকার নামে পথে, গাছ গাছালির মাথায়।

বসন্ত চুপ করে বসে আছে অন্ধকারেই। সৌরভী চলে গেছে অনেকক্ষণ; মাঝে মাঝে মনে পড়ে তার কথা; একটি অপরিচিত বিদেশী, তাকে ভালবেসেছিল; ওই স্বৈরিণী নারীর আজও মন কেমন করে। জীবনের শূন্য মুহূর্তগুলি ভরে রয়েছে তারই হারানো সুরের রেশে।

এ জীবনের সেই মাধুর্যের স্বাদ নিজে সে পায় নি। তবু দেখেছে আশপাশের জীবনে তার মহান অস্তিত্ব।

হঠাৎ একটা কান্নার শব্দে অন্ধকার ভরে ওঠে, কাঁদছে কে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। কেষ্ট মিস্ত্রী বৌটাকে পিটছে।

এ যেন রোজকার ঘটনা, গজরাচ্ছে কেষ্ট—দামড়া মাগী কুথাকার ; আজ কিনা লোজ্জা করে!

গৌরী চুপ করে প্রাণপণে কান্না থামাবার চেষ্টা করছে। ওই শয়তানের দিকে চাইতে পারে না ; মদো মাতাল জুয়াড়ি কেষ্ট। সামান্য মাইনে তার জুয়ার বাজিতেই নিঃশেষ হয়ে যায় ; মদ আর নিজের খরচ, তারপর গৌরীর দিন চলা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। সেদিন কেষ্টই তাকে সিনেমা দেখাতে নিয়ে যায় রামনগরে।

গিয়ে চমকে ওঠে গৌরী। হাফটাইমের আগেই কেষ্ট পান খেতে বের হয়ে গেল, পাশে বসে একটা মুষকো জোয়ান লোক ; বেহায়ার মত খপ্ করে ওর হাতটা ধরে ফেলে।

—আঃ! চাপা কণ্ঠে অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে।

লোকটা গজরাচ্ছে—লগদ দুটাকা কিষ্টকে দিইছি ভাই! তা হাত দিলেই তো ক্ষয়ে যাবে না, এত ডর কিসের! পান খাবা? পান।

ভয়ে ঘেমে নেয়ে উঠেছে গৌরী, কেষ্ট আসে অনেক পরে। একগাল হাসছে।

—কেমন ছবি দেখছো? আহা, হিরোইন একখানা মাল মাইরি। কি চাউনি?

ঘেন্নায় গৌরীর গা ঘিনঘিন করে ওঠে।

পাঁচু ব্যবস্থা করে ফেলেছে। কেষ্টও ছটফট করে।

তারও ব্যবস্থা হতো, কিন্তু গোল বাধিয়েছে এক বগ্‌গা ওই মেয়েটা। আজ সিনেমায় যাবার নাম শুনেই বেঁকে বসেছে। কেষ্টর মুখের উপরই বলে ওঠে,—যাবার আগে ওই নিমগাছের ডালে ফাঁসি দিয়ে আত্মঘাতী হবো।

কেষ্ট চুলের মুঠি ধরেছে খপ্ করে—মাইরী! শেষ মেষ আমার কোমরে দড়ি পড়ুক?

—আমি যাবো না। গৌরী সাফ জবাব দেয়।

তারপরই শুরু হয়েছে ভূতনৃত্য। পাঁচ টাকার রফা করেছিল। ঝাণ্ডির ছকে একবার যুৎসই করে ধরতে পারলেই তিন কাঁটার দান পঁচিশ টাকা।

চোখের সামনে একটা উজ্জ্বল আশাভরা ভবিষ্যৎ। কিন্তু সব ছিরকুটে দিয়েছে ওই বাঁজা ছুঁড়িটা।

বসন্তের ধমকে থামল কেষ্ট—মেরে ফেলবে নাকি?

এক মুহূর্ত! পরক্ষণেই কেষ্ট পায়ের তলে মাটি পায়, গর্জে ওঠে—ছুঁচ বলে চালুন তোর পিছনে কেন ফুটো? ধাওড়াতে কত নবলাটকী হচ্ছে তা চোখের উপরই দেখছি; তার বেলা দুষ নাই, ঘরের মাগকে পিটলেই বলে বেহেড মাতাল। আলবৎ মারবো। শাসন করতে নাই লষ্টা দুষ্টা মাগীকে? লইলে তোমাদেরই যে সুদিন আসবেক হে?

গৌরী ফোঁস করে ওঠে—থামবে তুমি!

কেষ্ট শান্ত মেয়েটাকে ক্ষেপে উঠতে দেখে চুপ করে গেল। গৌরী কি ভাবছে, মুখে চোখে তার দৃঢ়তার ছাপ। পরিষ্কার কণ্ঠে বলে ওঠে—চলো, সিনেমাতেই যাবো।

কেষ্ট যেন বিশ্বাস কর্‌তে পারে না ওর কথা—মাইরী বলছিস?

—হ্যাঁ। কাপড় চোপড় বদলাতে উঠে যায়।

চুপ করে ওর দিকে চেয়ে থাকে বসন্ত, কি একটা নাটকের অভিনয় চলেছে। একটা অঙ্কের যবনিকা পাত হল। কেষ্ট হাসছে দাঁত বের করে, বসন্তের দিকে সিগ্রেট এগিয়ে দেয়, একটা চারমিনার।

—লাও দাদা। দেখলা মেয়ে কেমন? সেই জল খেলে, অথচ ঘোলা না করে খাবেক নাই।

বসন্ত আবছা অন্ধকারে বসে আছে। একটা দৃশ্যের কথা মনে পড়ে; ছেলেবেলায় বহুদিন দেখেছে কলকাতায় থাকবার সময় কালীঘাটের দিকে অনেকেই টানতে টানতে বলির জন্য পাঁঠা নিয়ে চলেছে। পাঁঠাগুলো যেন ওই পথটা চেনে, নীরব নিবিড় আতঙ্কে দুপা মাটিতে ঠেকিয়ে প্রাণপণে বাধা দেয়।

কেষ্টর পিছু পিছু চলেছে গৌরী, রাস্তার উপরে গিয়ে একটা রিক্সায় উঠলো তারা।

গড়িয়ে চলেছে চিনতোড়ের জীবন যাত্রা, নির্মম নিষ্ঠুর এই স্রোত। এর

কঠিন আবর্তে পড়ে খড় কুটোর মত ভেসে চলেছে হাজারো প্রাণী অকূলের দিকে। কেষ্ট, গৌরী—আরও অনেকে চলেছে; বসন্তও।

পাঁচু চুপ করে বসে আছে ম্যানেজার মিঃ ফস্টারের বারান্দায়। ঘরের ভিতর লালাজী গুজগুজ ফুস ফাস করছে সাহেবের সঙ্গে; কি যেন টাকার লেন-দেন হচ্ছে। কি সব রহস্যময় জগৎ, পাঁচু বাইরে থেকে চেয়ে আছে আলো ঝলমল ঘরখানার দিকে। লালাজী কোমরের গেঁজিয়া থেকে নোটের তাড়া বের করে গুনছে। কপালে চোখ তুলে চেয়ে আছে পাঁচু, বুঝতে পারে ময়লা চিটকেনী কাপড়পরা লালাজীকে ফস্টার কেন এত মানে, আদর করে, সোফায় বসিয়ে তদ্বির করে।

লালাজী রেজিং কণ্ট্রাক্ট নিচ্ছে, তারই জন্য প্রণামী; নজরানা বোধহয়। মেজেতে নামানো রয়েছে মস্ত একটা ডালায় রকমারি ফল, সেলুফন পেপারে মোড়া রঙীন বোতল; একশো টাকা দাম নাকি। কেমন খেতে কে জানে; ওর নেশা কি রকম তাও জানে না।

বাবুর্চি এসে তুলে নিয়ে গেল। পাঁচু উঠে দাঁড়াল।

—চল বে।

ঝুড়িটা বইতেই তাকে এনেছিল লালাজী। নিরাসক্তভাবে তার দিকে এগিয়ে দেয় নগদ একটা টাকা।

—যা, ফুর্তি করে আয়।

—তালে রেজিং ঠিকা লিচ্ছ লালাজী; আমার কথাটা মনে থাকে যেন?

হাসে লালা—হ্যা হ্যা!

পাঁচু হাটতলার দিকে খুশি মনে চলে গেল। হাসছে লালাজী, নীরব হাসি, মোটা ভুঁড়ি কাঁপছে মাত্র; অস্ফুট একটা শব্দ ওঠে রাতের অন্ধকারে। অন্যতম বাহন ব্রিজমোহন এগিয়ে আসছে নুড়ি পথ দিয়ে, রাস্তাটা ফস্টারের বাংলোর পিছনে গিয়ে শেষ হয়েছে।

এদিক ওদিক দেখে এগিয়ে যায় লালাজী—সব ঠিক হ্যায়? কোই গড়বড় নেহি?

মাথা নাড়ে ব্রিজমোহন, ঠিকমত জ্যান্ত ভেটটাও পাঠিয়ে দিয়েছে সাহেবের বাংলোর পিছন দিকের রাস্তায়।

লালা নিশ্চিন্ত মনে গদীর দিকে এগিয়ে চলে নির্জন পথটা দিয়ে; কায হাসিল করার আনন্দ তার মনে, হঠাৎ সামনে সৌরভীকে দেখে থমকে দাঁড়াল। চিনতোড়ের স্তিতপ্রায় যৌবন। যাই যাই করেও ওর দেহের গভীরে থির হয়ে আছে আজও। চোখে ভর রাতের তারার দ্যুতি। হাসছে মেয়েটা।

—কুথা গিইছিলা গো এই পথে? ম্যানেজারের বাংলোয় বুঝি!

ম্যানেজারদের অনেককেই দেখেছে সৌরভী, তারা ছিল ফস্টারের চেয়েও দুর্দান্ত। ওদের রীতকরণও জানতে বাকি নেই, কারা যোগানদার ছিল তাও জানে সৌরভী, লালাজীর পিট পিটে শয়তানী দৃষ্টির গভীরতা ও জানে।

—তা কায হল কিছু, না মাগনাই ধুমুল দিচ্ছ?

—আরে রাম রাম! কি বোলছে সৌরভী দিদি।

লালাজী হাসবার চেষ্টা করে, সৌরভী সরে গেল। ঠিক গেল না, পথের ওই দিকে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে; কি যেন একটা কিছু ঘটছে তা বেশ অনুমান করতে পারে। রাতের তারাজ্বলা আঁধারে প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি।

লালাজীর মনে পড়ে যায় কথাটা। পাঁচুই বলেছিল, পাশের খুপরিতে থাকে কেষ্ট মিস্ত্রী। সেও তার হাত ধরা; কেষ্টও বলেছে। গদিতে বসে কথাটা ভাবে। তখনও সৌরভীর ছুরির ফলার মত হাসিটা কানে ভাসে। নষ্টা মেয়ে মানুষ, ওরা সব পারে। লালাজীর সব জাল ছিঁড়ে খুঁড়ে দেবে।

রোজকার মত আজও আড্ডা বসেছে। নারকুলিয়া সাহেবের কটা জিনিষপত্র নিতে এসেছে শরণ সিং, লালাজী গজদন্ত বিস্তার করে অভ্যর্থনা জানায়।

—আইয়ে সর্দারজী।

মেঘ না চাইতেই জল। কোনখানে কার টান তা জেনে ফেলেই চিনতোড়ে ব্যবসা ফেঁদেছে লালাজী। হাসতে হাসতেই কথাটা বলে ওঠে সে—চিড়িয়া তো উড়ে গেল সর্দারজী?

—ক্যা?

লালাজী বলে চলেছে সৌরভীর নোতুন নাগর নিয়ে লীলাখেলার কাহিনী।

কেষ্টর ঘরের পাশেই নোতুন সেই মালকাটা ছোকরার সঙ্গে লটঘট চলেছে; জমে উঠেছে বেশ।

লালা খুদে চোখ মেলে চেয়ে থাকে শরণ সিং-এর দাড়ি গোঁফ ঢাকা মুখের দিকে। একটা পরিবর্তন ফুটে ওঠে তাতে, নিষ্ঠুর কঠিন হিংস্র একটা ছাপ পরিস্ফুট।

—মালাই পিজিয়ে সিংজী।

একগ্লাশ চা এনে দেয়; সিংজী ছটফট করে জলছে।

সৌরভীকে পেয়েই দেশের মায়া ভুলেছিল। আজ হঠাৎ বুকের মাঝে পাঞ্জাবের মরুভূমির ঊষর রুক্ষতা জেগে ওঠে, বৈশাখের খররৌদ্র-বিদগ্ধ মৃত্তিকার মত অপরিসীম শূন্যতা তার সারা মনে।

উঠে পড়ে সে—নেহি লালাজী। চা নেহি পিয়ে গা।

—তব আউর কুছ!

মদের নেশাতেও এ জ্বালা ভুলতে পারবে না সে। একবার সৌরভীর সঙ্গে মুখোমুখি এর মীমাংসা করতে চায় সে। সেই নোতুন মালকাটাকে দেখিয়ে দেবে যে শরণ সিং এখনও পূর্ণোদ্যমেই বেঁচে আছে।

লালাজী ফোড়ন কাটে—ছোকরা নাকি এলেমদার। ইংরাজি ভি লিখতে পড়তে জানে। সৌরভীকে ফাসায় তো ওভারম্যান ভি হোয়ে যাবে। ও ছুঁড়ির কথা সাহেবরা শোনে।

গর্জন করে ওঠে শরণ সিং—বহুৎ দেখা ওইসা ছোকড়া!

উঠে পড়ে শরণ সিং, লালাজী শেষ অস্ত্র ছাড়ে নিপুণ শিকারীর মত,

—হম আভি দেখেছে তাকে ফস্টার সাহেবের বাংলোর পথে, ক্যা মালুম আভিতক্ হুয়াই হোগা জরুর।

শরণ সিংএর মুখ ব্লটিং পেপারের মত ফ্যাকাসে বিবর্ণ হয়ে যায়; লালাজীর কথাগুলো যেন বিশ্বাস করতে পারে না।

—সাচ বাত?

—গিয়েই দেখ গা না; মালুম বাংলোর পথে মণ্টার দোকানে পান ভি খাচ্ছে আভিতক।

দাঁড়াল না শরণ সিং, সিঁড়ি দিয়ে নেমে আঁধার পথ ধরে চলছে হন্ হন্ ক'রে; কোলিয়ারিতে কায করে বোধ হয় আঁধারে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে।

হিংস্র পশুর মত এগিয়ে যায় সৌরভীর সন্ধানে।

হাসছে লালাজী, ষাঁড়ের শত্রু বাঘ।

কলকাঠি নেড়েই পথ পরিষ্কার করে রাখে; সৌরভীকে টেনে আনবে শরণ সিং।

ব্রিজমোহনের জীবন্ত ভেটটির পরিচয় রাতের অন্ধকারেই অজানা থাকবে।

চর এসে খবর দেয়—পাঁচু মদ খাচ্ছে পচুই-এর দোকানে।

—থাক। বেহুঁস হয়ে পড়ে থাকুক পাঁচু নিকিরি।

—জয় রামজী! পরমেশ্বরী প্রসাদ লালা মহাভক্ত হয়ে উঠেছে।

রামজীর অপার কৃপা। কুলিগিরি করতে এসে লালা দোকান ফেঁদেছে; গদিয়ান লোক, মহাজনী কারবার; লরী গাড়ির ব্যবসা। রানীগঞ্জ, আসানসোলে মোকাম বানিয়েছে। এইবার কয়লা রেজিং ঠিকে নিচ্ছে; তারপরের ধাপ একটু উঁচুতে। তবু রামজীর কৃপায় তাও সম্ভব হয়ে যেতে পারে; নিজেরই একটা কোলিয়ারি করবার ইচ্ছে; জায়গা দেখছে, পুরানো কোন চালু ইনক্লাইণ্ড পিটই কিনবে প্রথম দফায়।

এক ধাপ থেকে অন্য ধাপে মসৃণ গতিতে উঠে চলেছে লালাজী। রামজীর মন্দির ধরমশালা গড়িয়ে দেবে কায হাসিল করতে পারলেই।

বর্ষার প্রথম বৃষ্টি। ঊষর বন্ধুর মৃত্তিকার সুপ্ত জ্বালার প্রকাশ প্রথম ধারাপাতে; মিষ্টি সোঁদা গন্ধভরা বাতাস; দলে দলে মেঘ জমছে প্যানচোত পাহাড় শীর্ষে। পিঙ্গল আকাশ ধূসর পাংশু রং-এ ছেয়ে নেমেছে বৃষ্টিধারা। শাল-পলাশ মহুয়া ডাঙ্গায় যৌবনের ঢল নেমেছে, মেতে উঠেছে পর্বতগোত্রীয় দামোদর।

পথ ছেয়ে জলধারা নামছে আটাড়ি, বনতুলসীর জঙ্গলের বুক চিরে, ঝরঝর কলকল শব্দে।

বসন্ত ভিজে নেয়ে উঠেছে; কোনমতে গিয়ে পিট হেডে উঠেছে বাতি নিয়ে।

মাখন, মালু, সবাই আগের ডুলিতে নেমে গেছে। পিছন থেকে পিট ওভারম্যান বলে ওঠে—জামাই আইচো হে?

বসন্ত কথা বলে না; ক্রমশ এগুলো ধাতস্থ করে নিয়েছে।

কেষ্টর ঘরের পাশেই নোতুন সেই মালকাটা ছোকরার সঙ্গে লটঘট চলেছে ; জমে উঠেছে বেশ।

লালা খুদে চোখ মেলে চেয়ে থাকে শরণ সিং-এর দাড়ি গোঁফ ঢাকা মুখের দিকে। একটা পরিবর্তন ফুটে ওঠে তাতে, নিষ্ঠুর কঠিন হিংস্র একটা ছাপ পরিস্ফুট।

—মালাই পিজিয়ে সিংজী।

একগ্লাশ চা এনে দেয় ; সিংজী ছটফট করে জ্বলছে।

সৌরভীকে পেয়েই দেশের মায়া ভুলেছিল। আজ হঠাৎ বুকের মাঝে পাঞ্জাবের মরুভূমির ঊষর রুক্ষতা জেগে ওঠে, বৈশাখের খররৌদ্র-বিদগ্ধ মৃত্তিকার মত অপরিসীম শূন্যতা তার সারা মনে।

উঠে পড়ে সে—নেহি লালাজী। চা নেহি পিয়ে গা।

—তব আউর কুছ!

মদের নেশাতেও এ জ্বালা ভুলতে পারবে না সে। একবার সৌরভীর সঙ্গে মুখোমুখি এর মীমাংসা করতে চায় সে। সেই নোতুন মালকাটাকে দেখিয়ে দেবে যে শরণ সিং এখনও পূর্ণোদ্যমেই বেঁচে আছে।

লালাজী ফোড়ন কাটে—ছোকরা নাকি এলেমদার। ইংরাজি ভি লিখতে পড়তে জানে। সৌরভীকে ফাসায় তো ওভারম্যান ভি হোয়ে যাবে। ও ছুঁড়ির কথা সাহেবরা শোনে।

গর্জন করে ওঠে শরণ সিং—বহুৎ দেখা ওইসা ছোকড়া!

উঠে পড়ে শরণ সিং, লালাজী শেষ অস্ত্র ছাড়ে নিপুণ শিকারীর মত,

—হম আভি দেখেছে তাকে ফস্টার সাহেবের বাংলোর পথে, ক্যা মালুম আভিতক্ হুয়াই হোগা জরুর।

শরণ সিংএর মুখ ব্লটিং পেপারের মত ফ্যাকাসে বিবর্ণ হয়ে যায় ; লালাজীর কথাগুলো যেন বিশ্বাস করতে পারে না।

—সাচ বাত ?

—গিয়েই দেখ গা না ; মালুম বাংলোর পথে মণ্টার দোকানে পান ভি খাচ্ছে আভিতক।

দাঁড়াল না শরণ সিং, সিঁড়ি দিয়ে নেমে আঁধার পথ ধরে চলছে হন্ হন্ ক'রে ; কোলিয়ারিতে কায করে বোধ হয় আঁধারে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে।

হিংস্র পশুর মত এগিয়ে যায় সৌরভীর সন্ধানে।

হাসছে লালাজী, ষাঁড়ের শত্রু বাঘ।

কলকাঠি নেড়েই পথ পরিষ্কার করে রাখে; সৌরভীকে টেনে আনবে শরণ সিং।

ব্রিজমোহনের জীবন্ত ভেটটির পরিচয় রাতের অন্ধকারেই অজানা থাকবে।

চর এসে খবর দেয়—পাঁচু মদ খাচ্ছে পচুই-এর দোকানে।

—থাক। বেহুঁস হয়ে পড়ে থাকুক পাঁচু নিকিরি।

—জয় রামজী! পরমেশ্বরী প্রসাদ লালা মহাভক্ত হয়ে উঠেছে।

রামজীর অপার কৃপা। কুলিগিরি করতে এসে লালা দোকান ফেঁদেছে; গদিয়ান লোক, মহাজনী কারবার; লরী গাড়ির ব্যবসা। রানীগঞ্জ, আসানসোলে মোকাম বানিয়েছে। এইবার কয়লা রেজিং ঠিকে নিচ্ছে; তারপরের ধাপ একটু উঁচুতে। তবু রামজীর কৃপায় তাও সম্ভব হয়ে যেতে পারে; নিজেরই একটা কোলিয়ারি করবার ইচ্ছে; জায়গা দেখছে, পুরানো কোন চালু ইন্‌ক্লাইণ্ড পিটই কিনবে প্রথম দফায়।

এক ধাপ থেকে অন্য ধাপে মসৃণ গতিতে উঠে চলেছে লালাজী। রামজীর মন্দির ধরমশালা গড়িয়ে দেবে কায হাসিল করতে পারলেই।

বর্ষার প্রথম বৃষ্টি। উষর বন্ধুর মৃত্তিকার সুপ্ত জ্বালার প্রকাশ প্রথম ধারাপাতে; মিষ্টি সোঁদা গন্ধভরা বাতাস; দলে দলে মেঘ জমছে প্যানচোত পাহাড় শীর্ষে। পিঙ্গল আকাশ ধূসর পাংশু রং-এ ছেয়ে নেমেছে বৃষ্টিধারা। শাল-পলাশ মহুয়া ডাঙ্গায় যৌবনের ঢল নেমেছে, মেতে উঠেছে পর্বতগোত্রীয় দামোদর।

পথ ছেয়ে জলধারা নামছে আটাড়ি, বনতুলসীর জঙ্গলের বুক চিরে, ঝরঝর কলকল শব্দে।

বসন্ত ভিজে নেয়ে উঠেছে; কোনমতে গিয়ে পিট হেডে উঠেছে বাতি নিয়ে।

মাখন, মালু, সবাই আগের ডুলিতে নেমে গেছে। পিছন থেকে পিট ওভারম্যান বলে ওঠে—জামাই আইচো হে?

বসন্ত কথা বলে না; ক্রমশ এগুলো ধাতস্থ করে নিয়েছে।

প্রথম প্রথম সর্বাঙ্গে ব্যথা ধরতো, কয়লার চাঁই-এর ঘর্ষণে আঙুলের ডগা হাতের চেটো ফেটে উঠেছিল শশাফাটা হয়ে; ক্রমশ শরীরের সেই দুঃসহ ব্যথা মরে গেছে; হাতের নরম চামড়া শক্ত হয়ে উঠেছে কড়া জমে। অজ্ঞাতেই গায়ের চামড়াও যেন পুরু হচ্ছে। কিন্তু মনের উত্তাপ জমছে তাতে; পুরু চামড়া ভেদ করে হুট করে আর প্রকাশ পায় না; জমছে তিলে তিলে; যেদিন প্রকাশ পাবে সেদিন হয়তো এই গণ্ডারের চামড়ার বাহ্যিক খোলসটাও ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।

মুখ বুজে লিপ্‌টে উঠলো গিয়ে; ভিতর বাইরে নেমেছে বৃষ্টি। অবিশ্রান্ত ধারায় পিটের স্যাপ্ট থেকে জল ঝরছে; তেলকালিমাখা জল পড়ছে জামা ভেদ করে; গায়ে মাথায় হিম শীতল স্পর্শ।

একাই এগিয়ে চলেছে ট্রাভলিং রোড ধরে, অন্ধকারে ঝলসে ওঠে আলোটা। অভ্যস্ত পদে চলেছে বসন্ত, পাশের সাইড গ্যালারি থেকে বের হয়ে আসে শরণ সিং। ওকে দেখে থমকে দাঁড়াল। তীব্র আলোয় নিবিড়ভাবে নিরীক্ষণ করছে বসন্তকে। দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা; কব্জির হাড়গুলো মোটা-সোটা, চোয়ালের শক্ত হাড় দুখানা ঠেলে উঠেছে কঠিন বলিষ্ঠতার ছাপ নিয়ে।

—কাঁহা কাম কিয়া আগাড়ি?

যেন কঠিন কণ্ঠে জেরা করে শরণ সিং তাকে। বসন্তও বুঝতে পেরেছে ওর মনোভাব। সাফ জবাব দেয়—অপিসমে হ্যায় হামারা পাত্তা।

শরণ সিং চুপ করে গেল ওর জবাবে। হঠাৎ বলবার মত একটা কথা পেয়ে চিৎকার করে ওঠে—আভি ডিউটিমে আতা হ্যায়? এক ঘণ্টা লেট।

বসন্ত বলে ওঠে—পিস রেট কা কাম, কমতি টব উঠবে, কম পয়সা পাবো। লোকসান তো আমারই।

শরণ সিং করবার বলবার মত কিছু না পেয়ে চুপ করে গেল আপাতত, মনে মনে গজরাতে থাকে।

বসন্ত চুপ করে এগিয়ে যায় নীচের দিকে; একা চলছে অন্ধকার পথে। বাতাসে চাপা গর্জনধ্বনির মত ফিসার থেকে মৃদুগ্যাস বের হয়ে চলেছে; জীবন্ত দৈত্যপুরী, মৃত্যুর স্তব্ধ প্রশান্তি ঢাকা এর বুক; মানুষ এখানে জীবনের চিহ্ন আনে। লোভ, ক্রোধ, নীচতা আর ভালোবাসা ভরা জীবন-স্বপ্ন এখানেই বিচিত্ররূপে ফুটে উঠে।

কোলফেসের কাছে পৌঁছে গেছে। ওদের গাঁইতির শব্দ, টুকরো কথা-বার্তা কানে আসছে। বসন্ত নিপুণ মালকাটার মত জিব, ঠোঁট, দাঁত দিয়ে কি অনুভব করছে। সূক্ষ্ম পরমাণুর মত অদৃশ্য কয়লাচূর্ণে বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে; থিক্ থিক্ করছে উপরের বায়ুস্তর, গ্যাসের চিহ্ন পরিস্ফুট; বাতাসে একটা জমাট উষ্ণতা; দাঁত, মুখ, ঠোঁট কির কির করে, অদৃশ্য ধূলিস্তর ঢুকছে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গেও। কাশি আসে।

হঠাৎ একটা গ্যালারির কাছে নজর পড়তেই থমকে দাঁড়াল।

চাপা অস্ফুট কণ্ঠে ধমকে ওঠে মালু—আলোটা নেভাও।

এগিয়ে আসে বসন্ত, মালু আঁধারে মিশে রয়েছে; অসহায়ের মত বলে ওঠে—আঃ, ভিজে জামা কাপড় শুকোচ্ছি, যা বৃষ্টি!

থমকে দাঁড়াল বসন্ত, আঁধারে হাসির শব্দ ভেসে আসে। মালু কাপড়-চোপড় পরেই এগোল।

—চল।

—ভিজে গেছে সব?

—ভিজ্‌ক, গরমে গায়ে গায়েই শুকিয়ে যাবে।

বসন্তকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়েই পথে নামল। বসন্ত আবছা-আলোয় ওর রুক্ষ কঠিন মুখের দিকে চেয়ে থাকে। হেসে ফেলে মালু।

—আপশোষ হচ্ছে নাকি? শেষমেষ আপশোষ বাড়তো আরও।

বসন্ত কথা কইল না, বঞ্চিত ওই মেয়েটির দিকে চেয়ে থাকে। জীবনের পুঞ্জীভূত বঞ্চনা ওকে কেন্দ্র করে; তবু অভিযোগ করে না কোনদিন। সব কিছু মেনে নিয়েই চলেছে সে।

বলে—সব ভোলবার জন্যই তো আঁধারে নেমেছি। এখানে আলো আসে কেন বল দেখি?

বসন্ত বলে ওঠে—আলো?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, চোখের আলো। যা আমি চাইনি; ছায়ার মত তাই কেন আসে আবার ভুল করে। ঠকেছি আমি, কিন্তু আর কাউকে ঠকাতে চাই না।

মালু মাঝে মাঝে কেমন হয়ে ওঠে, পরক্ষণেই বলে ওঠে কঠিন স্বরে বসন্তকে—কাজে লাগবে না? টব ভর্তি করো। মালকাটার আবার পিরীত, আরশুলা আবার পাখি!

কয়লার স্তূপ নিপুণ হাতে তুলতে থাকে।

পাঁচু নিকিরি টবটা ঠেলতে ঠেলতে চলেছে; একটু নিয়ে গিয়ে ফ্লাই সাণ্টিং-এর মত উৎরায়ের মুখে সজোরে ঠেলে দেয় নীচের পানে; লোহার পাটি আর চাকার ঘর্ষণে ওঠে এক ঝাঁক আগুনের ফুলকি। লাফ দিয়ে ওঠে বসন্ত, কোন কথা বলবার আগেই একতাল কয়লার জমাট ধুলো চাপা দেয় ফুলকিগুলোকে। গর্জন করে ওঠে,

—এ্যাই পাঁচু, মদ খেয়ে বেহুঁস হয়ে কাজ করছো। গ্যাস ভর্তি মাইন; এত বেহুঁস হয়ে কাজ করলে সর্বনাশ ঘটে যাবে।

পাঁচু গর্জন করে ওঠে—ক্যাঁ! বেহুঁস হ্যায়, মাতাল হ্যায় আমি! কারোও বাপের পয়সায় মদ খাই নি। এতকাল কাজ করলাম আজ ও বলে কি না বিপদ হবে ভারি। ম্যানেজার আইছ হে। জানো সর্দারশিপ পাশ করছি ইবার; ওই বাবা ফস্টারের বাপ সর্দার করে দেবে। ডবল সেলাম বাজাতে হবে তবে চাকরি।

বসন্ত কথা বাড়াল না। মাখন, ফকির সামলে নেয়—আরে ও দুদিনের ছোকরা, কোলিয়ারি দেখে ভয় পেয়েছে।

পাঁচু মাথা নাড়ে খুশি হয়ে—হাঁ! তাই বলুক। তবে আমার সঙ্গে যেন লাগতে না আসে। বাট্টু টাইট করে দোব। বাপের বিহা দিয়ে দোব ওর।

বসন্তও গুম হয়ে দাঁড়িয়েছে। মালু হাতটা ধরে বসন্তের।

—আঃ, মাতালের সঙ্গে বাহাদুরি নাই বা দেখালে। সবারই সঙ্গে লাগা কি তোমার স্বভাব? ম্যানেজার থেকে শুরু করে মালকাটা পর্যন্ত।

মিঃ মিত্রের আবির্ভাবে ঘটনাটা তখনকার মত চাপা পড়লো। বসন্তকে দেখে মিঃ মিত্র এগিয়ে আসে; বসন্ত নমস্কার করে বলে ওঠে—কি অবস্থায় কায চলছে দেখুন স্যার।

মালকাটারাও এসে ঘিরে ধরছে। জমাট বায়ুস্তরে গুমোট গরম, বাতাসের গতি বোধ হয় রুদ্ধ হয়ে গেছে; কয়লার গুঁড়োয় দম বন্ধ হয়ে আসে। কাশছে তারা। বসন্ত বলে ওঠে—গ্যাসের পার্সেণ্টাজ কত কে জানে, স্যার। কোলডাস্টও ট্রিট করা হচ্ছে না।

মিঃ মিত্র উপর থেকে আনা জলভরা বোতলটা খালি করে মাইনের নীচের বাতাসের স্যাম্পেল নিতে থাকে। বসন্তের কথায় কি যেন ভাবছে। ওদের অভিযোগ মিথ্যা, অহেতুক নয়।

—শরণ সিং !

শরণ সিং মিত্র সাহেবের সামনে এ্যাটেনশন হয়ে খাড়া হোল, যেন তারই অপরাধের বিচার চলেছে। মালকাটাদের সামনেই মিঃ মিত্র তাকে ধমকে ওঠে—ক্যা হোতা হ্যায় ইয়ে সব ?

মিঃ মিত্র বসন্তকে নিয়ে চারিদিকের গ্যালারিগুলো দেখতে থাকে ; ঘেমে ভিজে উঠেছে দুজনে, পিছু পিছু শরণ সিং চলেছে আসামীর মত ; মিঃ মিত্র বেশ হুকুমের স্বরেই বলে ওঠে শরণ সিংকে—স্টোন পাউডার ভি দেনেকো এন্তাজাম করনা !

মিত্র সাহেবও এয়ার স্যাম্পলের পরীক্ষার ফলাফল দেখে ব্যবস্থা করতে চায়। তারও দায়িত্ব রয়েছে। শরণ সিং গুম হয়ে থাকে। লম্বা চেহারা, মাথায় কালচে রংএর ষ্টিল হেলমেটে মনে হয় যেন অনাদিকালের অতন্দ্র প্রহরী। সাহেবের হুকুম শোনে জুতোর দুই হিল এক করে।

মিত্র সাহেব ঘুরতে চলে অন্যদিকে। বসন্তও কাযে মন দেয়। ফড়িং সরকার নির্বিকার মানুষ। টবের আসন থেকে উঠে এদিক ওদিক ঘুরছিল। মিত্র সাহেব চলে যেতেই থপাস্ করে চট পাতা টবের উপর বসে হাঁফাতে থাকে।

—বখেয়া বেধেই আছে। আরে বাবা ঝড় ঝড় টব বোঝাই করবি বাপের সুপুত্তরের মত ঘর চলে যাবি উঠে। যা গে না, নেশা ভাং দু দণ্ড ফুর্তি আত্তি করগে। তা লয় সাত সতেরো ফ্যাচাং।

সুযোগ বুঝে দু টবের হিসাব ঠিক তালগোল পাকিয়ে দিয়েছে এরই মধ্যে।

স্তব্ধ হয়ে ভাবছে শরণ সিং। সৌরভীকে সেই সন্ধ্যাবেলায় ধরেছিল বাংলোর পথের ধারে। লাস্যময়ী সৌরভী। শরণ সিং-এর কঠিন কলিজাখানা তার দুহাতের মুঠোয় ধরা। হাসছে সৌরভী, বলে ওঠে,—মর মিন্‌সে। তুর কাছেই যে চেরজন্মো থাকতে হবে এমন লেখাপড়া কিছু আছে নাকি র‍্যা ?

মনটা দগদগে হয়ে ওঠে ব্যথায়। সৌরভীর হাসি তার বুকে কাঁপন জাগায়। ওকে ছেড়ে চিনতোড়ে বাস করার কল্পনাই করতে পারে না। এখানের বাতাসের মত শরণ সিং-এর জীবনের সঙ্গেও জড়িয়ে গেছে সৌরভী।

শরণ সিং চটতে পারে না। দুর্বল বলহীন হয়ে ওঠে যোয়ান মর্দটা সৌরভীর সামনে। অস্ফুট আর্তনাদ করে ওর কথায়—কিঁউ?

হাসিতে ফেটে পড়ে সৌরভী ওর ছটফটানি দেখে, মজা লাগে। চোখ পাকিয়ে জবাব দেয় সৌরভী, সাতপাকের মাগই ঘর করে না, তা আবার রাখনীর পিরীত! ওতো চোখের কাজল গো—ধুয়ে দিলেই সাফ। দুফোঁটা চোখের জলেই মুছে যাবেক।

বাংলা ভাষার এত মার প্যাঁচ সে বোঝে না। ব্যাকুলভাবে এগিয়ে যায় আবছা অন্ধকারে ওর দিকে। হাল্‌কা পায়ে সরে যায় মেয়েটা। একাই দাঁড়িয়ে রইল সিংজী।

বেশ বুঝতে পেরেছে সৌরভীর মনে একটা ঝড় তুলেছে ওই ছোকরা, শুধু সেইখানেই ঝড় তুলে থামেনি। এখানে এই পিটের নীচে শরণ সিং-এর একচ্ছত্র রাজত্বেও অশান্তি তুলেছে। ম্যানেজাররা পর্যন্ত তার কথায় সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে, কয়েকশো মালকাটার চোখে তার শ্রদ্ধার আসন। শরণ সিং-এর সামনে বেশ একটা ঝড় এগিয়ে আসছে।

মরিয়া হয়ে উঠছে বেপরোয়া মানুষটি। বসন্তকে সে এর জবাব দেবেই। দুহাত দিয়ে মাথা চুলকোচ্ছে শরণ সিং মাথার হেলমেট খুলে।

হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে। বসন্তের সঙ্গে মিত্র সাহেবের এই ঘনিষ্ঠতা কেমন যেন ভাল ঠেকে না। পাঁচুও গজগজ করছে তখনও, বসন্তের শাসানি ভোলে নি।

শরণ সিং-এর ডাকে এগিয়ে গেল পাঁচু। কি বলছে সিংজী, পাঁচু ঘাড় নাড়ে; মুখে ওর ক্ষীণ তীক্ষ্ণ হাসির আভা, আঁধারেই তা ঢাকা রইল।

নারকুলিয়া কি ভাবছে। টিপি টিপি বৃষ্টি থামেনি। লাল জলে ছাপিয়ে উঠেছে নদীর বুক, লকলকে হয়ে উঠেছে ওপারের বনভূমি। সোদাল নিম-গাছগুলো থেকে ঝরছে বৃষ্টির সঞ্চিত জলকণা।

শরণ সিংকে অফিসে ঢুকতে দেখে মুখ তুলে চাইল। পাশের ঘরে দেখে আসে কেউ নেই, টাইপিস্টবাবু বাড়ি থেকে এবেলা আর আসেনি। ভেতো বাঙ্গালী, বাদলার দিনে বোধ হয় খিচুড়ি খেয়ে আর বেরুতে মন চায়নি।

ভাত-ঘুম দিচ্ছে। ওদিকের অফিসে দুচার জন মাত্র রয়েছে। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এসে বসল নারকুলিয়া। অন্ধকার পুরীর প্রহরী ওই শরণ সিং। উপরে অন্য ধাতের লোক।

পিট্ পিট্ করে চোখ; দীর্ঘ দেহ, তবু কেমন যেন গুড়ি মেরে চলা অভ্যাস হয়ে গেছে, দীর্ঘ পনেরো বছরের অভ্যাস। বাইরে এসেও সেই অভ্যাস যায়নি, মনে হয় মাথা উঁচু করলে বোধ হয় আকাশেই ঠেকবে; কোলিয়ারির নীচে চালে মাথা ঠেকার মত। মাথায় হেলমেট নেই; আধ কাঁচা চুলগুলোতে বৃষ্টির চূর্ণ জল কণা।

বলে চলেছে শরণ সিং একজনের কথা। আর সবাইকে চেনে জানে। কিন্তু একটি লোককে এখনও চিনতে পারেনি। নোতুন এসেছে, মনে হয় এ সব জানে শোনে, কাযের লোক। তবে খুব তেজী। এর মধ্যে দলও পাকিয়ে নিচ্ছে। আগে কায করতো ধানবাদ ফিল্ডে। মদনডিহি কোলিয়ারিতে। এখানে কোন গণ্ডগোল না বাধায়।

কুকুর যেন ভিজে চামড়ার গন্ধ পেয়ে নাক উঁচু করে বাতাসে কি শুঁকছে, পিছনের দু'পা দিয়ে ছিটিয়ে তুলছে পচামাটি, নোংরা আবর্জনা।

—বসন্ত ঘোষ। পাঁচ নম্বর ধাওড়া।

নারকুলিয়ার অনুমান ঠিক। তিনবার ওর নামে নালিশ এসেছে। ড্রয়ার খুলে ফাইলের নীচে থেকে একটা কাগজ বের করে বসন্তের সঙ্গে ফড়িংএর ঝগড়ার কথা আউড়ে যায় গড় গড় করে। শরণ সিং মাথা নাড়ছে।

—জী সরকার। পুরা ঠিক হ্যায়।

—কদিন আগে এয়ার স্যাম্পল, কোল ডাস্ট নিয়েও ঘোঁট পাকিয়েছে কোল ফেসে।

—মিস্ত্রি সাহেবকে নালিশভি জানিয়েছে।

—সবুর। নারকুলিয়া একটা পেন্সিল টেনে নিয়ে এই কথাগুলোও নোট করে নেয় ওর মাতৃভাষায়।

ওসব রেকর্ড ইংরেজি বাংলায় রাখে না, গোল গোল পাকানো গোঁফ দাড়িওয়ালা ভাষায় লিখে রাখে, কেউ হুট বলতেই যেন ফাঁস করে দিতে না পারে। এ অঞ্চলে একা সেই-ই ওই দেবভাষার দিশারী।

—লেট আস ওয়াচ এণ্ড সি। নারকুলিয়া মাথা নাড়ে।

এখন করবার কিছুই নেই একমাত্র ওর চালচলন কায কর্মের উপর নজর রাখা ছাড়া। সুবিধামত মৌকা পেলে ব্যবস্থা নিতে হবে। শরণ সিং বলে উঠে,

—ঠিক হ্যায় সাব। মালুম হোতা মামুলী কোই আদমী নেহি হ্যায়। হম্ ভি দেখে গা। হমরা আগে নালিশ করনেবালাকো হম নেই ছোড়েগা।

নারকুলিয়া চুপ করে থাকে। ওরাই পরস্পর বোঝাপড়া করুক, তাহলেই তার চাকরি পাকা হয়ে থাকবে। একটু রসান দিতে ছাড়ে না।

—সো বাত ঠিক হ্যায়।

শরণ সিং দাড়িগুলো খুলে পাকিয়ে গিঁট দিয়ে রেখেছে। বাঁধবার জালটা খোলা। দাড়িগোঁফের জঙ্গলে হাত চালাতে চালাতে বলে,

—হম্ ভি শিয়ালকোটকা রহনেবালা। ভাই ভাতিজা জঙ্গীমে হ্যায় ক্যাপটিন, লেফ্‌টি। এই সা ছোড়নেবালা আদমি হম্ নেহি হ্যায়।

নারকুলিয়া পিট পিট করে চাইছে—উ লোক ওভারম্যানশিপ পড়া হ্যায়, না পাশ কিয়া?

—জানে দিজিয়ে। ওভারম্যান হোগা? হিয়া? ওর দাড়ির জঙ্গলে চোখ দুটো জলজল করছে। রুটিতে হাত দিতে যে আসবে তাকে কোন দিনই সহ্য করবে না শরণ সিং। ঘর বাড়ি সব গেছে, ফেরবার পথ তার নেই। এইখানের মাটি কামড়েই পড়ে থাকতে হবে।

কথাটা বিশ্বাসই করতে পারে না শরণ সিং। নারকুলিয়া যেটুকু বিষ ঠিক ঢুকিয়ে দিতে পেরেছে এতেই আপতত কায চলবে।

সব বিভাগের মত কোলিয়ারির নিজেদের ওয়াচ এণ্ড ওয়ার্ড ডিপার্টমেণ্ট আছে পুরোদস্তুর। এদের কাযটা কিছুটা প্রকাশ্যে হয়, কিছুটা লেখা-পড়ার মধ্যে থাকে না। ওটা মৌখিক নির্দেশে চলে। কোন সাবুদ প্রমাণ কারো কাছেই থাকে না। যে হুকুম দেয়, আর যে তামিল করে দুজনেই থাকে ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

বড় বাড়িটায় খানকয়েক ঘরে সারিবন্দী লোহার খাট, চারিদিক পাঁচিল ঘেরা। মধ্যের মাঠে হাবিলদার ক'জন পাহারাদারকে প্যারেড করাচ্ছে টানা

টানা হেঁকে। কোনরকমে বিহারী নেপালী পাঞ্জাবী মেশানো পল্টন তড়বড় করে পা ফেলে হুকুম তামিলের চেষ্টা করছে।

সামনের সিপ্‌টে তাদের ডিউটি, প্যারেড করে বিভিন্ন পোস্টে বের হয়ে যাবে তারা। বসে বসে খেয়ে বেশ শাঁসে জলে ফুলে উঠেছে। ডাঙ্গায় ঘাস গজায় না, কিন্তু ওদের গোঁফের উর্বরতা দেখে তাক লেগে যায়। হাওয়ায় কারও লতানে গোঁফ ফির ফির করে উড়ছে।

—এ্যাটেনশান্।

কোন সিপাইর দল এ হুকুমটা বেশ রপ্ত করে নিয়েছে। মুখপাতের গামছা কিনা—গোড়াতেই দড়।

জমাদার পালোয়ান সিং একটা বর্তনে বেশ একতাল আটা ঠাসছে দলা-মোচা পাকিয়ে, গামছাটা ওর বিশাল ভুঁড়ির বেড় ঢেকে উঠতে পারেনি। পৈতায় বাঁধা চাবিটা বর্তনে ঠেকে মাঝে মাঝে টুং টাং শব্দ করে। চৌকায় গনগন করছে আগুন। ওদের আগুন নেভে না। একদিক থেকে কয়লার ছাই ঝেড়ে ফেলে অন্যদিকে কয়লা চাপিয়ে দেয়। রাবণের চিতার মত হরদমই জ্বলছে। কয়লার অভাব নেই এখানে।

শরণ সিংকে আসতে দেখে অভ্যর্থনা জানায় সিংজী—আরে ভাইজী, কিখে যান্দা?

শরণ সিং বেশ যেন ভাবনায় পড়ে গেছে নারকুলিয়ার কথায়। সাহেব-সুবোর কাছে ঘোরে। হয়তো ওর কথটা সত্যি, বসন্ত নাকি ওভারম্যানশিপ্ পাশ। এলেমদার তা ইতিমধ্যেই বোঝা গেছে। এটা সেটা জানে, ইংরাজি বলতে পারে সাহেবসুবোর সঙ্গে।

নজরে পড়ে গেলে হু হু করে উঠে যাবে। পিছনে রয়েছে ওই সৌরভী। ঠিক বুঝতে পারেনি এখনও সৌরভীকে। ও ছোকরাকে খেলাচ্ছে, না শরণ সিংকে নাচাচ্ছে! গোলমাল একটা বেধেছে তা বুঝতে পারে। আগেই একটু সাবধান হওয়া দরকার।

পালোয়ান সিং লোটায় জল চাপিয়ে তেজপাতা, এলাচ, লবঙ্গ, চিনি দিয়ে ফোটাচ্ছে, ফুটে উঠলে কিছু চা আর দুধ দিয়ে ঘাটতে থাকে।

—চায়র্থা পিজিয়ে।

শরণ সিং ভাবছে কি করে কথাটা পাড়বে। কোন ছুতোয় নাতায়

একবার ওকে চুরির কেসে ধরাতে পারলেই হয়, কোলিয়ারি ছাড়া করে দেবে। তার জন্য ওয়াচ ওয়ার্ডের দেশওয়ালী ভাই বেরাদারের সাহায্য চাই। ওরা চেষ্টা করলে সহজেই এ কায করতে পারে।

কলাই করা লম্বা গেলাসে এক গেলাস চা এগিয়ে দেয় জমাদারজী শরণ সিং-এর দিকে। আনমনে হাতে তুলে নেয় শরণ সিং ; কড়াপড়া হাতে একটু উত্তপ্ত আভাষ আসে। চুমুক দিতে থাকে। নাঃ, বাদলার দিনে উপরের মাটিতে বসে কম্বলের ওমে এমনি চা সত্যিই উপাদেয়, লোভনীয়।

—ক্যা খবর বলিয়ে। পালোয়ানজী গামছা ওরই মধ্যে একটু সামাল করে ছোট পিড়ে চেপে চৌকার আগুনের তাতে বসেছে।

শরণ সিং কথাটা পাড়ে কোন রকমে, একটু এ কথা সে কথার পর।

পালোয়ান সিংএর মুখে কয়লার তাতের লাল আভা। বাইরে নেমেছে মেঘঢাকা অন্ধকার ; ঝিম ঝিম বৃষ্টি পড়ছে, অফুরান বৃষ্টি।

ধাওড়ার খিলেন করা পাঁচ হাত বাই আট হাত খুপরিটুকুতে টিকতে পারে না বসন্ত। ছাদ বেয়ে টিপ টাপ জল পড়ছে ; দড়ির আলনায় টাঙ্গানো কয়েকটা প্যাণ্ট, ময়লা জামার উপর একটা ছেঁড়া চট চাপা দিয়ে বৃষ্টি ঠেকাবার চেষ্টা করেছে। রবিবার, সপ্তাহে একটি মাত্র ছুটির দিন ; তাও বৃষ্টিতে বরবাদ হয়ে গেল। কোন রকমে বের হয়ে পড়ে পথে। অন্য সকলেই প্রায় বাইরে। কাল হপ্তা পেয়েছে। এই ঠাণ্ডার দিন জুটেছে ইয়াকুব মিঞার সরাইখানায় ; চালাঘর জমে উঠেছে ওদের চিৎকারে, তেলেভাজাওয়ালা ঘুগনি বেচে শেষ করতে পারে না একহাতে।

—এ্যাই ! কৌন যাতা হ্যায় ?

মত্তপ কণ্ঠে কে যেন চিৎকার করছে। বসন্ত কান দিল না ওদের ডাকে।

আবছা অন্ধকার ঢাকা পথ দিয়ে চলেছে নদীর ধারে বস্তির দিকে। ফাঁকা ফাঁকা দু একটা বস্তি ; চিনতোড় গাঁ। বাউরী, বাগ্দী, দু চার জন ভুঁইহারদের ছোট নীচু ঘরগুলোর মাঝখানে একটা ঝাঁকড়া বটগাছ, গ্রামের ষষ্ঠীতলা।

কোলিয়ারির পত্তন হবার আগে ঝিম মেরে পড়েছিল অখ্যাত এই বসতি, পাহাড়ের ওদিকে নির্জন মেঘ নামা আঁধার সেদিনও ঘিরেছিল একে। পথ দিয়ে জলস্রোত বয়ে চলেছে।

ওদিকে রাস্তার ধারে মাচা করা দোকানটার ঝাঁপ বন্ধ। খদ্দের কেউ নেই, দোকানদারও বসে নেই খেয়াপারের যাত্রীর আশায়। ভরা দামোদর, পাথরে পাথরে ঠেক খেয়ে ছুটে চলেছে, নীচেকার চোরা পাথরে নৌকা লাগলে চুরমার হয় যাবে। খেয়া বন্ধ। বৃষ্টি ঢাকা রবিবারে অতীতের সেই আদিম জীবন যেন ফিরে এসেছে। নিঃসঙ্গ নির্জন বসতি, বৃষ্টিনামা আকাশের নীচে মৃতের মত অসাড় হ'য়ে পড়ে রয়েছে।

ক'দিন খাদে যায় নি মালু। বৃষ্টিতে ভিজে জ্বর টর হবে বোধ হয়। বেশ কাবু হয়ে না পড়লে কায বন্ধ করে না ওরা। কেমন যেন মন টানে একবার সংবাদটা নেবার জন্য। মাখন, ফকির, বুধন ওরাও সঠিক জানে না। বলতেও পারেনি বসন্ত ওদের খবরটা নেবার জন্য। একটা দুর্বলতা জেগে ওঠে গোপন মনে।

এই বৃষ্টিঝরা অলস সন্ধ্যায় মনে পড়ে তাকে। চিনতোড়ের বন্ধ্যা জীবনে ওই যেন একটু স্বপ্নের ক্ষীণ আভাস। সব কিছু চাওয়া পাওয়ার নেশাকে ছাপিয়ে ওঠে ব্যর্থ করুণ একটি সুর। বৃষ্টি ঝরা সন্ধ্যা নীরব কান্নায় ভরে ওঠে।

আবছা অন্ধকারে ছায়াঢাকা ঘরখানার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ভিতরের একটু আলো জানলার ফাঁক দিয়ে বের হয়ে আসে। জনমানব কেউ নেই।

কি ভেবে ফিরে আসতে যাবে, হঠাৎ আকাশ ছেয়ে আবার নামে বৃষ্টি।

বাধ্য হয়েই দরজার কড়াটা নাড়া দেয়।

—কে ?

ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শোনা যায়। একটু হকচকিয়ে গেছে সে।

বসন্তের সাড়া পেয়ে দরজাটা খুলে পাশে দাঁড়াল। এ সময়ে বসন্ত তার ঘরে আসবে ভাবতেই পারে না; একটা লজ্জা মেশানো আনন্দের সাড়া জাগে সারা মনে। মালু অভ্যর্থনা জানায়—বসো।

টিপ্।

একফোঁটা জল ঠিক জামার ফাঁক দিয়ে পিঠেই বিঁধেছে যেন তীরের মত। চমকে ওঠে।

—ইস। সব ঘরেই এমনি।

হাসে মালু, ওকে আসতে দেখে একটু আনন্দও হয়েছে। এক কোণে সে

পড়ে আছে। মেশেও না কারো সঙ্গে, মেশবার উপায় নেই। একক, নির্জনে নির্বাসিতা সে।

—খাদের নীচেই আছি বলে মনে হয়। আকাশে বৃষ্টি হয় এক ঘণ্টা তো ছাদে বৃষ্টি ঝরে দুঘণ্টা। জ্যালা যা হোক। এখানে মানুষ থাকতে পারে?

মালু বলে ওঠে—কালই লেগে যাও ম্যানেজারের সঙ্গে। একটা কায তো পেয়ে গেলে।

—মানে? বসন্ত একটা কাঠের নড় বড়ে টুল টেনে নিয়ে বসবার চেষ্টা করে।

মালু যেন বিদ্রূপ করছে—তুমি যে সকলের নজরে। পাঁচ নম্বর ধাওড়া, তিন নম্বর নামো ধাওড়ার সবাই নাকি তোমাকে মানে গণে।

—তাই নাকি? বসন্ত নিজেই এসব জানে না।

মালু গম্ভীর হয়ে গেছে। ঘরের কোণের টেমির আলোর আবছা জ্যোতি পড়েছে ওর মুখে গালে, একরাশ ছোট মাঝারি চুলে। নাকটা টিকলো; একটু কমনীয়তা আজও মুছে যায় নি ওর মুখ থেকে। কাপড়টা গায়ে জড়ানো। পুরুষালী পোশাকে যাকে রোজ দেখে, আজ সাদা মাটা এই পোশাকে, নির্জন সন্ধ্যার অন্ধকারে তাকে অন্য কেউ বলে মনে হয়। মালু যেন স্বপ্ন দেখছে, থমথমে ওর গলার স্বর।

—এ সব এখানে ভালো নয়। সবাই হাততালি দেবে, বাহবা দেবে ওদের হয়ে কথা বললে। কিন্তু কর্তারা তাকে ছাড়ে না সহজে। দরকার হলে মাটির নীচে চিরদিনের মত তার গলা টিপে স্বর বন্ধ করে গুম করে দেবে। দিয়েছেও অনেককে।

চমকে ওঠে বসন্ত ওর গলার স্বরে; শূন্য দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে নীরব আতঙ্কের বিস্ফারিত কালো ছায়া।

মালুর ডাগর চোখ ভরে ওঠে জলে; মোছবার কোন চেষ্টাই করে না। ভিজে গলায় বলে ওঠে,

—ওকেও তারা এমনি করে মেরেছিল।

অতীতের হারানো দিনের স্মৃতি সন্ধান ওর সারা মনে। মালু বার বার চেষ্টা ক'রে ভুলতে পারে না তাকে।

বাদলের বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য এখনও চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বোলগড়া

খাদে কায চলেছে পুরোদমে। মজুরি নিয়ে বাধে। বাদল তাদের দলপতি। তার কথায় ছশো মালকাটা কায বন্ধ করল। সাতদিন ধরে খাদের রেজিং বন্ধ। মালিকরাও নড়বে না, কোন মীমাংসাই হল না। বসে রয়েছে মালকাটারা, ধাওড়ায় মাগ ভাতারে উপোস পাড়ে, ছেলে পুলে কাঁদে ঘরে।

তবু নোয়াল না। পাকা বাঁশের মত শক্ত এরা! ভাঙবে তবু মচকাবে না।

গর্জে ওঠে তারা—এর প্রতিকার চাই।

সেদিন সকালেই খবর রটে যায় বাদল বেশ কয়েক হাজার ঘুস খেয়ে ভেগেছে; কোন পাত্তা নেই তার। কে যেন বলে মাঝ রাতে তাকে বড় রাস্তায় যেতে দেখেছে কোম্পানীর গাড়িতে। দোকানদার বুলু সাপুই বলে, কাল কলকাতা থেকে আসবার সময় রাতের ট্রেনে আসানসোলে নেমে প্লাটফরমে দেখেছে সে বাদলাকে। পরনে ধোপদুরুস্ত প্যাণ্ট, নোতুন চকচকে জুতো। সঙ্গে আরও কে ছিল। কলকাতা যাচ্ছে মোগলসরাই প্যাসেঞ্জারে। নানা রটনা; গুঞ্জরণ ওঠে মনে মনে। অবিশ্বাস আর রাগ ফেটে পড়ে।

ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় জনতা; এতদিনের শক্ত জমিতে চিড় খেয়ে যায়। মালিক তরফ হুমকি দেয়—আজ কাযে না এলে, নোতুন কুলিকামিন আসবে।

চুপ করল মালু। বসন্ত কি ভাবছে, বলে ওঠে—ওদের এমনি করে ঠকিয়ে গেল সে?

চমকে উঠে চাইল মালু, চকচকে চোখে জলের রেখা। মুছে নিয়ে জের টেনে চলে—না, বাদলা ঠকায় নি, মালিকরাই ঠকিয়েছিল আমাদিকে। কিছু দিন পর খবরটা বের হয়—বাদলাকে তারাই খুন করে গায়েব করে দিইছিল। ধ্বসা কোলিয়ারির সুঁদে ওর কাপড় জামা রক্তমাখা অবস্থায় পাওয়া যায়।

ওরা তাও চেপে গেল। কোন তদন্তই হতে দিল না তারা।

একটু দম নিয়ে বসন্তের দিকে চাইল চোখ তুলে—সে ঘটনা আজও অনেক কোলিয়ারিতে ঘটা অসম্ভব নয়।

বসন্ত চুপ করে থাকে। জীবনের এক একটা দিক, এক একটি মানুষকে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়ে ওঠে। লাখো নক্ষত্রের জ্যোতিতে ভাস্বর হয়ে ওঠে নীহারিকা, তেমনি অগণন মানুষের সম্মিলিত জীবনে—মহাজীবনের বিকাশ।

ওদিক দিয়ে গেল না বসন্ত ; মালুর কথাই সারা মনজুড়ে।

—সব জেনে শুনেও এভাবে এখানে কেন আছো তুমি ?

মালু জবাব দিল না, মাথা নাড়ে গম্ভীর ভাবে—পথ কই আর ? পেলে এইমাত্র ছেড়ে দিতাম। এই দেশ ছাড়া অন্য কোন দেশ জানি নি, চিনি না।

বসন্তও ভাবছে—বিয়ে থা করলেই তো পারো।

—বিয়ে! এত দুঃখেও হেসে ফেলে মালু, হাসি তার থামতেই চায় না। বসন্ত বোকার মত তার দিকে চেয়ে থাকে। হাসি থামিয়ে মালু বলে ওঠে,

—বিয়ে কে করবে বলো ? লোক কই ? পেলে তো করি। মালা ফুলশয্যা না হোক তবু বিয়ে তো। তাছাড়া কিই বা সে পাবে বলো ? কোন লোভেই বা আসবে ?

বসন্তের দিকে চেয়ে থাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। বৃষ্টি ঝরা নির্জন রাত ; জেগে আছে ক্ষীণ ওই শিখাটুকু আর তারা দুজনে। মালুর গলায় সহজ স্বাভাবিক স্বর।

—এখানে মালকাটাদের বৌ আর থাকে না, থাকে 'রাখনী', ওতে আর মন মানে না। যাও, রাত অনেক হয়েছে। কাল ভোরেই বেরুতে হবে আবার।

বসন্তকে যেন জোর করেই বের করে দিল মালু। এগিয়ে চলেছে বসন্ত। কাঁচা পথটা ছেড়ে উঠবে বড় রাস্তায়, কয়েকটা নিম আঁকড় গাছের জটলা। কাকে এগিয়ে আসতে দেখে সরে দাঁড়াল বসন্ত।

হাটতলার কাছে একটি মেয়ে এগিয়ে এসে দাঁড়াল সামনে। নির্জন পথ, বৃষ্টির মধ্যে অভিসারিকার দর্শন।

—যাবেগো ? চল না ?

বসন্ত হাসছে—খাটি খাই। পয়সা পাবো কোথায় ?

মেয়েটা টপ্ করে ওর জামার খুঁট ধরে ফেলে। কোন ধাওড়ার কারও ঘরের বউ বিটি ছিল, আজ যাবার জায়গা নেই, পোড়া কাঠের মত শ্মশান আগলিয়ে পড়ে আছে চিতার ধারে।

—মাইরী! একগাল হেসে একেবারে ওর গায়ের উপর এসে পড়ে।

বসন্তের পকেটে কয়েকটা টাকা ছিল, মরি বাঁচি হয়ে তার থেকেই একটা টাকা বের করে ওর হাতে গুঁজে দেয়,

—এই নাও, পরে আবার আসবো।

মেয়েটা হঠাৎ টাকা পেয়ে অবাক হয়ে যায়; অন্ধকারে ঠাওর হয় না, একটু নেড়ে চেড়ে বলে—লোট বটে তো ভাই, না সিনেমার পুরোনো টিকিট দিছ? ঠকিয়ে পার পাবে না কিন্তু।

বসন্ত তখন বড় রাস্তায় গিয়ে উঠেছে।

বৃষ্টি ধরে গেছে। আউড়ি বাউড়ি বইছে জলো হাওয়া, দামোদরের গর্জন ভেসে আসে, ক্রুদ্ধ আক্রোশে ফুলে উঠেছে নদী, টিলার নীচে এসে ছোবল মারে ঢেউ-এর হাজার ফণা।

মালুর কথা মনে পড়ে, পথ নেই তার। বন্দী জলের মত কঠিন পাথরে নিষ্ফল মাথা খুঁড়ে মরছে। চাকরি যদি যায় তার অবস্থা হবে ওই নিমতলায় দেখা মেয়েটিরই মত। ঝড় বাদলেও পথে দাঁড়িয়ে নির্লজ্জ হাসিতে জীবনকে ব্যঙ্গ করবে, দুষ্ট ক্ষতের পোকার মত সারা শরীরকে অসহ্য যন্ত্রণা দিয়ে চলবে ওর বাঁচবার চেষ্টা।

ছুটির, বিশ্রামের একটি দিন বৃষ্টিভরা আঁধারে খসে গেল।

মিত্র সাহেব এয়ার স্যাম্পেল এনে নিজেই ল্যাবরেটারিতে টেস্ট করে চমকে ওঠে। বর্ষার দিন, আদিম প্রাগঐতিহাসিক কোন তমসাচ্ছন্ন যুগে বনভূমি মাটির অতলে চাপা পড়ে আজ কয়লা হয়ে বের হয়েছে। সেদিন সেই বনভূমি জলার মধ্যে রুদ্ধ বাতাস বুকে নিয়ে ছিল, আজ তাও সঞ্চিত হয়ে আছে কয়লার স্তরে স্তরে প্রাণঘাতী মৃত্যুবিষ-বাষ্প হয়ে! বর্ষার দিনে হাজারো বছর পর আবার তারা বের হচ্ছে।

মালকাটা ঠিকই ধরেছে! বাতাসে দু-পার্সেন্টেরও বেশি গ্যাস জমেছে। এবং বেড়েই চলবে ওই গ্যাসের সঞ্চয়। দুটি মাত্র স্যাফ্ট; কোলিয়ারির আয়তন যা বেড়েছে সেই পরিমাণে বাতাসের 'ইনটেক' পর্যাপ্ত নয়। কায করতে গেলে আরও স্যাফ্ট বাড়ান দরকার।

ভাবতে ভাবতে রিপোর্ট নিয়ে ফস্টারের ঘরে ঢোকে। ফস্টার কাগজ-পত্রগুলো উল্টে চলেছে, মুখ তুলে চাইল মাত্র। মিত্র সাহেব চেয়ারটা টেনে বসে; শব্দে মুখ খুলল ফস্টার।

—ইয়েস মিঃ মিত্র ?

মিত্র কাগজখানা বাড়িয়ে দেয়—পাঁচ নম্বরের এয়ার স্যাম্পেল এনেছিলাম, এই তার টেস্ট রিপোর্ট, প্রিকেরিয়াস।

চোখ বুলিয়ে কাগজখানা সরিয়ে রেখে ফস্টার বলে ওঠে—কে তোমাকে টেস্ট করতে বলেছিল মিঃ মিত্র ?

জানাজানি হলেই বিপদ। মাইনার্স অপিসে খবর চলে যাবে। রেগে উঠেছে ফস্টার। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়ার মত অপরাধ !

মিত্র সাহেব ওর প্রশ্নের ধরনে একটু চমকে ওঠে ; বেশ কঠিন স্বরেই মিত্র জবাব দেয়—আমিই এনেছিলাম। মাইনের সেফটির জন্য আমরা সকলেই রেসপনসিবল।

—তা আমি জানি। ফস্টার জবাব দেয়।

—তাহলে তার ব্যবস্থা কর ফস্টার। কোল ডাস্ট ট্রিট করবার অর্ডার দিইছি। কিন্তু তাতেও বিপদ যাচ্ছে না। আই ওয়ান্ট ভেন্টিলেশন। এনাদার স্যাপ্ট ইজ নেসেসারী।

—তা সম্ভব নয়। ফস্টার স্রেফ জবাব দেয়। বহু টাকার ব্যাপার। এতেই তারা রেজিং করতে পারবে। বিপদ ! কোলিয়ারিতে অমন বিপদ আছে জেনেই আসে ওরা কাজ করতে, লাইফ ইন্সিওর কোম্পানীও প্রিমিয়াম বেশি দরেই নেয় তাদের কাছ থেকে। মিঃ মিত্র বলে ওঠে,

—থিঙ্ক অব ইট ফস্টার। আই স্ট্যাণ্ড বাই মাই রিপোর্ট। তুমি না কর, এজেন্টের নোটিশে আনবো।

ফস্টারের লাল মুখ শীতের মুলোর মত রাঙ্গা হয়ে ওঠে। মিত্র তাকেও পরোয়া করে না। কড়া কথা বলতে গিয়ে থেমে গেল। একই র‍্যাঙ্কের লোক, বিদ্যা বুদ্ধিতে তার চেয়ে বেশিই। মাইনিং কলেজের প্রফেসার ; ওর কথাকে উড়িয়ে দিতে পারে না ফস্টার।

রাগ চেপে বলে ওঠে—টেক ইট টু এজেন্ট দেন। আই এম হেল্পলেস্, ইউ সি।

মিত্র উঠে দাঁড়িয়েছে, কাগজখানা তুলে নিয়ে বের হয়ে যায়। যাবার সময় বলে ওঠে—ইউ ক্যান নট সার্ক ইওর রেসপনসিবলিটি ইফ এনিথিং হ্যাপন্‌স।

ফস্টারও জানে তার দায়িত্ব কতখানি, ভাবনায় পড়েছে সে।

কিছু ঘটলে ফস্টারকে দায়ী হতে হবে, সে ব্যবস্থা মিত্র করে রেখেছে। লগ্ বুক, ইনস্পেকশন বুকে নোট রেখেছে, ল্যাবেরেটরি টেস্ট বুকেও এর বিশদ বিবরণ লিখে রাখবে।

কিন্তু তাতে কি বিপদ কমবে? তিনশো করে তিন সিপ্টে প্রায় হাজার লোকের জীবন নিয়ে খেলছে এরা, একদিকে এদের মুনাফা, অন্যদিকে এতগুলো জীবন নিয়ে খেলা।

মিঃ ব্লেজার সবে মাত্র কয়েকটা কোলিয়ারি ইনস্পেকশন সেরে বাংলোয় ফিরেছে, এমন সময় ফস্টারের ফোন পেয়ে একটু চটে ওঠে। চটবার লোক ব্লেজার নয়; বিনয়ী, কৌশলী, ভদ্র ইংরেজ। কিন্তু মনের কথা কেউই টের পায় না তার। ফস্টার উত্তেজিত কণ্ঠে বলে চলেছে—ইট ইজ ডেঞ্জারাস! লেবার ক্ষেপাতে চায় মিত্র, অথবা তাদের মনে ভয় ধরানো, ইট ইজ সিম্পলি স্যাবোটেজ।

ব্লেজার হাসে মনে মনে। ফস্টার একটা পিটের ম্যানেজার; ব্লেজার কোম্পানীর কয়েকটা কোলিয়ারির স্থানীয় এজেণ্ট, তাই বোধ হয় তার বুদ্ধি আরও গভীর, ধৈর্য আর বিনয় অপরিসীম। ফোনটা নামিয়ে রেখে আপন মনেই হাসতে থাকে—ট্যাক্টলেস্ ইডিয়ট ওই ফস্টার।

অবশ্য ব্লেজারের তাতে সুবিধা; দুজনের মধ্যে গোলমাল জিইয়ে রাখতে পারলে কাযটা ভাল হবে।

চুপ করে জানলার বাইরের দিকে চেয়ে থাকে। দেখা যায় টিলার গা বেয়ে পথটায় এগিয়ে আসছে মিত্রের ছোট গাড়িটা।

ব্লেজার জানলা থেকে সরে গেল। অযাচিত ভাবে দেখা দিয়ে নিজের ওজন কমানো তার স্বভাব বিরুদ্ধ।

ফস্টারের সঙ্গে বেশ একচোট হয়ে গেছে তা মিত্রসাহেবকে দেখেই টের পায় ব্লেজার। নিজেই ড্রাইভ করে এসেছে গাড়িখানা সোজা অপিস থেকে। মাথার হেলমেটটা সিটে নামানো, খাকি পোশাকে কালির আবছা দাগ।

মিঃ ব্লেজার যেন কিছুই জানে না, নিবিষ্ট মনে রিপোর্ট দেখতে থাকে।

মুখ গম্ভীর হয়ে ওঠে···, সত্যিই বিপদের যথেষ্ট কারণ আছে। তবে কাজ চালান যায় এতে, অন্যান্য ব্যবস্থা নিলে।

—থ্যাঙ্ক ইউ ফর দিস রিপোর্ট মিঃ মিত্র।

মিত্র সাহেব ওর দিকে চেয়ে থাকে, ওকে কোন কথা বলতে দেবার আগে যেন মুখ বন্ধ করবার জন্যই বেয়ারা চা, এগ, টোস্ট আনে।

—প্লিজ! ব্লেজার নিজেই ওর দিকে চায়ের পিয়ালা অফার করে।

—থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। মিত্র সাহেব এতক্ষণ ছোটাছুটি করে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। গলা শুকিয়ে উঠেছিল চাপা উত্তেজনায়; দামী লেপচু টি-এর মিষ্টি সৌরভে যেন সতেজ হয়ে ওঠে শরীর।

ব্লেজারই বলে চলেছে—একটা সাপ্ট-এর সাজেসন দিচ্ছ মিত্র; তার জন্য হেড অপিসের স্যাংশন দরকার। অনেক টাকার ব্যাপার। আমি রেকমেণ্ড করে লিখছি, আজই।

মিত্র সাহেব উঠে পড়ে, ব্লেজার ওকে গাড়ির কাছ অবধি এগিয়ে দিয়ে যায়।

মিত্র সাহেবের এই সতর্কতার জন্য বার বার তাকে ধন্যবাদ জানায়; ম্যানেজার হবার এই প্রথম, প্রধান গুণ। চারিদিকে সাবধানী দৃষ্টি। ফস্টার তার তুলনায় একটা ডালহে.ডড ইডিয়ট।

বের হয়ে গেল মিত্র। ব্লেজার রিপোর্টখানা নিজের ড্রয়ারে তুলে রেখে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে। ফস্টার একটা ডালহেডেড ইডিয়ট! সিচুয়েশনটাকে এমনি ঘোরালো করে না তুলে নিজেই চাপা দিতে পারতো।

বদলে যাচ্ছে ব্লেজার। নইলে আজ হঠাৎ মিত্রের সঙ্গে এই ব্যবহার তার নিজের কাছেই নোতুন ঠেকে। একজন ইঞ্জিনিয়ার এজেন্টের বাংলোয় এসে নালিশ জানিয়ে যাবে এবং এজেন্ট তাতে সায় দেবে এটা যেন ইতিহাসে ঘটেনি।

কিন্তু ইতিহাস বদলাচ্ছে। ধূর্ত ব্লেজার তা বুঝেছে—ফস্টার তা বোঝেনি। খাস ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় এইবার এদেশী ব্যবসাদার ঢুকছে। শেয়ার ছাড়তে হবে এখানেও, বাঙ্গালী ডিরেক্টারও আসছে। কৌলীন্য হারাচ্ছে ব্লেজার ফস্টারের দল। থাকতে গেলে মানিয়ে নিয়ে চলতে হবে। অনেক শেয়ার এরই মধ্যে এদেশী প্রতিষ্ঠানের হাতে চলে গেছে।

তারা কর্তৃত্ব নেবার আগেই ব্লেজার কোম্পানীর পরিচালনায় একটা

আলগা ভাব আনতে চায়; ডিসিপ্লিন মরালিটির শক্ত ভিতে ইচ্ছে করেই চিড় খাইয়ে দেবে সে। যাতে তার জন্য বেগ পায় ওরাও।

আর মুনাফা! হস্তান্তর হবার আগেই ব্লেজার যা পারছে চেষ্টা করছে হাতিয়ে নেবার। বিলেতে কয়েক লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতির অর্ডার গেছে। নোতুন নামে নিজেও কারবার ফাঁদছে।

এত চিন্তার মাঝে তুচ্ছ ওই ফস্টার-মিত্রের ঝগড়ায় কান দেবার সময় তার নেই। লেবার আনরেস্ট! হাসছে ব্লেজার। সেইটাই শুরু হোক, ওতে ইন্ধন যোগাবে তারা।

রাত্রি নামে এখানের আকাশে; নিস্তব্ধ রাত্রি। শাসায় তার স্তব্ধতাকে স্টিম বয়লারের ক্রুদ্ধগর্জন। ওর জমাট আঁধার বুকে ছুরির ফলার মত বিঁধে থাকে আলোর রেখা; স্টেশন ইয়ার্ড থেকে সন্ধানী চোখ মেলে সমস্ত রেলইয়ার্ডের দিকে বিনিদ্র দৃষ্টিতে চেয়ে আছে কয়েকটা সার্চলাইট।

সাহেব-বাংলোর বাগানের আবছা গাছ গাছালির মাথায় মাঝে মাঝে ডেকে ওঠে রাতজাগা পাখি; কলরব কাকলীতে ভরে তোলে নিরন্ধ্র অন্ধকার। নীল ফ্লোরেসেণ্ট আলোর আভা মার্কারি ভেপারের আসমানী আলোর সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে, নেশা লাগানো আলো।

ফস্টার চুর হয়ে থাকে, বেপরোয়া উদ্ধত ফস্টার।

মাঝে মাঝে আসে মিসেস ব্লেজার; ব্লেজার নোতুন কোম্পানী ফ্লোট করার স্বপ্ন দেখছে; রাতের বেলাতেই হিসাব কাগজপত্র লেখাপড়া নিয়ে বসে, অধিক রাত্রি পর্যন্ত। মিসেস ব্লেজার প্রথম প্রথম আপত্তি করতো, এখন আর করে না। করবার বিশেষ কিছু নেই।

মদ্যপ কণ্ঠে ফস্টার কি যেন বলবার চেষ্টা করে মিসেস ব্লেজারকে। ওর শক্ত হাতের কঠিন নিষ্পেষণে নিজেকে সঁপে দেয় মিসেস ব্লেজার; কামনাতুরা নারী।

জ্বলছে ফস্টার, নবাগত ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু রবার্টস-এর বৌকে মনে পড়ে।

—দো সোডা!

মিসেস ব্লেজার গ্লাশে খানিকটা সোডা মিশোচ্ছিল সফেন পানীয়ের সঙ্গে, সোডা ছাড়াই পদার্থটা গলায় ঢেলে দেয় ফস্টার, বিচিত্র জ্বালা! দূর থেকে রেডিওতে একটা সুর ভেসে আসে।

মিসেস ব্রেজারের নীল স্বপ্নে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে চায় ফস্টার।

রাত নামে। তারাজ্বলা রাত্রি।

এদের রাজ্যেও রাত নামে। ধেনোমদ খেয়ে বেহুঁস হয়ে দুঃখকষ্ট ভোলবার চেষ্টা করে, কেউ বা গুমরে ওঠে বুকজ্বলা পিদিমের মত করুণ রুক্ষতায়। কেউ বা দেখে বাঁচবার স্বপ্ন। এত দুঃখের পরেও হাসি আনন্দের স্পর্শমাখা সংসারের রূপ!

বুধন মাঝির ঘরের দেওয়াল থেকে ঝুলছে কয়েকটা ফাঁপা বাঁশের চোঙ্গা, লাউ-এর খোল। শিকেতে ঝুলছে কালিমাখা ভাতের হাঁড়ি। সাঁওতালের ভাতের হাঁড়ি মাটি ঠেকে না, শূন্যে ঝোলে।

একটা বাঁশের চোঙ্গায় ফুটো করে তারই মধ্যে গুটিয়ে পুরছে দু'একটা নোট। দেওয়ালে খড়ির দাগ কেটে হিসাব করে হপ্তার মজুরি থেকে কত মোট জমাতে পেরেছে। একবেলার ভাত দুবেলায় খায়, যতটুকু পারে জমাবার চেষ্টা করে। চৌদ্দ টাকা, সাড়ে তিন গণ্ডা টাকা জমেছে, আরও চাই চারগণ্ডা, অন্যান্য খরচ আছে, আন্দাজ দশ গণ্ডা টাকা পুরলেই আর থাকবে না, পরদিনই চলে যাবে সে এখান থেকে নদী পার হয়ে আবার সেই হাঁসপাহাড়ীর বনে।

ঘর বাঁধবে! সে আর বুধী।

বাঁশির সুর, মহুয়ার গন্ধ আর পলাশের লাল নেশায় ভরপুর একটি পাখি-ডাকা জগৎ। কয়লার ধুলো জমাট অন্ধকার মৃত্যুপুরীর থেকে পালাবে ওই দৈত্যকে ফাঁকি দিয়ে।

বাঁশিটা বের করে ফুঁ দেয় আনমনে। রাতের আঁধারে কেঁপে ওঠে সুরের রেশ। ওই সুরে মিশে আছে মহুয়ার সৌরভ, শালফুলের গন্ধ, বুনো গেরুয়া হাওয়া আর বুধীর চোখের নেশা।

এ জগতের সবকিছু ভুলে যায় বুধন। সুরটা কেঁপে কেঁপে ওঠে মহাশূন্যে।

আনমনে ফকির শুনছে সেই সুর। অতীতের ফেলে আসা ব্যর্থ যৌবন আজ কান্না জাগায়; হু হু করে মন। অন্ধকার ঘরের এর্কোণ ওকোণ হাতড়ায় যদি মদ একঢোক থাকে। খালি বোতল হাতে ঠেকে একটা। বিরক্তি ভরে ছুঁড়ে ফেলে দেয় সেটাকে।

লক্ষ্মীছাড়ার সংসার। আগে এমন দিন ছিল না। একজন ঘরটুকু ভরিয়ে রেখেছিল প্রাচুর্য আর লক্ষ্মীশ্রীতে। অল্প রোজকার হোক, তবু সেই শান্তির স্পর্শ ভোলেনি ফকির। সারাদিনের কর্মক্লান্তির পর ধাওড়ায় ফিরতো। মদ, ভাত, জল তৈরি; তরঙ্গ টবে করে স্নানের জল ধরে রেখেছে। সাবানও জুটতো।

নিজেই জল দিয়ে সাবান রগড়াতো ওর বুক, পিঠ, সারা গায়ে। অন্য মালকাটারা কোথায় যেন হিংসা করতো তাকে।

কিন্তু সব কোনদিকে হারিয়ে গেল! সেই দিনগুলোকেও সঙ্গে করে নিয়ে গেছে তরঙ্গ।

কোন দূরে সেই মধুস্বপ্ন ভরা দিনগুলোকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তরঙ্গ।

ডাক দেয় তাকে বার বার। আঁধারের পারে আলোর নিশানা দেখে ফকির।

তাই বোধ হয় তরঙ্গ চলে যাবার পর আর কাউকে মনে ধরেনি ফকিরের।

ঘোরে পাঁচু। পাঁচু নিকিরি। সন্ধ্যার পর তার এই যাযাবর বৃত্তি।

সারা হাটতলা, অপিস কোয়ার্টার পাড়া, ধাওড়ায় তার টহল দিতে হয় পাঁচজনের খবর নিয়ে। লালাজীর গদির পিছনের ঘরে মাঝে মাঝে আসে নারকুলিয়া; স্বয়ং ফস্টারও।

সোফা কোচ দিয়ে ঘরখানা সাজানো, আলমারিতে সারি সারি বোতল সাজানো; কাঁচের গ্লাশও। লালাজীর নোতুন বাড়ির মহলের সঙ্গে সামনের গদির কোন সামঞ্জস্য নেই।

বৃষ্টি পড়ছে। টিপ টিপ বৃষ্টি।

পাঁচুর মত যমকাকদের বৃষ্টি ঝড়েই বেশি আনাগোনা। বসন্তের ঘরে কে এল, কি বলছে, কখনও লুকিয়ে কখনও দেখিয়ে তারই খবর নিতে আসে। তা ছাড়াও অন্যত্র খোঁজ খবর নিতে হয়; সঠিক সংবাদ শোনাতে হবে নারকুলিয়া, লালাজীকে।

ব্যাটা তেলেঙ্গী হাড় শয়তান, একটা কথাও ধাপ্পা দিয়ে বলবার উপায় নেই।

—কঁ্যা। কান খাড়া করে প্রশ্ন করে—কৌন রে? ক্যা বোলা?

পাঁচুর বিরক্তি জমছে মনে মনে। তবু উপায় নেই। পেটে খেলে পিঠে সয়। সেই অনাহার অভাবের হাত থেকে বেঁচেছে। আর বেড়েছে একটু সম্মান অনেকের কাছে।

নর্দমার ধারে কচু গাছের বুকে হলুদ ফুলের সমারোহ; রাতের বাতাসে কাঁপছে গাছের পাতা।

—ওই পাঁচুদা যি গো, এসো।

কেষ্ট মিস্ত্রী তাকে দেখতে পেয়ে টেনে নিয়ে যায়; গৌরী আসন পিঁড়ি হয়ে রুটি বেলছে আবছা টেমির আলোয়, কাঁপছে ওর যৌবন পুষ্ট দেহ; বাঁজা মেয়েটার দিকে চাইতে পারে না পাঁচু; লুব্ধ সেই দৃষ্টি। কেষ্ট ফরমাইস করে।

—চা আন।

চা! পাঁচুর বুকে অন্য তেষ্টা। চায়ের নাম শুনে হতাশ হয়।

কেষ্ট বলে ওঠে—খাওয়াবো একদিন তোমাকে পাঁচুদা।

গৌরী মাথা নামাল, ওই চাহনির অর্থ সে বোঝে; পাঁচু, কেষ্টর উপরই ঘৃণা জন্মেছে তার। তিল তিল ঘৃণা জড়িয়ে রয়েছে গৌরীর দেহ মনের অতলে। সামান্য কটা টাকার বিনিময়ে জানোয়ার কেষ্ট এখুনি বেসাতি ফেঁদে বসবে হয়তো।

—চায়ের দুধ নেই।

পাঁচু হাসছে—কেষ্ট একটা গাই কেন, বাঁজা গাই লয়, দুধ দেবে বাচ্চা হবে তেমনি গাই। গৌরীর দিকে চেয়েই চমকে ওঠে পাঁচু, ডাগর দুচোখে ওর আগুনের জ্বালাভরা দৃষ্টি, হঠাৎ কেমন যেন ভয় পায়। উঠে পড়ে পাঁচু।

—পরে আসবো একদিন। আজ চলি বৌ।

পাঁচু বেরিয়ে গেল।

রাতের আঁধারের জাগ্রত শয়তান। বুক জ্বলছে তৃষ্ণায়। গৌরীর কামনা-ব্যাকুল ব্যর্থ দেহটা ভেসে ওঠে বার বার; অন্ধকারেই এগিয়ে চলে পাঁচু।

ফকির ওকে দেখে খুশি হয়। একা দুটো মনের কথা কইবার লোক পায় যেন।

—আয় রে!

পাঁচুর মন অন্য দিকে, গলায় খানিকটা সতেজ জ্বালা ধরানো পানীয়ের দরকার। ফকির বলে ওঠে—তোকে কি বললে রে?

পাঁচু হঠাৎ যেন মনে করতে পারে না, একটু চেষ্টা করে, স্মরণে আসে।

—ও! তা কত কথা বললো। দেখতে যা সোন্দর হয়েছে দাদা, সারা ধাওড়ায় তেমন কেউ নাই!

—কিষ্টোর বউ? ফকিরের মনে জেগে উঠেছে কামনার সরীসৃপ।

—ছোঃ! কিসে আর কিসে? ও বাঁজা ছুঁড়িটোতো ভস্‌কা, তরঙ্গ তোমার লিটোল।

তরঙ্গ এখনও তারই আছে। ফকিরের কথা তার আজও মনে পড়ে। বার বার ডাকে তাকে তরঙ্গ দূর থেকে। ফকিরের বুকে বল ভরসা বাড়ে, একা পরিত্যক্ত সে নয়, তারও একটা শান্তির ঠাঁই আছে। এই বিশাল বিশ্বে অন্তত একজনও আছে যে শত আঘাত লাঞ্ছনায় ভরা ব্যর্থ ফকিরকে বুকে টেনে নেবে।

বেঁচে থাকবার একটা উদ্দেশ্য খুঁজে পায় ফকির।

পাখি ডাকছে, রাত জাগা ঘুম ভাঙ্গা পাখি। বাতাসে ভেসে উঠেছে আধ-মরা বকুল গাছ থেকে খসে পড়া ফুলের সৌরভ।

পাঁচু মাথা চুলকোয়—একটা টাকা দাও কেনে গো দাদা।

—টাকা!

—হ্যাঁ গো, গলাটা শুখাই গেছে।

পানীয়; বুক আর মনের তৃষ্ণা মিটবে। শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়বে অসাড় ঘুমের রাজ্যে এই স্বপ্নটুকু মনে নিয়ে। ফকির উঠে গিয়ে পাঁচ সিকে পয়সা বের করে।

—একটা বোতল নিয়ে আয়।

পাঁচু খুশিতে ডগমগ হয়ে ওঠে—এই না হলে দাদা। সাধে কি তরঙ্গ বলে এমন মানুষ হয় না পাঁচু। আমার সোনা বাইরে আঁচলে গেরো হয়ে গেছে। কবে আনবি তুর দাদাকে বলে যা।

ফকির হাসছে। সামনের দাঁতটা পড়ে গেছে। লালচে মাড়িতে কদর্য লাগছে হাসিটা। যেন ভেংচি কাটচে।

স্তব্ধ অন্ধকারে বসে আছে মাখন, আর তার বৌ। নিকোন ঝকঝকে একফালি উঠোনের কোলে কয়েকটা সন্ধ্যা মালতীর গাছে লাল ফুলের চাহনি; একটুকরো আকাশ কোল থেকে ক্ষণিকের জন্য মেঘ সরে গেছে। দেখা দেয় দু'একটা তারার স্নিগ্ধ আভা।

মাখনের দুই ছেলে হুগলীর পাটকলে চাকরি করে। সেই ঘনসবুজ ছায়া ঢাকা দেশের আবছা ছবি ভেসে ওঠে ওর চোখে! দু একবার গেছে সেখানে ছেলেদের কাছে। এমনি রক্ত লাল বন্ধ্যা পোড়া ডাঙ্গার মুলুক সে নয়; সবুজ ঘাসের গালিচা পাতা দেশ। পাখি ডাকে অলস মধ্যাহ্নে। সোনা রোদ গাঢ় হলুদের স্বপ্ন আনে গাছ গাছালিতে; ক্ষীর ধারা বুকে নিয়ে চলেছে মাতোয়ারা গঙ্গা, তার জল কূলে ঠেকে নেচে চলে।

—বুঝলি বৌ, ঘর বসত যদি করতে হয় ওই দেশই ভালো। মা গঙ্গা বইছেন, দুবেলা চান করে বুক জুড়োবে। এখানের মত পোড়া লি লি করা দেশ সে নয়।

মাখনের বৌ বলে ওঠে—কতদিন থেকে তো শুনছি ওই কথা। চল কেন্নে?

—যাবে ইবার। টাকাগুলোন কোম্পানীর ঘর থেকে নিয়েই চলে যাবো। ই আর ভাল লাগছে নাই। খাদের নীচে গরমে আর ডরে বুক কাঁপে রে।

মুক্তি চায় মাখন। এই মৃত্যুপুরী থেকে পালাবে সে। শান্তির সন্ধান করবে, বাঁচবে মাখন।

রাতের ঘুম লাগা একটি স্বপ্নের মত সেই জীবন তাকে ডাক দেয়।

ব্যর্থ কান্নায় কাঁদে সৌরভী, চিনতোড়ের লাস্যময়ী নায়িকা। যাকে হাটতলায় দেখেছে বসন্ত, শরণ সিং-এর সঙ্গে দেখেছে নিয়ামৎপুরের সিনেমা হাউসের কাছে, যাকে দেখে কোলিয়ারি অপিসে—সেই মেয়েটি এ নয়। দেহ মনের আসল সত্তাকে লুকিয়ে হালকা হাসির ঝরনায় ভাসিয়ে দেয় নিজেকে। কিন্তু রাতের অতলে কাঁদে সেই ব্যর্থ নারী; একজনকে ভালবেসে আজও তাই জ্বলে মনে মনে। তার তৃষ্ণা মেটাবার জন্যই সামনে যা পায় পানীয় বলে তুলে ধরে, কিন্তু সেই গরল জ্বালা তাতে বাড়ে মাত্র।

সৌরভী যেন স্বপ্ন দেখছে। লিস্টার মাতাল হয়ে মারতো তাকে।

সৌরভীর সারা দেহমনে সেই আঘাত যেন সুরের মাতন তোলে। দুর্মদ

বেপরোয়া লিস্টারকে তত নিবিড় করেই ভালবেসেছিল। তাকে কোথাও যেতে দিত না লিস্টার।

—হামরা বাংলোমে রহেগা তুম। চার্চ মে যাকে সাদী করে গা।

—সাদী! সৌরভী বিশ্বাস করতে পারে না কথাটা। মাতালের কথা।

হাসে লিস্টার—হ্যাঁ। জরুর। হাজব্যাণ্ড এণ্ড ওয়াইফ। ডারলিং!

নিবিড় নিখাদ প্রীতিমাখা সেই স্পর্শ।

একটি মানুষ অন্তত তাকে বঞ্চনা করেনি। সৌরভীও একটি মনকে নিঃশেষে ভালবেসেছিল। প্রেমের শতদল একবারই ফোটে মানুষের মনে। পূর্ব থেকে চলে তার প্রস্তুতি, জলের অতল থেকে শুরু হয় তার জাগরণ; তারপর একবারই মেলে ধরে তার শতদলের পাপড়ি। ভ্রমর আসে, গুঞ্জরণে ভরে তোলে পদ্মবন; রূপ, বর্ণ, রসে অভিষেক হয় প্রেমের; তারপরই তার ঝরার পালা, একটি একটি করে পাপড়ি খসে পড়ে নিস্তরঙ্গ জলের বুকে; হারিয়ে যায় সেই শতদলের চিহ্নটুকুও। সৌরভ মিশে যায় দিক্‌হারা বাতাসে। বাকি জীবন ধরে চলে সেই অসীমে উধাও স্বপ্নের ব্যর্থ অন্বেষণ।

লিস্টারকে কর্তৃপক্ষ সহ্য করতে পারে নি। একজন ইংরেজ বিদেশে গিয়ে শাসন শোষণ করবে, অত্যাচার ব্যভিচার করবে তাতে কোন সম্মান হানি হয় না। সেটা নেটিভের উপর তার দাবী। মদ খেয়ে তাদের দেশের মেয়ের ধর্মনষ্ট করা শাসকের পৌরুষের লক্ষণ।

কিন্তু লিস্টার তা করেনি। সৌরভীকে বিয়ে করেছিল ধর্মমতে।

মৌচাকে ঢিল পড়েছিল। ওই ব্লেজার তখন সেকেণ্ড ম্যানেজার, লিস্টারের নীচে।

সৌরভী ভোলেনি, লিস্টারের নামে ক্লাবে, অপিসে, আসানসোল কেল্‌নারে কত কেচ্ছা। ব্লেজারও ছাড়েনি তার ওপরওয়ালাকে জানাতে। লণ্ডনের হেড অপিসে রিপোর্ট গেল লিস্টারের নামে।

ধাওড়ায় ধাওড়ায় নিজে যেতো লিস্টার, এদের পালপার্বণে চাঁদা দিত, নেমন্তন্ন খেতে আসতো দুর্গাপূজা কালীপূজায়। পাতপেড়ে বসে খেতো। বাংলোয় সকলেরই অবারিত দ্বার।

অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল শাসককুল। লিস্টার তাদের উঁচু মাথা ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে।

সৌরভী চুপ করে। শন শন হাওয়া-কাঁপা রাত। নীরব নিস্তব্ধ চারিদিক। বসন্ত চেয়ে আছে ওর দিকে। সৌরভীর দুচোখে অতীতের স্বপ্ন। চোখের দৃষ্টিতে সেই আদিম নারীর ঘর বাঁধার কামনা, মন ভরার আনন্দ, আজ এত শূন্যতার মাঝেও ফিরে আসে তার দৃষ্টিতে, তারাকিনী রাত্রির নীরব নিশীথ নির্জনে।

বসন্ত জানে লিস্টারকে শাসক গোষ্ঠী সহ্য করতে পারে নি। জরুরি কেব্‌ল করে হোমে ডেকে আনা হয় তাকে। সেই তার শেষ যাওয়া। তার মত লোককে ফিরতে দেবে না ওরা।

ওদের জায়গায় আসবে রেজারের মত অর্থ পিশাচ, ফস্টারের মত মদগর্বী গোঁয়ার লোক। এখানের ঠিক ওই শ্রেণীর সঙ্গে যারা আপোষ করতে পারবে।

—জবাব কেন দেয় না বলতে পারো? আমি তো তার কাছে কিছু চাই নি। শুধু দুটো লাইন সে লিখতে পারে না?

বসন্ত ওর ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে সচকিত হয়ে ওঠে। সৌরভী বলে,

—আর একখানা চিঠি লেখো। বেঁচে সে আছেই। এই তো সেদিনের কথা, মরবে না সে।

বসন্ত ঘাড় নাড়ে।

সৌরভী চোখ মুছে উঠে গেল।

আর কাঁদে গৌরী! বসন্তের কানে আসে বৌটাকে পিটছে কেষ্ট।

বেদম। গর্জন কানে আসে।

—শালী সতী হইছে। বাঁজা মাগীটো কুথাকার। ঘরে লোকজন আপোষ বন্ধু এল তো অমনি তেরি মেরি। বলি কুন নাগর আছে তোর? কার কথায় তুই উঠিস বসিস? কি দেয় তোকে? কত টাকা? কেতনা রূপেয়া? নিকালো আভি!

ক্ষেপে উঠেছে কেষ্ট; উদ্দাম চিৎকার, জুড়েছে। কাঁদছে গৌরী।

নীরব জমাট অন্ধকারের বুকে ওর চাপা কান্না দীর্ঘ করুণ দীর্ঘতান সুর তুলেছে। বসন্ত শুনছে দেখছে, দেখছে চিনতোড়ের রাত নিশীথের জীবন। আশা নিরাশা ব্যর্থতা আর করুণ কান্না জড়ানো একটি জগৎ।

আলো জলছে দূরে। নীলাভ মার্কারি ভেপারের বাতি। জেগে আছে ক্ষুব্ধ গর্জন-মুখর দামোদর।

স্বপ্ন নয়—সত্যিই। সামনে দেখছে পরমেশ্বরী প্রসাদ লালা কোলিয়ারি রেজিং ঠিকে পাচ্ছে সে। টন পিছু একটা কমিশন থাকবে, তার তাঁবে থাকবে অনেক মালকাটা। ফস্টার এক কথায় রাজি, বিনিময়ে কিছু দিতে হবে তাকে অংশ। ব্লেজারকে মত করানো একটু মুস্কিল। তাও ফস্টার মিসেস ব্লেজারকে চাপ দিয়ে করাবে।

নোতুন অপিস ঘর করছে লালাজী, কথাটা এখনও ভাঙ্গেনি, তবে পাঁচু এক আধটু জানে।

জগদ্ধাত্রীকে কি শুভক্ষণে দেশ থেকে এনে ফেলেছিল জানে না পাঁচু। বোধ হয় অমৃতযোগ ছিল সময়টা। সেই মোটা জগদ্ধাত্রীকে দেখলে আর চেনা যায় না। জেল্লা ফিরেছে। চোখে মুখে তার কথা; শাড়ি, হাই হিল জুতো পরে সিনেমায় যায়, যাত্রার আসরে বসে প্রথম সারিতে; বাবুদের বৌ-ঝিরা ওকে দেখে গা টেপাটেপি করে, তাতে জগদ্ধাত্রীর কিছু আসে যায় না। ওদের হাঁড়ির খবর জানে।

লালাজীর গদিতে কার গহনা, কি কি বন্ধক আছে, মাসকাবারি কত দেনা তা জানে। ওদের বাইরে কোঁচার পত্তন, ঘরে ছুঁচোর কেত্তন।

সব জানে জগদ্ধাত্রী; কোন বৌ-এর কি কাণ্ড খিটকেলী, কার মেয়ের কোন ছেলের সঙ্গে ঢলাঢলি তা অজানা নয়। একা তারই দোষ?

পাঁচু যাত্রার আসর দেখাশোনা করে; লালাজী, নারকুলিয়া সাহেব অন্যান্য কার পাশে বসে হাসছে। ফস্টার বুঁদ হয়ে রয়েছে নেশায়। পুরো দমে যাত্রা চলেছে।

কালো সুন্দর মিষ্টি চেহারার মেয়েটা বেবশ হয়ে যেন রামের পার্ট দেখছে।

কেষ্ট মিস্ত্রীর বৌ গৌরী। জগদ্ধাত্রী ওর চোখ-মুখের চেহারা দেখে হাসে।

—এ্যাই ছুঁড়ি, মাথায় কাপড়টা দে? বেহুঁস হয়ে গেছিস নাকি? গৌরী চমকে ওঠে।

কি যেন স্বপ্ন দেখছিল এতক্ষণ। ভক্তি রামের পার্ট করছে। কচি কচি চেহারা; সীতাও সেজেছে সুন্দর। রামের দিকে চেয়ে গৌরী সব ভুলে গিয়েছিল।

সীতার জন্য কাঁদছে। স্ত্রীর বিরহে পুরুষও কাঁদে। সবাই কেষ্টর মত জানোয়ার নয়। মনটা কেমন করে ওঠে।

হঠাৎ জগদ্ধাত্রীর ঠোঁটের মুচকি হাসির শব্দে সচকিত হয়ে কাপড় ঠিক করে গৌরী বসল।

সৌরভী চেয়ে দেখছে জগদ্ধাত্রীকে। যাত্রার আসরে যেন মহারাণীর মত বসেছে ও। পাঁচু নিকিরির বৌ; এত ভালো কাপড় ও গয়না পরে বসেছে। কৌটায় এনেছে পান। মাঝে মাঝে একে ওকে দিচ্ছে। সৌরভীরও ওর চেয়ে গৌরবের দিন ছিল ম্যানেজারের বাংলোয় কাটিয়েছে কালা মেমসাব হয়ে। মোটর হাঁকাতো।

জগদ্ধাত্রী হাতের মোটা অনন্ত জোড়াটা বের করে রেখেছে, গলা আলগা। মোটা হার ছড়াটা যেন সহজেই নজরে পড়ে। সৌরভীর দিকে পান এগিয়ে দেয়।

—নাও গো।

সৌরভী গৌরীর দিকে চেয়ে রয়েছে। ভয়ে লক্ষ্মী মেয়েটা জড়সড় হয়ে কোণে ঠেকেছে।

সৌরভী বলে ওঠে—না ভাই পান আমি খাই না। আর এত লোকজন রয়েছে, বুকটা হাতগুলোন ঢাকো; গয়না তোমার আছে তা সবাই জানে। একটু সভ্য হয়ে বসো! আমরা না হয় এমনি! তুমিও কি—

গৌরী ফিক্ করে হেসে ফেলে। জগদ্ধাত্রী বোমা ফাটার মত ফেটে ওঠে,

—তোমার এত হিংসা কেনে? আমার আছে তাই পরি? বেশ করি।

যাত্রার ফাঁকা আসরেই সৌরভী নাক দুলিয়ে জবাব দেয়,

ভাতারের চাকরি চৌকিদারী
তায় রেখেচে মোচ্
সেই গরবে বৌ-এর গরব
ঘরে দেয় না ছোঁচ॥

—তুই থামলো সতী; কেন আসরের মাঝে হাঁড়ি ভাঙবো। চুপ কর।

পাঁচু গতিক দেখে সরে পড়েছে। এ সময় উপস্থিত থেকে কিছু না বললে জগদ্ধাত্রী ঘরে ফিরে তাকে ঝাঁটাপেটা করবে। সরে যাওয়াই নিরাপদ।

ফচকে ছোঁড়া কে বলে ওঠে—সখীর নাচ না কি গো?

কে জোর গলায় বলে ওঠে—ঘুরে ফিরে ভাই।

কলরব, হট্টগোল—গৌরী ভয়ে এতটুকু হয়ে যায়। সৌরভী পাশকরা

ঝগড়াটে, কোলিয়ারির নম্বরী প্রাণী। ভয়েই বোধহয় জগদ্ধাত্রী রণে ভঙ্গ দিল।

আবার ঐক্যতান বাদন শুরু হয়।

বসন্ত একদিকে বসে ছিল। মালুও। দুজনে হেসে ফেলে। লালাজী, শরণ সিং অকারণে গম্ভীর হয়ে যায়। জোরে ঢোল বাজছে আসরে।

লালাজী কনট্রাক্ট নিলে শরণ সিংও দলে থাকবে। পাঁচু আগে থেকেই লালাজীর বাহন হয়ে পড়েছে। হঠাৎ হাটের মধ্যে সৌরভীর জগদ্ধাত্রীকে উপলক্ষ্য করে এই কাণ্ডটা কেমন যেন লালাজীর মন মেজাজ বিগড়ে দিয়েছে। ফস্টার এই সময় উঠে চলে গেল। সৌরভী তার চেয়ারের সামনেই দাঁড়িয়ে হাত মুখ নেড়ে নাচ শুরু করেছিল।

কাণ্ডটা এ অঞ্চলের অস্বাভাবিক কিছু নয়, এমন ঘটনা ঘটেও। তবে এই নিয়ে প্রকাশ্যে কেউ বলা কওয়া করে না। সৌরভী সেই দুঃসাহসিক কায করেছে।

গৌরী আবার যাত্রা শোনে। রাম, লক্ষ্মণ আর লবকুশের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, চিনতোড়ের নোংরা পরিবেশে সে নেই। স্বপ্ন দেখা কোন অন্য জগতে হাজির হয়েছে সে। রামের পরিষ্কার কণ্ঠের কথাগুলো এক একটা করুণ সুরের মূর্চ্ছনার মত তার মনে রেশ তুলেছে।

কারা কারা হেসেছে, তাও দেখে নিয়েছে লালা।

জগদ্ধাত্রী মুখ হাঁড়ি করে আসর থেকে তখুনি উঠে গেছে। পিছু পিছু লালাজীও যায় ওকে ফিরিয়ে আনবার জন্য। একা জগদ্ধাত্রীর জন্যই যাত্রার ব্যাপারে পঁচিশ টাকা চাঁদা দিয়েছে। জগদ্ধাত্রী তার টাটের লক্ষ্মী, কারবারের পত্তন বদলে দিয়েছে।

কিন্তু তার মুখে ঝামা ঘসে দিয়েছে ওই স্বৈরিণী। হনহন করে আসছে জগদ্ধাত্রী আসর থেকে বের হয়ে। নির্জন পথ, আলোগুলো জ্বলছে দূরে দূরে। আসরের বক্তৃতার শব্দ একটু অস্পষ্ট শোনা যায়। লালাজী ওর হাতটা ধরে ফেলে—রাগ করলে নাকি?

জগদ্ধাত্রী বলে ওঠে—ও আসরে যদি যাই তবে আমার পাঁচটা বাবা।

হঠাৎ জগদ্ধাত্রীর ঠোঁটের মুচকি হাসির শব্দে সচকিত হয়ে কাপড় ঠিক করে গৌরী বসল।

সৌরভী চেয়ে দেখছে জগদ্ধাত্রীকে। যাত্রার আসরে যেন মহারাণীর মত বসেছে ও। পাঁচু নিকিরির বৌ; এত ভালো কাপড় ও গয়না পরে বসেছে। কৌটায় এনেছে পান। মাঝে মাঝে একে ওকে দিচ্ছে। সৌরভীরও ওর চেয়ে গৌরবের দিন ছিল ম্যানেজারের বাংলোয় কাটিয়েছে কালা মেমসাব হয়ে। মোটর হাঁকাতো।

জগদ্ধাত্রী হাতের মোটা অনন্ত জোড়াটা বের করে রেখেছে, গলা আলগা। মোটা হার ছড়াটা যেন সহজেই নজরে পড়ে। সৌরভীর দিকে পান এগিয়ে দেয়।

—নাও গো।

সৌরভী গৌরীর দিকে চেয়ে রয়েছে। ভয়ে লক্ষ্মী মেয়েটা জড়সড় হয়ে কোণে ঠেকেছে।

সৌরভী বলে ওঠে—না ভাই পান আমি খাই না। আর এত লোকজন রয়েছে, বুকটা হাতগুলোন ঢাকো; গয়না তোমার আছে তা সবাই জানে। একটু সভ্য হয়ে বসো! আমরা না হয় এমনি! তুমিও কি—

গৌরী ফিক্ করে হেসে ফেলে। জগদ্ধাত্রী বোমা ফাটার মত ফেটে ওঠে,

—তোমার এত হিংসা কেনে? আমার আছে তাই পরি? বেশ করি।

যাত্রার ফাঁকা আসরেই সৌরভী নাক তুলিয়ে জবাব দেয়,

ভাতারের চাকরি চৌকিদারী
তায় রেখেচে মোচ্
সেই গরবে বৌ-এর গরব
ঘরে দেয় না ছোঁচ॥

—তুই থামলো সতী; কেন আসরের মাঝে হাঁড়ি ভাঙ্গবো। চুপ কর।

পাঁচু গতিক দেখে সরে পড়েছে। এ সময় উপস্থিত থেকে কিছু না বললে জগদ্ধাত্রী ঘরে ফিরে তাকে ঝাঁটাপেটা করবে। সরে যাওয়াই নিরাপদ।

ফচকে ছোঁড়া কে বলে ওঠে—সখীর নাচ না কি গো?

কে জোর গলায় বলে ওঠে—ঘুরে ফিরে ভাই।

কলরব, হট্টগোল—গৌরী ভয়ে এতটুকু হয়ে যায়। সৌরভী পাশকরা

ঝগড়াটে, কোলিয়ারির নম্বরী প্রাণী। ভয়েই বোধহয় জগদ্ধাত্রী রণে ভঙ্গ দিল।

আবার ঐক্যতান বাদন শুরু হয়।

বসন্ত একদিকে বসে ছিল। মালুও। দুজনে হেসে ফেলে। লালাজী, শরণ সিং অকারণে গম্ভীর হয়ে যায়। জোরে ঢোল বাজছে আসরে।

লালাজী কনট্রাক্ট নিলে শরণ সিংও দলে থাকবে। পাঁচু আগে থেকেই লালাজীর বাহন হয়ে পড়েছে। হঠাৎ হাটের মধ্যে সৌরভীর জগদ্ধাত্রীকে উপলক্ষ্য করে এই কাণ্ডটা কেমন যেন লালাজীর মন মেজাজ বিগড়ে দিয়েছে। ফস্টার এই সময় উঠে চলে গেল। সৌরভী তার চেয়ারের সামনেই দাঁড়িয়ে হাত মুখ নেড়ে নাচ শুরু করেছিল।

কাণ্ডটা এ অঞ্চলের অস্বাভাবিক কিছু নয়, এমন ঘটনা ঘটেও। তবে এই নিয়ে প্রকাশ্যে কেউ বলা কওয়া করে না। সৌরভী সেই দুঃসাহসিক কায করেছে।

গৌরী আবার যাত্রা শোনে। রাম, লক্ষ্মণ আর লবকুশের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, চিনতোড়ের নোংরা পরিবেশে সে নেই। স্বপ্ন দেখা কোন অন্য জগতে হাজির হয়েছে সে। রামের পরিষ্কার কণ্ঠের কথাগুলো এক একটা করুণ সুরের মূর্চ্ছনার মত তার মনে রেশ তুলেছে।

কারা কারা হেসেছে, তাও দেখে নিয়েছে লালা।

জগদ্ধাত্রী মুখ হাঁড়ি করে আসর থেকে তখুনি উঠে গেছে। পিছু পিছু লালাজীও যায় ওকে ফিরিয়ে আনবার জন্য। একা জগদ্ধাত্রীর জন্যই যাত্রার ব্যাপারে পঁচিশ টাকা চাঁদা দিয়েছে। জগদ্ধাত্রী তার টাটের লক্ষ্মী, কারবারের পত্তন বদলে দিয়েছে।

কিন্তু তার মুখে ঝামা ঘসে দিয়েছে ওই স্বৈরিণী। হনহন করে আসছে জগদ্ধাত্রী আসর থেকে বের হয়ে। নির্জন পথ, আলোগুলো জ্বলছে দূরে দূরে। আসরের বক্তৃতার শব্দ একটু অস্পষ্ট শোনা যায়। লালাজী ওর হাতটা ধরে ফেলে—রাগ করলে নাকি?

জগদ্ধাত্রী বলে ওঠে—ও আসরে যদি যাই তবে আমার পাঁচটা বাবা।

লালাজী জিব কাটে—আরে রাম রাম। হমরা সাথ চলো ?

—না, ওরা এইবার জুতো মেরে বসবে। তোমার খাতির কত বোঝা গেছে। জগদ্ধাত্রী সাফ জবাব দেয়।

—ক্যা। দপ্ করে জ্বলে উঠে লালা।

ওই মালকাটাদের অধিকাংশই তার দোকানে দেনদার। এক সপ্তাহ বাকি বন্ধ করে দিলে বাছাধনরা টুসকে যাবে। লালাজীকে অপমান করতে সাহস করে তারা!

ওদের বিদ্রূপ হাসির তীক্ষ্ণ শব্দ তখনও কানে আসে লালার। চুপ করে কি ভাবছে দাঁড়িয়ে।

জগদ্ধাত্রী হনহন করে চলে গেল, লালাজীর ডাকে ফিরলো না।

গুম হয়ে কি ভাবতে ভাবতে লালাজী ফিরে এসে আসরে বসল। হনুমানজীর বক্তৃতা লম্ফ ঝম্প চলেছে পুরোদমে। অন্য সময় হাত উঠিয়ে ঘন ঘন প্রণাম করতো লালাজী। আজ তাও ভুলে গেছে। সামনে পিছনে চারিপাশে বসা দাঁড়ান মালকাটাদের দিকে চেয়ে কি যেন খুঁজছে। হঠাৎ নজর পড়ে বসন্তের দিকে।

একদল ওরা বসে হাসাহাসি করছে। নারকুলিয়া আর লালাজীর দিকে চেয়ে কি যেন বলাবলি করছে ওরা। নারকুলিয়াও বুঝতে পেরেছে, লালাজীও।

লালাজীর কোলিয়ারি অপিসে অবারিত দ্বার। কর্মচারীদের অনেকেই লালার খাতক, 'হবু রেজিং ঠিকেদার', সুতরাং লালা একটু মর্যাদাই পাবার আশা রাখে।

শনিবার হপ্তার দিন ; পরদিন বন্ধ। অর্থাৎ আজকের পাওয়া টাকাটার বেশির ভাগই দেনা মিটিয়ে এটা সেটা কিনেও যা অবশিষ্ট থাকে, রাত্রেই সেটুকু ইয়াকুব সাহেবের গদিতে দিয়ে বেঘোর অবস্থায় এখানে ওখানে আছাড় খেয়ে ধাওড়ায় পৌঁছে কালকের দিনটা খোয়াড়ি ভেঙে কাটাবে। যেদিনই হপ্তা হোক না কেন, তার পর দিন তাদের কাযে আসবার মত ক্ষমতা থাকবে না। কর্তৃপক্ষ তাই শনিবারই হপ্তার মাইনে মিটিয়ে দেয়। রবিবার ছুটি। সোমবার থেকে আবার ধার করে, টাকায় ছ'দিনে দু আনা সুদ।

শনিবার দুপুর থেকেই কোলিয়ারির গেটের বাইরে বসেছে ফেরিওয়ালার দল কাটা কাপড়, রং বেরং-এর জামা, পেনি ফ্রক, কাঁচের চুড়ি, পুঁথির মালা, আয়না, নেবু, তেল, মনোহারী জিনিস-এর পসরা নিয়ে; সুটকি মাছ, এটা সেটার বিক্রেতা। ধাওড়া থেকে বৌ মেয়েছেলেরাও আসে প্রথম চোটেই বাপ, দাদা, স্বামীর হাত থেকে যেটুকু পারে ছিনিয়ে নিতে। ওরা বের হয়ে গেলে পাই পয়সাও আর ফিরবে না, সব খরচ করে শূন্য হাতে ফিরবে।

আর এসেছে লালাজী। পে অপিসের জানলার পাশেই বারান্দায় একটা টুল নিয়ে কামড়ে বসেছে। একটা লাল খেরো বাঁধানো লম্বা খাতায় ইকড়ি মিকড়ি ভাষায় হিসেব লেখা, এক একজনের নামের পাশে।

হপ্তার টাকাটা নিয়ে জানলা থেকে আসবার আগেই লালাজী বিড়ালের ইন্দুর ধরার মত নিপুণ তির্যক গতিতে খপ্ করে হাতের মুঠোটা থ্যাবড়া হাতে চেপে ধরে টান দেয়।

—সতের রূপেয়া তিন আনা এক পয়সা। আভি লাও পুরা।

লালাজীর কণ্ঠস্বরে কাঠিন্য। জগদ্ধাত্রী অপিসে আসেনি, তাহলে কাল রাত্রিতে ওদের হাসি টিটকারি দেওয়া মুখ কেমন তামাটে কাঁদ কাঁদ হয়ে যায় লালাজীর ধমকে ঠিক বুঝতে পেরে শান্তি পেতো।

—পায়ে ধরি লালাজী, মাগ ছেলে লিয়ে উপোস দিতে হবে। মাইরী!

কাকুতি মিনতি করে লোকটা, গর্জন শোনা যায়।

—হম্ কি করবে। লাও পুরা রূপেয়া।

জোর করে দুমড়ে মুচড়ে কেড়ে নিল তার হাত থেকে।

বিবর্ণ লোকটা দাঁড়িয়ে থাকে। সামনে বিরাট গহ্বর যেন হাঁ করে আছে। সাতদিনের উপবাস আর হতাশাভরা দিনগুলো মনে হয় দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত। পার হয়ে সামনের হপ্তা পাবার কল্পনা আসে না।

আর একজনকে ধরেছে লালাজী,—এ্যাই শূয়ার কা বাচ্চা।

—আসছে হপ্তাহে দোব, মা কালীর দিব্যি লালাজী। ছেলেটোর অসুখ; ওষুধ পথ্য পাবে না। নিজের জর, মোট তিন দিনের মাইনে পেছি। লটপট করছিলাম জরে।

লালাজীর মন টলে না; লোকটার হাত ছেড়ে ঘাড় ধরেছে।

অসুস্থ দুর্বল শরীর ধাক্কায় ছিটকে বারান্দা থেকে গড়িয়ে পড়ে দাওয়ার নীচের মাটিতে।

—জল!

কদিন জ্বরেই হোক, দুর্বলতার জন্যই হোক লোকটা কেমন অচৈতন্য হয়ে যায়। কে ছোটে জল আনতে, কেউ তুলে ধরে তাকে। ইতিমধ্যে লালাজীর ট্যাঁকে ওর হাতের টাকা কটা ঢুকে গেছে। লালাজী পরবর্তী খদ্দেরের পিছনে লেগেছে।

—ন রূপেয়া ছ'আনা।

একটা গুঞ্জরণ ওঠে, দলবদ্ধ মালকাটার দল হঠাৎ যেন চটে উঠেছে লালাজীর এই ব্যবহারে। লোকটা ভিজে জলমাথায় উঠে বসে কপাল চাপড়াচ্ছে।

যাদের হাত থেকে লালাজী কেড়ে নিয়েছে সংখ্যায় তারাও কম নয়; মৃদু প্রতিবাদ ক্রমশ গাঢ় হতে থাকে।

—মারবেক, খুন করে ফেলাবেক নাকি?

—ইয়ার বিচার চাই। ইখানে যমের মত বসবার উ কে?

—ডাক ম্যানেজারকে।

লালাজী নির্বিকার; ভিড়ের মধ্য থেকে মাখন, যদু মাহাতো, বসন্ত এগিয়ে আসে।

বসন্তই বলে ওঠে,—ক্যা হোতা হ্যায়? এ জুলুমবাজী এখানে কেন? বাকি পাও অন্য জায়গায় ধরে আদায় করে নাও। অপিসের মধ্যে কেন?

—হঠাও উসকো।

ওর কথায় ভিড়ের মধ্যে একটা গুঞ্জরণ ওঠে। এতদিনের অত্যাচার ওরা সহ্য করেছে। মনে মনে জমেছিল প্রতিবাদ। লালার হিসাবও কেউ দেখে না। জিনিস যা আনে তার কি দাম, কত হয়েছে, লালা যা বলে তাই সই। একগুণ দিয়ে দ্বিগুণ লিখলেও কথা বলার উপায় নাই।

হাঁকিয়ে দেবে—দুসরা জায়গামে উঠনা লেও গে।

অন্য কোথায় বাকি দেবে তাদের!

—ক্যা? ক্যা বোলতা হ্যায় তুম?

লালা ওর কথা শুনে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। এতদিন ধরে এই ভাবেই

চালিয়ে আসছে সে। এর জন্য ম্যানেজার থেকে শুরু করে মালবাবু, ক্যাশ-বাবুকে পর্যন্ত ভেট দেয়। তারপর এই কথা! বেশ রসিয়েই বলে ওঠে লালাজী,

—কেন? তুমার কি হোয়েসে! আমার টাকা আমি লেবে, ব্যস সিধা কথা।

—এখানে কেড়ে নিতে পারবে না, অপিসের মধ্যে বিনা পাসে ঢুকে জুলুম করছো কেন?

এই সহজ দাবীটা মালকাটারাও যেন হঠাৎ বুঝে ফেলে। যে লোকটার হাত ধরেছিল সেও এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সরে দাঁড়াতেই লালা ওর চুলের মুঠিটা ধরে।

—ফের! গর্জন করে ওঠে লোকটা।

বারুদের স্তূপে আগুন লেগেছে। একটি মুহূর্ত। যাদের টাকা পয়সা কেড়ে নিয়েছিল তারাও লাফ দিয়ে পড়ে। এই চরম সুযোগ নিতে কেউ ছাড়ে না।

—ই ক্যা হোতা হায়। এ সিপাহী লোগ্। লালা চিৎকার করছে।

একটা ধ্বস্তাধস্তি বেধে যায়। লালা ছিটকে পড়ে টুল থেকে। তার চাপা আর্তনাদ ওদের কলরবে ঢাকা পড়ে যায়, ক্যাশবাবু দরজা জানলা বন্ধ ক'রে হৈ চৈ শুরু করেছে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই সব ফাঁকা। কেউ কোথাও নেই, একা লালা বারান্দায় বসে কপাল চাপড়াচ্ছে; টাকার থলিয়া ছিঁড়ে পড়ে আছে একদিকে, এদিক ওদিকে ছড়ানো দু একটা আনি পয়সা, বাকি টাকাকড়ি কিছুই নেই।

দ্বারোয়ান, ওয়াচ ওয়ার্ডের লোকজন গোলমাল থামলে ছুটে আসে। শতকণ্ঠে কৌতূহলী প্রশ্ন—ক্যা হুয়া এ লালাজী?

লালা টাক চাপড়াচ্ছে—সত্যনাশ হোগিয়া, হায় রাম।

ফস্টারও নিজে এসে জোটে, ব্রেজার ছিলো বাতিঘরে; গোলমাল শুনে সাহেবও এসে পড়ে, লালাজী আছাড় বিছাড়ি খায় সাহেবের জুতোর ওপর, মোটা তাকিয়ার মত পেটটা বের হয়ে পড়েছে।

—পাঁনশো রূপেয়া লুট হোগিয়া সাব। জান চলা যাতা হায়। ডাকু-খুনী লোক সব। বাবারে।

—কারা ছিল?

—মালকাটার দল। শালা লোগ্‌—

—দেখলে চিনতে পারবে? ফস্টার কঠিন স্বরে বলে ওঠে।

—এই হাটের মাঝে বললে আস্ত রাখবে না বাবা, সব এক কাট্টা হোয়েসে। লুট করবে ইবার। মকাম লুট লেগা।

ব্লেজার চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, কাযটা প্রথমতই বেআইনি হয়েছে ওকে ঢুকতে দেওয়া; লুট করবার সুযোগ ওরা নিয়েছে। সাক্ষী সাবুদ কিছুই পাওয়া যাবে না।

ফস্টার গর্জন করে—এক একটাকে ধরে চাবকাতে হয়। কে কে ছিল? প্রথম কে কথা বলেছিল তোমার সাথে?

—নোতুন একজন মালকাটা; একটু থেমে হিসাব করে বলে লালাজী, —ঠিক চিনি না হামি তাকে। নোতুন আদমী!

চমকে ওঠে ফস্টার। বসন্তই! সে ছাড়া আর কেউ প্রতিবাদ করেনি এতদিন।

—বাঙালী?

ঘাড় নাড়ে লালা, দুচোখে জল ঝরছে। হাপুস কাঁদছে সে পাঁচশো টাকার জন্যে। যেন সর্বনাশ হয়ে গেছে তার।

—টেল হিম টু গো। ব্লেজার বিরক্ত হয়ে উঠেছে। নিস্ফল এ প্রচেষ্টা, কোন প্রতিকার এ ভাবে করা সম্ভব নয়।

লালা শাসায়—পুলিশমে ডায়েরি করে গা সাহেব। এমনি ছেড়ে দোব না! কভি নেহি।

ব্লেজার ওর কিম্ভূতকিমাকার কাপড়খসা দেহটার দিকে চেয়ে থাকে। মনে মনে ফুঁসছে ফস্টার। এজেন্ট সাহেব না থাকলে এখুনিই ধাওড়ায় গিয়ে এক একটাকে টেনে বের করে কুকুরের মত চাবকাতো। হুকুম দিচ্ছে ক্যাশ অফিসকে ফস্টার,

—যারা মাইনে নিয়েছে তাদের সকলকেই ফাইন করে ওর টাকা পুজিয়ে দেওয়া উচিত।

ফস্টার লালাকে ফেলতে পারে না। ব্লেজারের দিকে চোখ পড়তেই থেমে গেল ফস্টার। এজেন্ট সাহেবের চোখে বিরক্তির চিহ্ন। পাইপটা তুলে ঝাড়তে ঝাড়তে বলে ব্লেজার,

—নো লুজ টক্‌স ফস্টার। কাম টু মাই অপিস।

লালাজী অসহায়ের মত চেয়ে থাকে ব্লেজারের দিকে।

ঝড়ের মেঘ উঠছে। এ ঝড় আসবে তা জানতো ব্লেজার। এতদিন ওরা সয়ে এসেছে। কিন্তু চিরকাল তা চলবে না। শিখা জ্বলেছে, ওরা শুধু উস্‌কে দেবে যাতে তাদের চলে যাবার পর যারা আসবে এই ব্যবসায়ে, তারা যেন দ্বিগুণ মুনাফা করতে না পারে। পদে পদে, বিপদ বাধা আর ওই আন্দোলন ঠেলে এগোতে হবে তাদের। মিঃ ব্লেজার সেই চতুর বৃটিশদেরই একজন। বলে ওঠে,

—ওদের মাঝে দুর্নীতি, অবিশ্বাস, লোভ আর আন্দোলন পুষে রাখতে হবে ফস্টার। আওয়ার ডেজ আর নাম্বারড। পরে ভারতের নৈতিক চরিত্র, মর‍্যালিটি, যার জন্য তাদের গর্ব, যা তাদের একমাত্র পুঁজি, সেইটিই নিঃশেষে যাতে তারা হারিয়ে ফেলে তাই করে যাবো আমরা।

ফস্টার ঠিক বুঝতে পারে না কথাগুলো; সে জানে শাসন আর শোষণ। তার বেশি কিছু জানা নেই। তাই হয়তো সে মাত্র ম্যানেজার, আর মিঃ ব্লেজার এজেণ্ট, লাখোপতি। ব্লেজার বলে চলে,

—কিছু খরচ বাড়বে আমাদের, কিন্তু ভবিষ্যতে এই খরচ, দাবী ওরা আরও বাড়াতে চাইবে। মালিকের সঙ্গে সেই বিবাদ কোনদিনই মিটবে না।

ফস্টার বলে ওঠে—তাহলে কায চলবে কি করে?

হা হা শব্দে হাসতে থাকে ব্লেজার—সে তারা ভাবুক। নোতুন মালিকরা। ইউ উইল নট বি হিয়ার। উই কুইট ইণ্ডিয়া।

ব্লেজার হাসছে। ওর ভাবনা নেই। প্রভূত সঞ্চয় করেছে সে। আর ফস্টার! যা রোজকার তা মদ আর আনুসঙ্গিকেই যাচ্ছে। লালার কাছে কত নিয়েছে কে জানে। দেশে গেলে এই পেন্সনে উপোস দিতে হবে এক বেলা; এখানে চাকরের ছড়াছড়ি, সাজানো বাংলো, গাড়ি, পয়সা, প্রতিপত্তি। সেখানে? কেউ পুছবে না তাকে। কেরানীগিরির সন্ধান করতে হবে পথে পথে। হতাশা ফুটে ওঠে ফস্টারের স্বরে—এ্যাণ্ড উই স্টার্ভ দেয়ার?

এর জবাব ব্লেজার দিতে পারে না। বড় কঠিন সনাতন প্রশ্ন।

ঘটনাটা এতখানি গড়াবে তা স্বপ্নেও ভাবেনি। ইতিহাসে এমন ঘটেনি চিনতোড়ের। এ যেন বিক্ষোভের পূর্বাভাষ। কিছু বদলোক আছে সত্যি

—মালকাটার দল। শালা লোগ্—

—দেখলে চিনতে পারবে? ফস্টার কঠিন স্বরে বলে ওঠে।

—এই হাটের মাঝে বললে আস্ত রাখবে না বাবা, সব এক কাট্টা হোয়েসে। লুট করবে ইবার। মকাম লুট লেগা।

ব্লেজার চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, কাযটা প্রথমতই বেআইনি হয়েছে ওকে ঢুকতে দেওয়া; লুট করবার সুযোগ ওরা নিয়েছে। সাক্ষী সাবুদ কিছুই পাওয়া যাবে না।

ফস্টার গর্জন করে—এক একটাকে ধরে চাবকাতে হয়। কে কে ছিল? প্রথম কে কথা বলেছিল তোমার সাথে?

—নোতুন একজন মালকাটা; একটু থেমে হিসাব করে বলে লালাজী, —ঠিক চিনি না হামি তাকে। নোতুন আদমী!

চমকে ওঠে ফস্টার। বসন্তই! সে ছাড়া আর কেউ প্রতিবাদ করেনি এতদিন।

—বাঙ্গালী?

ঘাড় নাড়ে লালা, দুচোখে জল ঝরছে। হাপুস কাঁদছে সে পাঁচশো টাকার জন্যে। যেন সর্বনাশ হয়ে গেছে তার।

—টেল হিম টু গো। ব্লেজার বিরক্ত হয়ে উঠেছে। নিস্ফল এ প্রচেষ্টা, কোন প্রতিকার এ ভাবে করা সম্ভব নয়।

লালা শাসায়—পুলিশমে ডায়েরি করে গা সাহেব। এমনি ছেড়ে দোব না! কভি নেহি।

ব্লেজার ওর কিম্ভূতকিমাকার কাপড়খসা দেহটার দিকে চেয়ে থাকে। মনে মনে ফুঁসছে ফস্টার। এজেন্ট সাহেব না থাকলে এখুনিই ধাওড়ায় গিয়ে এক একটাকে টেনে বের করে কুকুরের মত চাবকাতো। হুকুম দিচ্ছে ক্যাশ অফিসকে ফস্টার,

—যারা মাইনে নিয়েছে তাদের সকলকেই ফাইন করে ওর টাকা পুজিয়ে দেওয়া উচিত।

ফস্টার লালাকে ফেলতে পারে না। ব্লেজারের দিকে চোখ পড়তেই থেমে গেল ফস্টার। এজেন্ট সাহেবের চোখে বিরক্তির চিহ্ন। পাইপটা তুলে ঝাড়তে ঝাড়তে বলে ব্লেজার,

—নো লুজ টক্‌স ফস্টার। কাম টু মাই অপিস।

লালাজী অসহায়ের মত চেয়ে থাকে ব্লেজারের দিকে।

ঝড়ের মেঘ উঠছে। এ ঝড় আসবে তা জানতো ব্লেজার। এতদিন ওরা সয়ে এসেছে। কিন্তু চিরকাল তা চলবে না। শিখা জ্বলেছে, ওরা শুধু উস্‌কে দেবে যাতে তাদের চলে যাবার পর যারা আসবে এই ব্যবসায়ে, তারা যেন দ্বিগুণ মুনাফা করতে না পারে। পদে পদে, বিপদ বাধা আর ওই আন্দোলন ঠেলে এগোতে হবে তাদের। মিঃ ব্লেজার সেই চতুর বৃটিশদেরই একজন। বলে ওঠে,

—ওদের মাঝে দুর্নীতি, অবিশ্বাস, লোভ আর আন্দোলন পুষে রাখতে হবে ফস্টার। আওয়ার ডেজ আর নাম্বারড। পরে ভারতের নৈতিক চরিত্র, মর‍্যালিটি, যার জন্য তাদের গর্ব, যা তাদের একমাত্র পুঁজি, সেইটিই নিঃশেষে যাতে তারা হারিয়ে ফেলে তাই করে যাবো আমরা।

ফস্টার ঠিক বুঝতে পারে না কথাগুলো; সে জানে শাসন আর শোষণ। তার বেশি কিছু জানা নেই। তাই হয়তো সে মাত্র ম্যানেজার, আর মিঃ ব্লেজার এজেন্ট, লাখোপতি। ব্লেজার বলে চলে,

—কিছু খরচ বাড়বে আমাদের, কিন্তু ভবিষ্যতে এই খরচ, দাবী ওরা আরও বাড়াতে চাইবে। মালিকের সঙ্গে সেই বিবাদ কোনদিনই মিটবে না।

ফস্টার বলে ওঠে—তাহলে কায চলবে কি করে?

হা হা শব্দে হাসতে থাকে ব্লেজার—সে তারা ভাবুক। নোতুন মালিকরা। ইউ উইল নট বি হিয়ার। উই কুইট ইণ্ডিয়া।

ব্লেজার হাসছে। ওর ভাবনা নেই। প্রভূত সঞ্চয় করেছে সে। আর ফস্টার! যা রোজকার তা মদ আর আনুসঙ্গিকেই যাচ্ছে। লালার কাছে কত নিয়েছে কে জানে। দেশে গেলে এই পেন্সনে উপোস দিতে হবে এক বেলা; এখানে চাকরের ছড়াছড়ি, সাজানো বাংলো, গাড়ি, পয়সা, প্রতিপত্তি। সেখানে? কেউ পুছবে না তাকে। কেরানীগিরির সন্ধান করতে হবে পথে পথে। হতাশা ফুটে ওঠে ফস্টারের স্বরে—এ্যাণ্ড উই স্টার্ভ দেয়ার?

এর জবাব ব্লেজার দিতে পারে না। বড় কঠিন সনাতন প্রশ্ন।

ঘটনাটা এতখানি গড়াবে তা স্বপ্নেও ভাবেনি। ইতিহাসে এমন ঘটেনি চিনতোড়ের। এ যেন বিক্ষোভের পূর্বাভাষ। কিছু বদলোক আছে সত্যি

কিন্তু সকলেই যে চড়াও হয়ে লালার উপর পুঞ্জীভূত আক্রোশের শোধ তুলতে এগিয়ে যাবে ভাবেনি বসন্ত।

রাস্তার নীচে এসে সেই বলে ওঠে—কেউ কোথাও জটলা করবে না। যে যার ধাওড়ায় চলে যাও।

মাখন এগিয়ে আসে—কুন সমন্ধী টুঁ টি কাড়বি না। একব্যাটা ধরা পড়লেই সকলের কোমরেই দড়ি পড়বেক।

বসন্তকে টেনে নিয়ে চলে গেল মাখন। বিড় বিড় করতে থাকে,

—ইসব ঝামেলায় কেন কথা কইতে যাও বলো দিকিন? বোলতার চাকে ঢিল পড়েছে।

বসন্ত চুপ করে নিজের ঘরে এসে ঢুকলো। মাখন বলে ওঠে—কুথাও বেরুবে না কিন্তু একলা।

—বেশ।

লালাকে চেনে সে। পুলিশে গেছে ডায়েরি করতে। অন্যপথও নেবে সে। চুপ করে এই চোরের মার সহ্য করবে না।

ঘরে ঢুকেই মালুকে দেখে অবাক হয়। এখানে সে ছুটে আসবে ভাবতেই পারেনি। খাদ থেকে উঠে হপ্তা নিতে গিয়ে গোলমাল দেখে চলে এসেছে।

—তুমি! বসন্তের কণ্ঠে রুদ্ধ বিস্ময়।

মালু হাঁপাচ্ছে—লালাজী থানা পুলিশে গেল। তোমার নাম ও জেনে ফেলেছে।

—তাই নাকি? ঠাট্টার সুর বেজে ওঠে বসন্তের কথায়।

—হাসি নয়, বার বার মানা করেছি তোমায় কায করছ কাযই করো। তা নয় যত অকাযেই তোমার আগ বাড়িয়ে যাওয়া চাই। কেন?

মালুর দুচোখে অনুরোধ আকুতির ছোঁয়া। এগিয়ে এসে ওর হাতটা ধরে বলে ওঠে ব্যাকুল স্বরে,

—কেন এমনি তুমি বলতে পারো? কারোও কথা শোন না?

চুপ করল বসন্ত, ওর হাসি থেমে গেছে। হঠাৎ পথ চলতে চলতে কি যেন দেখে থমকে দাঁড়ানো, পথিকের মত দুচোখে ওর রুদ্ধ বিস্ময়। এ অনুরোধ যেন তার বহু চেনা; বহু শোনা।

অথচ কেউই তাকে বাঁধতে পারেনি, নিজের মতেই সে চলেছে। মহা-

স্রোতের আবর্তে ভেসে চলেছে, দু পাশে তার শ্যামছায়াঘন উপবন, ফসল ফুলের সমারোহ, বাঁচবার শান্তিময় আশ্বাস, পাখির কূজনভরা শান্তিনীড়।

কিন্তু বার বারই সেই ডাক ফেলে একা ভেসে চলেছে এই আবর্তে; ঘূর্ণিপাকে ভেসে চলেছে বনগড়ানি মরা কাঠের গুঁড়ির মত। তোড়ে মুখে নাকে ঢুকেছে বালি, প্রাণঘাতী ঢেউ তুফান, দিকহারা নদী। তবু এই যাত্রাই করছে সে।

বসন্ত একটা বিড়ি ধরিয়ে বসল নিশ্চিন্ত মনে। মালুর উৎকণ্ঠা তবু বেড়ে চলে,

—কি বিপদ বাধালে দেখদিকি। কোম্পানীর সাহেবরা ওর হাতধরা। চাকরিও যাবে নির্ঘাৎ। আর কিছু না হয়। শুনছো? কথা কানে ঢুকছে?

বসন্ত একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে চলেছে। মাঝে মাঝে লালাজীর উদোম ল্যাংটো বিশাল তাকিয়ার মত গড়ানো দেহটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে; হাসছে হো হো করে। মালু আজ বদলে গেছে।

সেও রেগে ওঠে—ভাল মানুষ যা হোক? মজা টের পাবে।

বসন্তের মনে একটা কথা জেগে উঠেছে। আজ এই অতর্কিত আক্রমণ অকস্মাৎ ঘটেনি। এর প্রস্তুতি চলেছিল বহু বৎসর ধরে। ঘুমন্ত পাহাড়, বনের বুক থেকে ঝড়ের সঙ্কেত উঠেছে। পশ্চিমের কালো জমাট মেঘ ঝড়ের দূর স্পন্দনে লাল ধূলোয় ছেয়ে গেছে। থমথমে হয়ে উঠেছে মেঘকালো আকাশ।

মালু বলে ওঠে—কেন তুমি এখানে এসেছো বলতে পারো?

—চাকরি করতে। সহজভাবেই জবাব দেয় বসন্ত।

—ছাই। মালুর গায়ের কাপড় খসে গেছে। খাটো করে কপচানো চুলগুলো ওর বলিষ্ঠ সুঠাম কাঁধে পড়েছে ছোট বাবরির মত, সুন্দর একটি তরুণ কিশোরের মত লালিত্য ওর মুখে।

বলে ওঠে,—হয় নিজের পরিচয় নিজেই জানো না। না হয় চেপে যেতে চাও। আমারই মত নাম ভাঁড়িয়ে, পরিচয় ভাঁড়িয়ে এসেছো অন্য কোন মতলবে! গরীবদিকে ক্ষেপিয়ে তুলে তাদের সর্বনাশ করতে চাও। মালিকদের জাতশত্রু। প্রতিশোধ নিতে চাও তাদের উপর, এই মালকাটাদের ক্ষেপিয়ে তুলে।

চমকে ওঠে বসন্ত, কড়া বিড়ির এক গাদা ধোঁয়া গলার কাছে আটকে যায় ; কোনরকমে গোটা কতক কেসে সামলে নেয় সে। মালুর কথাগুলো সোজা তীরের মত এসে বেঁধে। নিজেকে চেপে রেখে হাসতে থাকে।

—রাজপুত্তুর, এসেছি রাজকন্যের সন্ধানে। তা দেখছি রাজকন্যে শাপে পাথর হয়ে গেছে। তাই জাগাবার চেষ্টা করছি।

খপ্ করে ওর হাতটা ধরে কাছে টেনে নেয় মালুকে।

একটি মুহূর্ত। উত্তেজনার বশে মালুকে চরম আঘাত হেনেছে কোনখানে, সেই উত্তেজনায় হাঁপিয়ে ওঠে সে। কোথায় যেন ঝড় উঠেছে। হু হু ঝড়! মালুর নরম বুক কঠিন বাঁধন ছিঁড়ে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে চায় নিজেকে। ব্যর্থ বঞ্চিত জীবনের পুঞ্জীভূত বেদনা অশ্রু হয়ে ঝরে পড়ে। বসন্তের উষ্ণ নিঃশ্বাস তার গালে। অবশ করে দেয় তাকে।

পরমুহূর্তেই সরে দাঁড়াল মালু, কঠিন কঠোর সেই স্বাতন্ত্র্যকে ফুটিয়ে তুলতে চায় সে। কিন্তু বাঁধ ভাঙ্গা জোয়ারের আঘাতে আজ সব দ্বিধা ভেসে গেছে। বসন্ত তাকে উন্মাদ করে দেবে।

প্রতিবাদ করে মালু অস্ফুট কণ্ঠে,—না—না।

সরে দাঁড়াল সে। চকিতের মধ্যে মালু বের হয়ে গেল নিজেকে সামলে নিয়ে। ভুল, একই ভুল সে বার বার করতে পারে না। ওর কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে চায়। এতদিন তার পরিচয়, নারীত্বকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে। সেই মৃত আত্মাকে আর জাগিয়ে তুলতে চায় না এই শ্মশানের চিতাভস্মের উপর। মিথ্যা অকারণে কোন সার্থকতা আর নেই।

বসন্ত চুপ করে বসে আছে। এক মুহূর্ত আগের সেই মানুষটিকে চেনে না বসন্ত, মালুর দুচোখের সন্ধানী দৃষ্টির কাছে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারে না বসন্ত ; চুপ করে ভাবতে থাকে। অসংখ্য মুখ ভেসে ওঠে, কোলিয়ারির কালিমাখা মুখ। মনের সব কালিমা ফুটে উঠেছে ওদের মুখে, চোখের তারায়।

যদু মহাতো, মদনা, ফকির, বুধন, মাখন সর্দার আর কত লোকের ভিড়। একা কারও ক্ষমতা নেই এই গলিত স্রোতকে জাগিয়ে রাখে, ঠিকপথে বইয়ে নিয়ে যায় সমস্ত অত্যাচারকে ভাসিয়ে দূর করে দিতে।

প্রতিপক্ষ বিদ্যাবুদ্ধি, অর্থ প্রতিপত্তিতে ঢের বেশি শক্তিমান। ওদের সঙ্গে পেরে ওঠা দুষ্কহ ব্যাপার। কিন্তু তবু টিকে থাকতে হবে এদের। সংখ্যায় এরা অনেক বেশি গরিষ্ঠ।

মাখনকে কয়েকজন মালকাটার সঙ্গে আসতে দেখে এগিয়ে যায় বসন্ত। ধাওড়ার কাছে আসতে জলস্রোতের মত কল্লোল মুখর, দীর্ঘতর হয়ে ওঠে দলটা। ফকির বেশ চড়া সুরেই বলে ওঠে,—কে জানে কে কি করেছে কেউ দেখিনি কিনা। ছাপ জবাব দিই দিবি সম্মাই।

—হুঁ ত কি? সবাই সায় দেয়।

মাখন এগিয়ে এসে বলে—বড় সাহেব ডেকে পাঠিয়েছে সম্মাইকে। এখুনি! জোড় বাংলোতে।

বসন্ত কি ভাবছে, নিজের বাংলোতে ডেকে পাঠাবার কারণ কিছুটা অনুমান করতে পারে। কে জানে, হয়তো পুলিশ ফোর্স অপেক্ষা করছে সেখানে। জোর করে ধরে নিয়ে যাবে ওদের। টিলার তিনদিকে দামোদরের জল; পালাবার পথ নেই। পথ মাত্র একদিকে; ছোট ষোলফিট টার-ম্যাকডাম করা পথ; জনকয়েক বন্দুকধারী হলেই কাজ হয়ে যাবে।

—চল!

বসন্ত বলে ওঠে—সবাই বাংলোর কাছে যাবে না, প্রথমে মাত্র ছ-সাত জন যাবো। যদি ধর পাকড় করে আমরাই ধরা পড়বো। বাকী দূরে পথের বাঁকে থাকবে। ইশারা করলে এগিয়ে যাবে। নয়তো যাবে না কেউ।

—ঠিক কথা। সবাইকে গুটিয়ে জালে ফেলতে যেন না পারে।

বসন্তের কথায় এগিয়ে আসে কয়েকজন—প্রথম দলে আমিও যাবো।

এগিয়ে আসে পাঁচু নিকিরি; সরপুঁটির মত সরু বুকটা চিতিয়ে। ভিড়ের মধ্যে একটা চাপা উল্লাস ধ্বনি ওঠে,পাঁচু যেন শহীদ হ'তে চলেছে। কে বলে ওঠে—ঘেঁটু ফুলের মালা আনবো নাকি রে?

বসন্ত পাঁচুর দিকে চেয়ে থাকে সন্ধানী দৃষ্টিতে।

পাঁচু হঠাৎ চমকে ওঠে; পরক্ষণেই সামলে নেয়।

—শালা লালাজীর পেট ফাঁসাবো আমি নির্ঘাৎ। জুয়োচ্চোর এক নম্বর। একবার বাগে পেলে হয়, গাঁইতির এক ঘায়ে জান খেয়ে ফেলবো। বলে কিনা

তুঁর ঘরভাড়া ছমাস বাকী, না দিবিতো কোটঘর করবো। হাত পেতে লিয়ে অজবল মিথ্যে কথা কয়। বলে দূর হই যা, তুই দল করিস উদের সঙ্গে।

মাখন পাঁচুর দিকে চেয়ে আছে। পাঁচু বলে চলেছে।

—আম্মোও ছেড়ে কথা কই নি। বল্লাম যাদের সঙ্গে খাটি খাই তারাই আপন জন। তুমি শালো কে হে? গেছে সাহেবের কাছে লালিশ করতে। চল সাহেবকেই দেখবো ইবার।

—ঠিক কথা! সমস্বরে জবাব দেয় ওরা।

উত্তেজিত জনতা পাঁচুর বীরত্বে মুগ্ধ হ'য়ে ওঠে। বসন্ত চুপ করে চলেছে ওদের সঙ্গে। কোলাহলমুখর জনতা।

শোভাযাত্রা এগিয়ে চলে; ধাওড়ার মেয়েরা কয়লা কুড়োন ছেড়ে ঝুড়ি বগলে ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। কয়েকটা ল্যাংটো ছেলে ছিপে চ্যাং মাছ গেঁথে খালে ডোবায় জমা জলে লড়কানি দিচ্ছিল, তারাও ছিপ গুটিয়ে কাঁধে তুলে ওদের সঙ্গে চিৎকার করে। রীতিমত আদিম শোভাযাত্রা। আধুনিক জিগির নেই, তবু ওরা নিজেদের দাবী জানাবার জন্য চলেছে আজ।

এ এক নোতুন অভিজ্ঞতা। যেন পাথরের বুকে শিহর জাগে, প্রথম শিহর; অন্যদিন মাথা নামিয়ে কম্পিত বুকে তারা ঢোকে এই চৌহদ্দীর মধ্যে পাহারাদারকে জানিয়ে, তাদের দয়ায়। আজ পাহাড়ীর উপর খাঁজকাটা পাথরের ঘুমটি ঘর থেকে হাবিলদার চেয়ে থাকে ওদের দিকে, বিনা এত্তেলায় ওরা মাথা উঁচু করে বেপরোয়া গতিতে আজ চলেছে। পাহারাদারগুলো চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। উল্লাসে ফেটে পড়ে জনতা, নব আনন্দের স্পর্শ ওদের কণ্ঠ স্বরে; শালবনে ঝড় উঠেছে, বৃষ্টি ভরা অপরাহ্ণে প্রথম বৈশাখের ঝড়।

টিলার ধারে এসে ওরা থামল, এগিয়ে যায় বসন্ত, ফকির, মাখন, পাঁচু আর নামো ধাওড়ার মুকুন্দ সর্দার। বাকী সকলে অপেক্ষা করতে থাকে নীচে পথের মুখে, সন্ধানী দৃষ্টি ওদের।

মিঃ ব্লেজার, ফস্টার আর তিনজন ওভারম্যান, এসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজারও রয়েছে। ওরা যেতেই এগিয়ে আসে ব্লেজার। ফস্টার মুখ লাল করে বসে থাকে; তার এসব ভালো লাগে না। মাথায় তুলছে ওদের এজেণ্ট সাহেব প্রশ্রয় দিয়ে।

বসন্ত বলে ওঠে—আজকের ব্যাপারে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। এর জন্য

দায়ীও নই আমরা। কোন মন্দ লোক এসব করেছে। তাছাড়া লালার হিসাব ঠিক থাকে না। বেশি দরে কম ওজনে জিনিস দিয়ে দ্বিগুণ দাম লিখে ঠকায় সবাইকে।

ব্লেজার প্রশ্ন করে—অন্য কোথাও যায় না কেন জিনিস কিনতে?

—বাকীতে কে দেবে? কোম্পানী থেকে রেশন দাও, হপ্তাহে দাম কেটে নেবে। এত দামে আমরা চাল ডাল কিনতে পারি না। কোম্পানীর ঘরে খাটি, থাকতে দিয়েছ, খেতেই বা দেবে না কেন? দাম কেটে নাও। এই আমাদের প্রাপ্য!

বসন্ত দাবী জানায়। একটু ভেবে মিঃ ব্লেজার এক কথাতেই রাজী হয়ে যায়। ফস্টার চমকে ওঠে। একটা ভাল রোজকারের পথ বন্ধ হয়ে গেল। লালাজী মাসে মাসে আর বাংলোয় আসবে না, ভেট আসাও বন্ধ হয়ে গেল তার বাংলোয়।

বসন্ত বলে ওঠে—আর একটা কথা স্যার।

ব্লেজার ওর কথাগুলো শুনছিল, কোথাও বেআইনি ঝাল ফুটে ওঠেনি। তবু বেশ আইনের বাঁধুনি আছে, নরম মিষ্টি সুরে দাবীগুলো পেশ করছে। যেন বিনয়ের অবতার। ফস্টারের পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বালা করছে।

ব্লেজার মুখ তুলে চাইল। বসন্ত বলে ওঠে—সেদিন আমরা জানিয়েছি, মাইনে গ্যাস জমছে। ফস্টার চুপ করে বসে থাকে। বসন্ত বলে,

—কোল ডাস্টও ট্রিট করবার কোনও ব্যবস্থা হয় নি। এ অবস্থায় কাজ করা বিপজ্জনক, এর জন্য কোন প্রতিকার কোম্পানী করেনি।

মিঃ ব্লেজার যেন আকাশ থেকে পড়ে; ফস্টারের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে,

—হোয়াট ইজ ইট ফস্টার?

সমস্ত দোষ বেমালুম ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দিল সাহেব। ফস্টার কাঁপছে রাগে। বলে ওঠে—এয়ার স্যাম্পেল টেস্ট করা হচ্ছে।

বসন্ত জবাব দেয়—তার রিপোর্ট আমরাও দেখেছি। যদি চান তবে কপি দিতে পারি স্যার। কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান হবে না। গ্যাস জমেই চলবে, একটা ব্যবস্থা করুন।

মাঝখানে যেন বাজ পড়েছে; ব্লেজার আর ফস্টারের নীরব চাহনিতে ফুটে ওঠে আতঙ্কের ছায়া; ওই দীর্ঘ সতেজ যুবকটি মিথ্যা কথা বলেনি।

এতদিন ওকে দেখেছে ফস্টার; ওর কথা আর কাজের মধ্যে ঐক্য আছে। টেস্ট রিপোর্টের মত এতবড় গুরুতর জিনিস কি করে ওর হাতে গেল জানে না; কে জানে আরও কি খবর সে রেখেছে। ফস্টারও শিউরে ওঠে মনে মনে। প্রসঙ্গটা তখনকার মত চাপা পড়ে।

ব্রেজার আশ্বাস দেয়—দায়িত্ব আমাদেরও আছে, আমি আজই রিপোর্ট নিয়ে ব্যবস্থা করছি।

—থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।

বসন্ত বের হয়ে আসছে। ব্রেজার শেষবারের মত সাবধান করে দেয় ওকে।

—পিট অপিসে আজ যে গোলমাল হয়েছে তা প্রথম ভুল বলেই ক্ষমা করলো কোম্পানী, ভবিষ্যতে এর শাস্তি পেতেই হবে, এরকম কোন শৃঙ্খলা ভাঙবার মত কাজ কোম্পানী প্রশ্রয় দেবে না। ডিসিপ্লিন ফার্স্ট, ডিসিপ্লিন লাস্ট, মাইণ্ড ছাট।

বের হয়ে এল তারা, কোম্পানী রেশনের দোকান দেবে। বাকীতে মাল মিলবে, হপ্তা থেকে কেটে নেবে তার টাকা। আর লালার দরজায় গিয়ে হাত পাততে হবে না। পাঁচু নিকিরি হুমকি ঝাড়ে।

—সাহেব ভয়ে সিটিয়ে গেছে হুঁ হুঁ বাবা; দোব না একদিন সাহেবের বাংলোতে লাল ঘোড়া ছুটিয়ে? লালা বধ করে দোব না? ভয়ে তাই বাছা-ধন কেঁচো।

মাখন, মুকুন্দ ওরা যেন ঠিক কথাটা বিশ্বাস করতে পারে না। এত ভদ্র লোক হয়ে উঠবে ওরা হঠাৎ ভাবতেও কেমন সন্দেহ ঠেকে! ব্রেজার এক কথায় সব দাবী মেনে নিয়েছে; কিন্তু বিশ্বাস করে না, ভরসা পায় না।

—দেবে তো হে খুড়ো?

মুকুন্দকে জিজ্ঞাসা করে মাখন। মুকুন্দের এ লাইনে বিশ বছর চাকরি হয়েছে। সেও ঘাড় নাড়ে—কে জানে ব! বলছে তো, দেখ কি দেয়।

প্রথম আলোড়ন। প্রথম আন্দোলন। প্রথম জয় লাভ করেছে ওরা। তারই উল্লাসে মুখর জনতা আজ ইয়াকুবের দোকানে পয়সা ছড়িয়ে দেয়।

—লাও, পিও।

বসন্ত জানে শ' কয়েক টাকা ওরা পেয়েছে। লালার তহবিল লুঠ করে

মাখনের হাতে কিছু জমা পড়েছে। বাকী হাতিয়েছে পাঁচু নিকিরি, কেষ্ট মিস্ত্রির দল।

—মেম্বর হতে হবে সবাইকে, চাঁদাও দিতে হবে।

পাঁচু বলে ওঠে—মাগ নাই ছেলে কাঁদে, ঘর নাই আগড় বাঁধে! সমিতিই নাই বলে দাও চাঁদা! আরে হোক সমিতি, আমরা যেছি কুথাকে? লড়বো, জোরসে লড়বো। লালা বধ করে দোব দালালকে।

কেষ্ট মিস্ত্রি বেসুরো চিৎকার করে—দালালকো হালাল করো!

ভাঁড়ে ঢালতে থাকে তাজা পানীয়; চাল ভাজা মুড়ি চিবুচ্ছে মশমশিয়ে। বসন্ত সরে এল। এখানে মিটিং-এর কথা বলা অসম্ভব।

মাখন ঘাড় নাড়ে—ওমনিই ওরা বাবু; নিজের জন্যেও ভাবে না। কাল কি খাবে সে ভাবনাও নাই।

ওদের ভাবনা ভেবে উঠেছে কোম্পানী। ব্লেজার জানে এই আন্দোলন, জাগরণকে চেপে রাখা যাবে না; একদিক দিয়ে এর প্রকাশ ঘটবেই। তাই এর প্রকাশকে বিকৃত করে তোলাই ওদের এই আন্দোলনের আঘাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার একমাত্র পথ।

নারকুলিয়া উঠে পড়ে লেগেছে। আয়োজন করছে সবদিক থেকে, বানচাল করার আয়োজন।

হাটতলার ধারে একখানা ঘর ছেড়ে দিয়েছে কোম্পানী, কাঁচা বাঁশের ডগায় একটা নিশান তুলে অপিস করা হয়েছে। হাটে ঢেঁড়া দিয়ে যায় কলকাতা থেকে শ্রমিক-দরদী নেতা যদু পতিতুণ্ডি আসছেন আজ, শ্রমিক কল্যাণ-সংঘের উদ্বোধন করতে। দলে দলে যোগ দিন।

হাটতলায়, রাস্তার ধারে সেগুন শিশু গাছের গুঁড়িতে, নিয়ামৎপুরে বাস স্টপেজে টাঙ্গান হয়েছে ইস্তাহার। সাইকেল রিক্সার পিছনে লটকানো হিন্দী উর্দুতে ওই কথাগুলো। গেট সাজানো হয়েছে।

পাঁচু নিকিরি নেচে উঠেছে। রাধানগর টকির ইস্তাহার বিলির মত একটা ছ্যাকড়া গাড়ি ভাড়া করে ফুটো সাইড ড্রাম আর কর্নেট বাজিয়ে ডিসের-গড়, ঝালবাগান, রাধানগর, দেজুড়ি এলাকায় হ্যাণ্ডবিল বিলি করে ফিরছে।

সেই-ই শাল ডাল ভেঙ্গে এনে ফটক সাজান তদারক করছে। সঙ্গে জুটেছে একপাল ছেলে, তারাও পিছু পিছু ঘুরছে যেন যাত্রার দল আসছে কালীপূজার সময় কোলিয়ারিতে।

মাখন, মুকুন্দ অনেকেই একটু উৎসাহ প্রকাশ করে। কোম্পানী নিজেই সমিতি গড়তে এগিয়ে এসেছে। এককালীন দুশো টাকা চাঁদাও দিয়েছে ফণ্ডে।

নারকুলিয়া ধাওড়ায় এসে খোঁজ খবর নিচ্ছে। হাটতলায় লোক ভরে যায়; নেতা এসেছে কলকাতা থেকে। মহানগরী। সেখানের সব কিছুই আলাদা। সেই কর্মব্যস্ত নগরে কোলিয়ারির শ্রমিকদের প্রাণের বন্ধু যে একজন নেতা এতদিন কি করে চুপ করেছিলেন তাদের ভুলে এটা তারা বুঝতে পেরে অবাক হয়ে গেছে।

বেঁটে খাটো লোকটি; খদ্দরের পায়জামা আর লাল গেরুয়া রংএর পাঞ্জাবী; উস্কোখুস্কো চুল। হাই পাওয়ার চশমার ফাঁক দিয়ে দুনিয়াটাকে অনেক বড় করে উদার দৃষ্টিতে দেখছে। গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দেয় তালরুই-এর মেজবাবু; ওপাশে বসে ইয়াকুব সাহেব। ফিনফিনে গিলেকরা কল্কাদার নক্সাকাটা পাঞ্জাবী, চোস্তের উপর মানিয়েছে চমৎকার; কানে আতরের তুলো। আসরে উঠেই তিনি শ্রমিক ফণ্ডে একশো টাকা চাঁদা ধরে দেন; তালরুই-এর মেজবাবু খানদানী ঘরের ছেলে, সভাপতির হাতে সিল্কের রুমালে করে এককালীন সাহায্য বাবদ এগিয়ে দেয় দুটি গিনি।

হাততালি বাজছে। ঘন ঘন সিটি বেজে ওঠে তীক্ষ্ণ শব্দে।

তারই মাঝে উঠে দাঁড়ালেন কলকাতার নামকরা এডভোকেট শ্রমিকবন্ধু নেতা যদু পতিতুণ্ডী। গলার মালাটা নামিয়ে বার কতক ঢোক গিলে শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে বচন ছাড়তে লাগলেন, খোলঠাসা তুবড়ি থেকে ফিনকি দিয়ে ফুলঝুরি ছুটছে। কখনও হিন্দীর টুকরো ছোটে।

—কেয়াবাৎ!

—সাবাস!

শ্রমিক কল্যাণ সমিতির সভ্য হতে পেরে ওরা আজ ধন্য।

যদু পতিতুণ্ডি যাত্রার দলের নায়কের মত গলা কাঁপিয়ে বলে চলেছে,

—বাঁচবার জন্য সংগ্রাম করতে হবে। চাই আলো, চাই বাতাস, চাই স্বাস্থ্য, সুযোগ সুবিধা। ওরা না দিলে আমরা আন্দোলন করবো।

গরম গরম কথা ; শুনে সকলেই খুশিতে ফেটে পড়ে ; ফকিরের মুখে হাসির আভা। বুধন স্বপ্ন দেখছে কটা মাত্র টাকার জন্য একবেলা ছাতু লঙ্কা চিবিয়ে থাকতে হচ্ছে না। সেও একটা ছোট ঘর তুলেছে ডুংরীর ধারে। অনেক টাকা নিয়ে গেছে। করকরে রূপোর টাকা ; দোমড়ানো কাগজ নয়। একটা কালো গরু কিনবে, সে আর বুধী ঘর বেঁধেছে।

অজানতেই কোমরে গোঁজা বাঁশীটার দিকে হাত যায়। ফকির ধরে ফেলে হাতটা—এ্যাই, ইখানে লয়। শোন কি বলছে বাবু! কবে উসব দিবেক বলছে শুনে লে কান করে। শেষম্যাষ যেন গুলমাল না হয়।

ওদের হাতে যেন সবকিছুই এসে গেছে।

বিভিন্ন কোলিয়ারি থেকে মালকাটারা এসেছে। এসেছে কৌতূহলী ছেলে, বুড়ো, মেয়েরাও। দূর থেকে তারাও শোনে। তাদের স্বামী ছেলের মাইনে বাড়বে। বিনা ভাড়ায় ভালো বাসা মিলবে থাকতে, এ যেন তারাও ভাবতে পারে না।

যদু পতিতুণ্ডি, তালরুই-এর মণ্ডপ মেজবাবু, ইয়াকুব সাহেব—হঠাৎ এরা কেন এদের দুঃখে গলে গেল ঠিক বুঝতে পারে না। নারকুলিয়া ঘুর ঘুর করছে একদিকে।

যদু পতিতুণ্ডি বজ্র নিনাদে হুঙ্কার ছাড়ছে—সবাই ইউনিয়নের সভ্য হোন। একতাই বল। ইংরাজিতে দামী কথাটাও বলে ওঠে।

এখানে বুঝুক না বুঝুক ওদের একটু শ্রদ্ধা অর্জন করতে গেলে ইংরাজি বলতেই হবে। যদুবাবু তা জানে।

হাটতলায় আজ যেন রথের মেলা বসেছে। মিটিংএর বাইরে বসেছে চা পানের দোকান। গ্যাসবাতি জেলে অশত্থতলার এক কোণে কালো অয়েল ক্লথের উপর ছটা চৌবন্দি ঘর কাটা জাহাজ-কাঁটা তাস-মার্কা জুয়ার ছক বসেছে। চামড়ার গোল বাক্সে ঘট ঘট ঘুঁটি নড়ছে। টুপটাপ জমে ওঠে ছকের উপর আনি দুয়ানি এর ওর পকেট থেকে। কানে পোড়া বিড়ি গুঁজে উপু হয়ে বসেছে কেষ্ট মিস্ত্রি, চোখ দুটো করমচার মত লাল।

—এ্যাই শালা, দিলম জাহাজে এড়ে এই ব্যাঙের আধুলি। ডোবা দিকি জাহাজ?

কেষ্টর বুক ফুলে উঠেছে, চার টাকা রোজ বেড়ে ন্দিন পাঁচ সাতে দাঁড়াবেই। বাবু যা ছাড়ছে।

কে যেন বলে ওঠে—গুল দিচ্ছে না তো মাইরী?

ছোকরা মালকাটা ক'জন, গায়ে সিনেমা মার্কা চকচকে মেয়ে, কুকুর, সাপ, ব্যাঙ আঁকা হাওয়াই সার্ট, ফুলপ্যান্ট; গলায় লাল রুমাল বাঁধা। ভয়ে ভয়ে বলে—সত্যি রে, শালা চারশো বিশ লয় তো?

—কে জানে? পোড়া সিগারেটটা দু আঙ্গুলে ধরে শেষটুকুও টেনে উশুল করতে ছাড়ে না সে।

গমগম করছে হাটতলা। সৌরভী একপাশে দাঁড়িয়ে আছে সাজবেশ করে। তার আর কোলিয়ারিতে কোন সম্বন্ধ নেই; মরদটা ছিল বটে, সে কয়েক বছর হল মরেছে; ব্লাস্ট করতে গিয়ে সামনেই পড়ে ডিনামাইটের; পাথরের জমাট স্তরের সঙ্গে তার হাড়গোড় কখানাও ধুলো হয়ে উড়ে গেছল। খানিকটা তুলে এনেছিল ওরা।

ওই ফস্টারই বলে—নিজের দোষে মরেছে, কিছুই পাওনা হয় না তোমার। তবে দয়া করে দিচ্ছি দুশো টাকা, টিপ ছাপ দিয়ে নিয়ে যাও।

শরণ সিং তার থেকে পাঁচ টাকা খেয়েছিল টাকা দেবার সময়; সে দিন সৌরভী নোতুন এসেছিল এই মুলুকে।

পরে শরণ সিং-এর বহু পাঁচ টাকা সে উশুল করেছে।

সৌরভী তেলেভাজা দোকানের পাশে বসে কাঁচা শালপাতার ঠোঙ্গায় গরম পিঁয়াজী চিবুচ্ছে তারিয়ে তারিয়ে আর শুনছে ওই হাঁক ডাক। পয়সা কিছু বাড়বে ওদের, বাড়ুক। সেই সঙ্গে বাড়বে তাদেরও রোজগার।

—এক আনার বেগুনি দে কেন্নে?

মণ্টা যেন শুনতেই পায় নি। সৌরভী ফোঁস করে ওঠে—বলি কথা যে কানেই লিসনা রে, হাঁ করে ভাবছিস কি?

একজন খদ্দের বলে ওঠে—তুকে।

সৌরভীকে নিয়ে রঙ্গ রস করতে ছাড়ে না। কৃত্রিম কোপে বলে ওঠে —ধ্যাৎ।

একজন আধ বুড়ো মালকাটা ওদিকে দড়ি দড়ি করে মুড়ি ভিজিয়ে জল

মেখে কোৎ কোৎ করে ঢোঁক গিলছিল। চোখ দুটো টানে বুজে আসছে, মাঝে মাঝে দেখা যায় লালচে চোখ দুটো।

—পয়সা দাও গো। তিন আনা। মণ্টা তাগাদা দেয় লোকটাকে।

বুড়ো একবার পিট পিট করে চেয়ে গম্ভীর ভাবে সৌরভীকে দেখিয়ে দেয়। —উ দিবেক। আমাদের লুক বটে।

মজা দেখছে অন্যান্য অনেকে। সৌরভী ধমকে ওঠে—হ্যাঁরে, মিনসে! ঢং দেখ না ঘাটের মড়ার।

মিনসে নির্বিকার ভাবে চপে কামড় দিয়ে দাঁত পড়া মাড়ির ডগে পাগ্‌লাতে পাগ্‌লাতে বলে ওঠে—হেঁই বাপ্‌রে। লিয়ে এসে এমনি করে ঠকাবি গো? তখন কত সুহাগ কাড়লি, এখন লুকের মাঝে এমনি না চিনি ভাব!

—মুখে তুর থ্যাংরা মারবো মড়া কুথাকার। দামোদরের গব্বে যা। সৌরভীকে ঘিরে ওরা হাসিতে ফেটে পড়ে।

হঠাৎ বুধনকে দেখে ওর দিকে চেয়ে থাকে সৌরভী; শক্ত সমর্থ যোয়ান। গায়ে ওর পাথরের মত দৃঢ়তা; চওড়া ছাতি, মাথার বাবরিতে লাল গামছাখানা ভুখুঁট করে বাঁধা। কোমরে ছোট বাঁশীটা গোঁজা রয়েছে, ওতে লুকোন আছে কোন যাদুময় সুর। মাঝে মাঝে শুনেছে সৌরভী ওই সুর সাথীহীন একলা নিশুতি রাতে। বাল্যের দিনগুলো যৌবনের বহু স্বপ্নমেশা সে ক্রন্দন কোন দূর থেকে হাতছানি দেয় তাকে বার বার।

বুড়ো খুঁট থেকে পয়সা বের করে দিচ্ছে। সৌরভীকে বলে ওঠে,

—তুরটাও দুব গো, ও কোসমের মা?

বাঁজা সৌরভী কিনা কুসুমের মা! হাসির ঝরনা ছোটে।

বুড়ো হাড় বদমাইস, সব গেছে এখনও চ্যাংড়াপনা যায় নি। বুধন বেগুনি নিয়ে বের হয়ে এল দোকান থেকে। মুখ টিপে হাসছে সে-ও।

সৌরভীও ভিড়ের মধ্যে থেকে পাশ কাটিয়ে সরে এল। সন্ধ্যার অন্ধকারে ভরে উঠেছে চারিদিক। মিটিংএর জায়গায় একটা মাত্র আলো ওই নেতাদের কাছে। বাকী অন্ধকার।

সমিতিতে কে কে থাকবে তাই ঠিক হচ্ছে। পাঁচু নিকিরি সর্দারী করছে চারিদিকে। যে যার ধাওড়ায়, নেশার দোকানে ফিরবে। উসখুস করছে সবাই, যেন বেলুন চুপসে গেছে।

যত্নু পতিতুণ্ডি, মেজবাবু এক গাদা নাম পড়ে গেল। এরা সবাই সমিতির কাজ কর্ম চালাবে।

—এ্যাই চুপ করো সবাই। লোক্ করে শোন। পাঁচুর হাঁকটাও গোল-মালে ডুবে যায়।

সভার কায শেষ হল এইখানে। মালকাটারা দৌড়ল দোকানের দিকে। দেখতে দেখতে হাটতলা ফাঁক হয়ে যায়; ছিটিয়ে থাকে শুকনো পাতা; পড়ে আছে দুএকটা বাঁশ।

লালাজীর গদি-বাড়িতে জমাট আড্ডা বসেছে। খানাপিনার প্রাচুর্য। কচ্চি ভোর মাংসের ব্যবস্থাও করেছে বাইরে থেকে আগত ওই নেতাদের জন্য। ইয়াকুব সাহেবও লালাজীর আতিথ্য গ্রহণ করেছে। মেজবাবু চুপচাপ গলায় ঢেলে চলেছে দামী পানীয়। নিজের পয়সায় আর জোটবার উপায় নেই। ওটা পরের ঘাড়েই চালাতে হয়। যত্নু পতিতুণ্ডী মশায় নিরামিষী লোক। তার এসব চলে না, তার জন্য রাবড়ি, মালাই, সন্দেশের ব্যবস্থা। নারকুলিয়াও ওই দলে।

পাঁচু তদ্বির করে চলেছে। লালাজী মনে মনে আঁচ করে খরচের।

খরচটা অবশ্য নারকুলিয়ার অফিস থেকেই এসেছে। সেটা গোপনতম সংবাদ। লালাজীই অতিথিসৎকার করাচ্ছে; মাঝে মাঝে যত্নু বাবুর কথাগুলো আবৃত্তি করে,

—বেস্ বলিয়েছেন যদো বাবু! সব সুখ সুবিধা জোরসে ছিনায়ে লেবে হমলোগ্। সচ্ বাত!

হাসতে থাকে হো হো করে কলা গাছের মত প্রশস্ত উরু চাপড়ে।

—আপনাকে আউর সন্দেশ দিই! এ ব্রিজমোহন! মালাই লাও।

ইউনিয়নের ব্যাপারটা নিরাপদে চুকে যেতে নারকুলিয়া অন্য কথা ভাবছে। এবার কাকে নিয়ে পড়বে।

বসন্ত প্রথম দিকটায় গিয়েছিল ওখানে মাখনের চাপে।

—না গেলে সবাই কি ভাববে। এতবড় জৌলুস তোমাকে নাহলে মানাবে না।

কেষ্ট বলে ওঠে—মাইরী, তুমিই সব করলে শেষমেষ বেঁকে বসবা? না গেলে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে যাবো কিন্তু। ভালো কথায় চলো বলছি।

ওদের সঙ্গেই গিয়েছিল বসন্ত। কিন্তু এর পর কি হবে তা জানে। চাকা ঘুরেছে, কিন্তু ঘুরে গিয়ে আরও কাদায় ঢুকে গেছে। এরা পরে তা টের পাবে।

যদু পতিতুণ্ডীকে সে চেনে, ভাল করেই চেনে। তাই সামনে যেতে চায়নি। এ এলাকায় মালিকদের যেমন কোলিয়ারি আছে, যদু পতিতুণ্ডীর তেমনি প্রতি কোলিয়ারির থেকেই বিনা পরিশ্রমে কিছু মাসোহারার ব্যবস্থাও আছে পার্টির চাঁদার নাম করে।

এবং কি কায করে তা এরা জানে না, বসন্ত জানে হাড়ে হাড়ে। সুতরাং যদুবাবুর আসার খবর শুনেই চমকে উঠেছিল।

—কে এনেছে তাকে? মাখনকে প্রশ্ন করে বসন্ত।

—মেজবাবু, তালরুই-এর মেজবাবু। ওনারাই সিদিন এসেছিলেন বটে। বেবিকরচে বসে শলা হোল। পাঁচুও জানে সব।

চুপ করে যায় বসন্ত। তালরুই-এর চৌধুরী বংশ এককালে এ অঞ্চলের জমিদার ছিল; সব গেছে আজ মদ আর অন্যান্য নেশায়। মেজবাবুর অবস্থাও সে জানে। বারোহাজার টাকায় কেনা নোতুন গাড়ি বেচেছে ওই ইয়াকুবকে মদের টাকা দিতে না পেরে।

মালকাটার বৌ ঝিয়ের উপর নজর আজও যায়নি। সেই মেজবাবুই এগিয়ে এসেছে।

একটু থেকেই চলে আসে সে, ওরা টাকা পাবার স্বপ্ন দেখছে। যদুবাবুর গরম গরম লেকচারে হাততালি দিক। বসন্ত উঠে আসছে।

জনহীন ধাওড়া। ঝেঁটিয়ে সবাই গেছে মিটিংএ। ঘরের আলোও জ্বলেনি। জমাট অন্ধকার দূরাগত সান্টিং ইয়ার্ডের ইঞ্জিনের আলোয় চিড় খেয়ে যায়। এমনি আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মালু, ওকে দেখে এগিয়ে আসে।

কেউ কোথাও নেই। ধাওড়ার নীচে একটা আধমরা ঝরনার ধারে বসলো তারা; পাথরে পাথরে জমাট বেঁধেছে অন্ধকার; জোনাকির আলোর ফুলকি ঝরে গাছে গাছে, অসীম শূন্যতার মাঝে। পথ হারিয়ে ওরা খুঁজে ফেরে সেই পথ।

—ওখানে কি হল? মালুর কণ্ঠে ব্যাকুলতার সুর।

বসন্ত হাসে, আঁধারে ঠিক দেখা যায় না ; ওর হাতখানা তুলে নিয়েছে মালু। বসন্ত বলে ওঠে,

—ওরাই চালাবে সমিতি। ভালোই হল।

—এ আমি জানতাম। মালু বসে পড়ে ওর পাশে।

—আমার কায কমলো। বসন্ত যেন হতাশই হয়েছে।

মালু বলে ওঠে—কিন্তু বিপদ বাড়লো এইবার।

বসন্ত ঠিক বুঝতে পারে না ; মালু বলে চলেছে—পিছন থেকে ওদের সরিয়ে দিয়ে তোমাকে একা পেয়ে এবার সব কিছুরই জবাব দেবে।

বসন্ত চুপ করে কি ভাবছে। নদীর বালুচরে ডেকে যায় রাতের আঁধারে স্নাইপ, বালি হাঁস ; ওপারের বনে কোথায় ডাকছে শিয়াল ; কেঁপে কেঁপে ওঠে সেই তীক্ষ্ণ শব্দ ; নদীর জলে ভেসে আসছে ক্ষুব্ধ গর্জন ধ্বনি। শব্দময় ছন্দময় একটি জগৎ। মৃত্যু আর জীবনের সংঘাতে ছন্দ মুখর।

মালু এগিয়ে আসে তার দিকে ; ভীরু নিঃশেষ একটু গোপন আবেদন। ব্যর্থ যৌবন প্রীতির সংস্পর্শে মধুর স্বপ্নে ভরে ওঠে ; পাথরের বুকে যেন সবুজ শেওলা জমেছে। বালিতে ফুটেছে ফণিমনসার নীল ফুল। গন্ধহীন, তবু ব্যাকুল আবেদনে সে দিনের প্রথম আলোয় স্নান করে ভ্রমরের পদধ্বনি শোনে কান পেতে, সাগ্রহে।

—বড় ভয় করে আমার! মালু বসন্তের হাতটা নিজের হাতে তুলে নেয়।

বসন্ত কথা বলে না। এমনি করে একটি মাটির কাছাকাছি মানুষের জড়মনেও সুর বাজে, একই সুরে একই রেশে। এ যেন ভাবতেই পারে নি সে এতদিন।

একটা জায়গায় মানুষের মাঝে কোথায় সাম্য আছে। প্রীতি ভালবাসার ক্ষেত্রে সেই চিরন্তন সত্যের সুর। কে কোথাকার মানুষ কোনদিন দেখেনি ; তবু হঠাৎ মনে হয় তাকে অতি আপন জন, বহুকালের চেনা জানা।

রাত হয়ে গেছে। মালু ফিসফিসিয়ে বলে ওঠে।

—দশটার ভোঁ বাজছে।

কঠিন কণ্ঠে অস্তিত্ব ঘোষণা করে ওই যন্ত্র দানব, এখানের মানুষের সব আশা-কামনা, সুখ শান্তি ওর হাতের মুঠোয়। ওরই নির্দেশে চলেছে এখানের জীবন। ওর সুরে বাঁধা এ মাটির জন্ম মৃত্যু।

ঝিম ঝিম বৃষ্টি পড়ছে। একটা খণ্ড বিক্ষিপ্ত মেঘের টুকরো উড়ে এসে জমেছে। ফিরফিরে বাতাসে ভেসে আসা চূর্ণ বৃষ্টি কণায় ভিজে ওঠে দুজনে।

মালু সদর রাস্তাটার কাছে এসে বাঁ দিকে নেমে গেল আঁধার ঢাকা গাঁ বস্তির দিকে।

শনিবারের রাত, আনন্দ আর মুক্তির হালকা খুশিতে ভরে ওঠা রাত। পরদিন ছুটি।

রবিবারের পরদিনই সেই আঁধার থাকতে আবার যোয়াল টানা ; সেই ভয়েই মনের অবাধ খুশি মিইয়ে যায়। তার উপর বৃষ্টিঝরা রাত। এমনিতেই মনটা কেমন শূন্যতায় ভয়ে ওঠে বসন্তের। অতীতের কথা ভাবেনি এতদিন। অমনি বিস্মরণের জমাট আঁধারেই তা ঢাকা থাক। বেশ আছে নিজেকে ভুলে গিয়ে ; নিঃশেষে সে ভুলে যেতে চায়। ভুলেছেও।

আজ হঠাৎ যেন মনে পড়ে আঁধার মেঘের কোল ভেঙ্গে বিজলীর ঝলকের মত ঝলসে ওঠে সেই তীব্র অনুভূতি। পা বাড়াল ভিজে পথ ধরে। রেলওয়ে সান্টিং ইয়ার্ডের উপর সার্চলাইটের আলোর চারি পাশে চূর্ণ জলকণা রামধনুর আভা এনেছে।

মদের চালাতেও গোলমাল থেমে গেছে। কে একজন চালার নীচে বেহুঁস হয়ে পড়ে আছে। মাঝে মাঝে এক একবার নড়াচড়া করে আবার স্থির হচ্ছে দেহটা। মদের ঘোরে ডুবে আছে সে।

নিশুতি ধাওড়া, আকাশ বাতাস দূরের স্যাকস্‌ন পাম্পের শব্দে ভরে উঠেছে। হিস্ হিস্ গর্জন যেন ক্রুদ্ধ বাসুকীর গুমরে ওঠা দীর্ঘশ্বাস।

ধাওড়ার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। পিছনে কে আসছিল এতক্ষণ খেয়াল করেনি বসন্ত, হঠাৎ পাথরে পিছলে পড়ার একটা শব্দ শুনে চমকে উঠে পিছনে চাইতেই দেখে লোকটা উঠে হন হন করে চলে গেল অন্ধকারের মধ্যে।

—কে ?

কোন সাড়া দেয় না। আঁধারে শোনা যায় পায়ের শব্দ, ছুটে পালাল লোকটা নিরাপদ দূরত্বে। কেন ঠিক বুঝতে পারে না, বোধহয় ধরা পড়বার ভয়ে।

একটু চিন্তার রেখা ফুটে ওঠে ওর মুখে। কি ভাবছে! লোকটার অমনি রহস্যজনক অন্তর্ধানে সে একটু বিস্মিত হয়।

ধাওড়ার ঘরের দিকে এগিয়ে চলে পায়ে পায়ে।

সৌরভী চলেছে চত্বর থেকে বের হয়ে। মিটিং ফিটিং বোঝে না সে। গালে ঝালবড়ার দু একটা দানা তখনও লেগে আছে, তাই জিব দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দাঁতের ডগায় কাটছে; মিষ্টি, ঝাল, নোনতা স্বাদ। চলেছে হন্ হন্ করে। বুধনের গামছায় বাঁধা শালপাতার ঠোঙ্গায় কয়েকটা ঝালবড়া পিঠের দিকে ঝোলান।

নেশার জন্য মনটা উসখুস করছে। টাকা অনেক পাবে, এইবার চিনতোড়ের বাস তার ফুরোবে। বনপাহাড়ের নেশা তাকে টেনেছে, মনে আসে বুধীর কালো চিকন দেহ।

বাঁশীটা বের করে ফুঁ দেয়।

অন্য জগৎ। ফুলঝরা লাল ধুলো ভরা পথ। পাহাড়ের কোলে কাল জল-ভরা ছোট্ট ঝরনা। দুপাশে তার নুইয়ে পড়েছে অর্জুন বির্বকিরমচা গাছের কালো ছায়া; পাথরে পাথরে ঘা খেয়ে ছন্দমুখর হয়ে উঠেছে পাহাড়ী ঝর্ণা।

বুধী জলে নেমে দাঁড়িয়ে আছে। একগাল হেসে বলে,

—ওঠ, সর কেনে; উঠবো কেমন করে, ওই!

বুধনের ওদিকে যেন নজর নেই, গাছের শিকড়ে বসে বাঁশী বাজাচ্ছে। দুপুরের অলস রোদকাঁপা নিথর মধ্যাহ্ন।

—কথা কানে যেছে না নাকি? কিষ্ট ঠাকুরের মত বাঁশীই বাজাবা?

ফিক্ করে হেসে ফেলে বুধন। বুধীও মরিয়া হয়ে ভিজে কাপড়টা গায়ে জড়িয়ে ওঠবার চেষ্টা করে। ততই জড়িয়ে ওঠে ভিজে কাপড়টা পুরুষ্ট গায়ে; নিটোল মসৃণ মাংস পিণ্ডগুলো ঠেলে উঠছে দৃপ্ত ভঙ্গীতে।

নিজেরই লজ্জা আসে বুধীর; হড়বড় করে গলা জলে গা ডুবিয়ে দিয়ে হাসতে থাকে। হঠাৎ বুধন লাফ দিয়ে ওঠে, বুধী জলের ধারে এসে দুহাত দিয়ে আঁজলা আঁজলা জল ছিটুচ্ছে তার দিকে।

—সর বলছি বেহায়া কুথাকার।

হাসিতে ফেটে পড়ে দুজনেই।

হঠাৎ সামনে সৌরভীকে দেখে থমকে দাঁড়াল বুধন। হাসছে সৌরভী, —কিষ্ট ঠাকুরের মত বাঁশী বাজাছ এই সন্ঝে বেলায়, ঘরে থাকতে নারলাম, তাই এলম কুল মজিয়ে।

সৌরভীর চোখের কোলে কুল মজানোর কালি অনেকদিন থেকে জমেছে। তবু হাসিতে ওর ছুরির ধার, মনের সব বাঁধন কেটে দিতে পারে সে।

বাঁশী নামাল বুধন। কাঁপছে যেন তার বুক। পথে-হাটে ওকে দেখছে; সবারই সঙ্গে ওমনি ধারা, কথার যেন খই ফুটছে। আজ হঠাৎ রাতনির্জনে তাকে কাছে আসতে দেখে শিউরে উঠেছে। কাঁধের গামছায় বাঁধা ঠোঙাটার দিকে চেয়ে বলে ওঠে সৌরভী,

—আবার কুন ছিরাধিকের জন্য লিয়ে যেছো ভাই? দাও কেনে দুটো ঝাল বড়া; একঢোক ঢেলে দাও গলায়।

—নাই। বুধন কোন রকমে জবাব দেয়।

হাসিতে ঝলসে ওঠে সৌরভী। খপ্ করে ওর হাতটা ধরে ফেলে—নাই কিগো! নাই নাই করলে সাপের বিষও হরে যায়। আছে। এই দেখ। সৌরভী আঁচলের নীচে থেকে একটা কালো বোতল বের করে।

—দিশী! বুধন যেন ভয় পেয়েছে।

ধেনো কিংবা মহুয়াই তারা খায়। এত তেজী বিষের মত ঝাঁঝালো, খারাপ তা নয়। আহার নেশা দুই-ই হয় তাতে। এই বোতলের পানীয় শুধু নেশাই আনে, কুরে কুরে খায় জীবনীশক্তি।

—কেন পছন্দ হোল নাই? মনে ধরে নি বুঝি?

—উসব খেতে নাই। বুধনের স্বরে দৃঢ়তা ফুটে ওঠে।

সাঁওতালের গোঁ, ভাঙ্গবে তবু মচকাবে না। সৌরভীর মনে হয় ওই বলিষ্ঠ সুঠাম বুধনের কাছে সে আর ওই মদ যেন একই সঙ্গে ঘৃণ্য। চুপ করে থাকে সৌরভী। বাচাল লাস্যময়ী নারী ওর নীরবতার পাষাণ প্রাচীরে কোথায় মাথা ঠুকে ব্যর্থ হয়েছে।

হারানো যৌবনের মিথ্যা স্বপ্ন দেখেছিল সৌরভী, সে আর ফিরবে না কোনদিন। বৃথাই তার জন্য কান্না; চিনতোড়ের মাটিতে সে নিঃশেষে মরে গেছে।

বুধন চলে গেল ধাওড়ার দিকে। দাঁড়াবার, ওর সঙ্গে কথা কইবারও প্রয়োজন বোধ করে না সে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে সৌরভী। ব্যর্থ একটি কান্নাভরা মন।

বাঁশার সুরটা আবার উঠছে ভিজে সন্ধ্যায়; নেশা লাগানো সুর। সৌরভীর অতীত জীবনের একটি পাপড়ি কবে শুকিয়ে ঝরে গেছে। আজও যেন সেই ম্লান সৌরভ তার মনে ফিরে আসে। নদীপারের আঁধার ঢাকা আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। সুরটা কান্নার মত ভেসে আসে অতীতের তীর হতে।

কি ভেবে উঠে পড়ল সৌরভী; বৃষ্টি-ঝরা রাত্রে বাড়ির দিকে এগিয়ে চলে। মনে মনে চরম পরাজিত হয়েছে লাস্যময়ী নারী; একদিন ছিল, যেদিন সৌরভীর জন্য সারা চিনতোড় পাগল। ম্যানেজার স্বয়ং তাকে বাংলোয় নিয়ে গিয়ে তোলে। রূপ তার অফুরান। ম্যানেজারের কাছে দরবার করতে হবে? চল সৌরভীর কাছে।

বলিষ্ঠ দুর্মদ মানুষটাকে কি করে জানে না সৌরভী হাতের মুঠোয় এনেছিল! অফুরান ভালবাসার প্লাবনে ভরে তুলেছিল তার জীবন-নদীর দুইকূল।

সেই সৌরভী আজ জীবনের একটা পরম সত্যকে যেন বার বার ঠেকে শিখেছে; একদিন বন্যার মত সব এসেছিল অযাচিত ভাবে, আবার লিস্টারের বদলীর সঙ্গে সঙ্গেই কোনদিকে সব উপে গেল। ভোজবাজি! একরাতের মধ্যেই উধাও। ভোঁ ভাঁ।

তবু তৃপ্ত সে। সেও বঞ্চনা কাউকে করে নি। লিস্টারও বঞ্চনা করেনি তাকে। জীবনটা তাই ভোগউচ্ছল আলো মাখা, অন্ধকার নয় তার কাছে। আজও মনের মণিকোঠা সেই পাওয়ার স্বপ্নে বিভোর।

মাঝে মাঝে ঝড় ওঠে!

ডাগর দীর্ঘ সেই ছেলেটি! বসন্তকে ঠিক ওই দৃষ্টিতে দেখতে পারে না সৌরভী। কেমন মিষ্টি লাগে, ভাল লাগে। কোলিয়ারির মদো মাতাল আর গোঁয়ারের ধাত ওর নয়। শক্ত কঠিন একটি মন অন্য কোন সমাজের ছোঁয়ায় রঙীন। লিস্টারের সঙ্গে এক জায়গায় ওর মিল আছে, নিদারুণ ঐক্য। এদের মধ্যে থেকেও বসন্ত এদের উপরে, স্বতন্ত্রজাতের। তাই বোধ হয় ভালবাসে ওকে।

কি ভেবে বসন্তের ধাওড়ার দিকে একটু এগোল। দুদণ্ড কথা বলা যায়

ওর সঙ্গে। হারানো দিনের কথা, স্মৃতি রঙীন দিনের খুশির স্বপ্ন দেখে সৌরভী! বসন্তের ঘরে আলো জ্বলছে না; একটু দূর থেকেই ফিরছে সৌরভী।

হঠাৎ দাঁড়াল। চারিদিকে সন্ধানী দৃষ্টি ওর; ঘ্রাণশক্তি দিয়ে বেশ যেন বুঝতে পারে বাতাসে কোন আগত বিপদের ভয় মিশে আছে। এ অঞ্চলের বিপদের কথা সে জানে; খাদের নীচেই শুধু মরে না; সামান্যতম কারণেই এই আঁধার রাজ্যে মৃত্যু আসে কালো ডানা মেলে। কোন আপোষ মীমাংসা খাটে না; একজনকে চির দিনের জন্য সরে যেতে হয়।

চুপ করে দাঁড়াল সৌরভী। আবছা তারার আলোয় মনে হয় মূর্তিটা বসন্তের ধাওড়ার আশেপাশে ঘুরছে। চোখে ওর জ্বালা। সৌরভীকে দেখেছে, মনে হয় চেয়ে আছে এই দিকেই। জলকচু ঝোপের আড়ালে সরে গেল সে। কি একটা চিন্তা খেলে যায় সৌরভীর মাথায়।

বৃষ্টিঝরা রাত। লালাজীর গদি বাড়ির পিছনের দিকের ঘর কখানার দরজা জানলা বন্ধ। জমাট অন্ধকারে ডুবে গেছে সব কিছু। জগদ্ধাত্রীর চোখে ঘুম নামছে। শান্তি তৃপ্তির গাঢ় ঘুম নামছে, শীতল বাতাসের মত স্নিগ্ধ করে সারা দেহমন।

আগেকার অভাব অভিযোগের দিনগুলো মনে পড়ে। পাঁচু নিকিরির বৌ, ধাওড়ায় একটা শূয়োর খুপরিতে পড়ে থাকতো; খাটো খাও। সারাদিন খেটেও মিলতো না কিছু। পাঁচু লম্ফঝম্প করার পরই প্রহার শুরু করতো; শীর্ণ প্যাকাটির মত দেহ, সরু লিকলিকে ঠ্যাং। কদাকার ভূতের মত লোকটার চড় চাপড় লাথি খেতো; দুচার দিন পর জগদ্ধাত্রীও রুখে দাঁড়াল। শুধু দাঁড়ালই নয়, ঘোষণা করে চিনকুঠীর মুলুকের পরম সত্য দর্শন—ভাত দেয় কি ভাতারে, ভাত দেয় আমার গতরে।

তারপরই চ্যালেঞ্জ—আয় দেখি যমকাকটো, প্যাটে লাথি মেরে ভাত উঠিয়ে না দিই তবে এক বাপের বিটি লই। আমার সাতটো বাপ।

কিছু দিন পরই বেগতিক দেখে পাঁচু দেশে বনবাসে পাঠায় তাকে।

জগদ্ধাত্রীও ফিরে এসে পথ চিনে নিয়েছে। তার নিজের বাঁচবার পথ।

পয়সা চাই তার। গহনা শাড়ি আরও কিছু। চিনতোড়ের একজনের বাঁধা সে।

—এ্যাই!

ক্ষীণস্বরে মত্তপ জড়িত কণ্ঠে ডাকছে পাঁচু। বাইরের দরজা বন্ধ। ধাওড়ার পচা কাঠের বেড়া নয় যে লাথি মেরে ভেঙ্গে ঘরে ঢুকবে। লালাজীর সেগুন কাঠের দরজা। পাঁচুটা বদলায় নি। তেমনিই রয়ে গেছে। তেমনি মাতাল তেমনি শয়তান। আরও টিকটিকির মত লম্বাই হয়েছে, তেমনি ভূতের মত শীর্ণ।

জগদ্ধাত্রীর ঘেন্না করে ওই মরদটাকে।

বিছানার একদিকে লালাজী ঘুমে মগ্ন। নাক ডাকছে।

ক্লান্ত পরিশ্রান্ত লোকটা বেঘোরে ঘুমুচ্ছে। তবু বুলডগের মত সচেতন ঘুম।

—এ্যাই, শালী।

পাঁচু জগদ্ধাত্রীকে ডাকছে। আঁধারে ওর মত্ত কামনা ফেটে পড়ে কণ্ঠস্বরে।

দরজায় ধাক্কার শব্দ শুনেই তড়াক্ করে ঘুম ভেঙ্গে উঠে পড়ে লালাজী। চোখে মুখে আতঙ্কের ছায়া; কে জানে দলবেঁধে ডাকাতি করতে এসেছে নাকি!

—এ দারোয়ান। ডাকু!

জগদ্ধাত্রীর মোটা দেহটা ধরে হাউ মাউ করে চেঁচিয়ে ওঠে।

পাঁচুর নেশা ছুটে যায়। বাইরেই আজ ঠাঁই তার। বাড়িতে ঢুকতে দিতে মানা। লালাজীর মতলব আজ যেন খানিকটা বুঝতে পারে সে। সারা শরীরে চঞ্চল রক্তস্রোত বইছে।

সব কামনার রেশ থেমে গেছে, ধীরে ধীরে মনের শান্ত গহিন অতল থেকে উঠছে জ্বালা! অসহ্য জ্বালা, শরীরের সমস্ত শিরাতন্ত্রীতে বইছে উষ্ণ রক্ত স্রোত।

এরই জন্যে লালাজী জগদ্ধাত্রীকে এনে তুলেছে তার বাড়িতেই। পাঁচুকে সরিয়ে ফেলে সব কিছু লুঠ করে নিতে চায়। টাকাকড়ি, তার হপ্তার রোজ-কারের প্রতিটি পয়সাই ছিনিয়ে নিয়েও খুশি হতে পারে নি।

তাদের সবকিছু নিয়ে তবে থামবে তারা।

পাঁচু চিৎকার করে ওঠে—খোল দরজা, আজ খুন করে ফেলবো দুটো-কেই। ঘরে খিল দিয়ে ছিনেলিপনা!

ওদিকে লালাজীও ক্ষেপে উঠেছে। রাত দুপুরে তারই ঘরে মদ খেয়ে দাপট দেখাতে আসবে ওই পেঁচোর মত একটা মালকাটা—এটা কল্পনাই করতে পারে না লালাজী। তাকে খেতে দেয়, মাঝে মাঝে দু এক টাকা দেয় তাইই ঢের। মালকাটাকে ওই দিয়েই তার জীবন স্বত্ব কেনা যায়।

লালাজী বের হয়ে আসতেই পাঁচু সামনে জগদ্ধাত্রীকে দেখেই এগিয়ে যায়, জগদ্ধাত্রীও রুখে দাঁড়িয়েছে মেনি বেড়ালের মত দাঁত বের করে।

—তুর মুরোদ বোঝা গেছে, পাতকাটির মত ওইতো দশা। মাগকে খেতে দিতে পারিস না আবার ভাতার! ভাত দেবার ভাতার নয় কিল মারবার গোঁসাই।

—এ্যাও! পাঁচু সরলপুঁটির মত কাঁটা বের করা বুক চিতিয়ে দাঁড়ায় মরদের ভঙ্গীতে।

—ভাগ শালা! লালাজী ওর কোমরেই এক লাথি মেরেছে অতর্কিতে!

টাউরি খেয়ে ছিটকে পড়ে পাঁচু! হাসছে জগদ্ধাত্রী।

লালাজীর উত্তম জেগে ওঠে ওর হাসি দেখে, খপ্ করে ওর টুঁটিটা এক মুঠোর মধ্যে ধরে আসমানে তুলে নিয়ে গিয়ে বাড়ির বাইরে রেখে এসে দরজার হুড়কোটা বন্ধ করে দেয়।

শূন্যে কাঠি কাঠি হাত দুটো তুলে দাপাচ্ছে পাঁচু।

দৃশ্যটা মনে করে হাসিতে ফেটে পড়ে জগদ্ধাত্রী। লালাজী দরজাটা বন্ধ করে ওর লাস্যময়ী ভঙ্গীর দিকে চেয়ে থাকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে। কাপড় চোপড় খসে পড়েছে, মাথার একরাশ চুল ভেঙ্গে লুটিয়ে পড়েছে ঘাড়ের উপর থেকে নিটোল পিঠ ছেয়ে।

পাঁচু চুপ করে গেছে। বৃষ্টি-ঝরা রাত্রে নিরাশ্রয় লোকটা চমকে উঠেছে, পথ চলতে চলতে কোথায় প্রচণ্ড ঠোক্কর খেয়েছে যেন—নখটা উড়ে গেছে। রক্তাক্ত জ্বালা আর বেদনাময় অনুভূতি! ধাওড়ার সেই জগদ্ধাত্রী আর ও নয়। চিনতোড়ের স্রোতে মাথা তুলে দাঁড়ানো একটি রূপবতী মেয়ে; পাঁচুর আর কোন দাবীই নেই তার উপর।

সব হারিয়ে গেছে তার! একটুকু ঘর, একটু আশ্রয়ের ঠিকানা।

পাঁচু নিকিরি বৃষ্টি-ঝরা রাতে পথে দাঁড়িয়ে কাঁদছে! হ্যাঁ! চোখ ফেটে জল নেমেছে। শন শন হাঁকছে হাওয়া।

সৌরভী বাড়ি ফিরে চলেছে। নিস্তব্ধ নিশুতি রাত! ঘুমিয়ে পড়েছে চিনতোড় বসতির কুলি ধাওড়া, কাল ভোর থেকে আবার জেগে উঠবে। দৈত্য পুরীর একক প্রহরীর মত জেগে আছে বয়লার আর কোলিয়ারির পাম্পগুলো! ধক্ ধক্ জল উঠছে নীচে থেকে।

গাছ গাছালির আঁধার জটলা ঘেরা পথটা পার হয়ে বাড়ি ঢুকলো সৌরভী।

লিস্টারের দেওয়া কুকুরটা জেগে আছে। ভরযোয়ান একটা আলসাশিয়ান। জ্বলছে ওর দুচোখ; এগিয়ে এসে মোটা লেজ নেড়ে চারপাশে ঘুরতে থাকে সৌরভীর।

—সর!

তাঁকে সরিয়ে দিয়ে দাওয়ায় উঠলো। ঘরের আলোটা জ্বলছে, একটা টুলে বসে আছে শরণ সিং। ওকে দেখেই উঠে আসে।

বৃষ্টিতে জামা শাড়ি আধভেজা, মাথার চুলে দু একবিন্দু জলকণা লেগে রয়েছে। আলোতে ঝলমল করে।

—কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

সৌরভী ওই লোকটার দিকে চেয়ে থাকে। মনে পড়ে একটু আগের অস্পষ্ট ছায়াচ্ছন্ন মূর্তিটার কথা।

চোখের নজর তার একটুকুও কমেনি। মনে মনে ঘৃণা হয়। ওর প্রকৃত স্বরূপের পরিচয় আজ বেশ টের পেয়েছে সে। একসঙ্গে কারবার করে। সুদের কারবার কিছু কিছু করায় শরণ সিংকে দিয়ে। সুদের পয়সা এমন কি অনেক সময় আসলও ফিরে আসে না সৌরভীর, কতক খায় মালকাটারাই। কোত্থেকে দেবে। কতক মারে ওই পাঞ্জাবী পুঙ্গব।

তবু কোথায় যেন ভাল লেগেছিল ওকে সৌরভীর।

শরণ সিং বলে ওঠে—রাত দুপুরে মোহব্বৎ করনে গিয়া ওহি বসন্তকা পাশ! ক্যা ভেট না হুয়ি? উতো এক লেড়কাকা সাথ হ্যায়। লৌণ্ডা কাঁহাকা।

হা হা করে হাসছে শরণ সিং। ওদের দেশে মেয়ের সংখ্যা স্বভাবতই কম। নিজেরও এত পয়সা ছিল না—মেয়ে কেনে। কোন রকমে দুধের সাধ ঘোলে মেটাবার সখ!

হাসছে হা হা করে লোকটা। খুব একটা গভীর রহস্য আবিষ্কার করে বসেছে। মালুর সঙ্গে বসন্তকে দেখেছে কয়েকবার। সৌরভী দপ্ করে জ্বলে ওঠে।

মুহূর্ত মধ্যে ওই কদর্য ইঙ্গিতে ক্ষেপে উঠে সশব্দে ওর দাড়ি ঢাকা গালেই এক চড় কসে দেয়। হাসি থেমে যায় শরণ সিংএর; জ্বলে ওঠে দুটো নীল চোখ।

সৌরভী ওই নীল চোখের চাহনিকে পরোয়া করে না; বুক ফুলিয়েই জবাব দেয়—ফের যদি ওই কথা কোনদিন বলবি, দেড়েলের দাড়ি এক খি এক খি করে উপড়ে দোব।

শরণ সিং সৌরভীর দাম বোঝে। ওর দেহের স্রোতে ভেসে যাবার স্বপ্ন তার মনে। সৌরভীকে কেন্দ্র করেই চিনতোড়ে তার ভাগ্য ফেরানো। ওই লিস্টারকে বলে কয়ে ওভারম্যানগিরি জুটিয়ে দেয়।

বেইমান সে নয়। মাঝে মাঝে হিংস্রক হয়ে ওঠে। সৌরভীর রাত দুপুরে ওই বসন্তের ওখানে যাওয়াটা কোনদিনই ক্ষমার চোখে দেখবে না সে। তবুও মনে হয় ওতে যেন নিজের পৌরুষও আছে। যে নারীর জন্য বহু মন বহু জন পাগল, সেই মেয়ে একা তারই।

হাসছে শরণ সিং, সৌরভীকে জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করে।

সরে দাঁড়াল সৌরভী।

জীবনে বহু কিছু পেয়েছে সে; একজনকে হারিয়ে বহুর মধ্যে সেই বিদগ্ধ মনের জ্বালা মিটোবার সন্ধান করেছে। কিন্তু যতই ঘুরেছে ঘাটে ঘাটে জীবনের শূন্য পাত্র পূর্ণ করে নিতে, ততই দেখেছে সবখানের জলে থিক থিকে পোকা, কামনার ক্রিমি কীট গিজ গিজ করছে। কলসী আর ভরা হয় নি, শূন্যই রয়ে গেছে। গায়ে লেগেছে মাটি আর পা হয়েছে ক্ষত বিক্ষত। পথ চলাই সার হয়েছে।

—এ সৌরভী!

শরণ সিং ডাকছে, কামনামদির সেই কণ্ঠ। নেশা লাগানো সেই আহ্বান।

—যাও সিংজী। শরীরটা ভাল ঠেকছে না। ভিজে জ্বর আইচে।

শরণ সিং ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। মনে মনে ঝড় ওঠে। রাগ আর অতৃপ্ত কামনার ঝড়।

—যাও। দরজায় খিল দোব। রাত হয়েছে!

চুপ করে শরণ সিং বের হয়ে গেল।

ক্লান্ত দেহখানা টেনে সৌরভী দরজা বন্ধ করে ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

আঁধারে চেয়ে রয়েছে কুকুরটা, লিস্টারের হোম থেকে আনা আসল বিলেতী কুকুর। ওর গায়ে হাত বোলাতে থাকে সৌরভী।

হারানো অতীতের একটি অনুভূতি। কাকে বার বার মনে পড়ে। নিঃশেষ প্রেমের প্রসাদে শূন্য মন তার ভরিয়ে দিয়েছিল।

মেঘ ঢাকা আকাশে একটা মাত্র তারা জেগে উঠেছে। শন শন হাওয়ায় ভেসে আসে বর্ষার দামোদরের ক্রুদ্ধ গর্জন।

চিনতোড়ের জীবনের বহু দিনের সাক্ষী সে, জড়িয়ে আছে এদের জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য একটি অংশ হয়ে।

অবছা অন্ধকারে পলায়মান লোকটাকে চিনতে পারেনি বসন্ত। একটু অবাক হয়ে এসে ধাওড়ায় উঠলো। বাতি জ্বলে নি, দেশালাইটাও ভিজে গেছে জল পেয়ে; কেমন যেন আলো জ্বালতেও ইচ্ছা হয় না।

অন্ধকারেই বসন্ত চুপচাপ বসে আছে। এই মিটিং, ওদের উল্লাস উত্তেজনার দাম কি? তার শেষ কোনখানে গিয়ে হবে তা জানে বসন্ত। সমস্ত চেষ্টা তার ব্যর্থ হয়ে গেল বোধ হয়।

আজ চিনতোড়ের উপর তার বিতৃষ্ণা এসে গেছে। ঘুম আসে না। খাওয়া দাওয়াও হয় নি। মাখনের ওখানে খেতে যেতে মন চায় নি।

হঠাৎ দরজার কাছে কাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চমক উঠল বসন্ত। চিঠি লিখছিল একটা; তাড়াতাড়ি সেটা চাপা দিয়ে উঠে এল।

গৌরী এগিয়ে আসে হাতে কলাইকরা থালায় খান কয়েক রুটি, একটা টিনের ছোট বাটিতে একটু ডাল, পাশে বেগুন কুমড়ো দিয়ে একটুখানি চচ্চড়ি।

—রাতে খেতে যান নি শুনলাম; নিয়ে এলাম দাদা।

কেষ্ট মিস্ত্রির বৌ গৌরী। আড় ময়লা লাল পাড় শাড়ি পরনে, কপালে একটু সিন্দুরের দাগ, মাথায় ঘোমটা; শার্ণ চেহারায় চোখ দুটোই সারা মুখের মধ্যে নজরে পড়ে। আকুল মিনতি ভরা সেই চাহনি।

ওর নীরব আকুতি এড়ান যায় না। বসন্ত জানে সামান্য ওইটুকু সংগ্রহ করতে তাকে বোধ হয় আজ রাতের খাওয়া বাদ দিতে হয়েছে। কেষ্ট মিস্ত্রির রোজকার যেন শরতের বৃষ্টি। এই হাঁক ডাক হুড়ুম দুড়ুম করে এল—একটু পরেই সাফ, চিহ্নমাত্র নেই।

হপ্তার টাকা মদ তাড়িখানা আর জুয়োর আড্ডাতেই যায়। মেরে মেরে লক্ষ্মী বউটাকে আধমরা করে তুলেছে।

বসন্ত ওকে ফেরাতে পারে না—একি! এতো লাগবে না। দুখানামাত্র হলেই চলবে। নিয়ে যাও বাকি রুটিগুলো।

ওর হাতেই তুলে দিল থালাটা একটা সানকিতে নিজের জন্য কিছু রেখে।

—জল? গৌরী ভীরুকণ্ঠে প্রশ্ন করে।

—আছে বোধ হয়। বসন্ত কুঁজোটার দিকে এগিয়ে একহাতে তুলেই নিরাশ হয়ে যায়। কিছুমাত্র জল নেই, তোলা হয় নি বাইরের কল থেকে। শশব্যস্ত হয়ে ওঠে গৌরী।

—থাক, থাক। আমিই এনে দিচ্ছি। পরদিন থেকে কুঁজোটা বাইরে রেখে যাবেন। আমিই তুলে দোব জল।

প্রায়ই এমন হয়। বসন্ত কোন কোনদিন জল না পেয়ে সরকারী চৌবাচ্ছা থেকে শেওলা ধরা জলই তুলে আনতো, না হয় জল না খেয়েই থাকতো কষ্ট করে।

আমতা আমতা করে বসন্ত—আবার তুমি কষ্ট করবে?

—কষ্ট আর কি? আমাকে তো তুলতেই হয় জল, সেই সঙ্গেই না হয় এক কলসী বাড়তি তুলবো।

থালা তুলে রেখে চলে গেল সে। রাতের অন্ধকারে পাশের ধাওড়ার মদন লস্করের ছেলেমেয়েগুলোর কান্না ভেসে ওঠে।

মা বুড়ীও কাঁদছে, মদন বোধ হয় বাড়িতে টাকা কড়িও দেয়নি। এ কান্নার স্বর আলাদা। নাড়ি চুই চুই করা কান্না। খিদের কান্না; জীবনের

সামান্যতম অস্তিত্বটুকু বজায় রাখবার জন্য শেষ প্রচেষ্টার ব্যর্থতায় কাঁদছে ওরা ঘেংড়ে ঘেংড়ে নাকি সুরে। বসন্তের গলায় দলা পাকিয়ে আসে রুটি কখানা।

ব্রেজার বৃষ্টি ধোয়া সকালে বাংলোর মাঠে পায়চারি করছে। ঝকঝকে হলদে জমাট মিষ্টি রোদ কচি শালগাছ মহুয়াগাছের চিকণ পাতায় পিছলে পড়ে, যৌবনের আভাস চারিদিকে। বর্ষার গেরুয়া জলে ভরে উঠেছে দামোদর; পাহাড়ের এ কোল থেকে ওপারের জঙ্গল সীমা পর্যন্ত থই থই করছে জল—ফুলে ফেঁপে উঠছে ঢেউ আউড়ি বাউড়ি বাতাসে। খেয়াপারাপার বন্ধ; খেয়াঘাটের ধারে ছোট একটা ঝুপড়ির বাইরে চারপাই পেতে মাঝিরা তাড়ির ভাঁড় নামিয়ে হল্লা করছে। নদীর মধ্যে একটা ছোট দ্বীপের মত পাহাড়, চারিপাশে ধারাল ফণায় নদী গাছ গাছালির সবুজটুকুকে চেঁছে পুঁছে মুখে পুরেছে। লাল পাথুরে স্তরে গিয়ে আঘাত করছে জলরাশি।

ব্রেজার ভাবছে। বেশ কয়েক বৎসর আগে এই এলাকার বহু জমির উপরিস্বত্ব নিম্নস্বত্ব নিয়েছিল কোম্পানী, সেদিন ভাবেনি এর থেকে এত কোটি টাকা মুনাফা হবে। পড়ো পতিত গড়লায়েক পতিত বাদ, ডাঙ্গা, তড়া জমি, ঘাস অবধি গজায় না; বর্ষার জলে পাথর জমা ডাঙ্গার বুকে এক আধটু শেওলা জন্মায় মাত্র। শাল জঙ্গলও তেমন নেই যে কাঠ বিক্রিও হবে কিছু।

সেই ডাঙ্গাজমির অতলে আজ সোনা ফলেছে।

নোতুন আইন হচ্ছে; মাটির তল থেকে কয়লা তুলে ফাঁক করে আসছিল এতদিন, ফলে দু দশ বছরের মধ্যেই উপরের জমি ধ্বসে পড়ছে। ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে গ্রাম, বসতি, রাস্তা, ধেনোজমি।

উপরিস্থ জমির স্তর ধ্বসে নেমে একাকার হয়ে যাচ্ছে। তাই সরকার আইন করেছে সমস্ত কয়লা তোলা ফাঁকটুকু বালি দিয়ে ভরাট করতে হবে যাতে ধ্বস না নামে।

খরচ বাড়লো অনেক কিন্তু!

চুপ করে ভাবছে ব্রেজার। বাগানে গোলাব কেয়ারির মধ্যে একটা ছাতা বসান, রং চং-এ কাপড়ের নীচে কয়েকটা বেতের চেয়ার; মিসেস

ব্লেজার চুপ চাপ একটা লিলেনের উপর ক্রচেটের এমব্রয়ডারি করছে। সিটিং রুম থেকে ফোনের কনেকশন করা আছে বাগানে। টেলিফোনটা বেজে ওঠে।

—ইয়েস! এগিয়ে গিয়ে ফোনটা তোলে ব্লেজার যেন এরই জন্য সে অপেক্ষা করছিল।

—ট্রাঙ্ক কল ফ্রম ক্যালকাটা। এক্সচেঞ্জের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শোনা যায়, কনেকশন করে দিল কলকাতার সঙ্গে।

এ্যাটর্নির সঙ্গে ব্যবস্থা আগে থেকেই করা ছিল। দামোদর নদী যে রাজা জমিদারের এলাকা দিয়ে এসেছে তাদের সকলেরই সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে গেছে, সকলেই অবাক হয় বালির আবার দাম কি! নদীর বালি ওতো পাহাড় হয়ে জমছে দিন দিন, নদীর বুক বুজে যাচ্ছে, ফলে সামান্য বন্যাতেই ভেসে যায় নদীর দুধারের গ্রাম বসতি; জলধারা ডুবিয়ে দেয় ক্ষেত খামার। সেই বালি উঠিয়ে নিয়ে জল যাবার পথ করে দিলে সুবিধাই হবে সকলের, বন্যার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে। কিন্তু এত টাকা কোথায়, কেউ যদি এ কাযের ভার নেয় তারা উপকৃতই হবে। বালি তোলবার জন্য স্বত্ব দিতে তারা রাজি আছে, তবে কিছু সেলামী লাগবে কাগজপত্র পাকা করে নিতে। কথায় বলে রাজা রাজড়ার ব্যাপার! কথা কইতে যাওয়া দূরের কথা দর্শন করতে গেলেই সেলামী দিতে হয়। হোক না ছোট খাটো ভূঁইহার—আদিবাসী, তবু রাজা তো; শালগ্রাম শিলার ছোট বড় নেই।

কলকাতা থেকে গিলবার্ট কোম্পানীর ফাস্ট এ্যাটর্নি কথা বলছে। ব্লেজারের মতলবে সেও ঠিক সায় দিতে পারে না; পার্টির ব্যবসার স্বার্থ তাকেও দেখতে হবে।

বলে ওঠে—এই স্বত্ব নিতে এতগুলো টাকা বালিতে ঢেলে কি হবে মিঃ ব্লেজার? ইট ইজ নট পেয়িং।

দেড়শো মাইল দূরে পার্বত্য টিলার বাগানে বসে ব্লেজার হাসে মনে মনে। এ কথার জবাব দেবার কিছু নেই। কোম্পানীর এজেন্সি তার ফুরিয়ে যাবে; রোজকারের অন্য পথ চাই। নির্দেশ দেয়,

—কোম্পানী রেজিস্টার্ড করবার ব্যবস্থা করো, ওদের সঙ্গে ডিডস কমপ্লিট করে রাখো, কয়েক দিনের মধ্যেই কলকাতা গিয়ে ফাইনাল করে ফেলতে চাই।

দামোদরের বালি অওাল পর্যন্ত তার স্বত্ব নিয়ে বসবে। অনেক টাকা, না হয় কিছু লোকসানই হবে।

—ইয়েস বিল?

ব্লেজার ফোন নামিয়ে দামী আইভরি কেস থেকে সিগারেট বের করে লাইটার খুঁজতে খুঁজতে বলে ওঠে-- এনাদার বার্গেন জেনি। ইয়েস, ইউ ক্যান কল ইট এ বার্গেন।

—তুমি কি দেশে ফিরবে না? আবার ঝুঁকি নিয়ে স্পেকিউলেশন করছো?

মেম সাহেব হোমের স্বপ্ন দেখে; পার্বত্য বন্ধুর বনসমাকীর্ণ এলাকায় কোন আত্মীয় বন্ধু নেই, ক্লাব-সোসাইটির চিহ্ন নেই। নিজের দামী শাড়ির সংগ্রহ, জুয়েলারি ইত্যাদি কিছুই দেখাবার—তারিফ করবার লোক নেই। ওয়ার্ড-রোবেই ঠাসা হয়ে রয়েছে। মেশবার, আউটিংএ যাবারও কেউ নেই ফস্টার ছাড়া।

ফস্টার। মন্তপ দুর্মদ একটা জ্বালাময় ধুমকেতু। গোঁয়ার লোক, গায়ের জোরেই দুনিয়া চালাতে চায়। জেনি ব্লেজার হাতের কায থামিয়ে দূর মেঘ ছায়াঘন পাহাড়ের দিকে চেয়ে থাকে; বর্ষার ভিজে আকাশের এখানে ওখানে জমাট বেঁধে আছে কোলিয়ারির চিমনি থেকে নির্গত কালো ধোঁয়ার স্তূপ।

ব্লেজার ছোট গাড়িখানা নিয়ে বেরুচ্ছে, টিলার পাকদণ্ডী রাস্তা দিয়ে ছোট সাঁকোটা পার হয়ে মেরুণ রংএর গাড়িখানা বড় রাস্তার বাঁকে উধাও হয়ে গেল।

পথ চলতে গেলে হোঁচট খায় মানুষ, পড়ে গিয়ে ধুলো কাদা লাগে গায়ে। তাই বলে পথ চলা বন্ধ করা যায় না। পায়ের ধুলোকাদা ঝেড়ে মুছে আবার সোজা হয়ে যে চলতে পারে, বাঁচবার দাবী আছে তারই।

পাঁচু এটা সার বুঝেছে। লালাজীকে তার চাই-ই। বেশি চাপ দিলে কি পরিণাম হবে তার নমুনা গতরাত্রেই দেখেছে পাঁচু। বেশি না ঘাঁটিয়ে আপোষ করাই ঠিক করেছে সে।

লালাজীও চতুর লোক; পাঁচুর চেয়েও ফিকিরবাজ। তাই সকালবেলায় গদিতে পাঁচু ফিরে আসতেই উঠে গিয়ে আপ্যায়িত করে,

—কাঁহা থা কাল? দাদাজীকা একঠো বাত নেহি মানো গে?

পাঁচুর যে এমন রসালো দাদা ছিল তা জানতো না পাঁচু। অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

লালা পিটপিটে চোখ মেলে চেয়ে রয়েছে; পাঁচু মাথা তুলবে না; মাথা তোলবার মত মেরুদণ্ড তার নেই। কুকুরের সামনে এক টুকরো রুটি ফেলে দিয়ে তার লেজ নাড়া দেখবার জন্যই যেন ফরমাইস করে লালা।

—এ ব্রিজ মোহন, মালাই আর চপ লে আও।

পাঁচুকে হাতে রাখা দরকার। পাঁচুও আপোষ করে নিয়েছে।

লালাজীর ভাগ্যের চাকা মসৃণ গতিতে চলেছে। কোনখানে কিভাবে তেল দিতে হবে এই গূঢ়মন্ত্র সে জেনে ফেলেছে। ব্লেজার থেকে শুরু করে ফস্টার, মায় পাঁচু নিকিরি, ইয়াকুব সাহেব, তালরুই-এর নির্বিষ ওই অনঙ্গ চৌধুরীকেও ভেট দেয়। কোম্পানীর ইউনিয়নের একজন পৃষ্ঠপোষক। সুতরাং কর্তাদের তদ্বিরেই কোলিয়ারির রেশনসপের মালপত্র যোগান দেয় সে; রেজিং ঠিকের অনুমতির অপেক্ষায় বসে আছে।

পাঁচুকে টোপ দেয়—ওভারম্যান হোবে পাঁচু বাবু?

লালাজীর কথায় পাঁচু স্বপ্ন দেখে।

সব গেছে এই স্বপ্নের পিছনেই, তবু আজও স্বপ্ন দেখে, সব কিছু আবার ফিরে আসবে তার চতুর্গুণ হয়ে।

পাঁচু বর্তমানে ইউনিয়ন নিয়ে পড়েছে; লালাজী, নারকুলিয়া, মেজবাবুও সায় দেয়। পাঁচু ইউনিয়নের ট্রেজারার। ইলেকশন কবে কোনখানে হল তা কেউ জানে না।

ইউনিয়ন চালু হয়েছে পুরো দমে। একটা আলমারি ডোনেশন দিয়েছে লালাজী, ইয়াকুব সাহেব দিয়েছে চেয়ার টেবিল। খানকয়েক পুরোনো কাগজ খাতা তাতে সাজানো। ফিটফাট কেতাদুরস্ত ব্যাপার। সভ্য ভর্তি করা চলেছে। লালাজী মন্তব্য করে—খুব হুঁশিয়ার, বাকি সবকুছ হুসমে রাখনা। সমঝা?

কোম্পানী একটা ছোট খুপরি ছেড়ে দিয়েছে। লাল পতাকা উড়ছে বাঁশের ডগে, একটা টেবিল টুল নিয়ে বসে আছে পাঁচু নিকিরি আর মদন লস্কর; একজন [illegible] নাম লিখছে খাতায়; মেম্বরদের নাম; বাতিঘর থেকে

বের হয়ে পিটের দিকে যাবার মুখেই ঘরটা ; সকলকেই সামনে পাওয়া যায়। মেম্বরদের নাম উঠছে, দুআনা চাঁদা লাগবে মাসে।

খেলার ব্যবস্থা হবে, যাত্রা গান, তামাসা, লোটো নাচ; তাছাড়া মালকাটা-দের জন্য লেখাপড়া শেখানোর ব্যবস্থা হবে। দুআনায় সাড়ে বত্রিশ ভাজা। মাখন বলে ওঠে—লে বাবা নামটা লিখে লে।

বাবু মুখ তুলে ওর দিকে চাইল—তোমার ?

পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল বসন্ত, কথাটা তারই উদ্দেশে। বসন্ত এগিয়ে এসে নামটা বলে। বাবু লিখে চলেছে।

পাঁচু নিকিরি, মদন লস্কর যেন তাকে চেনেই না ভাবখানা এমনি গোছের। পাঁচু একমনে একটা পুরোনো খবরের কাগজের ছবি দেখছে।

শরণ সিং 'পিট মাউথের' দিকে এগিয়ে চলেছে ; হঠাৎ বসন্তকে দেখে চেয়ে থাকে। দিনের আলোয় তাকে নিরীক্ষণ করছে। বসন্তের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই শরণ সিং একটু অপ্রস্তত হয়ে গিয়ে লালাজীর দোকানের মধ্যে ঢুকে গেল।

বসন্ত চেয়ে থাকে ওই দিকে। একটা চক্র মসৃণ গতিতে ঘুরে চলেছে। লালাজীর কারবার আগে কোলিয়ারির বাইরে চল্‌তো, এখন কোম্পানীর সাহেবদের হাতের মুঠোয় এনে ওই কারবার জাঁকিয়ে তুলেছে ভেতরেই। মাখন থামের উপর বসে দলের আর সকলের জন্য অপেক্ষা করছিল। সেও বলে ওঠে,

—ভূতের ভয়ে উঠলাম গাছে, ভূত বলে আমি পেলাম কাছে। ইবার ঘাড়ের উপর বসে রক্ত শুষছে শালা।

ডাঙ্গার কাঁকর আর নেই ; ঝাঁট দিয়ে রাতারাতি এনে চালের বস্তায় মিশিয়েছে। তেলের সঙ্গে মিশছে 'হোয়াইট ওয়েল', তার উপর চোটার সুদী কারবার নাকের উপর দিয়েই চালাচ্ছে। যাকে একদিন ওই বারান্দায় ফেলে প্রহার দিয়েছিল, সেই লালাজী এখন গাড়ি হাঁকিয়ে আসে। সাহেবদের সঙ্গে সিগারেট ফোঁকে, শ্রমিক কল্যাণ আপিসের মাতব্বর।

মাখন, বসন্ত সেই সাধারণ মালকাটাই রয়ে গেল।

লালাজীর গাড়িটা এসে দাঁড়িয়েছে ; ইউনিয়ন অপিস থেকে পাঁচু ছুটে গিয়ে গাড়ীর দরজা খুলে দাঁড়াল ; লালাজী নামছে দয়া করে, মুখে কুশ্রী হাসির বিকৃত রূপ।

বসন্ত মুখ ফিরিয়ে নিল।

মারকুলিয়া, লালাজী চলেছে; পিছন পিছন শরণ সিং। ভবিষ্যৎ কণ্ট্রাকটারের মন যুগিয়ে চলছে শরণ সিং; সেও কিছু পাবার আশা রাখে; ওদের ছাপিয়ে উঠেছে পাঁচু; হন্ত দন্ত হয়ে আগে আগে যেন পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে।

ক্যানটিন; রেশনসপ্!

সবই ইংরাজিতে লেখা। মালকাটাদের জন্য নিশানা করা হয়েছে ইংরাজি ভাষায়।

ওরা সেই দিকে এগিয়ে গেল। ফেটে পড়ে জৌলুস!

—গুডমর্নিং লালাজী!

ফস্টার পিটের দিকে চলেছে, লালাজীকে সম্মান দেখায়। বিনয়ে গলে পড়ে ওর কুমীরের মত চেহারা।

মাখনরা উঠে পড়েছে। দলের আর সবাই এসে গেছে।

—এত দেরি করলি কেনে?

মাখন বিরক্ত হয়ে যায়, বসন্ত জানে পরে যাওয়ার জন্য শরণ সিংএর কাছে কি ব্যবহার পাবে।

কেন যে ওই পাঞ্জাবীপুঙ্গব চটেছে তা এতদিনে টের পেয়েছে খানিকটা। হপ্তার টাকার অংশ ওকে দিতে হয় এই নাকি রেওয়াজ। বসন্ত তা করেনি।

বর্ষার ঝির ঝিরে জলধারা দুহাজার ফিট পাথরের স্তর চুইয়ে পড়ছে। একটা প্রকাণ্ড ভূগর্ভস্থ পুরী, শুধু পথই আছে আর কিছু নেই কেবল জমাট পাথর।

কোলিয়ারির আণ্ডার গ্রাউণ্ড ম্যাপে চৌকা নীল লাল ঘরগুলো আর মাঝখানের সরু পথগুলো দিয়ে এগিয়ে গেলে পেন্সিল যেখানে ঠেকবে জমাট কয়লার স্তরে, তার মাথার উপর দিয়েই বয়ে চলেছে বর্ষার দুকূলপ্লাবী দামোদর, বুকে তার মাতামাতি ঢেউ, ঝড়ো হাওয়ার হাঁকপাড়া তুফান।

ক্ষীণ পাথরের স্তরে সাজান পৃথিবী; জমাট নিরন্ধ্র; তবু কোথাও অদৃশ্য ফাঁকটুকু দিয়ে নেমে আসে তার স্তর ভেদ করে জলকণা; ডবল পাম্প বসান হয়েছে। অন্ধকার সুড়ঙ্গের ধারের নয়নজুলীতে জলের ঝর ঝর শব্দ বেড়েছে। বাতাসে ভাপসা [illegible] গন্ধ।

বসন্ত ড্রিলিং মেসিনের ব্লেডটা জোর করে পাথরের স্তরে বসিয়ে সুইচ অন করে দিয়েছে। জমাট পাথরের স্তরে ঘূর্ণায়মান তীক্ষ্ণধার ফলাটা বিঁধছে, নীরব প্রকৃতির পাষাণ বাধায় প্রতিহত হয়ে ছিটকে আসতে চায় তীক্ষ্ণ ফলা—বসন্ত চেপে ধরেছে হাতলটা; কাঁপছে সর্বাঙ্গ থর থর করে; কপাল দিয়ে ঝরছে বিন্দু বিন্দু ঘাম, শরীরের প্রতিটি পেশীর সূক্ষ্মতম অংশটুকুও কেঁপে উঠছে। কয়লার জমাট স্তরের মধ্যে প্রবেশ করে ড্রিলিং মেসিনের ফলা, তীক্ষ্ণ বেগে ঘুরছে ড্রিলটা।

আশপাশে কয়লার স্তূপ থেকে ওরা কয়লা তুলছে টবে। টিপ টিপ জল ঝরছে। হঠাৎ পিছনে কার লাঠির খোঁচা খেয়ে ফিরে চাইল বসন্ত মেসিন 'অফ' করে। কালো জমাট আঁধারে জ্বলছে একচোখা দৈত্যের মত ল্যাম্পটা। শরণ সিংএর কণ্ঠস্বর ধ্বনি প্রতিধ্বনি তোলে। কাল রাত্রির দৃশ্যটা ভোলেনি। সৌরভীর অবহেলা ভরা দৃষ্টি ফুটে ওঠে। শরণ সিং কঠিন কণ্ঠে প্রশ্ন করে এগিয়ে এসে।

—হিঁয়া তুম ক্যা করতা হ্যায়?

বসন্ত কপালের ঘাম মুছে ফেলে বলে ওঠে—কাষ করছি।

—তিন নম্বরমে কাম করনে কো বোলা তুমকো।

বসন্ত কেব্‌লটা গুটিয়ে নিয়ে জবাব দেয়—হিঁয়াই কাম করেগা, মিত্র সাব নে বোলা।

মাখন, বুধন, ভুবন, মালু, ফকির, আরও কয়েক জন এসে ঘিরেছে তাকে। শরণ সিং বলে চলেছে—ইধার পিছু হোগা। অব ইনক্লাইণ্ড মে চলো তুম লোগ।

একটু চমকে ওঠে ওরা; বহু ভালো জায়গার কয়লা বিশেষ দলের লোক-দের দিয়ে কাটান হয়; বিপদজনক নোতুন কয়লার স্তর কাটতে হয় যাদের সঙ্গে বনেনা তাদের দলকেই।

বাইশশো ফিট নীচেও নোতুন জায়গায় নামতে হবে। সবে কাটাই হচ্ছে সেখানে। ড্রিলিং মেসিন দিয়েও কাটা চলবে না, চার ফিট জায়গায় গুঁড়িহয়ে কোল পকেটের মধ্যে বসে ছিনি দিয়ে টুকরো টুকরো করে ছাড়াতে হবে কয়লা; পরিমাণও সামান্য বেরুবে, এবং সমূহ বিপদ। যে কোন মুহূর্তে মাথার চাল ধ্বসতে পারে—এদের ভাষায় যাকে বলে 'বা[illegible]।

শরণ সিং হুকুম করে—চলো সব কোই।

শরণ সিং বসন্তকে যেন ঠেলে নিয়ে চলে দলবল সমেত। ফকির গজ গজ করছে।

—ওখানে কায করতে কেউ চায় না।

পা রাখা যায় না; অন্ধকার আর গুমোট গরম মাথামাখি হয়ে আছে। কয়লার স্তর ছয় ইঞ্চিতে এক ইঞ্চি ঢালু হয়ে এসে এইখানে জমাট পাথরের শক্ত স্তরে বাধা পেয়ে সোজা নেমে গেছে, প্রায় এক ইঞ্চিতে এক ইঞ্চি গ্রেডেশন। গা টা খাড়া কুয়োর মত সোজা, তেমনি জমাট অন্ধকার; তারই সামনে এসে দাঁড়াল তারা—হিঁয়া। উত্তর যাও।

একটা দৈত্য যেন প্রকাণ্ড হাঁ ক'রে রয়েছে।

বসন্ত থমকে দাঁড়াল; মাখন, ফকিরের মত পুরোনো মালকাটাও চমকে উঠেছে। এমন ভাবে কায করার পরিণাম কি তা ভালোই জানে তারা। মালু চুপ করে চেয়ে আছে; কয়লার কালিমাখা মুখের মধ্যে ডাগর দুটো চোখে জমাট আতঙ্কের ছায়া।

পিস রেটের মাল কাটার কায করা এখানে পোষায় না। বাঁধা মাইনের মালকাটাদের এই কায, জোর করে তাদের দিয়ে করানো হচ্ছে। বসন্ত এগিয়ে যায়—এখানে কায করা যায় না।

শরণ সিং নিরাসক্ত কণ্ঠে জবাব দেয় মৎ করো। পিস রেটকো কাম, কয়লা হোগা তব্ পয়সা। নেহি হোগা, নেহি মিলেগা কুচ।

আইনত ওই কথা বললেও কোন প্রতিকার করা যাবে না তা জানে বসন্ত। ইউনিয়ন থেকে একটি কথাও বলবে না কেউ। তারা জানে মালকাটা শায়েস্তা করবার ঠাঁই এটা। ইউনিয়নের কাউকে—দালালদের কেউ এখানে আসবে না কোনদিনই।

পিস রেটের মালকাটাদের বরং কাযই দেবে না, তবু বাধ্য হয়েই মাখন চুপ করে থাকে। সারাদিন কায করেও এখানে কোন রোজকার নেই।

ফকির স্তব্ধ হয়ে চারিদিক চেয়ে কি দেখছে! বাতাসে বাতাসে এখানে মৃত্যুর কালো ছায়া; মাখন বুধন বসন্ত মালু নীচের দিকে চেয়ে দেখছে। গ্যালারির দুপাশের দেওয়াল থেকে আংটায় বাঁধা একটা দড়ি ঝুলছে, এই ধরে

সিঁড়ির মত ধাপ বেয়ে ওই খাদে নামতে হবে। বাতাসের অস্তিত্ব নেই; নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়, বুকে টান ধরে। হাঁপাচ্ছে ফকির। একটা কয়লার চাল হতে থেকে থেকে ঝুর ঝুর করে কয়লা কুচি ঝরছে। কোন ছায়াঘন ডুংরীর ছবি মনে পড়ে; তরঙ্গ আর সে। আজও সেই ফুলডুংরীর বনে বনে মহুয়া ফোটে; পথ হারিয়ে এতকাল ঘুরে তারা যেন ফিরে চলেছে ডুংরীতে। তরঙ্গ আজও পথ চেয়ে আছে তার; আবার বাঁচবে তারা।

হাঁপাচ্ছে কুকুরের মত ফকির। নয়ানজুলীর জলই আঁজলা আঁজলা করে মুখে দেয়; গন্ধ—তেল গ্রিজের গন্ধ ভরা বিস্বাদ জল; থু থু করে ফেলে দেয়।

আলো নেই—হাওয়া নেই; একবিন্দু জলও তেষ্টায় মুখে দিতে পারবে না; এই জীবনের উপর এতদিনের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ আজ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

গুরু গুরু কাঁপছে কোলিয়ারির রন্ধ্রপথ, কয়লার স্তরগুলো। বদ্ধ বাতাস ঘাত প্রতিঘাতে কেঁপে ওঠে।

বসন্ত মাখনের কথায় ফিরে চাইল। মাখন নেমে গেছে দড়ি ধরে। নীচে থেকে হাঁক পাড়ে—সবাই কি মাদী হয়ে গেলি তোরা? আয়, নেমে আয়।

মালু কথাটা শোনা মাত্র আগে গিয়ে দড়ি ধরে নামতে থাকে। বসন্তও এগিয়ে যায়।

শরণ সিং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে; তার প্রতাপটা দেখাতে চায় ওদের। ফকিরকে লাঠির খোঁচা দেয়।

—তুম ভি যাও।

রুখে ওঠে ফকির—কুন শালা যাবেক হে? পরানের ভয় ডর নাই?

শরণ সিং বলে—জরুর যাবে। তুমার বাপ যাবে।

ফকির চাপা স্বরে গর্জে ওঠে অঙ্গীভঙ্গী করে—আমার ইয়ে যাবেক! রইল তুমার জন, চলল কিষ্টধন। ইমন চাকরিতে পেচ্ছাব করি দিই তিনসের চোদ্দপোয়া।

ফকির হনহন করে উঠতে থাকে।

—ফকির! বসন্ত ডাক দেয়। ফকির জবাব দেয় আজ।

—না! শালা মরবার কলে পা দুব নাই। আমারও মাগ সংসার আছে। ঘর বসতই করবো। ইখানে আর লয়।

শরণ সিং চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। ফকির তার নাকের সামনে দিয়ে চলে গেল জবাব দিয়ে।

মালু বলে ওঠে—চলে গেল লোকটা?

মাখন ছিনি দিয়ে কয়লা চোটানো বন্ধ করে বলে ওঠে

—ঢেঁকি যতই মাথা নাড়ুক না কেনে গর্তেই পড়বেক শেষ মেষ। যাবেক কুথাকে? ফিরে এল বলে।

ফকিরকে কি এক নেশায় পেয়ে বসেছে। হনহন করে এসে সোজা লিফট দিয়ে উপরে উঠে ফকির চলতে থাকে অপিসের দিকে। কয়েকজন মালকাটা ইতিমধ্যেই এসে হামলা স্থরু করেছে ইউনিয়ন অপিসের সামনে।

ওইখানে কায করানো নিয়ে গোলমাল শুরু হয়েছে।

কে বলে—ওই খাদে কায করবো নাই।

—সারাদিনে একচিলতে কয়লা উঠবেক নাই, দম বন্ধ হই মরবো।

অন্যজন বলে ওঠে—ওই দু আনা চাঁদা দিলম, তুমরো ইয়ার পেতিকার করবা নাই? সারাদিন কুয়োদাঁড়া টানবো নাকি হে? তালে মাঠে কুয়োদাঁড়া টানলাম বা। দিব্যি আলো হাওয়া তো মিলবেক।

কিন্তু ইউনিয়নের কর্তারা কেউ নেই, যে যেদিকে পেরেছে সরে গেছে। ফকির এসে উঁকি মেরে দেখে কাগজ কখানাও নেই, সেই বাবুও উধাও। পাঁচু নিকিরি বসেছিল, সেও হাওয়া হয়ে গেছে।

এদিকে ওদিকে ঘুরে দেখে লালাজীর দোকানের এককোণে বসে পাঁচু চা খাচ্ছে। ফকিরকে আসতে দেখে এগিয়ে এল।

কালি ঝুলি মাখা চেহারা; মাথার চুলে কয়লার গুঁড়ো; নাক কানের ভাঁজে কয়লার চিটচিটে দাগ, মুখ চোখ থমথমে। ফকির বলে ওঠে,

—একবার আসানসোল যাবি পাঁচু?

—কেনে? পাঁচু ঠিক বুঝতে পারে না। ওর গলার স্বরে থমথমে ভাব। ফকির এগিয়ে আসে, চারিদিক চেয়ে বলে ওঠে চুপি চুপি,

—সেই যে কুথাকে লিয়ে যাবি বলছিলি? সেই যে রে ইয়ের কাছে?

পাঁচু হঠাৎ মনে করতে পারে কথাটা; আসানসোলের নামো ধাওড়ার ঘরে কে যেন আজও ওর পথ চেয়ে আছে। ফকিরের ওই কিম্ভূতকিমাকার কালি-মাখা মূর্তির দিকে চেয়ে বলে ওঠে গম্ভীর ভাবে,

—তা চানটান করে একটু ছিমছাম হয়ে লাও, এমনি হয়ে সিখানে যাবা কি করে?

ফকির খুশি হয়ে ওঠে—বেশ, বৈকালেই চল তালে।

পাঁচু মনে মনে কি ভেবে জবাব দেয়—বেশ।

ফকির এগিয়ে চলে অপিসের দিকে। দুপুরের রোদ ম্লান হয়ে আসে গাছের মাথায় ওপারের শালবনে; নীল ছায়া লেগেছে ধ্যানমগ্ন প্যানচোত পাহাড় সীমায়। আয বহু দিন পর কাজ পালিয়ে দিনের আলোয় ডুব দিয়েছে সে। মুক্তির স্বর শুনেছে সে আজ। কোনদিনই এই অন্ধকার পাতালপুরীতে আর ঢুকবে না। তরঙ্গকে ফিরে পাবে, আবার ফিরে পাবে তার সেই হারানো দিন। শ' পাঁচেক টাকা জমেছে, ফিরে যাবে সে দেশে।

অপিসে এসে ওঠে। জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে ভিতরের বাবুদের দিকে চেয়ে থাকে। যে যার কাযে ব্যস্ত। খটাখট শব্দে টাইপরাইটার মেসিন চলেছে। টেবিলের উপর নানা কাগজ; মাঝে মাঝে ফোন বাজছে। পিটএর ডুলির ঘণ্টার মত এ শব্দ নয়—হলেজ স্টেশনের ঘন্টির চেয়েও মিষ্টি।

—কি চাই রে? একজন বাবু ওর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে।

সারা পিঠ, বুকময় তখনও কয়লার গুঁড়ো মাখা। চিকন মসৃণ সেই কালো গুঁড়োগুলো ঘামের সঙ্গে মিশে একটা আস্তরণের মত বসেছে সর্বাঙ্গে।

—আজ্ঞে মাইনে আর পেভিডেন ফন্। ভয় মাখানো স্বরে কথাগুলো বলে ফকির।

বাবু বিড়িতে শেষ টান দিয়ে পোড়া অংশটা মেজেতে ফেলে জুতোর তলা দিয়ে মাড়াতে মাড়াতে বলে,

—কি বলছিস? ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারে না ওর কথা।

—আজ্ঞে কায আর করবো নাই। পাওনা মিটাই দাও চলে যাবো।

—দরখাস্ত দিয়ে যা। টিপছাপ লাগবে।

—তা দিব আজ্ঞে। ফকির কালিমাখা আঙুলটা বাড়িয়ে দেয়। যেন

এখুনিই সব হয়ে যাচ্ছে। বাবু পয়সার গন্ধ পায়। এদিক ওদিক চেয়ে বলে ওঠে—পঁচিশ টাকা লাগবে কিন্তু, সব ব্যবস্থা করে দেবো।

—পঁচিশ টাকা! এক কুড়ি পাঁচটো টাকা!

—হ্যাঁ! বাবু কাযে মন দেয়। যেন টাকার কোন লোভ তার নেই। নির্লিপ্ত। একটু কি ভেবে বলে ওঠে ফকির—তা দিব বটে।

পাঁচু বারবার তার দিকে চেয়ে দেখে। স্নান করে ক্ষার সাবান মেখে সাফ সুতরো হয়েছে ফকির, তবু পনেরো বছরের জমানো কয়লার কষ একদিনের সাবান ঘসায় ওঠে না। দেহ মনে তার ছাপ পাকা রং-এর মত জড়িয়ে গেছে। একটা ফরসা কাপড় গায়ে হাঁড়ির ভিতর থেকে লাটভাঙ্গা কোচকানো মেরজাই আর বগলে একটা গামছা জড়ানো পুঁটুলিতে তরঙ্গের ফেলে যাওয়া কটা রূপোর পঁউছে পায়জোর, তারই জিনিস আজ আবার তাকেই ফিরিয়ে দিতে চলেছে। রাস্তার ধারে মণ্টার পানের দোকানে টাঙ্গান আয়নায় বার বার চেহারাখানার দিকে চেয়ে পকেট থেকে কাঁকুই বের করে মাথা আঁচড়াতে থাকে।

—মিঠে পান দে দিকিন। ফকির আজ দিলদরিয়া।

মণ্টাও একটু অবাক হয় ফকিরকে এই বেশে দেখে। পানটা জলের বালতিতে চুবিয়ে পাতার শির ছাড়াতে ছাড়াতে বলে ওঠে,

—কোথায় যাবে নাকি গো? সিনেমা দেখতে?

ফকির কাঠের বেঞ্চিতে বসে উসখুস করছে রাস্তার দিকে চেয়ে; ডিসেরগড় থেকে বাস আসবার সময় হয়ে গেছে, পাঁচুর দেখা নেই। মণ্টার কথায় বলে ওঠে—চলে যাবো বাবু এখান থেকে! আর কাম করবো নাই খাদে।

পানে চুন বোলানি বন্ধ হয়ে যায় মণ্টার, এই চিনকুঠী থেকে কায ছেড়ে নিজের খুশিতে চলে গেছে এমন বিশেষ কাউকে নজরে পড়ে নি। তাদেরই একজনকে চোখের সামনে দেখেও যেন বিশ্বাস করতে পারে না।

—তাই নাকি গো?

—হুঁ ত কি? ফকির সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে।

পাঁচু হেলতে দুলতে আসছে। ফকিরের ছটফটানি থামে। পাঁচু দেরি করে এতক্ষণ যেন তার যাওয়া পণ্ডই করে দিচ্ছিল।

—এত দেরি হল যে?

বসতে বসতে পাঁচু বলে ওঠে—আর একটা পান লাগা মণ্টু। আঃ!

বেঞ্চিতে হাত পা ছড়িয়ে বসল পাঁচু—আসুক কেনে বাস তোমার? ছটফট করছো কি গো? দেরি এখনও ঢের।

ফকির এক দৃষ্টে ডিসেরগড় থেকে আগত ছায়াঘন রাস্তার দিকে চেয়ে আছে; কাদাজাম অর্জুন গাছের জটলা, ফাঁক দিয়ে বাসখানা বেরুল। বাতাসে ওঠে গুরু গুরু শব্দ। কেমন যেন ভয় ভয় করে, কোথায় কতদূরে চলেছে সে, দীর্ঘ দশ বছর পর চিনতোড়ের বাইরে যাচ্ছে। মুক্তি পেয়েছে সে এই জীবন থেকে। খুশিতে মন ভরে ওঠে। হর্নের শব্দ এগিয়ে আসে।

—ওঠ রে পাঁচু।

পাঁচু একটু জিরিয়ে নিচ্ছিল, অবেলায় লালাজীর গদিতে বেশ আতপান্ন আর দই জুটেছিল। পেটটা ভরে রয়েছে। গজ গজ করতে থাকে আপন মনে।

—শালা বুড়োর ভীমরতি ধরেছে।

আলোজ্বালা জি-টি-রোড। শব্দমুখর, ছন্দমুখর জীবন। সারা বর্ধমান জেলার বাস লরী ট্যাক্সি যেন জমা হয়েছে এই রং বাহারের হাটে। হর্ন বাজিয়ে ছাদ সমান উঁচু দিল্লী কানপুর-এলাহাবাদগামী মাল বোঝাই ট্রাকগুলো আগাগোড়া তেরপল মোড়া অবস্থায় ছুটে চলেছে ঝড় তুলে।

দোকানে আলোর ঝলক, ফকির এতটুকু হয়ে গেছে ব্যাপার দেখে। চিনতোড়ের টিমটিমে ধাওড়া কোথায় হারিয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে দামোদরের ওপারে ছায়াঘন প্যানচোত পাহাড় সীমা।

যেতে যেতে রিক্সায় চুপ করে বসে ভাবছে ফকির। আঙুল গুনে হিসাব করে পাঁচুর আড়ালে। আট আনা খসেছে চায়ের দোকানে, আট আনা নেবে রিক্সাওয়ালা। গোটা টাকাটাই গেল। পাঁচুকে সিগারেট কিনে দিয়েছে, তারই ভুরভুরে গন্ধ ছাড়ছে টানে টানে।

—কতদূর রে?

পথের রূপ দেখে সে। দুপাশে আবছা অন্ধকার, সরু রাস্তার ধারে হুইয়ে পড়া খোলা খাপ্‌রার ঘর; ড্রেনে থিকথিক করছে বর্ষার জমা জল। মশা উড়ছে।

মাঝে মাঝে এক একটা লাইট পোস্টের ধারে কারা রং চংএর শাড়ি পরে হাসাহাসি করছে। ওদের টুকরো কথার শব্দ কানে আসে। কে যেন সুর ধরে।

ঝিঙা ফুল লিলেক জাতি কুল গো
পিরীতি হোল বড় শূল।

মানভূমের পল্লী অঞ্চলের গান ছেলেবেলায় অনেকবার শুনেছে ফকির। মনটা কেমন উদাস হয়ে যায় সেই সুরে। ফুক ফুক করে একটা কালো মেয়ে বিড়ি টানছে আর গান গাইছে।

এক উঠোন আর খুপরি ঘর; মাটির দেওয়াল, সান বাঁধানো চটা ছাড়া উঠোন, খাপরার নীচু ছাউনি; ইলেকট্রিক আসেনি এখানে। তেলের বাতি টিম টিম করছে।

—তরঙ্গ কই গো? অ মাসী।

পাঁচু পরিচিত এখানে। সোজা ঢুকে গেল। ফকির ইতস্তত করে অচেনা এই অদ্ভুত জায়গায় ঢুকতে।

কে যেন আবছা আঁধারে সরু পথটায় ওর ঘাড়ের উপরই পড়ে; একটা বিচিত্র অনুভূতি। উষ্ণ নরম স্পর্শ; মদের টক টক নেশা ধরানো গন্ধ। চমকে ওঠে ফকির।

মেয়েটি সামলে নিয়ে বলে ওঠে—মরণ! ঘাটের মড়াও ইবার ভিড়ছে ইখানে। ইকি কাশী এয়েছো নাকি ভাই? বগলে যে সাঁয়া পুঁটুলি।

পাঁচু এসে পড়ে ইতিমধ্যে, ফকিরকে সরিয়ে নেয়—চল ভিতরে।

মেয়েটি আঁধারে মিশে যেতে যেতে ফোড়ন কাটে—হ্যাঁ, বাগিয়ে লিয়ে যাও স্যাঙাতটোকে; ফ্যাচ্‌কা গরু।

পাঁচু জবাব দেয়—গরু লয় দিদি, বলো এঁড়ে গরু। বকনার খোঁজে এসেছে।

কেমন চমকে উঠেছে ফকির। পাঁচু তাকে ঠকিয়েছে নিশ্চয়। বেউস্তে পাড়ায় এনেছে এতদিন বাজে কথা বলে।

ফকির রুখে দাঁড়িয়েছে। সে বগলের পুঁটুলিটা চেপে ধরে বলে ওঠে,

—না, যাবো নাই ভিতরে।

—সে কি গো! তরঙ্গকে বলে এলম।

তরঙ্গ! তরঙ্গ পড়ে আছে এই নরকে! কি যেন ভাবছে। পাশ দিয়ে দুজন লোক টলতে টলতে ভিতরে গিয়ে ঢুকলো দুটো মেয়ের কাঁধে ভর দিয়ে। জড়িত কণ্ঠে বলে তারা,

—পা আমার টলে না ভাই; পেঁচি লই বুঝলে। এই নাইনে এতকাল আছি।

—চলো। পাঁচু ওকে হাত ধরে নিয়ে চলেছে। অসাড়ের মত চলেছে ফকির। ঠিক মানতে ইচ্ছে করে না। তরঙ্গ এখানে আসবে না এটা সে নিশ্চিত জানে।

—এসো গো জামাই, এসো। ইটি কে?

একপাল মেয়ে উঠোনে জটলা করছিল। মুখে সস্তা পাউডারের ছোপ, কাল রংএর উপর সাদা আস্তরণ পড়েছে খড়িপড়া পুরোনো চালকুমড়োর মত। পাঁচুর সঙ্গে ফকিরকে দেখে একটি কম বয়সী মেয়ে মাথায় ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢাকবার চেষ্টা করে, কৃত্রিম লজ্জায় যেন ভেঙ্গে পড়ে।

—ওমা ভাসুর ঠাকুর যি গো। ছায়া মাড়াস নি লো গঙ্গা ছান করতে হবেক।

কে তাকেই ঠেলে দেয় ফকিরের দিকে, হুড়মুড়িয়ে গিয়ে পড়ে মেয়েটা ওর গায়ে। ফকির জড়সড় হয়ে গেছে।

বিচিত্র পরিবেশ। খোলার ঘরের মেজেতে একটা খাটপাতা, ফিটফাট বিছানা। নীচে এনামেলের হাঁড়ি কুঁড়ি, বাটি ঘটি, একপাশে দুখানা ইটের উপর বসানো রং চটা বাক্স, দড়ির আলনায় ঝুলছে কখানা শাড়ি, জামা; একপাশে টাঙ্গান কার্তিক পুজোর ময়ূরের পাখনা। ও পুজোটার এখানে ধুম বেশি।

—তরঙ্গ কই গো? ফকির বার বার তাকেই খুঁজছে। তার আশাতেই আজ সব ছেড়ে এসেছে বাইরে।

পাঁচু কোথায় সরে গেছে তাকে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে। মেয়েটা গায়ের জামা খুলে ফেলেছে; বিশ্রী কদর্য ভঙ্গীতে নিঃশেষ যৌবনের শেষ ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে যেন প্রেতাত্মার মত খিলখিল করে হাসছে।

—তরঙ্গ, তরঙ্গ করে যি গেলা গো। রাখো দিকি ওই পুঁটুলিটা। কি যক্ষির মত আগলে আছো। তরঙ্গ ছাড়া কি মেয়ে নাই? না চোকে ধরে না? সরাও পুঁটুলিটা!

জোর করে ছিনিয়ে নিতে যায় পুঁটুলিটা, ফকিরও উঠে দাঁড়ায়। ওর মধ্যেই ওর যথাসর্ব্বস্ব। কোম্পানির দেওয়া কয়েকশো টাকা, সারা জীবনের শেষ সঞ্চয়, তরঙ্গের ফেলে আসা ক'খানা রূপোর গহনা আর শাড়ি।

—না, খবরদার।

বুক দিয়ে জীবনের শেষ সঞ্চয় আর মধুর স্মৃতিটুকুকে জড়িয়ে রাখতে চায়। চোখদুটো জলে ওঠে—না।

—বাঃ, বেশ তো? কি আছে দেখি ওতে।

থাবলে ধরে পুঁটুলিটা অর্ধনগ্ন ওই মেয়েটি, ফকিরের শরীরে ফিরে আসে দুর্মদ জোর, এক ধাক্কায় ওকে ছিটকে ফেলে দিয়ে দরজাটা খুলে বের হয়ে আসতে যায়, পালাবে এখান থেকে এই মুহূর্তে।

মেয়েটি পড়ে পড়েই আকাশ ফাটানো চিৎকার করে ওঠে,

—খুন করে ফেলালেক গো, দৌড়ে আয় গো তুরা। মানস্থরে এসেছে গো।

খন খনে কাঁসা ফাটার আওয়াজ, বস্তিতে একটা চাঞ্চল্য পড়ে যায়; এ সব এখানের নিত্যকার ঘটনা; মুহূর্তমধ্যে বারান্দায় একটা গামছাপরা বিরাটকায় জীবকে দেখে থমকে দাঁড়াল ফকির।

উত্তমাঙ্গ অনাবৃত, মাংসের চলন্ত একটা স্তূপ; মাথার চুল দেখে বোঝা যায় মেয়েমানুষই। কোন রকমে গামছা জড়িয়ে লজ্জা নামক বস্তুটিকেও লজ্জা দিয়েছে।

হাঁড়ির ভিতর থেকে আওয়াজ বের হচ্ছে—ধরতো ওকে বেজা; খুন-খারাপি করতে আসে বিমলীর বাড়িতে?

বিড়ালের শিকার ধরা করে দুখানা হাত এসে ফকিরের টুঁটি টিপে ধরে।

—তরঙ্গকে খুঁজতে এসেছি আমি। ফকির আর্তনাদ করে।

—তরঙ্গওয়ালা রে? নিয়ে যা বুড়োকে।

হুকুম দেয় সেই মাংস স্তূপ; দাঁড়াতে পারছে না; দাওয়াতেই থপ্ করে বসে পড়ল; রায় দিয়ে যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে—এ্যাই বুচি, হাওয়া কর।

—করছি গো মাসী।

ফকির কি যেন বলবার চেষ্টা করে, কিন্তু লোকটা ওর মুখে একটা হাত চাপা দিয়ে টেনে নিয়ে চলেছে আঁধারে; কে যেন টান মেরে বগল থেকে পুঁটুলিটা ছিনিয়ে নেয়, ফকির ধরে রাখবার চেষ্টা করে। একটা শব্দ নাকের কাছে, প্রচণ্ড আঘাতে টলে পড়ে সে। ঠোঁটে ভিজে উষ্ণ আভাস, জিবে অনুভব করে নোনতা একটা স্বাদ। রক্ত! রক্ত পড়ছে টপ টপ করে।

সব কেড়ে নিয়ে তাকে রাস্তায় ঠেলে বের করে দিয়ে শাসায় দৈত্যের মত লোকটা—সোজা চলে যাবি, লইলে দু আধখান করে দোব হ্যাঁ।

ফকির নির্বাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে আছে, নাক দিয়ে রক্ত ঝরে জামাটা ভিজে উঠেছে।

কেষ্ট মিস্ত্রি সেদিন বাড়িতে পা দিয়ে একটু অবাক হয়ে যায়। গুনগুন করে গান গাইছে বৌটা। এককালে ওর গলা মিষ্টিই ছিল; অভাব অভিযোগ আর অযথা মার খেয়ে কান্নার দাপটে গলার স্বর বেসুর হয়ে উঠেছে। তবুও গুনগুন করে গান গায় গৌরী। স্নান সেরে চুলগুলো ঘাড়ে খুলে রেখেছে, নীল শাড়িতে আধময়লা রং মানিয়েছে চমৎকার। ছেলেপুলে হয়নি, যৌবন তাই শত লাথি ঝাঁটা খেয়ে যাই যাই করেও থেকে গেছে। বাটনা বাটছে আর গুনগুন করে সুর ভাঁজছে।

সেই রাত্রে হাটতলায় যাত্রার গানের একটা কলি। ঝকমকে পোশাকপরা রামের মুখখানা ভেসে ওঠে; আহা! বেচারার দুঃখে মন ভরে ওঠে। সুন্দর ছেলেটা! গুনগুন করে সুরটা মনে রেশ তোলে—

যৌবন যে যায় গো সখি
বঁধু ফিরে না চায়
মোর ধরম রাখা দায়॥

—বাঃ! বেশ সোন্দর গাইতে পারিস মাইরী, একটো ঘসির মেডেল দোব নাকি?

নেশার পয়সা জোটে নি, মনটা ভাল ছিল না। গৌরীর এই মধুর ভঙ্গী দেখে তবু মনটা খুশিতে ভরে ওঠে।

ওর উল্লাসধ্বনি শুনে চমকে ওঠে গৌরী। ধাওড়ার বারান্দায় একটু জায়গা ছেঁড়া চটের পর্দা দিয়ে ঘেরা ; রাস্তা থেকে অন্দরের ওইটুকু ছিন্নময় পার্থক্য। মাথা পিঠের আদুড় অংশটুকু দেখে ফিরে চাইল, চোখের তারায় সেই চমকের আভা ; কেষ্ট মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকে। গৌরীর এই মনের দিকে কোনদিনই সে দৃষ্টি দেয় নি। দেবার অবকাশ তার ছিল না।

সুন্দরীই ছিল এককালে। ওদের ঘরে সুন্দরী মেয়ে মেলে, কিন্তু গৌরী অনেক দিক থেকেই তাদের চেয়ে সেরা ; কেষ্টার চেয়ে অনেক গুণে ভালো। এতদিন এত মারধোর অত্যাচার অভাব মুখ বুজে সয়ে এসেছে। মুখ ফুটে কোনও প্রতিবাদ করেনি। মাতাল—সর্বনাশা কেষ্ট, দেশের ঘর বাড়ি বিষয় আশয় যৎসামান্ত যা ছিল সবই আজ জুয়োয় খুইয়ে পুড়িয়ে পথে নেমেছে, সে পথ এসে থেমেছে এই চিনকুঠীর দেশে। যে দেশের উপরে নীচে, ভিতরে বাইরে কেবল কালো, আঁধার মেশা কালোর স্তূপ। কেষ্ট সব হারিয়েছে তার, গৌরী হারিয়েছে তার মন, রূপ যৌবন, সেই মিষ্টি হাসি। আজ যেন হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েছে কেষ্ট, সবই তার আছে। কিছুই হারায়নি।

—কি গো ? হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছো যে ? বসো।

একটা কাঠের পিঁড়ি এগিয়ে দেয় তার দিকে। কেষ্ট চেপে বসে। মন খুশীতে ভরে ওঠে।

—তালের বড়া হচ্ছে বুঝি ?

—হুঁ !

গৌরী চোখ মটকে একটু হাসে। বাতাসে মিষ্টি গন্ধ, আকাশে শেষ বর্ষার কালো মেঘস্তূপ ঘিরে আঁধার নেমেছে। বৈকাল থেকেই নেমেছে সন্ধ্যার ঘনঘটা। পথের ধারে শিরীষ আর মেহগনি গাছে ভিজে বাতাসের আনা-গোনা।

ছেলেবেলাকার দিনগুলো কেষ্টর সামনে ভেসে ওঠে। গাঁয়ের পাশে বনগড়ানি খাত বয়ে চলেছে, মহুয়াগাছের ঝাঁকড়া পাতায় বৃষ্টির সবুজ কালো ছায়া, তালগাছের সারি দেওয়া পুকুরের উঁচু পাড় থেকে সশব্দে আছড়ে গড়িয়ে পড়ে পাকা তাল; পাতার আড়ালে উঁকি মারে কাঁদি কাঁদি অগুনতি রং ধরা ফল ; পুকুরের জলে সোনালী চোখ বের করে তাল দু'একটা ভাসছে। তাই কুড়োনোর ধুম। কে ক'গণ্ডা জমা করতে পারে। তারই জন্যে ভোর রাতে

মাঠ পুকুরের ধারে আনাগোনা; কোন দুষ্ট ছেলে প্রথম তালপাতায় একটা ঢিল ছুঁড়ে খড়াং করে শব্দ তুলে একটা মস্ত পাথর জোরে পুকুরের জলে ছুঁড়ে দেয়—যেন তাল পড়েছে! কেউ না কেউ ছুটে আসবেই তালের লোভে!

হি হি হাসছে গাছের আড়ালে ছেলের দল! কেমন জব্দ!!

তালের মাড়িতে চালগুঁড়ি মিশিয়ে কাঁচা মহুয়া পাতায় আটকে সেদ্ধ করতে দেয়; পাতপিঠে। তালের গন্ধ, সিদ্ধপাতার গন্ধ মিশে একটা বিচিত্র সৌরভ ওঠে কেষ্টর মনে। প্রাচুর্যের দিন, শান্তির দিন।

বাল্যের স্মৃতি সৌরভিত মুহূর্তগুলো আনন্দের ক্ষীণ আভায় ভরে তোলে তার আজকের শূন্যতা।

—আজ যে জন্মাষ্টমী, তালের বড়া খেতে হয়।

—হুঁ! তাহলে বল কেষ্ট ঠাকুরের জন্মোদিন? এ্যাই আমার?

গৌরী চপল হয়ে ওঠে—উঁহু, তুমি সে কেষ্ট নও। তার ছিল ষোলশো গোপিনী।

কেষ্ট পিঁড়ির উপর চেপে বসে গরম বড়ায় কামড় দিতে দিতে বলে,

—পয়সা নাই তাই, নাহলে এ মুলুকে ষোলশো গোপিনীর অভাব? একবার ওঠে কাঁটায় একটা দান, না হয় জাহাজে? তিন কিস্তা দান, গুটি তিন মোড় মারলেই ব্যস; তিন তিরিক্কে নয়; ন'গুণ পেয়ে যাবো। এক টাকাটায় ন'টাকা, কুড়ি টাকায় প্রায় দুশো টাকা; তা শালা ঈশ্বরে কেওট মহা ধড়িবাজ খেলোয়াড়, বেগতিক দেখলেই দু'হাত চেপে ধরে।

হঠাৎ গৌরীর মুখের দিকে চেয়েই চুপ করে যায়, সেই হাসির আভা মিলিয়ে গেছে, একটা গাম্ভীর্য ফুটে ওঠে তার মুখচোখে, উনুনের লালাভ আঁচটা মুখে কপালে পরশ বোলায়। থমথমে মুখ চোখ।

—রেগে উঠেছো? না।

গৌরী কড়াইটা দুম করে নামিয়ে বলে উঠে—যে রামায়ণ শোনাচ্ছো এতে পুণ্যির সীমে নেই। লজ্জা করে না তোমার? লাজ লজ্জা নেই। মদ আর জুয়ো।

—লাজ! লাজ থাকবে মেয়ের। আমি মরদ মানুষ। বাপের বেটা—কিষ্ট দত্ত। আসুক কে আসবে লাইনের কাযে আমার সঙ্গে। বাড়তি রোজকার করি, একটু নেশাভাঙ—টাসটা আসটা করি! কুটু সম্বন্ধীর বাপের পয়সায় করি না।

—খুব রোজকারই করো? তাই মাগকে টেনে বার করো পরপুরুষের সামনে। ছিঃ! গৌরীর মন বিষিয়ে উঠেছে।

দপ্ করে জ্বলে উঠে কেষ্ট; স্বভাবই অমনি। একে ইয়াকুব সাহেবের দোকানে বাকি মেলেনি। এর ওর কাছ থেকে দু'এক ঢোক মাত্র পেয়েছে বাড়তি, চাপা নেশার আগ্রহটা বেড়ে চলে। তিরিক্ষি মেজাজ ক্রমশ ধূমিয়ে ধূমিয়ে দপ্ করে জ্বলে উঠেছে। পিঁড়ের উপর সোজা দাঁড়িয়ে পড়ে কেষ্ট।

—মাগের নাক নাড়া খেয়ে থাকবো নাকি? ধ্যুত্তোর! সতী! জন্ম গেলো ছেলে খেতে আজ বলে ডান।

এক লাথিতে সানকিটা উলটে ফেলে সে, গড়িয়ে পড়ে বড়া কটা উঠোনের কাদায় ঘাসে।

গৌরী চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। বহু কষ্টে আজ সে যোগাড় করেছিল ওই ক'টির। এমনি নির্দয় অবহেলায় শিউরে ওঠে তার মন। সমস্ত সুর বেসুরো বেজে ওঠে। কেষ্ট থালাটা ছিটিয়ে ফেলে হনহন করে বের হয়ে যায়।

আজকের ঘটনা নয়, যখনই গৌরী এমনি করে এগিয়ে গেছে বার বার ওর দিকে, নির্দয় নিষ্ঠুর লোকটা তার সব সেবা কঠিন স্বরে প্রত্যাখ্যান করেছে, বেয়াড়া স্বভাব কোনদিনই শোধরাল না।

ছিটিয়ে পড়ে থাকে সব আয়োজন।

উনুনের আঁচ জ্বলে যাচ্ছে। গৌরী অনুভব করে দুফোঁটা চোখের জল কখন তার অজানতে ওই গনগনে আগুনের তাপে পড়ে ধোঁয়া হয়ে অসীমে মিলিয়ে গেল। নিষ্ফল, ব্যর্থ এ কান্না।

একটা স্বতঃপ্রবৃত্ত প্রতিবাদ ফুটে ওঠে ওদের মনে। তুষের আগুনের মত ধিকি ধিকি জ্বলছে, একটা সূত্র ধরে বের হয়ে আসছে।

ওই পিটের মধ্যে তারা কায করতে চায় না। করবে না। অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে তারা। পিট থেকে গলদঘর্ম হয়ে উঠে এসে দেখে বসন্ত ইতিমধ্যেই জটলা শুরু করেছে। ফস্টারকে ঘিরে ধরেছে তারা। ফস্টার সাফ জবাব দেয়—ইউনিয়ন থেকেই অভিযোগ জানাও। একা কেউ বললে কোম্পানি শুনবে না।

ইউনিয়নের পাণ্ডাদের দেখা সাক্ষাৎ নেই। পাঁচু, মদন ছুটোছুটি করছে আপন মনেই।

বসন্ত, মাখন ওরা চুপ করে শিরীষ গাছের নীচে বসে হাঁপাচ্ছে। মাঠে আয়োজন চলেছে মিটিং-এর। দলে দলে মালকাটারা জমা হচ্ছে।

নীরব দর্শকের মত বসে আছে বসন্ত। দেখছে ওই ক্ষুব্ধ বিক্ষুব্ধ জনতাকে।

লালাজী ক্যানটিন থেকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ওদের দিকে। অকারণেই নায়কুলিয়া ঘোরাফেরা করে, বসন্ত চেয়ে দেখে ওই তেলেজি কিসের যেন সন্ধান করছে।

অধৈর্য হয়ে ওঠে জনতা। টিপিটিপি বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ক্রমশ খবরটা প্রকাশ পায় লোকের মুখে মুখে।

যদু পতিতুণ্ডি মশায় কলকাতার নামকরা এ্যাডভোকেট ; তার সময় নেই। এখানকার একজন নেতা তালরুই-এর মেজবাবুর হাতে এসব দেখা শোনার ভার। তিনি এসে পৌঁছেন নি। সমবেত জনতা উত্তেজিত হয়ে ওঠে,

—কই সে গেল কোথায় ?

পাঁচু নিকিরি, কেষ্ট, মদন নস্কর এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে। আসানসোল থেকে আসবার জন্য ট্যাক্সি ভাড়া চেয়েছিল মেজবাবু ; ফণ্ডে টাকা তেমন নেই, অগত্যা আনা হয় নি। মেজবাবুর সম্মান রক্ষা করতে না পারলে আনা ঠিক নয়।

মাখন উঠে পড়ে—আসবে না ?

—উঁহু !

বসন্ত চুপচাপই বসে ছিল, শিবহীন যজ্ঞ। সেক্রেটারি নেই, কেই-ই বা মুখপাত্র হয়ে বলবে ? পাঁচু নিকিরি উঠে দাঁড়ায়। ঋণপাঁড় নেমকহারাম মাতাল পাঁচু আজ নেতা। কে যেন বলে ওঠে—লালাজীর পোষা কুকুর !

অনেকেই সরে পড়ে ক্ষুণ্ণ মনে, উত্তেজিত সুরে কথাবার্তা শোনা যায়। পাঁচু বলে চলেছে।

—ভাই সব, এর জন্য আমরা প্রতিবাদ করবো। আমাদের দাবি মানতে হবে। এই জুলুম—

—এ্যাও !

—শালা মাগের ভেড়ুয়া

আঁধারে ঠিক কি ঘটলো ঘটনাটা বোঝা যায় না, কে একতাল কাদা সোজা ছুঁড়েছে; কাদা গিয়ে পাঁচুর হাঁ করা মুখে, নাকের মধ্যে ঢুকে তার বাক্ রুদ্ধ করে দিয়েছে। শুধু বাক্ রুদ্ধই নয়, দমবন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে পাঁচুর।

একটি মুহূর্ত! সকলেই চমকে যায়। পরক্ষণেই সেই স্তব্ধতা প্রচণ্ড হাসির শব্দে ফেটে পড়ে।

মদন একটা পাঁচিলের মাথায় উঠে চিৎকার করছে—কোন শালা করেছিস? বাপের ব্যাটা হোস তো এগিয়ে আয়।

—তোর বাপের নাম কি র‍্যা? জানিস? জনতার মধ্য থেকে কে হেঁকে ওঠে।

ফোলা বেলুন চুপসে যায়; জোঁকের মুখে চুন পড়েছে। মদনের মায়ের ইতিহাস সবাই জানে। ইলেকট্রিক চার্জম্যান ডিসুজা এখনও পাশের গাঁয়েই রয়েছে রিটায়ার করে; মদনের মা তার বাসায় ঝি গিরি করতো, খাদের কাযে নাম লেখানো মালকাটা কামিন, কিন্তু কাযে কোনদিনই আসেনি।

তার দাম অবশ্য দিতে হয়েছিল তাকে। মদনা তারই নজীর। মদনার গায়ের রংও এদের চেয়ে ফর্সা, এক আধটু বলতে কইতে পারে ইংরাজি মেশানো দু'একটা বুলি। ইলেকট্রিকের কায করে।

হৈ চৈ করে মিটিং ভেঙ্গে গেল। ওদের উত্তেজনা গোলমাল দেখে ম্যানেজার ফস্টার আগে থেকেই ওয়াচ এণ্ড ওয়ার্ড ডিপার্টমেন্টকে খবর দিয়ে রেখেছে। পালোয়ান সিংও টিলার পাশে কয়েকজন সিপাই নিয়ে তৈরি ছিল। বিন্দুমাত্র গোলমাল হলেই সে-ও আসরে অবতীর্ণ হবে। শরণ সিং আগে থেকেই গোলমেলে লোক কটাকে চিনিয়ে দিয়েছে। নিস্ পিস্ করছে ওদেব হাত।

কিন্তু তার আগেই ওরা সরে গেল নিজে থেকে। মাথা নীচু করে বসন্ত ফিরেছে ধাওড়ায়; এমনি হবে সে জানতো। একা বসন্ত নয়; ওদের সকলেই ফুলছে নীরব অসহায় আক্রোশে।

—তুমি কিছু বলবা নাই? এমনিই চলবেক এই বাঁদরামি?

চারনম্বরের থুতু মাহাতো বসন্তকে দেখে এগিয়ে আসে। ওর পিছনে আরও পঞ্চাশজন মালকাটা রয়েছে। বসন্ত মাথা নাড়ে।

—উঁহু। আমি এ সবে নেই। ইউনিয়ন থেকেই এর ব্যবস্থা করতে হবে।

—ও ইউনিয়ন আমরা মানি না, মানবো নাই। পিছন থেকে ওরা জোর গলায় হেঁকে ওঠে।

—একা তোমরা বললে হবে না, সবাই এ কথা বললে তবে এর ব্যবস্থা হবে। বসন্ত জবাব দেয়।

—তাহলে ?

—যতদিন না হয় ততদিন এমনি ভাবেই চলবে।

আবছা অন্ধকার নামে আকাশে, তারই ছায়া তাদের মনে। সারাদিন খেটে মাত্র ওই রোজকার ? ইচ্ছে করেই তাদের উপর এ জুলুম করছে কোম্পানি! তবু কায বন্ধ করার উপায় নেই। আগে কায বন্ধ করলেও দুচারদিন লালাজী, রামনগরের মধু সাহার গদিতে ধার মিলতো। চাল ডালও পেত তারা। এখন চাল ডালও দিচ্ছে কোম্পানির হপ্তার টাকা কেটে নিয়ে, হপ্তা মিলবে না—চাল ডালও বন্ধ। দুদিকে জড়িয়ে পড়েছে তারা। এ যেন জালে জড়িয়ে ফেলে লাঠিপেটা করে খরগোস মারার মত অসহায় বন্দী মৃত্যুন্মুখ অবস্থা। এর থেকে নিষ্কৃতির কোন পথই নেই।

ধাওড়ায় ফিরে আসে বসন্ত, রাত্রি হয়ে গেছে। নিস্তব্ধ ধাওড়া। বারান্দায় উঠে একটু অবাক হয়ে যায়। কেষ্টর ঘরের সামনে উনুনটা নিভে আসছে। চারিপাশে ছড়ানো হাঁড়ি থালা আরও কি। একটা কুকুর নিশ্চিন্ত নীরবে খেয়ে চলেছে একটা থালা থেকে কি সব ; ওর পায়ের শব্দ পেয়ে সরে দাঁড়াল একটু। জিনিসপত্র ছত্রাকার করে ফেলা।

এ তাদের প্রায়ই ঘটে। চুপ করে এসে ঘরে ঢুকলো বসন্ত।

এখানের সবই আলাদা। এই হাসি এই কান্না, আলো আর ছায়ার জালবোনা এর পথ। ঘৃণা ভালোবাসা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়ানো ; এক হয়ে মিশে গেছে বন্ধুত্ব আর শত্রুতা, জীবন আর মৃত্যু।

হঠাৎ দরজার কাছে শাড়ির মৃদু শব্দে মুখ তুলে চাইল বসন্ত। এগিয়ে আসে গৌরী ; মুখচোখ কান্না ভিজে, কণ্ঠস্বর থমথমে।

—গোটা কতক টাকা দিতে পারেন ? গোটা পাঁচেক।

—টাকা! বসন্ত ওর কথায় অবাক হয়ে যায়। এত অভাব অভিযোগে উপোস দিয়েছে, মুখ বুজে মার খেয়েছে কেষ্টর কাছে। কেঁদেছে রাতের পর রাত। তবু কোনদিনই হাত পেতে কিছু নেয়নি। আজ এমন একটা

জায়গায় আঘাত বেজেছে ওর—যার জন্য শেষ মর্যাদাটুকুও ভুলে আর এক কাঙ্গালীর কাছে হাত পেতেছে।

—কি হবে?

কথা বললো গৌরী; ডাগর অশ্রুঝরা দুটো চোখ তুলে চাইল। একটু চুপ করে থেকে বলে ওঠে—চুঁচুড়া জানেন? চুঁচুড়ার ওদিকে আমার ভাই থাকে। সেইখানেই চলে যাবো। এখানে আর পারছি না।

অসহায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে গৌরী; মুক্তি চায় সে এই কঠিন কঠোর জীবন থেকে। জালে বন্দী অসহায় খরগোসের মত অবস্থা তারও—এখানের সকলেরই। সবাই মুক্তি চায়, বাঁচতে চায়।

কিন্তু!

বসন্ত বলে ওঠে—টাকা!

সারাদিন পরিশ্রম করে আজ মাত্র রোজকার করেছে দেড়টাকা। যা দিয়ে কোন মুক্তিই কেনা যায় না। মাথা নাড়ে বসন্ত হতাশ ভাবে,—টাকা নেই গৌরী, থাকলেও আজ দিতাম না। কোথায় যাবে? এখানে সব ঠাঁই একই। গরম কড়া থেকে গিয়ে পড়বে গনগনে উনুনের তাতে।

চুপ করে সরে গেল গৌরী। কাঁদছে সে।

কি করবে বসন্ত! নীরব দুঃখে সমবেদনা জানানো ছাড়া তার করার কিছুই নেই। সেও ওদের মতই একজন।

বসন্ত খাটিয়ার উপর বসে কি যেন ভাবতে থাকে আকাশ পাতাল। তেনরা পালির কাজ শুরু হয়ে গেছে। নাইটসিফ্‌টের ভোঁ বেজে গেছে। মাটির অতলে চিররাত্রির দেশে নেমে গেছে অনেকে, সেখানে ঘুম নেই, চিরজাগ্রত প্রহরীর মত জেগে আছে সন্ধানীর ল্যাম্পগুলো।

কাশির শব্দে মশারি টাঙ্গানো বন্ধ করে চাইল। জোর করে কাশার শব্দ, ইচ্ছে করে মনোযোগ আকর্ষণ করছে কাশির মালিক। কেষ্ট ঢুকেছে, সোজা এসে বসে পড়ল খাটিয়ার উপর যেন বেশ দাবী তার জন্মে গেছে ইতিমধ্যেই।

—বেশ আছো মাইরী বসন্ত দা, বিয়ে থাও করোনি। দিব্যি আইবুড়ো কাত্তিকটি হয়ে আছ। ফুলে ফুলে মধু খাও কেম্নে ধতো পারো? তবে হুশিয়ার দাদা, ইখানেঁ শালা রোগের বাথান। খাস সাহেবী রোগ, একেবারে বিলেতী। তবে দেখে শুনে চললে ঠিক আছে।

গলা খাটো করে বলে ওঠে—বিপদে আপদে পড়লে ডেকো দাদা, লজ্জা করো না। বসন্ত ঠিক বুঝতে পারে না ওর কথাগুলো। মশারির দড়ি বাঁধতে থাকে।

—চল, বাঁধি দড়িটা।

অর্থাৎ ওঠবার ইঙ্গিত। কেষ্ট উঠে এগিয়ে আসে, দু একটা ঢোঁক গিলে বলে ওঠে—দাও কেন্নে গোটা পাঁচেক টাকা। কাল সকালেই দিয়ে দোব দুটাকা সুদ সমেত।

—কি হবে? বসন্ত প্রশ্ন করে।

—তোমাকে গোপন করবো না, বউটার খুব অসুখ। মেয়েলি অসুখ, চেপে চেপে রেখে বেড়েছে গুটেক। চিকিচ্ছে হবেক নাই তোমরা পাঁচজন থাকতে?

একটু অবাক হয় বসন্ত, কেষ্টর দি... চেয়ে থাকে। মিথ্যা কথাটা গলগল করে বলে চলেছে। বসন্ত জবাব দেয়'

—টাকা কোথায় পাব কেষ্ট? এ সপ্তাহে মোট পনের টাকা পেয়েছি।

—মাইরী!

—হ্যাঁ! বসন্ত মশারিটা গুঁজছে। ওদিকে তেলের কুপিটাও নোটিশ দিচ্ছে। দপ্‌ দপ্‌ করে ওঠে শিষটা, তেল কমবার সঙ্কেত; ক্ষীণ হয়ে আসছে শিখা। দপ্‌ করে নিভে যাবে এইবার। বিরক্ত হয়ে ওঠে কেষ্ট।

—ধ্যাৎ! থামোকাই এলাম। গোটা দুয়েক থাকে তো দাও না? বলে কেষ্ট—ব্যাটাকে একহাত দেখে লোব। কাঁটায় আড়বো—তিন তিরিক্কের দান। কড়কড়ে ষোলটাকা।

—টাকা নেই। বসন্ত সাফ জবাব দেয়।

—ধ্যাৎ তেরি। কেষ্ট বের হয়ে গেল ঘর থেকে।

শুয়ে পড়েছে বসন্ত, ছোট একফালি জানালা দিয়ে বাইরের মেঘঢাকা লালচে আকাশ খানিকটা দেখা যায়, তারার দীপ্তিও নেই কোনখানে।

হঠাৎ উৎকর্ণ হয়ে ওঠে বসন্ত। একটা তীব্র আর্তনাদ ভেসে ওঠে বাতাসে। কে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কান্নার সুরে বাতাস ভরে ওঠে।

কেষ্টর গর্জন শোনা যায়—মাগনা যাবি ওর ঘরে? মাগনার পিরীতের নাগর তুর? এত ফুসফাস কি হচ্ছিল? বার কর ক'টাকা এনেছিস! না হলে তুর এক দিন কি আমার এক দিন আজ! ডুবে ডুবে জল খাওয়া হচ্ছে নচ্ছার মাগী।

গৌরীর চাপা কণ্ঠস্বর শোনা যায়—ছিঃ ছিঃ একেবারে জানোয়ার হয়েছ? কয়েকটা চড় চাপড়ের শব্দ শোনা যায়, নীরব কান্নায় ভরে ওঠে রাতের নিঃশব্দ অন্ধকার।

বসন্ত জানলাটা বন্ধ করে দেয়। তবুও যেন কানে আসে ওই কান্নার শব্দ; ব্যাকুল করে তোলে ওর কান্না। অমানুষ কেষ্টর হাতে ওরা কেঁদেই সারা হবে, নিষ্ফল এ কান্না। এখান থেকে বেরুবার পথ ওদের নেই। ঘর-সংসার ওরা চায়, সতীত্বের বেড়াজাল ঘেরা ক্ষীয়মাণ সমাজের শেষ বেড়া আঁকড়ে ধরে পড়ে আছে। ওরা এ জগতের কাছে একটা বেমানান অভিশাপ।

কাদামাখা কিম্ভূতকিমাকার মূর্তিটা এই পরিবেশে বেমানান ঠেকে। লালাজীর খাস কামরার ঝকঝকে মোজাইক-এর মেজেতে পায়চারি করছে ফস্টার। নারকুলিয়া গুম হয়ে কি ভাবছে; ভয় পেয়েছে লালাজী। পাঁচু আর মদনকে ওরা যেন চিনে ফেলেছে। কাদার তালটা পাঁচুর মুখে চোখে মাথায় ছিটিয়ে লেগেছে, সর্বাঙ্গে গড়িয়ে পড়েছে পচা নর্দমার খিঁচ; মদন লস্করকে ধরবার জন্য তাড়া করেছিল। মদন রেলিং টপকে অপিসে ঢুকে বেঁচেছে।

একটা ঝড়ের পূর্বাভাস; প্রকাশ্যে তারা এইবার আরও কিছু করবে। পিটের গণ্ডগোল বাইশ শো ফুট নীচে থেকে উপরে এসে পৌঁচেছে।

—কে কে ছিল?

মদন বলে ওঠে—সব্বাই। একধারসে। বসন্ত, মাখন, যদু মাহাতো, যাত্রাদলের ছেলেরা, আরও অনেকে।

ফস্টার ফিরে দাঁড়াল নামগুলো শুনে, কি যেন ভাবছে—নারকুলিয়া?

নারকুলিয়া তার বলার আগেই নোট বই বের করে নামগুলো লিখে চলেছে খস্ খস্ শব্দে। লালাজী শশব্যস্ত হয়ে ফস্টারের সামনে লাল ফেনাজমা গেলাসটা তুলে ধরে।

—থ্যাঙ্ক উ।

এক সিপ্ নিয়ে গলায় বুলোতে থাকে ফস্টার, জ্বলছে গলাটা।

লালাজীর কণ্ট্রাক্ট আজ সই হতো, কিন্তু ফাঁক থেকে এই গণ্ডগোলটা সব তালগোল পাকিয়ে দেয়।

লালাজী সান্ত্বনা দেয়—সব ঠিক হো যায়েগা সাব। রেশন বন্ কর দেগা?

—নো! ফস্টার ব্লেজারের জন্যই এই পথ নিতে পারে না। চুপ করে কি ভাবছে।

—তোমার কণ্ট্রাক্ট কাল সই করবো লালাজী, আজ নেহি হোগা। মাই ওআর্ড ইজ ওআর্ড।

নারকুলিয়া উঠে পড়ে লেগেছে। আর লেগেছে পালোয়ান সিং-এর দল। তাদের নজর চারিদিকে। নারকুলিয়া সকাল বেলাতেই বাতিঘরে গিয়ে পাকড়াও করে শান্তিবাবুকে। ওর ছেলে নরেন থিয়েটার ক্লাবের পাণ্ডা, দলটিও কম নয়। শান্তিবাবুর আশা ছেলেকে কোন রকমে আর দুটো বছর পড়িয়ে বি-এস-সি পাশ করিয়েই এপ্রেনটিস করে দেবে সাহেবদের ধরে করে। গড়িয়ে গড়িয়ে সেকেণ্ড ক্লাশ ম্যানেজারি পাশ করতে পারলেই যথেষ্ট। কিন্তু এ আশায় যেন ছাই পড়েছে। নারকুলিয়া বলে ওঠে,

—নেহাৎ বন্ধু লোক বলেই কথাটা জানালাম শান্তিবাবু, ছেলে তোমার পাকা লীডার হয়ে গেছে। লেবার লীডার। তা হলে যে সাহেবদের কাছে দরবার তো চলবে না। ভবিষ্যৎ একেবারে অন্ধকার। নো চান্স।

শান্তিবাবু থ' হয়ে যান। নারকুলিয়া হাঁড়ির খবর জানে। কোলিয়ারিতেও বেশ হৈ চৈ চলছে চারিদিকে।

শান্তিবাবু বলে ওঠেন—কলেজে পড়ছে। পড়াশোনায় ভালো।

—কাঁচা মাথার দিকেই বেশি নজর ওদের। তাছাড়া এইখানেই বন্ধুবান্ধব জুটেছে ক'টি বখাটে বাউণ্ডুলে ছেলে।

শান্তিবাবু কি ভাবছেন। অনুনয় করেন,—এ নিয়ে ঘাঁটিয়োনা সাহেব, আমি ছেলেকে কালই আসানসোল বোর্ডিং-এই রাখবার ব্যবস্থা করবো। সরিয়ে দেবো এখান হতে।

নারকুলিয়া ভালমানুষী দেখায়--সেই ভালো। নেহাৎ বন্ধু লোক তাই কথাটা জানালাম। প্রকাশ করো না বুঝলে? টপ সিক্রেট।

সেই টপ সিক্রেট খবরটা একে একে ওই দলটির সবকটি অভিভাবকের কানে তোলে সে।

কম্পাসবাবু, মালবাবু, ডেসপ্যাচক্লার্ক সবাই তার যে বিশিষ্ট বন্ধু, নারকুলিয়া তাদের বিশেষ হিতৈষী, এই কথাটা পাকে প্রকারান্তরে জানিয়ে দেয়। ফড়িং সরকার গলদঘর্ম হয়ে পিট থেকে উঠে আসছে; নারকুলিয়াকে এগিয়ে আসতে দেখে কয়েকটা উপরি পাওনার টাকা আর খানিকটা খৈনি সামলে ফেলে সুট করে। চোরের উপর যেন বাটপাড়ি না হয় ব্যাপারটা এমনই।

তার মুখে খবরটা শুনে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠে ফড়িং; রাগে কাঁপছে। ভক্তির এই কাণ্ড!

নারকুলিয়া নির্বিকার কণ্ঠে বলে চলেছে।

—নেহাৎ বন্ধুলোক বলেই জানালাম কথাটা। তোমার চাকরি ধরেই টান পড়বে। দিনকাল বড় খারাপ পড়েছে কিনা? ছেলেকে শাসন করো সরকার।

চাকরি গেলে কি হবে তা কল্পনাই করতে পারে না ফড়িং, নৈরাশ্য ভরা জমাট অন্তহীন অন্ধকার যেন গ্রাস করছে তাকে। সেই অভাবের তাড়না আজও ভোলেনি ফড়িং।

গর্জন করে ওঠে,—দরকার হয়, গাছ গেছে, ডালপালাও ছেঁটে ফেলবো সাহেব। মাগ আগেই গেছে, উ শালার ছেলেকে আজই নিকাল দেঙ্গা। ঘাড় পাকড়কে নিকাল দেঙ্গা। ব্যস।

নারকুলিয়া মনে মনে হাসছে। ফড়িং বাতি জমা দিয়ে সাদা কাপড়ের পটি লাগানো ছাতা মেলে হন্ হন্ করে চলতে থাকে। গজগজ করে,--সাতেও নাই পাঁচেও নাই, বলে কিনা চাকরি যাবে?

—ক্যা হোয়েসে সরকার মোশাই? নমস্তে!

লালাজী বিনয়ে গলে পড়ে। দাঁড়াল ফড়িং সরকার। এক মিনিটের মধ্যেই পরম ভরসাস্থল খুঁজে পায় সে। সাহেবদের বন্ধু লোক। মুরুব্বি পাকড়ায় তাকেই।

—বলুন দিকি লালাজী একি সুবিচার! সৎ ছেলে—বখাটে বাঁদর। সে কি করল না করল অমনি সাহেব বলে কি না চাকরি যাবে। ব্যস। বিচার নাই এর?

লালাজী হাসছে—সবই রামজীর ইন্‌ছা সরকার মোশাই। তিনিই নোকরি দিয়েসেন ফির লিবেন তো তিনিই লিবেন। ক্যা, ঠিক বাত নেহি?

—তা ঠিক। তবে আমার যে বেঠিক অবস্থা লালাজী? তুমি যদি একটু বলো। ও ব্যাটাকে দূর করে দেব আজই।

—আচ্ছা পিছু দেখা যাবে।

হন্‌হন্‌ করে ফড়িং বাড়ির দিকে এগোল, একটা বিহিত আজই করবে সে। লালাজীকেও ধরতে হবে। এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার ওই একমাত্র পথ।

তেতে ওঠে সারা শরীর; মেঘ ভাঙ্গা চিড় চিড়ে রোদ। সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরায়, বৃষ্টির জলে সবুজ গাছ গাছালি ভরা পথটা দিয়ে একা চলেছে ফড়িং হনহন্‌ করে, ঘামছে সারা গা। কোনদিকে নজর নেই। মাথায় যেন রক্ত চড়ে গেছে রাগে আক্ষেপে, দপ্‌ দপ্‌ করে মাথা।

মঞ্জরী ঠেলে উঠে পড়ে বিছানায়, পানদোক্তার রসে জ্যাবজেবে দাঁতের মাড়ি বের করে ফোঁস করে ওঠে,

—হ্যাঁ, তারপর আমে দুধে মিশে যাবে আঁঠিটাই পড়ে থাকবে। দুষী হবো আমিই। ওতে নেই। সতীন কাঁটা না ঘাটানোই ভালো। তুমিই বলো ওকে। বলবো কি? আমিই ডরিয়ে কাঁটা হয়ে থাকি ওর ভয়ে। ছেলে তো নয়—মানস্থরের মত চাউনি—যেন উবু উবু গিলে খাবেক।

—দূর করে দিও। হম্‌ বোলেগা। ব্যাটা লীডার হয়েছে?

ফড়িং ঘামে নেয়ে উঠেছে। আদুরী পাখাটা এনে বাতাস করতে থাকে। ফড়িং-এর থলথলে চর্বি বহুল দেহ থেকে আল্‌কাতরা রংএর কষ বেরুচ্ছে। মঞ্জরী ঘৃণায় শিউরে ওঠে, পিচ্‌ করে একমুখ লাল ছোপ লাগানো পানের পিক জানলার বাইরে ফেলে পাশ ফরে ঠোঁটের ডগে একটা অবজ্ঞার শব্দ তোলে,—চু—ঢং দেখো। বাপ সোহাগী এলেন।

ফড়িং হাঁকাচ্ছে—তাকে ভাত দিবি না বুঝলি? তার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ আর নাই। ত্যজ্য পুত্তুর করবো। না হলে চাকরি নষ্ট হয়ে যাবে। টাকা, টাকা চাই-ই। ভাতে হাত দিলে ছেলেকেও সইবো না। সে ছেলে নয়—শত্রু।

মঞ্জরী ফোড়ন কাটে—বোঝ এইবার। গরীবের কথা বাসি হলে মিষ্টি হয়। সব সমান। কেমন ঝাড় দেখতে হবে।

—চান করো বাবা, বেলা হয়েছে। আদুর ওই টিপ্পনী সহ্য করা অভ্যাস হয়ে গেছে। সইতে পারে না ভক্তি; তাই বাড়ি এলেই বেধে যায় দু'জনের তুমুল ঝগড়া।

ফড়িংএর হুঁস ফেরে, বেলা গড়িয়ে গেছে। উঠে পড়ে চটের পর্দা ঘেরা জায়গাটুকুতে ঢুকলো এক টুকরো ক্ষার সাবান হাতে। রোমশ গা, কালি যেন চিপে বসেছে। তাই ঘসতে থাকে খ্যাঁস খ্যাঁস করে।

আদু ব্যাপারটার গুরুত্ব খানিকটা অনুমান করতে পারে। মা মরা দুই ভাই বোন এদের সংসারের ধাতে বাঁধা পড়ে নি। বাবার কথাবার্তা শুনে ভাবনায় পড়ে।

দাদা সকাল থেকেই বাড়ি ফেরেনি। রাস্তায় গুন গুন সুর শুনে বের হয়ে যায় আদু। দাদা, নরেনদা, আরও ক'জন ফিরছে; পূজোয় থিয়েটার হবে, তারই রিহার্সেল আর পার্ট করা নিয়ে ব্যস্ত।

—দাদা!

ভক্তি বাইরে থেকে বাবার তর্জন গর্জন শুনছিল। হঠাৎ আদুর ডাকে দরজার কাছে দাঁড়াল—কি রে?

—বাড়ি ঢুকো না এখন। বাবা চটে আগুন। বলে তুমি নাকি কুলি মজুর ক্ষেপাচ্ছ।

—মানে? আকাশ থেকে পড়ে ভক্তি।

—বাবাকে কে বলেছে অপিসে। বাবাতো বাড়ি ফিরে তোমার খোঁজ করছে। বলে বাড়ি ঢুকতে দোব না। ও বাড়িতে থাকলে চাকরি থাকবে না আমার। মাও চটে উঠেছে।

নরেন ও আরও ক'জন এগিয়ে আসে। নরেনই বলে—তাহলে এখন যাস না বাড়িতে। কিন্তু কে বল্লে এসব কথা?

বিষ্টু এগিয়ে আসে—বুঝলি নির্ঘাৎ ওই নারকেল ব্যাটা।

—আচ্ছা! ভক্তি মনে মনে গজরাতে থাকে।

—চল দেখি! নরেন ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল।

আদু চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। একটা গণ্ডগোল কোথায় পাকাবে এটা বুঝতে পেরেছে।

—দাদা!

—পিছু ডাকিস না।

ভক্তি দাঁড়াল না, ওদের সঙ্গে চলে গেল। ক্ষুণ্ণ মনে বাড়ি ঢুকলো আদু। দিনটাই বিশ্রী ঠেকে। মুখের ভাত ফেলে চলে যাওয়াটা কেমন যেন বিশ্রী ঠেকে ওর। তবু যাবে ভক্তি, যেতেই হতো তাকে; আদু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে—কাঁদছে সে। মনে হয় এতবড় পৃথিবীতে সে একা। তার যাবার ঠাঁই নেই কোথাও।

—কই রে? ফড়িং মোটা গলায় হাঁক দেয়।

মা পাশ ফিরেও উঠবে না, ভাত বেড়ে দেওয়াতো দূরের কথা। আদুই ভিতরে গেল, বাইরের ঘর থেকে সাড়া দেয়—যাই বাবা।

ফড়িং বিড় বিড় করে ইষ্ট নাম জপ করছে পূর্ব দিকে দাঁড়িয়ে। উনুনের উপর তাতে বসানো গরম ভাতের হাঁড়ি আর পোস্ত তরকারি, ডাল বাড়তে থাকে আদু।

—আর ভাত? সেই লবাবকে সোজা বলে দিবি বুঝলি?

—হ্যাঁ! আদু ঘাড় নাড়ে। চোখ দুটো অকারণেই ভিজে ওঠে।

কে জানে আজ সারাদিন কিছু জুটবে কি না দাদার বরাতে।

নরেন বাবাকে দেখে এগিয়ে আসে। শান্তিবাবু গম্ভীরস্বরে বলে ওঠেন,

—সামনেই তোমার পরীক্ষা, পড়াশোনা না করে হৈ চৈ করে বেড়াচ্ছ?

ভক্তি জবাব দেয়—এখনও ঢের দেরি আছে মেসোমশাই।

মেসোমশাই! গায়ে যেন ঠাণ্ডা জল ছিটিয়ে দিয়েছে ছোকরা। ফোঁশ করে ওঠেন মালবাবু,

—থাম দিকি ডেঁপো ছোকরা। নিজে তো গোল্লায় গেছো আবার ওটিকে কেন বকাচ্ছ! চুপ করে গেল ভক্তি। নরেন মৃদু প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করে,

—বাবা।

—হ্যাঁ হ্যাঁ সব জানি। সবারই সব কীর্তি। আমার সাফ কথা—পড়াশোনা করো, ওসব লিডারি চলবে না। যার তার সঙ্গে গলা ধরাধরি করে পথে ঘাটে আড্ডা ওসব আমি সইব না। যাও, ভিতরে যাও।

নরেন আর ভক্তি বিষ্টুকে ডেকে এনেছিল দুপুরে ওইখানেই খাবে। কিন্তু

সব যেন কোথায় গণ্ডগোল হয়ে গেছে। একটা কিছু চক্রান্ত ঘটেছে নিশ্চয়। নরেন মুখ নামিয়ে ভিতরে চলে গেল। ভক্তি, বিষ্টু ফিরে আসে পথের দিকে।

প্রায় তিনটা বাজে। নিস্তব্ধ জনহীন পথ। না বৈকাল—না দুপুর। পেটের মধ্যে অসাড় একটা অনুভূতি, খিদে পেয়েছিল কিন্তু বর্তমানে তার তীক্ষ্ণ অনুভূতিটা নেই। মনের জ্বালা, অপমানের কশাঘাত আর চাপা রাগের তীব্রতায় কেমন অসাড় অনুভূতিতে পরিণত হয়েছে।

—কিছু আছে রে পকেটে ?

বিষ্টুর ক্ষিদে সহ্য করা অভ্যাস নয়; যাহোক কিছু চাই। এগিয়ে যায় মাল ইস্টিশানের পাশে মণ্টার ছোট তেলেভাজা-চায়ের দোকানের দিকে।

—বসুন গো বাবু।

যাত্রার দলে পার্ট করে মণ্টা দূত, সৈনিক, নেপথ্য প্রহরীর। আর সাজে ঘন ঘন; তামাক সাজে। মণ্টার সাধ জীবনে নিদেন একবারও রাজা মন্ত্রীর পার্ট করবে, না হয় সেনাপতিরও। কোলিয়ারির যাত্রাদলেও তার যাতায়াত। বুক ঠুকে বলে সবাইকে,—আমি না গেলে চিনতোড়ের যাত্রা দল কানা। ছাপ্ ভোঁ ভোঁ। ফাইনাল ঘণ্টা আর পড়বে নাই। কনসেটই বাজবে।

ঘণ্টাটা বাজায় মণ্টুই। সুতরাং কথাটা একদিক থেকে ঠিক।

মণ্টু দলের মাথা ভক্তি আর ডানহাত ওই বিষ্টুকে দেখে যেন হাতে চাঁদ পায়। চৌমাথার মোড়ে হাটতলায় তার দোকান। হপ্তার দিন হাট, জমাট হাট। জিনিসপত্র কিছু মেলে, আর মেলে চারিদিকের কোলিয়ারির নানা খবর, মায় কার সঙ্গে কার রং ধরেছে, কে কার সঙ্গে পালাবার যোগাড় করতে গিয়ে ধরা পড়েছে—সেই সংবাদও তেলেভাজার সঙ্গে পরিবেশন করে। মণ্টার দোকানে তাই ভিড় লেগেই থাকে। অবশ্য রাতের বেলায় পিছনের খুপরিতে মণ্টার নাকি অন্য ব্যবসাও আছে; সোডার বোতল থরে থরে সাজান। আসানসোল থেকে চালান আসে। ওই সোডার বোতলের ভিড়ে ইয়াকুব সাহেবের ভাটিখানার তাজা পানীয় মিশোন থাকে ওই বোতলেই।

কে ধরবে কি আছে, ভাঁড় না হয় গেলাসে ঢালো, গলাতেই ঢালো; পিছনে ঝালবড়া, বেগুনি, আলুর চপ তো আছেই।

একটা বেঞ্চি দেখিয়ে মণ্টা অভ্যর্থনা জানায়—বসুন আজ্ঞে। একটু চা সেবা হোক।

—চা!

বেলা ঠিক বুঝতে পারে না, মেঘলা দুপুর। ভাত খাওয়ার বেলা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। পেটে কত্তাল বাজছে।

বিষ্টু বলে ওঠে—দে, ঝালবড়া গরম আছে রে?

—ওতো দুপুরের ভাজা; তা চপ গরম হবে দিই।

শালপাতার ঠোঙ্গায় কয়েকটা চপ এনে দিয়ে মণ্টা নিজেই উনুনের আধ নিভন্ত আঁচে কটা কুচো কয়লা ফেলে ঝামা পড়া কালিবর্ণের কেটলিটা বসিয়ে দেয় কয়েক কাপ জল দিয়ে। শুরু করে,—আজ্ঞে সুন্দর চকে নোতুন দল খুলছে। যাত্রার দল। পোশাক আনাচ্ছে, যন্ত্রপাতিও এসে গেল আজ্ঞে। ঢোল, তবলা, হারমোনিয়াম, বেয়ালা।

আশপাশের কোলিয়ারির মধ্যে বেশ আকচা আকচি আছে। এর দল ভালো না ওর দল ভালো, তাই নিয়ে বেশ চেষ্টা, দল ভাঙ্গাভাঙ্গি হয়। সুন্দর চকের মালিক নবীন প্রধানের নিজেরও খুব শখ যাত্রায়।

সাহেবী কোলিয়ারি নয় যে কাষ আর কাষ ছাড়া কোন কথা নেই। কি যেন ভাবছে ভক্তি।

মণ্টা বলে চলেছে—তা আজ্ঞে রামের পার্ট করবার লোক পেছে না। নাহলে চিনতোড়ের বিষদাঁত ভেঙ্গে দেবে বলছিল। আমিও বল্লাম—সেটি হচ্ছে না বাবা, তোদের বাবুকে বলগে, ভক্তি বাবু থাকতে পোজ পশচার-মোশান আর ওই এ্যাকটোতে পারবি না তোরা; পোশাক পরে তরোয়াল ঘুরিয়েই আসরে নামবি। চিনতোড়ের বেন্দবস্ত আছে।

ভক্তি কি ভাবছে, গরম গরম চপ কটা মন্দ লাগছে না। বেশ ঝাল ঝাল একটা স্বাদ, গরমমশলার গন্ধটা ভাল লাগছে। চায়ের তারের সঙ্গে মিলে একটা মিষ্টি ভাব আসে মনে।

নবীনবাবু শৌখীন লোক—যাত্রার জন্য কোলিয়ারি ফাণ্ড থেকে বেশ কিছু খরচ করেন।

মণ্টা জিজ্ঞাসা করে—কি বই করছেন বাবু? তা ধরেন কেনে সীতাই। ওদের যাত্রার দিনই লাগিয়ে দ্যান। দেখবেন সোন্দর চকের আসরে মাছি উড়ছে। স্রেফ মাছি। কেবল পোশাক টোশাকগুলো একটু চেকনাই আনবেন।

কথা বলে না ভক্তি; একটা সিগারেট এগিয়ে দেয় মণ্টু, সেই সঙ্গে

একখিলি পান। পেটের জ্বালাটা কমেছে একটু। মনটাও শান্ত হয়েছে। মণ্টু একটু চাপা স্বরে বলে ওঠে,—এবার পার্টটা একটু নম্বরী দেখে দিতে হবে ছোটবাবু; অন্তত তিন চার দিন কায থাকবে; ফুললো আর মলো—চলবে না বাবু; এতদিন এ্যাকটো করলাম পাকা হয়ে উঠেছি তো?

ভক্তি কি ভাবছে, বিষ্টুই জবাব দেয়,—সে তো ঠিক কথা। এবার ভাল রোল তোমাকে দেওয়া হবে। কি রে ভক্তি?

ভক্তি উঠে পড়ে কোন রকমে হুঁ হাঁ জবাব দিয়ে। বিষ্টু এগিয়ে আসে, —বাড়ি যাবি না?

—তুই যা, আমি একটু পরে যাবো।

ভক্তি এগিয়ে গেল চড়াই-এর দিকে।

সিগারেটটায় টান দিচ্ছে, গলার কাছে ঈষদুষ্ণ একটা স্পর্শ, মনের জ্বালা একটু কমে আসছে। একটা পথ যেন পেয়েছে সে। চটিটা ছিঁড়ে গেছে— বাবার মুখখানা মনে পড়ে; বিশাল দেহ, তেমনি বিশ্রী ওর কথা বার্তা। সৎমায়ের কথাগুলো মনে পড়লে দেশ ছেড়ে কোথায় পালাতে ইচ্ছে করে।

চিনতোড়ের ওই পরিবেশ একঘেয়ে হয়ে উঠেছে। সেই গতানুগতিক জীবন; সকাল থেকে এর দাওয়া, তার দোকান, না হয় বিষ্টুদের খাপরার ঘরে মচকানো খাটিয়ায় বসে রিহার্সেল দেওয়া, সব তার কাছে বিষ ঠেকছে।

এগিয়ে চলে চটিটা টানতে টানতে, এই তো মাইল তিনেক রাস্তা। খানিকটা গিয়ে অন্য জগতে যেন পৌছে। চিনতোড়ের সীমানা পার হয়ে গেছে, রাস্তার ধারে ঢালুর নীচে দেখা যায় লাল কাঁকর ঢাকা পথ—কয়লার কালোর দাগ ওখানে পড়েনি। সবুজ ঘাসের বুকে সিঁথির সিন্দুরের মত চলে গেছে পথটা, থেমেছে বাংলোর সিঁড়ির মুখে। মন্দির, ঝাউপাতার বাহার আর ব্যোগেনভিলার সবুজ লতা ঢাকা বাগান; পথের দুধারে সাদা রং করা ইটের নিশানা।

ভারি জমাট গলায় দুটো কুকুরে চিৎকার করছে। ভক্তি এগিয়ে গেল বাংলোর ভিতরে। নেপালী দ্বারোয়ান এগিয়ে আসে।

খবরটা হাওয়ার বেগে ছড়িয়ে পড়ে, ফড়িং সরকার পথে ফেরবার মুখেই শুনেছে ভক্তি এক কথায় গিয়ে সুন্দর চকে ভালো চাকরি পেয়েছে। খাদের

উপরের কায। দরকার হলে বাসাও পাবে। ভদ্র কায মোটামুটি। মাইনেও মন্দ নয়।

বেশ খুশি মনে হেলতে দুলতে বাড়ি ঢোকে। সামনে দাওয়াতেই বসে চা খাচ্ছে ভক্তি, আদুর সঙ্গে কি কথাবার্তা চলছে। বাবাকে দেখে ওদের কথা-বার্তা থেমে যায়; গম্ভীর হয়ে ওঠে ভক্তির মুখ চোখের ভাব।

ফড়িং সরকার অমায়িক ভদ্রলোক। কয়লামাখা অবস্থাতেই দাওয়ায় থপ করে বসে বলে ওঠে,—যাক, ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন। গুরুর কৃপা। জয় গুরু—জয় গুরু।

দুবার চোখ কপালে তুলে ইষ্ট নাম করে নিয়ে বলে চলে—তাহলে সাইকেলেই যাতায়াত করো। ভালোই হল, এই তো চাই। ব্যাটাছেলে বসে থাকবে কেন? হাড় শয়তান এখানে শালারা, চাকরি একটা ছিল, তা তোমাকে না দিয়ে বাইরে থেকে কাকে আনছে। বেশ জবাব হয়েছে এবার। ওই তো সুন্দর চক, চিমনীর ধোঁয়া দেখা যায়। এইবার বাপ-বেটার রোজকারে আসানসোলের কাছে একটু আস্তানা তুলি। তোমার মায়ের ভবিষ্যৎ আছে।

ভক্তি বলে ওঠে--সুন্দর চকেই থাকতে হবে আমায়। আজই চলে যাচ্ছি।

ফড়িং-এর মধুমাখানো কণ্ঠস্বরে ঝাল ফুটে ওঠে--মানে! আলাদা থাকবে?

—হ্যাঁ। এ বাড়িতে আর নয়। ভক্তির কণ্ঠে দৃঢ়তা ফুটে ওঠে।

যে মানুষ একটু আগেই আদরে গলে যাচ্ছিল, পরমুহূর্তেই তালি লাগানো ছাতা হাতে লাফ দিয়ে উঠে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

—নিকালো আভি। দুধ-কলা দিয়ে কালসাপ পুষেছিলাম এতকাল?

মঞ্জরী থামের পাশে দাঁড়িয়ে মুচকে মুচকে হাসছে; যোগান দেয়,—বলে কিনা বোনকেও নিয়ে যাবে! একই ঝাড়ের বাঁশ তো, গিঁটে গিঁটে পাক।

—এত খোশামুদি কেনে রে বাবা? যা না।

ভক্তি ওকথা বলেনি; আদুও রাজি হয় নি যেতে।

ফড়িং সরকার ঘর্মাক্ত কলেবরে লাফাচ্ছে—এখনও মরিনি, একাই একশো। যার খুশি সে আভি নিকালে যাক। বদ গরুর চেয়ে শূন্যি গোয়াল ভালো।

ভক্তি উঠে দাঁড়াল। আদু কাঁদছে। আজ সত্যই দাদা চলে গেল।

একা পড়ে রইল সে এই পরিবেশে। মঞ্জরীর কথায় হুঁস হয়,—আর কাঁদতে হবে না; মানুষটা যে সারাদিন খাদের নীচে থেকে তেতে পুড়ে ফিরে

এল তার হেফাজৎ না করলে পিণ্ডি জুটবে কোথেকে? গলায় তো লেগে রইলে কাঁটার মত।

ফড়িং সরকার গুম হয়ে বসে আছে। ফাঁক থেকে কিছু নগদ টাকা জিনিসপত্র আসতো ঘরে, তাও আর আসবে না।

ভক্তিও বাবাকে চিনে ফেলেছে। লোভী, মহালোভী। সামান্য মাত্র লোকসানের ব্যাপার দেখলে বদলে যায়—চরম আঘাত করতেও ছাড়ে না। ফড়িং সরকার পিতার কর্তব্য কতটুকু করেছে আজ তা যাচাই করতে ইচ্ছে হয়, আগাছার মত জন্মেছে, মানুষ হয়েছে ভক্তি। বিনা হেফাজতে গজিয়ে উঠেছে। আজ তাতে ফুল ফল ধরলে ওআরিশান হতে আসে সবাই।

তাকেই ওবেলায় দূর করে দিয়েছে কুকুরের মত, এবেলায় আদর জানাতে আসে।

কেমন যেন মন বিষিয়ে ওঠে ভক্তির। জিনিসপত্র পড়ে রইল, একাই বের হয়ে গেল ভক্তি।

চিনতোড়ের উপর তবু একটা মায়া পড়ে গেছে তার।

রাতটা বিষ্টুর ওখানে কাটিয়েই চলে যাবে কাল এখান থেকে।

ফড়িং সরকারের গর্জন তখনও শোনা যায়,—একেই বলে কলিকাল! এতকাল খাওয়ালাম পরালাম পাখি পোষা করে, এখন বলে—নেহি মাংতা! ঠিক হ্যায়! আমুও ফড়িং সরকার, দেখ লেঙ্গা।

চিনতোড়ের মাটির সঙ্গে তার বাল্যের পরিচয়; কত জন কত মন তার পরিচিত এখানে। মূল শিকড় থেকে তার দেহমন এই মাটির রস—ভাবধারা গ্রহণ করেছে। ওই দামোদর পুষ্ট করেছে তার দেহ।

সবকিছু থেকে উৎখাত হয়ে চলে যাচ্ছে সে। কেন যাচ্ছে তা ও জানে।

আঁধার ঘেরা পথটা দিয়ে আসছে। পথে পথে ছড়ানো ওর পরিচিত জন। বাড়িতে তার স্নেহ প্রীতির স্পর্শ নেই—তাই পথে পথে ছড়ানো তার স্বজন বন্ধু। সবাইকে ছেড়ে চলেছে সে। নির্জন ধাওড়ার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। এখনও ওরা বাড়ি ফেরেনি।

দোসরাপালির ছুটি হবে রাত্রি নটায়; বাকি যারা আছে তারাও মদ-

শালায় না হয় রামনগর সিনেমার আশে পাশে ঘুরছে। হঠাৎ আবছা আঁধারে গৌরীকে দেখে থমকে দাঁড়াল। ফর্সা রং—সুন্দর চেহারা; প্রথম আসার দিন থেকে ওকে চেনে, জানে। ভালো লাগে ওর মিষ্টি হাসি মাখা সম্বোধনটুকু—ওই রাজা যি গো? তা বিবাগী হয়ে ঘুরছো কি রাণীর শোকে?

চুলগুলো উস্কোখুস্কো, সারাদিন নাওয়া খাওয়াও হয়নি! এতক্ষণে সেটা বুঝতে পারে ভক্তি। চুপ করে ওর দিকে চেয়ে থাকে।

নির্জন আবছা অন্ধকার ঢাকা স্থঁড়ি পথ, তারার আলোর রোশনী ওর চোখে।

গৌরীর মনে পড়ে ওর সেই মূর্তি; সাধারণ মানুষ সে নয়—ব্যর্থ একটি মন। সব হারিয়ে যে কাঁদে নিদারুণ ব্যথা বেদনায়। একা সঙ্গীহীন এক পথিক। স্বপ্নরাজ্যে যেন গৌরীর মন চলে যায়।

—তা বসতে দিই কোনখানে, সিংহাসন তো নাই। ঘরে চল।

উনুনে চাটা চাপিয়ে দিয়ে কয়েকটা আলুর চপ সাজিয়ে দেয় প্লেটে করে। একফালি লালাভ আলো পড়েছে গৌরীর মুখে; মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ভক্তি। এই তার জগৎ। পথে পথে ছড়ানো প্রীতির স্পর্শ, অজানা অনাস্বাদিত একটু অনুভূতি কেমন যেন জেগে উঠছে মনের অতলে।

—কালই চলে যাচ্ছি এখান থেকে। সুন্দরচকে চাকরি পেলাম।

—তাই নাকি!

হাসছে গৌরী, দুচোখের তারায় কি মধুর আবেশ মাখা নীরব আমন্ত্রণ।

ঝড়ো বাতাস গাছের মাথায় দীর্ঘশ্বাস তোলে, ব্যাকুল ব্যর্থ সেই নিঃশ্বাস। গৌরী এগিয়ে আসে। তার মনেও ঝড় উঠেছে। ব্যর্থ জীবন যৌবন কাঁদে নিষ্ঠুর অত্যাচারে। কেষ্ট তাকে বন্দী করে রেখেছে। রাতের অন্ধকারে কোনদিন অন্য কারও সামনে পড়ে শিউরে উঠেছে ঘৃণায়, দুচোখ ফেটে এসেছে কান্না।

ভক্তির দিকে চেয়ে আছে মনভরা দৃষ্টিতে। একটি সুর—ভালো লাগা জগতের স্বপ্ন। রাতজাগা পাখি ডাকছে। নিজেকে এমনি করে চেনেনি গৌরী।

—ভুলে যাবে আমাকে?

ভক্তি চমকে ওঠে, এতদিন খেয়াল করেনি কাকে ভোলা যায়—কাকে যায় না। আজ ব্যাকুল হয়ে ওঠে মন। পথ চলতে আনমনে কি এক সম্পদ পেয়ে গেছে যাকে হারাতে ব্যথা লাগে।

—আবার আসবো। এই তো সুন্দরচক।

—চোখের আড়াল হলেই মনের আড়াল। গৌরীর চোখ ছল ছল হয়ে ওঠে।

ভক্তির সারা দেহ মনে একটা জ্বালা; শান্তির স্পর্শ খোঁজে সে।

—গৌরী!

চমকে ওঠে ভীরু মেয়েটি, এতদিনের চাওয়া সার্থক হতে চলেছে তার। ভক্তির সদ্যজাগ্রত প্রথম কামনার অজানা শিহরে শিউরে ওঠে সে। এক-দিনের বরিষণেও ঊষর মরুভূমির বুকে কুসুমস্বপ্ন জাগুক; ব্যর্থ গৌরী আজ যেন সার্থক হয়েছে।

গালে ওর উষ্ণ নিঃশ্বাস, আবেশে চোখ বুজে আসে গৌরীর। বিমুগ্ধ একটি ব্যর্থ নারী—রাতের অন্ধকারে নবজন্মের স্বপ্ন দেখে; একটা মধুর স্বপ্নময় অনুভূতি শরীরের তন্ত্রীতে আনে তৃপ্তি ও শান্তির গাঢ় স্পর্শ।

হারিয়ে যায় দুজনে।

রাত হয়েছে। ভক্তি ফিরছে বিষ্টুর বাড়ির দিকে। সারা মনে হাহাকার। এতদিন চিনতোড়ের জীবন তাকে এই বৈচিত্র্য, এত প্রীতি ভালবাসার সন্ধান দেয় নি।

কিন্তু এ যেন একটি বিদ্রূপ—পাওয়ার পরই হারানোর কথা। কালই চলে যাবে সে এখান থেকে।

সবাই যেন তাড়িয়ে দিল তাকে; নরেন চলে গেছে কলেজ বোর্ডিংএ, গোবিন্দ-নবীনও নেই; তাদের দল, বন্ধুত্ব প্রীতির সম্পর্ক ছিন্ন ভিন্ন করে দিল একটা লোক।

একটা জানোয়ার—তার জবাব ও দিতে পারবে না?

কি যেন ভাবছে ভক্তি।

ছোট টারম্যাকাডম্ রাস্তাটার বুকে দুপাশ থেকে নুইয়ে পড়ে আঁধার ঘন করে তুলেছে কয়েকটা পিয়াশাল কেঁদ গাছ, বাঁশ গাছ, ওপাশে নিচু টিলার গা বেয়ে গভীর খোয়াই দামোদরের দিকে চলে গেছে।

পাশেই ক্যালভার্টের কাছে আবছা আঁধারে কাকে দেখে থামল ভক্তি।

তাদের পরিচিত বহু দিনের আড্ডার জায়গা—ওই সাঁকোর বাঁধানো চাতালে বসে তারা আড্ডা জমাতো। নরেন, নবীন, গোবিন্দ, বিষ্টু—আরও অনেকেই। যাত্রার পার্ট ঠিক হতো, খোস গল্পও জমতো।

আজ কেউ সেখানে নেই। ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসে।

—বিষ্টু! তুই!

এগিয়ে যায় ভক্তি। আরও কে একজন রয়েছে। বিষ্টুর মুখে থমথমে আঁধার ঘেরা দৃঢ়তা।

—শালাকে ঠাণ্ডা করে দোব ভক্তি; ওর চুকলি খাওয়া ঘুচিয়ে দোব। মানভুমী ছত্রীকে চেনে নি ও।

কার কথা বলছে ঠিক বুঝতে পারে না ভক্তি। বিষ্টু সব পারে। ছোট খাটো জোতদার। দাঙ্গা ফৌজদারী করা অভ্যাস আছে। চিনতোড়ের এলাকার বাইরে তার বাড়ি। কোলিয়ারির তাঁবে সে থাকে না, বরং কোলিয়ারিই তাদের সর্বনাশ করেছে। নকড়া ছকড়ায় কিনেছে তাদের জমি, পিলার কাটিংএর সময় গ্রামকে গ্রাম নামমাত্র ক্ষতিপূরণ দিয়ে হটিয়ে দেবে। তার উপর এই অবিচারও সইতে হয় তাদের।

বিষ্টু বলে ওঠে—তুই আমার বাড়ি চলে যা। দাঁড়াস না এখানে।

—তুই।

ধমকে ওঠে বিষ্টু—যা বলছি তাই কর। চলে যা এখুনি। আমি আসছি।

আবার আঁধারে মিলিয়ে গেল বিষ্টু; ভক্তি কথা বাড়াতে সাহস করে না। চলে গেল সেও।

নারকুলিয়া শেষ বাসে হাটতলার কাছে নেমে ফিরছে কোলিয়ারিতে তার বাসার দিকে। মাইলখানেক পথ; চড়াইএর নীচে নেমে পথটা আবার চড়াইএর গা বেয়ে উঠে এসেছে মাথার দিকে। উপরেই সারি সারি বাংলো—তফাতে বাবুদের কোয়ার্টার। নিস্তব্ধ পথ, কুঁচ, বনতুলসীর জঙ্গলে ঢাকা পথ, নীচে দামোদরের ক্রুদ্ধ জলরাশি মেতে উঠে মাথা খুঁড়ছে পাথরে পাথরে। বাতাসে তারই গর্জন ধ্বনি: মেঘলা আঁধার।

বাঁকের মাথায় এসে দাঁড়াল, দূরে নদীর পাড় বরাবর জ্বলছে মার্কারি ল্যাম্পগুলো ক্ষীণ নীলাভ আভায়, পিটের ঘণ্টার শব্দ রাতের বাতাসে ভেসে

আসে ক্ষীণতর হয়ে। নাইট সিফ্‌টের লোকজন নেমে গেছে। কেউ যাতায়াত করে না।

একটা রিক্সা নিলে হতো—শুধু শুধু আট আনা পয়সা দিতে বাধে তার। বগলে কাগজে মোড়া ছিটের জামা, ফস্টারের বরাতি টুকিটাকি জিনিস একটা হ্যাণ্ড ব্যাগে।

বাঁকের মাথার কাছে আসতেই থমকে দাঁড়াল। বাঁশ গাছের জটলা ঢাকা অন্ধকার সাঁকোর মাথায় শাল গাছ নুইয়ে পড়ে জায়গাটাকে আঁধারে ভরে তুলেছে। সিগারেট ধরাতে যাবে, হঠাৎ পিছন থেকে অতর্কিত আঘাতে ছিটকে পড়ে রাস্তায়; চিৎকার করবার আগেই তারা তার ঘাড়ে চেপে বসে গলা টিপে ধরেছে; শ্বাসরোধ হয়ে আসছে। কাঁকর পাথরের শক্ত রাস্তায় নির্দয় ভাবে ওর মুখটাকে রগড়ে চলেছে, সেই সঙ্গে লাথি-কিল-চড়ও বৃষ্টি হচ্ছে। শক্ত বেলের মত আধ কামানো মাথাটা ধরে রাস্তার সঙ্গে ঠুকে ঠুকে ঝুনো নারকেল ফাটাবার চেষ্টা করছে।

অস্ফুট আর্তনাদ ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসে—জ্ঞানহীন দেহটা লাথি মেরে রাস্তার ধারে গড়িয়ে রেখে আবার তারা আঁধারেই মিলিয়ে গেল।

টিপ টিপ বৃষ্টি নেমেছে। কতক্ষণ ছিল জানে না নারকুলিয়া, মুখে চোখে বৃষ্টির ঠাণ্ডা জল লাগতেই উঠবার চেষ্টা করে। মুখ ঠোঁট নাক থেবড়ে গেছে, রক্তে ভিজে গেছে জামাটা; হাতড়ে জিনিসগুলো খুঁজতে থাকে। একটা আলো এগিয়ে আসছে। মোটরের আলো—হর্ন দিতে দিতে।

চিৎকার করে ওকে ডাকবার চেষ্টা করে নারকুলিয়া। জমাট আতঙ্কে কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেছে, উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। বিকৃত একটা আর্তনাদ বের হয়, অন্য কেউ যেন চিৎকার করছে।

গাড়িখানা এসে থামলো। নামছে ড্রাইভার; ওপাশ থেকে নেমে আসে স্বয়ং ব্লেজার; মুখে চোখে তার বিস্ময়ের চিহ্ন।

—হোয়াট ইজ ইট!

নারকুলিয়া ভেউ ভেউ করে কেঁদে ওঠে—কিল্ড স্যার। মার্ডার।

ড্রাইভার ওকে ধরে তুলল সামনের সিটে।

—ডিসপেনসারি মে লে চলো। ব্লেজারের মুখে যেন আষাঢ়ের মেঘ জমেছে।

কোলিয়ারিতে ক্রমশই বেশ একটা পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ—কঠিন প্রতিবাদের সুর ফুটে উঠছে। অরাজকতার জন্য নয়। ওরা যেন সবদিক থেকে এদের কঠিন শাসন আর শোষণটাকে মেনে নিতে পারছে না। আজ ওরা নারকুলিয়াকে অপমান করেছে—কোনদিন আরও উপরে উঠবে সেই হাত। এ তারই সূচনা।

তবু এই আন্দোলনকে অন্তরের গোপন কোণ থেকে সমর্থন করে ব্লেজার। উঠুক, এমনি আগুনই জ্বলে উঠুক, তারপর যারা আসবে তারা যেন এই সর্বনাশা আগুনে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

কোলিয়ারির ম্যানেজিং ডিরেক্টার বোর্ডে ইণ্ডিয়ান নিতে বাধ্য হয়েছে কোম্পানী। কিছু শেয়ার কিনেছে বিখ্যাত কোল কনসার্ন মুখার্জি অ্যাণ্ড সনস্। বিরাট ব্যবসায়ী, বেঙ্গল চেম্বারের তারাও ফার্স্ট ক্লাশ মেম্বার। বিলাতী কায়দায় ফার্ম করে বহুদিন যাবৎ কারবার চালাচ্ছে।

এতদিনে ব্লেজার বুঝতে পেরেছে তাদের দিন ঘনিয়ে আসছে। ভারতীয়দের সঙ্গে ওদের প্রাধান্য মেনে নিয়ে চলতে হবে। ওরা দু'একদিনের মধ্যেই কোলিয়ারি ইন্‌স্‌পেকশনে আসছে, কলকাতার বোর্ড থেকে সেই ব্যবস্থা সেরে ফিরছে ব্লেজার। পথে এই ঘটনা দেখে মনে মনে খুশিই হয়েছে যেন। পোড়ামাটি নীতি, পিছনে যা রেখে যাবে শত্রুসৈন্য যেন তার থেকে একদানা খাবার—একটু মাথা গোঁজবার ঠাঁই না পায়, চলবার সব পথ বন্ধ, ভস্ম করে দিয়ে যাবে।

তবু যেন কোথায় সম্মানে বাধে ; ডিসপেনসারিতে গাড়ি পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই খবরটা বিদ্যুৎবেগে ছড়িয়ে পড়ে। নারকুলিয়ার মুখের চেহারা বদলে গেছে। মাথায় পুরু ব্যাণ্ডেজ ; মুখে, নাকে প্লাস্টারের ব্যাণ্ডেজ ; চোখ দুটো পিট পিট করছে ফোলা মাংসের ফাঁক থেকে।

চারিদিকে মালকাটা, ওভারম্যান, ইলেকট্রিক পাম্প হাউসের লোকরা জমেছে। ফস্টার বাংলো থেকে এসে লম্ফ ঝম্প জুড়েছে।

—ক্লিয়ার আউট, ইউ বাস্টার্ডস।

ব্যাপারটা জমে আরও সকালের সিফ্‌টের লোকজন আসার আগে থেকেই। নাইট সিফ্‌টের খাদের নীচে নারকুলিয়ার খবর পৌঁছে গেছে। হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে তাকে, কেষ্টা বলে—আছে কি নাই কে জানে।

সাপের মাথায় ধুলোপড়া ফেলেছে কেউ। নাইট সিফ্টের ওভারম্যান, মুন্সীরা পর্যন্ত সুর বদলে ফেলেছে।

ফেসে নেহাৎ পিশ রেটের কায, কয়লা কাটার মাপে মজুরী; নাহলে কাজকর্ম বন্ধ করলেও যেন তাদের কিছু বলবার মত সাহসটুকুও নেই।

রাতের কায শেষ হতেই লোকজন জটলা করছে পিটের সামনে মাঠে; প্রথম পালির লোকজনও এসে জমা হয়।

মাখন বলে ওঠে—ব্যাটা নারকেলকে? শরণ সিংকে কে পিটিয়েছে শোনলাম?

বসন্ত দাঁড়িয়েছে ভিড়ের মধ্যে, পাঁচু নিকিরি, গদাধর, মদনও বলবার চেষ্টা করে—কাযে যা না তোরা, কায কামাই করলে রুজি মিলবে না।

কে আড়াল থেকে বলে—চোখের জলে ধুইয়ে দিলম মাটি

সেই মাটিতে কুড়িয়ে পেলম হারানো পিরীতি॥

দেখিস, তুর পিঠে না এইবার পড়ে। দালালগিরি!

পালোয়ান সিংএর রেজিমেণ্ট আজ খুব কর্মব্যস্ত।

ভোর থেকেই তারা বুট পালিশ করে চকচক করে তুলেছে। বোতামে, চাপরাশে ব্রাসোর ঝকঝকে পালিশ; মায় হাতের খেঁটে লাঠিটা পর্যন্ত। পালিশ একটু কমতি হওয়ার জন্যই যেন এই কাণ্ডটা ঘটে গেছে। তাই ডবল পালিশ করে ধোপদুরস্ত খাকি হাফ্‌প্যাণ্ট মাপসই—ফুলপটি লাগিয়ে পুরো ইউনিফর্মে এসে হাজির হয়েছে ডিউটিতে।

—ভিড় হটাকে। সবলোক আপনা কামমে যাও।

জমাদারের বাঁশি বাজে, সেই সঙ্গে ঝকঝকে পোশাকপরা সিপাইএর দল 'ফল ইন' করে মার্চ করে চলেছে কোলিয়ারির বাইরের মাঠে।

—রাইট-লেফট, রাইট···রাইট!

হেঁকে চলে সিপাইএর দল, জোর ধমকে মাটি কাঁপছে ওদের পায়ের ভারে।

সারা কোলিয়ারিতে একটা তোড়জোড়, নীরব প্রস্তুতি চলেছে। কর্তৃপক্ষ জেগে উঠেছে ধূমায়িত আগুনের অস্তিত্বর সন্ধান পেয়ে। নারকুলিয়াকে প্রহার করেছে ওরা, এইবার আঁধার রাতে না হয় খাদের নীচে তুচ্ছ কারণে

আর কাউকেও রেয়াত করবে না। সামান্য ঘটনাটা শ্রমিকদের বিক্ষিপ্ত শক্তিকে কোন অদৃশ্য বন্ধনে বেঁধে দৃঢ়তর করে তুলেছে। দুই পক্ষই যুধ্যমান। নিজের শক্তি সংগ্রহ করছে। চারদিকে কড়াকড়ি বাঁধন।

পিটে নামবার সময় ফস্টার, শরণ সিং দাঁড়িয়ে থাকে। কেউ একটু লেট হলেই তাকে ফিরিয়ে দিচ্ছে।

—নেহি হোগা আজ কাম।

—সাব!

গর্জন করে ফস্টার—ভাগো হিঁয়াসে।

কয়লার রেজিং কমে গেছে, কমুক। তবু ব্লেজারের সেই কথা, ডিসিপ্লিন ফার্স্ট, ডিসিপ্লিন লাস্ট।

বসন্ত জানে, এমনি ঘটবে। ওই পাথরই কাটতেও হবে। অন্যত্র যত কয়লা থাকুক না কেন, শাস্তি দেবার, নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখবার জন্যই যা খুশি করাবে। একক প্রতিবাদ করে ফল হবে না। এর জন্য চাই প্রস্তুতি।

কোলিয়ারির মাঠে অপেক্ষা করছে মাখন, বসন্ত। সকালের রোদ গাছ-গাছালি ছেয়ে ফেলছে। দূর থেকে বয়লারের ক্রুদ্ধ গর্জন ছাপিয়ে ভেসে ওঠে পাখির ডাক। ওপারের শাল বনে শেষ বর্ষার ছোঁয়া লেগেছে, সবুজের ঘন ছোঁয়া।

মালু চুপ করে চেয়ে আছে বসন্তের দিকে। এই যুদ্ধোদ্যম তার ঠিক ভাল লাগে না; ওদের প্রভূত শক্তি সামর্থ্য বুদ্ধি, তার বিরুদ্ধে মালকাটাদের সামর্থ্য কতটুকু! এর শেষ পরিণতিও সে দেখেছে। নিষ্ঠুর হতাশাময় আর উপবাসের কালিমা ঢাকা।

বসন্তকে ঠিক চিনতে পারেনি আজও, একটা জীবন্ত প্রতিবাদের মত শক্ত মানুষটি। বাইরে থেকে চেনা যায় না।

মাখন দাঁতে করে ঘাস চিবুচ্ছে। রোদের প্রথম তাপ লাগে মন্দ নয়। উপবাসী দেহতন্ত্রীগুলোয়, রক্ত কণিকায় উঠছে ওই রোদের মিঠে উত্তাপ, তৃষিত মৃত্তিকায় জলের অনুপ্রবেশের মত একটা শান্ত মধুর অনুভূতি সঞ্জীবিত করে তোলে তাকে।

এমনি মিঠে সবুজ পরিবেশে সেই গঙ্গাতীরের একটি স্বপ্ন তার মনে ভেসে ওঠে। একটু ঘর, সবুজ গাছগাছালি ঢাকা দেশ।

ঘর বাঁধবে সে। এখানে মাটিতে জীবন শুকিয়ে গেছে। বেঁচে গেছে ফকির। বহুদিনের বন্ধু, সে হয় তো আবার হারানো ঘরের ঠিকানা পেয়েছে; সুখী হয়েছে।

দলে লোক পায়নি। একজন কম নিয়ে কায করতে হচ্ছে। তবু ফকির এই গোলকধাঁধাঁ থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে—এটা ভাবতেও ভাল লাগে।

মাখনও যাবে।

হঠাৎ ফকিরের মত কাকে আসতে দেখে চমকে ওঠে।

ফিরে এসেছে ফকির। ঝুলঝাড়া চেহারা; মুখচোখে কালির জমাট দাগ, চোখ দুটো উপবাস আর অনিদ্রায় কোটরে ঢুকে গেছে। মাথায় চুলে খড় ধুলোবালির চিহ্ন। ঠোঁটের উপরটায় একটা কাটা দাগ। কপালের খানিকটা ফুলে আবের মত নেমে এসেছে চোখের উপর।

ধ্বংসস্তূপের একটা মানুষ। নেশার গন্ধ, মুখে চোখে লালচে আভা।

—ফকির!

—হুঁ, ফিরেই এলম। ই পাতাল ছেড়ে যাবো কুথাকে? সব শালা কুনদিকে হারিয়ে গেছে দাদা, আমাদের সব এমনই বেঘোরে হারায়।

বসন্ত কথা বলে না। হতাশ ওই লোকটার দিকে চেয়ে থাকে। এ মাটির বুক থেকে বাঁধন ছিঁড়ে কেউ যেতে পারে নি। পাকে পাকে জড়িয়ে ধরে, এর বাঁধন নাগপাশের মতই।

ঘণ্টা বাজছে! বয়লারের বাড়তি ষ্টিম ছেড়ে চলেছে। সাদা, উষ্ণ জলকণায় ভরে ওঠে চারিদিক, সূর্যের আলো পড়ে রামধনুর মত রং বাহারের সৃষ্টি করে।

ফকির চেয়ে আছে ওই দিকে; এত সুন্দর, এত বর্ণালী ওর বুকে, তবু অস্তিত্ব খুঁজে পায় নি কোন খানেও।

খুঁজতে গিয়ে ব্যর্থ রক্তাক্ত হয়ে ফিরে এসেছে। বাইরের আঘাতের চেয়ে মনে কোথায় নিদারুণ ব্যথা সে পেয়েছে। কাঁপছে সারা শরীর!

—চল গো? মাখনের ডাকে হুঁশ ফেরে।

—হ্যাঁ! কোনরকমে শীর্ণ দেহটা নিয়ে প্ল্যাটফরমে উঠলো।

গজগজ করছে ক্ষুব্ধ মালকাটার দল। এ ওর মুখের দিকে চায়। বসন্ত কথা বলে না। লিফ্‌টের মুখেই দাঁড়িয়ে আছে ফস্টার, শরণ সিং। একবার ওর দিকে চাইল তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টিতে।

বসন্ত মাথা নুইয়ে সেলাম করে, ফস্টার ভ্রূক্ষেপও করে না।

টিং টিং টিং! ঘণ্টা বাজছে।

স্থাপ্টের অতল থেকে এক ঝলক হাওয়া ঝড়ের বেগে লিফ্‌টের ঊর্ধ্বচাপে উঠে আসে। গরম ভাপসা গন্ধময় হাওয়া আসছে মাটির অতল থেকে। চমকে ওঠে বসন্ত!

সশব্দে ডুলিটা এসে দাঁড়াল। মাথায় দোমড়ানো লোহার চাদরের ছাউনিতে জল জমে আছে—মাটির নীচেকার চোয়ানো জল, দু এক টুকরো পাথর, কাঠের কুচি তাতে আটকে। দিনের আলোর বুক থেকে ওদের মানুষের রাজ্য হতে ছিনিয়ে নিয়ে আবার তৎক্ষণাৎ নেমে যায় ডুলিটা চির-অন্ধকারের অতলে।

আঁধার আর আলোর জগতে ও খেয়া দেয় বার বার।

বুকে ওর আশা নিরাশার দোলায় দোদুল্যমান বিক্ষুব্ধ জনতা। আজ তারা, অমনি বিক্ষোভে ভরে উঠেছে।

স্থাপ্টের গা বয়ে জল ঝরছে। সশব্দে নেমে চলেছে ডুলিটা।

বসন্ত বলে ওঠে—খুব ভালো লাগছে, না মাখন?

ফকির হাসছে—হাঃ হাঃ হাঃ।

অসংলগ্ন হাসি। মাখন ধমক দিয়ে ওঠে—এ্যাই ফকির।

ফকির চুপ করে চেয়ে থাকে ওর দিকে; প্রশ্ন করে—ডরাইছিস খাদের ব্যাত দেখে? অ্যা!

আবার হাসছে আপন মনেই।

পিট বটমে এসে পৌছেচে ডুলিটা। শান্ত স্তব্ধ জগৎ। ভয়ে ভয়ে আলো জ্বলছে দু একটা—দূরের আঁধার অতলে হারিয়ে গেছে তার রোশনী।

লালাজীর ক্যানটিন স্টোর্স বেশ জেঁকে উঠেছে। শাপে বর হয়েছে তার। পয়সা মারা যাবার ভয় নেই, উপরন্তু যা করবার ঠিকই করে চলেছে, তবে বখরা দিতে হয় কর্তৃপক্ষকে। চড়া সুদের কারবারও চলেছে বেশ। তবে এ কারবারে পালোয়ান সিং-শরণ সিংরাই এক চেটে আধিপত্য শুরু করেছে। টাকায় হপ্তাহে দু আনা সুদ। না দিলে কোতোয়ালীতে ধরে নিয়ে গিয়ে

ছুতোয় নাতায় প্রহার ; আসল মজুতই থাকলো, সুদ ঠিক মাটির নীচে থেকে আলুর মত বের হয়ে আসে। ওদিকে কোলিয়ারির রেজিং ঠিকে পেয়ে তার হাতের বেশ কিছু মজুর মালকাটাকে লালাজী তদারক করছে।

—গোল মৎ করো বাবা, লাইনসে খাড়া হো যাও। এ্যাই হারামজাদ ?

সোজা হুঙ্কার ছাড়ে, রেশন দেওয়া হচ্ছে। ওদিকে তেলের টিনের আড়ালে লুকোনো হোয়াইট ওয়েলের পিপে। ঠিক হিসেব মত পাইল দিয়ে এক টাকা সের পড়তা ফেলেছে—সেই তেল বিক্রী করে দেড় টাকায় ; চালের ব্যাপারে ক'দিন থেকেই গণ্ডগোল চলেছে। পচা কাঁকর ভর্তি চালই দেওয়া হয়, অখাদ্য। ইয়াকুব সাহেবের মদের দোকানেও চাল যায় লরী দরুনে ; চটে উঠেছে সকলেই। ভাত আর মদ দুটো মাত্র খাদ্য, তাকেও অখাদ্য করে তুলেছে লালা।

—কোথেকে এ চাল আন বাবা ? ই যে বাবা বেঙ্কার আগুনে সেদ্ধ হয় না।

—বহুৎ বদবু।

লালাজী ফোঁস করে ওঠে—হম্ ক্যা ফোঁকট লাতা হ্যায় ? যো মিলতা ওহি দেতা। লেগা তো লেও, নেহি তো ভাগো।

যাবার জায়গা নেই। টিকি বাঁধা। অগত্যা জনতা চুপ করে গেল।

আবার একটু পরেই গুঞ্জন ওঠে। নোতুন লোকের দল পিছনে এসে শুরু করেছে গোলমাল। লালাজী ভাল চাল এখানে তোলে না। তার জন্য আলাদা গুদাম আছে, বেশি কিছু দর দিলে বা ক্ষেত্র বিশেষে তাদের জন্য আলাদা ভাবে পৌছান হয় বাড়িতে।

সেই সৌভাগ্যবানদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়।

বুধনও লাইনে দাঁড়িয়ে ফুলছে মনে মনে। ওই মোটা দেড় চোখো লোকটা তার সব সাধ বরবাদ করে দিয়েছে। কথাটা ভুলতে পারেনি আজও।

বুধনের সেদিন সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে। হাট থেকে মুরগী কিনে এনেছিল দুটো ; দেশ থেকে এসেছে বুধিয়ার ভাই আর কাকা ; বিয়ের কথা-বার্তা পাকা হয়ে যাবে। আরও দুচার জনকে নেওতা করেছিল ; ঘরেই মদ তুলেছে বাখর দিয়ে। কিন্তু হাঁড়ির মুখ খুলে চমকে ওঠে ; নিমন্ত্রিতরা বসেছে

গোল হয়ে, বাটিতে মুরগীর ঝলসানো মাংস, নূন আর একটু তেল বোলান মাত্র; তাই চিবুচ্ছে; ভাত আর মদ।

কিন্তু মদের দুর্গন্ধে কাছে টেকা দায়। লালাজীর চাল বিলকুল বরবাদ করে দিয়েছে তার আয়োজন। বুধিয়ার কাকা দুটো দানা মুখে দিয়ে থু থু করে ফেলে দিয়ে বলে ওঠে,

—ইযি শূয়োরের দানারে, ই খাস কিস্‌কে?

বুধনের গালে কে যেন চড় মেরেছে, সমস্ত আয়োজন তার পণ্ড হয়ে গেল। হাড়িয়া মেলে না, মেলে কালীমার্কা দিশী। সাঁওতালের তাতে নেশা মেটে না।

—তাহলে? বুধিয়ার কাকা একটু ক্ষুণ্ণ হয়।

বুধন চুপ করে থাকে, সেই সময় লালাকে সামনে পেলে বোধ হয় খুনই করে ফেলতো। কাকার মেজাজ বিগড়ে গেছে, নেশার সময় নেশা না পেলে কথা কইতেই মন চায় না। তাই কথাবার্তা তেমন কিছু এগোল না।

ফণ্টামাঝি হুঁকো টেনেই নেশা থামাতে চেষ্টা করে। বলে চলেছে সাঁওতালের ঘর বসতের কাহিনী।

—ঘুরে বেড়াতো ইদিক উদিক, ই বন সি বনে। ঝর্নার জলের ধারে হারা ঘাস দেখে থমকে দাঁড়ালো তারা; জল দিলেক সরাতে—ধান ছিটাই দিলেক কুঁকড়োকে। সেই মুরগী যদি ধান খায়, জল খায় আর বাঁক দেয়, তবে জানবেক ই মাটিতে ঘর বসত হবেক; ঠাণ্ডা মাটি বটে। কেনে ইটি হল বল দিখি তু?

বুধন এসব কথার মানে বোঝে না, সে ঘর ছেড়ে চিনকুঠীতে কায করতে এসেছে। ফণ্টা মাঝি সাতাশীর মাতব্বর, জান বুঝ আছে। মাথা নেড়ে বলে ওঠে,

—ভাত পাবা, জলও আছে আর আছে সুখ স্বোয়াস্তি। কুঁকড়োর হাঁকে এইটিই বুঝাই দিলেক। তাই ই মাটিতে কুঁকড়োর হাঁকটিই নাই; ওই যে কথাটিই বললাম। সুখ, ওইটিই নাই গো ছেলা।

বুধন চুপ করে বসে থাকে। বুধিয়ার মুখখানা মনে পড়ে; মনে হয় একবার দৌড় দিয়ে গিয়ে দেখে আসে তাকে—বর্ষার জল পেয়ে কেমন কচি চিকন শাল গাছের মত হারা হয়ে উঠেছে।

তারা পরদিনই চলে গেল নদী পার হয়ে ওই পাহাড়ের ছায়াঘন বনসীমার দিকে।

বুধনের মনটা হাহাকার করে ওঠে, সাঁওতালের মরদ। কিন্তু একবার এই জীবনের স্বাদ পেয়েছে, কলের জল, বাতি গাড়ি আর দুটো কাঁচা পয়সার মুখ দেখেছে; ডুংরির জীবনটাকে আজ ভয় করে।

—যাবিনি তুই?

—কাড়ান পরবে যাবো গো।

হাতে টাকা পেলে বুধির জন্য শাড়ি, কাঁচমালা আর আরশি নিয়ে যেতে হবে। পয়সা তবু ধরা যায় না হাতে, আসে আবার পিছলে বের হয়ে যায়। কেনা হয় না। ছাতাপরবে যাবে,—কাড়ান পরব শেষ হয়ে গেল। ছাতাপরবে যাবে নির্ঘাৎ।

যাওয়া আজও বুধনের হয়নি, স্বপ্নে যেন ডাক দেয় ফুল ডুংরি বার বার তাকে।

—এই, কি লিবি?

লালাজীর ডাকে হুঁশ হয় তার। লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। কোথায় সেই বুধিয়ার ডাগর চোখের চাহনি। কোথায় বা সেই ডুংরির ছায়াঘন শালবন। কোলিয়ারির ইট কাঠ লোহার রাজত্ব। বুধন সাড়া দেয়,

—চাল দে, ভালো দিবি বটে হঁ।

গামছার খুঁটটা পাতে, মনে হয় যেন ভিখিরীর মত আঁচল পেতে দাঁড়িয়েছে কার দরজায়। কয়েক সের লাল মোটা ভাঙ্গা খুদ আর কাঁকর-বালি কে ঢেলে দেয় ওর আঁচলে, বাতাসে ধুলো উড়ছে তার থেকে, আর তেমনি দুর্গন্ধ।

—ই কি দিছিস? বরার দানা দিবি?

লালাজী ওদের আগের বারের কঠিন আক্রমণে একটা চোখ ঘুস দিয়ে খালাস পেয়ে এসেছে, বাকী চোখটা লাট্টুর মত বনবন করে ঘোরাতে থাকে। সে দিনও বদলেছে—লালাজীও। ধমকে ওঠে,

—চল্ হঠ; ভিক্ষের চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া! যো মিলছে ওহি বহুৎ মেহেরবাণী।

পিছনের জনতা ক্ষেপে ওঠে—মাংনা দিছ নাকি হে তুমি?

—ভারি লম্বা লম্বা কথা তুমার ; শালা হারামী কাঁহাকা।

বুধন রাগে ফুলে ওঠে, প্রতি সপ্তাহেই এই ব্যাপার। অথচ বাজার থেকে দাম কম তো নয়ই, বেশিই। চালগুলো ধাঁ করে ওর মুখের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলে ওঠে,

—লে, তুই খা। কাঁকর আর ডাঙ্গার ধুলো ঝেঁটিয়ে আনবি কেবল।

কানা চোখে মুখে হাঁয়ের মধ্যে ঢুকে গেছে চালগুলো—একটা কলরব। কারা যেন হৈ চৈ করে ওঠে। পালোয়ান সিং-এর বাহিনী মুহূর্ত মধ্যে এসে পালিশ করা বেটন হাকড়াতে থাকে কাঁধে মাথায়। কে বুধনের হাতটা ধরে টান দেয় ; বুধনও পিছিয়ে গিয়ে ওর বুকেই এক লাথি কসেছে, পাহারাওয়ালা এই অতর্কিত আক্রমণের জন্য তৈরি ছিল না। মারাই তাদের অভ্যাস, মার খাওয়া নয়। তাই হঠাৎ এ উলটো ব্যাপার দেখে একটু ঘাবড়ে গেছে সে।

কয়েক জন ঘিরে ফেলে তাদের, দুচার জন মালকাটা কুলী ফাঁক বুঝে সরে পড়েছে, পালোয়ান সিংও এসে পড়ে। বুধনকে ওরা ধরে কাবু করে ফেলেছে। মারের চোটে নাক ফেটে রক্ত ঝরছে ; মাথার বাবরি চুলগুলো মুঠো করে একজন পাহারাদার তাকে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে। কোলাহলে ভরে উঠেছে অপিসের সামনের মাঠ ; বাবুরা উঁকি ঝুঁকি মারে জানলার কাছে বারান্দায়।

—উরে বাপ্‌রে! ই যে ডাকাত ধরেছে পালোয়ান সিং।

পালোয়ান সিং দাড়ি চুমরে সাবাস দেয়—হামি ডাকাইতের বাবা আছে।

লালাজী ঘরপোড়া গরুর মত সাবধানী হয়ে উঠেছে আগেকার সেই লুঠতরাজের পর। মুহূর্ত মধ্যে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে দোকানের। হেঁচে কেশে খানিকটা সামলে নিয়ে বের হয়ে এসেছে বারান্দায় ; তারস্বরে হাঁক পাড়ে,

—ই ভি থে উস রোজ, হমারা পান্‌শো রুপেয়া লিয়া। আজ ভি বদ মতলব থে। হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা। অব্ পাকড় গিয়া।

বুধন গোঁ ধরে রয়েছে—ই চাল কেনে দিবি তুই? কিস্‌কে? ইতো কাঁকর বালি, ঠকাবি কেনে বটে?

সে বোঝে না, ঠকানোই এখানের ধর্ম, বিনা প্রতিবাদে ঠকাই এখানের ভদ্রতা, আইন। বুধন সে আইন অমান্য করেছে।

সমস্ত চোট পড়েছে বুধনের উপর।

কয়েকজন পাহারাওলা ওকে ধরে টেনে নিয়ে চলে ফস্টারের ঘরের দিকে। লালাজী চেঁচাচ্ছে।

তফাতে দাঁড়িয়ে আছে মালকাটার দল, শূন্য থলি হাতে। লালা নাকি রেশনই দেবে না। দোকান বন্ধ করে দিয়েছে।

ক্রুদ্ধ জনতা কলরব করে ওঠে—এ্যাই শালা!

লালা পিছন দিকে চেয়ে সটান ফস্টারের ঘরে ঢুকে পড়ে। কলরব বাড়তে থাকে ক্রমশ।

অতল অন্ধকারে মিট মিট জ্বলছে কয়েকটা জোনাকির মত আলো; পাতালপুরীতে কঙ্কালের দল ঘুরে বেড়াচ্ছে। জমাট কঠিন দেওয়ালে গাঁইতি মেরে তারা যেন মুক্তির সামান্য পথটুকু করে নিতে চায়; আলো বাতাসের স্বপ্ন ওদের উন্মাদ করেছে। অবিশ্রান্ত চলেছে গাঁইতি কুমারী মৃত্তিকার অতলে।

খটাখট্ শব্দে গাঁইতি চলেছে। ধুপধাপ পড়ছে কয়লা। গরমে—আর পরিশ্রমে দরদর ঘাম ঝরছে। হুঁশিয়ার!

কয়লার ঝুড়ি উঠছে উপরে, সেখানে গিয়ে টবে ঢালো। এক একবার ঘাম মুছে ফেলে আবার গাঁইতি ধরছে। কালো ধুলো মাখা চটচটে খানিকটা জলীয় পদার্থ—ঘাম ঠিক নয়। নিঃশ্বাসে ঢুকছে সেই বাতাস, নাসা রন্ধ্রপথ যেন বুজে আসে কয়লার ধুলোতে। বুকে টান ধরছে। দম বন্ধ হয়ে আসে শ্রান্তি ক্লান্তি আর গুমোট গরমে।

মাখন দুহাতে নয়ানজুলীর জল ছিটচ্ছে গায়ে মাথায়, আবার গাঁইতি ধরে। টন টন করছে শরীর, বিষবাষ্প অবশেষ জীবনশক্তিটুকুকে কুরে কুরে খাচ্ছে। বসন্ত মাঝে মাঝে গাঁইতি তুলে চোট দিতে থাকে। মাখন প্রতিবাদ করলে বসন্ত বাধা দেয়।

—একটু জিরোও সর্দার।

হাঁপাচ্ছে মাখন। বয়স হয়েছে এইটাই টের পায় মাখন। হাতের শক্ত পেশীগুলো যেন ছিঁড়ে যাবার উপক্রম।

দৈত্যের মত গাঁইতি চালাচ্ছে ফকির। চোখ দুটো লাল জবা ফুলের মত, কালো কয়লার কসের গভীর কোটর থেকে ধকধক করছে। হাঁফানির শব্দ উঠছে বাতাসে।

মাখন একটু অবাক হয়—এ্যাই ফকির!

ফকির কথা বলে না, দুর্মদ বেগে গাঁইতি চালাচ্ছে; ঝড় ঝড় করে ধ্বসে পড়ছে চাপ চাপ কয়লা।

—বে আক্কেলে চোট মারিস না। এ্যাই। মাখন ওর ব্যবহারে বিস্মিত হয়। বেপরোয়া হয়ে উঠেছে ফকির। মৃত্যুপুরীর মাঝে ও যেন মেতে উঠেছে ধ্বংসের মত্ততায়।

নরম স্তর, এ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যই ওই। মাটির এত নীচে কয়লার স্তরের মধ্যে বহু বিচিত্র ভূতাত্ত্বিক সমস্যা এবং প্রশ্ন জমা হয়ে আছে। কোথায় জমে আছে সঞ্চিত গ্যাস—মুহূর্তের অসতর্ক আঘাতে সেই সঞ্চিত গ্যাস বেগে বের হয়ে এসে সমস্ত বাতাসকে বিষাক্ত বিস্ফোরকে পরিণত করে তুলবে, গাঁইতির আঘাতে সামান্য ফুলকিটুকুই চরম সর্বনাশ ঘটাবে। না হয় কোথাও অন্য বিপদও হতে পারে। বিরাট চাপই ধ্বসে পড়বে হুড়মুড় করে, এ ফিল্ডে এই বাম্পিং খুবই স্বাভাবিক ঘটনা।

মাখন বলে ওঠে—ইখানে কায করব নাই বসন্ত, সাংঘাতিক জায়গা। ভাল ঠেকছে নাই।

দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় মাখন কি যেন অমঙ্গলের সন্ধান পায়। দলের অনেকেই কায বন্ধ করেছে।

কয়লা বোঝাই করার ফাঁকে মালু ঘামে ক্লান্তিতে জমাট দেওয়ালে হেলান দিয়ে একটু জিরুচ্ছিল। সে নীরবে এই প্রতিবাদ সমর্থন করে। বসন্ত বলে ওঠে,

—একা তুমি বললে হবে না, দেখ ওরা সকলে কি বলে?

হাতের গাঁইতি কাঁধে তুলে ওপাশ থেকে নামো ধাওড়ার মানিক সর্দারও এগিয়ে আসে—চল এখুনি কায ছেড়ে। কালের বাসায় কায করতে নামবো নাই। ঢের জায়গা আছে কোলিয়ারির, সিখানেই মাল কাটবো। না দেয়, দেখা যাবেক কিলা।

বসন্ত তা জানে। অফুরন্ত কয়লা এখানে। তবুও এই খন্দের ভিতর

নামানোর কারণ ঠিক বোঝে না; খানিকটা অনুমান করে মাত্র। ক্রমনিম্ন কয়লার একশো ফিট প্রশস্ত স্তর হঠাৎ ভূগর্ভে একটা জমাপাথরের বাধা পেয়ে একটু নেমে গিয়ে সেই পাথরের স্তরের ওপাশে উঠে আবার চলেছে সেই স্বাভাবিক গতিতে। সাধারণত নিয়ম এমনি, 'ফল্টি রক' হলে সেই পাথর-টাকে ব্লাস্ট করে সুড়ঙ্গ তৈরি করে ওপাশে আবার সেই কয়লার স্তরে গিয়ে কয়লা তোলে। কিন্তু কোম্পানী সেই খরচটুকুও করতে রাজি নয়, এদের দিয়ে কয়লার স্তরেই সুড়ঙ্গ করিয়ে নিচ্ছে, তাছাড়া এই জায়গাটা বোধ হয় শাস্তি দেবার জন্যই কোলিয়ারিতে রাখা হয়েছে—মালকাটা জব্দ করবার ঠাঁই। পরিশ্রম তিনগুণ—মজুরী তার তুলনায় সেই রেটই, অতি সামান্য।

—ওঠ রে। এ্যাই ফকির। যদু মহাতো উঠে এসে হাঁক পাড়ে। পিছু পিছু উঠেছে অনেকেই।

ফকিরের কোন দিকে নজর নেই। তার মন কোন সুদূরে। কায করে চলেছে একটা অন্য মানুষ।

ওর মনে মনে একটা হতাশার কালোছায়া, প্যানচোত পাহাড়ের গায়ে বর্ষার মেঘ জমার মত জেঁকে বসেছে—ঢেকে ফেলেছে তার নীল রোদ মাখা আভাষ। এতদিনের প্রতীক্ষা, পথ চাওয়া সব ব্যর্থ হয়ে গেছে। তার সমস্ত সঞ্চয়টুকু পর্যন্ত কেড়ে নিয়ে ওরা রাতের আঁধারে দূর করে দিয়েছিল। মাথায় কপালে যে আঘাত পেয়েছে—তার চেয়ে ঢের বেশি আঘাত বেজেছে তার বুকে।

নেশায় চুর হয়েও সেই দৃশ্য—হাসি আর টিটকারী ভুলতে পারে না। বীভৎস একটা জগতের দুঃস্বপ্ন, প্রতিবাদ করতে পারে নি, জমাট কয়লার স্তরে সেই প্রতিবাদের আঘাত ফুটে ওঠে প্রচণ্ড গতিতে।

—নেশায় ডুবে আইছিস নাকি রে? এ্যাই ফকরা—মাখন ধমক দিয়ে ওঠে।

ফকির একবার মুখে চাইল মাত্র ওদের দিকে। শূন্য দৃষ্টি। আলোয় ঠিক ঠাওর হয় না কিছু! কোথায় যাবে? কেনই বা যাবে?

সব পথ—ঘর তার হারিয়ে গেছে।

পা দুটো টলছে। শক্ত হাতে গাঁইতিটা চালে গিঁথে দিয়ে ধরে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে। ঝুর ঝুর ঝরছে আলগা কয়লা।

রাত্রির আবছা দৃশ্যগুলো মনে পড়ে—অর্ধনগ্ন চেহারা; বহুদিন দেখেনি ওদের; একটা নেশার মত তীব্রতা তার আচ্ছন্ন চিন্তাধারাকে তীক্ষ্ণ অনুভূতিতে ভরে তোলে।

—উঠে আয়, এই হতভাগা!

ওরা একে একে উঠে গেছে উপরে; ফকির মাথার উপর চ্যাঙ্গাড়ের মাঝ থেকে চাড় দিয়ে গাঁইতিটা খুলতে থাকে। হঠাৎ ল্যাম্পের ক্ষীণ আলোয় চোখে পড়ে মালুকে—গরম আর ঘামে ভিজে উঠেছে তার সর্বাঙ্গ; যৌবন পুষ্ট অনাবৃত দেহে সেই কামনার তীব্র অনুভূতির সার্থকতা খুঁজে পায় সে; গুরু গুরু কাঁপছে কুমারী প্রস্তরশিলা।

একটি মুহূর্ত! ধক্ ধক্ করে জ্বলে ওঠে ব্যর্থ ফকিরের চোখ দুটো। মাথাটা ঘুরছে—ঝুলন্ত গাঁইতিটা ছেড়ে দিয়ে উন্মাদের মত তাকে জড়িয়ে ধরে ফকির; আলো দুটোর সুইচ অফ করা—আদিম নিবিড় অন্ধকারে ফকির জড়িয়ে ধরেছে মালুকে—ওর নরম ব্যর্থ দেহটাকে। মালু চিৎকার করতে গিয়ে থেমে গেল। অতর্কিত আক্রমণে হতভম্ব হয়ে গেছে, সারা দেহে ওই উন্মাদ মানুষটার কামনার তীব্রতা—গরলের মত জ্বালা তুলেছে।

দুই হাত দিয়ে আঁচড়ে কামড়ে তাকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করে মালু। ফকির নিবিড় ভাবে চেপে ধরেছে, বহু যুগের তৃষ্ণার জ্বালা তার চোখে; নিঃশেষে লুটে নিতে চায় সে, যারা তার এতবড় সর্বনাশ করেছে, তাদের এক জনকেই সামনে পেয়ে আজ তৃষ্ণা মিটোতে চায়।

বসন্ত চমকে ওঠে; বাতাসের স্তরে মৃদু একটা শব্দ তরঙ্গ তার মনকে নিদারুণ আঘাতে ভরে তোলে। অসহায় মালু! জেগে ওঠে ওর বুক চিরে একটা ক্ষীণ শব্দ। মালু চিৎকার করে ওঠে।

—ফকির! উপর থেকে বসন্তের চিৎকারে গ্যালারি ভরে যায়। —হুঁশিয়ার! বাম্পিং!

যে যেদিকে পারে অতল অন্ধকারে সরে যাবার চেষ্টা করে। একটা প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে ওঠে অতলপুরী; ধুলো—কালো ধুলোয় ভরে যায় বাতাস; দমবন্ধ হয়ে আসে ধুলোমাখা বাতাসের অতর্কিত চাপে। আলোর ক্ষীণ রেখা ধূলি-জালে হারিয়ে যায়—সব ঢেকে দিল নিষ্ঠুর ধরিত্রী। অতলের মাঝে জেগে ওঠে তার অন্তহীন স্তব্ধতা।

মাখন চিৎকার করে ওঠে—ফকির !

ফড়িং সরকার বসেছিল দূরে। আকস্মিক একটা প্রচণ্ড শব্দে টিনের পিপের সিংহাসন ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে দৌড় মারে সোজা। চেনা শব্দ, বুক কাঁপানো অনুভূতি। ভিজে পাথরের সুঁড়ি পথ বেয়ে মোটা শরীর নিয়ে ছুটছে। বৃথা ছোটা—সত্যিই যদি কিছু হয় কোন খানে এর রক্ষা নেই, ভাল করে জেনেও তবু ছোটে জৈবিক বৃত্তির স্বাভাবিক প্রকাশে।

—গ্যাস এক্সপ্লোশন !

একটু উঠে যেতেই দেখে শরণ সিংও দাঁড়িয়ে পড়েছে—আসছিল এই দিকে। কোল ফেসে একটা কিছু ঘটেছে। বিস্ফোরণ নয়; বোধ হয় বাম্পিংই হবে। কোথাও ধ্বস নেমেছে ;

—ক্যা হুয়া ?

ফড়িং হাঁফাচ্ছে। শরণ সিং ওকে ধরে ফেলে—ক্যা হুয়া মুন্সীজী ?

—ক্যা হুয়া ! ধ্বসেছেন। বাবা বাসুকী নাগের ফণা টলেছে এইবার। উরে বাপ্‌রে ! ফড়িং ওর হাত ছাড়িয়ে স্যাপ্টের দিকে ছুটতে চায়।

বাধা দেয় সিংজী—ডরো মৎ !

কান পেতে শোনে কোলিয়ারির কাঁপুনি থেমে গেছে, কাদের কথার টুকরো শব্দ ভেসে আসে। শরণ সিং এগিয়ে যায়।

ফড়িং সরকার বলে ওঠে—যেও না সিংজী, শালাদের চেনো না। দু'একটা চাপা পড়েছে নির্ঘাৎ। তোমাকেও ধরে দেবে তাদের সামিল করে। ক্ষেপে আছে ওরা।

কথাটা ঠিক।

শরণ সিং কি ভেবে থমকে দাঁড়াল। পরমুহূর্তে ফড়িং সরকারের সামনে দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে এগিয়ে চলে—আও মুন্সীজী !

—যাবো ? দেখো বাবা প্যাঁদানি না দেয় কিন্তু। মালকাটার প্যাঁদানি ! গন্ধর্ব ছুটিয়ে দেবে। শরণ সিং চলেছে ফড়িংএর সাহসে ভর করে, ফড়িং চলেছে সিংজীর ভরসায়।

স্থির হয়েছে কোলিয়ারির কাঁপুনি। কয়লার গুঁড়ো ধুলো থিতিয়ে পড়তেই ক্ষীণ আঁধার ভাঙ্গা আলোর তির্যক রশ্মিতে দেখা যায় ধ্বংসের পরিমাণ। নীচুর দিকে যে কুয়োখাদে তারা কাজ করছিল প্রকাণ্ড ধ্বসে সেই ঢালু খাদটা

প্রায় বুজে এসেছে। একটা স্তব্ধ আতঙ্কের হিম স্পর্শ ওদের শিরা উপশিরায় বয়ে যায়।

মৃত্যুর পদধ্বনি ওঠে বাতাসে। কালো জমাট স্তব্ধ মৃত্যুর যবনিকা নামল তাদের সামনে। ছিনিয়ে নিয়ে গেল সহকর্মী বন্ধু দোসর ক'জনকে।

—মালু! বসন্তের ডাকে মাখন ওর দিকে চাইল।

একা মালু নয়, ফকিরও রয়েছে ওই ধ্বসের নীচে। মাখন চুপ করে চেয়ে থাকে বসন্তের দিকে। চক চক করে জ্বলছে কয়েকটা হেডলাইট। অসীম নৈরাশ্য মাখা স্তব্ধতাই ওদের শেষ পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

মৃত্যু!

জীবন আর মৃত্যুর মাঝে ব্যবধান এখানে একটি মুহূর্ত মাত্র। অতল অন্ধকারের জগতে একমাত্র উজ্জ্বল সত্য। কয়েকজন মালকাটা চাপা পড়ে মরেছে। স্বাভাবিক দুর্ঘটনা। বাম্পিং। এর জন্য কোলিয়ারি কর্তৃপক্ষের করবার কিছুই নেই। নির্দোষ নিরপরাধ তারা।

মাখন বলে ওঠে—ওমনি চাপা পড়েই থাকবে ওরা!

স্তব্ধ মালকাটার দল কিছু বলে না। জীবন্ত থাকতে দেহটার মালিক একজন থাকে; এখানে মৃত্যুর পর সেই দেহের জিম্মাদার ওই কোম্পানী।

বাধা দেয় বসন্ত—তাছাড়া এখন ওখানে যাওয়া নিরাপদ নয়। চারদিকে চাল জখম হয়ে আছে, আরও ধ্বসবে কিনা কে জানে। প্রপিং করে খুঁটি দিয়ে তবে তোলা যাবে।

যদু মাহাতো গাঁইতির উলটা পিঠ দিয়ে ধ্বস নামা চালটা ধীরে ধীরে ঠুকতে থাকে। কান পেতে শোনে সেই বিচিত্র নিরেট আওয়াজটুকু। মাটির অতলের কাহিনী।

কখনও হাসি, কখনও কান্নার মত হালকা সুরেলা একটা আওয়াজ কেঁপে কেঁপে ওঠে।

মালুর ডাগর চাহনি তখনও ভেসে ওঠে বসন্তের চোখে; ব্যর্থ জীবনের যবনিকাও তেমনি ব্যর্থতার মাঝেই ঘটলো।

বসন্ত চুপ করে কি ভাবছে, ম্যানেজার মিঃ মিত্র নীচেই ছিল ইন্‌স্‌-পেকশনে। শব্দ শুনে সে গিয়ে হাজির হয়েছে। বসন্ত ওকে দেখে এগিয়ে আসে।

—দুজনকে পাওয়া যাচ্ছে না স্যার!

মিঃ মিত্র চারিদিকে চেয়ে দেখেই বিস্মিত হয়। সামনেই সেই সাদা পাথরের স্তর, পাশ দিয়ে পিটটা নেমে গেছে—ওটাকে বোর করে সুড়ঙ্গ না চালিয়ে কোম্পানী পাশ কাটানো কয়লার স্তর ধরে কাটাই করে পথ বের করে'চলেছে। এতবড় একটা ভুল ফস্টার জেনে শুনে করবার অনুমতি দিয়েছে দেখে আশ্চর্য হয় মিত্র সাহেব।

আলগা স্তরে বাম্পিং ঘটবেই—ঘটেছেও তাই। শরণ সিং ওকে দেখে ভরসা পায়, একটু এগিয়ে আসে; ফড়িং সরকার আবার গড়ানো পিপের উপর বসে ফেলে যাওয়া খৈনির কৌটা তুলে নেশার আয়োজন করছে। বুকের কাঁপুনি তখনও থামেনি, মাঝে মাঝে দাঁত কত্তাল বাজছে। নেশা করে যদি একটু ভরসা ফিরে পায়।

মিঃ মিত্র শরণ সিংএর দিকে ফিরে বলে—বোর নেহি চলতা?

—নেহি সাব! বড়া সাব নে বোলা এ গ্যালারি সে যানেকো।

—অর্ডার দিয়া?

অর্থাৎ লিখিত পড়িত কোন অর্ডার আছে কিনা জানতে চাইছে মিঃ মিত্র।

বসন্তও এসে দাঁড়িয়েছে। ফস্টার সাহেব ও সব ব্যাপারে লিখে পড়ে কোন হুকুম দিতে চায় না। শরণ সিং আমতা আমতা করে।

—হম্‌কো বোলো উনে।

—আউর তুম কাম শুরু কর দিয়া, অব ক্যা হোগা? ক্যায়সে উঠেগা উ ডেডবডি?

মাখন এগিয়ে আসে—তুলবো আমরা?

মিঃ মিত্র ধমকে ওঠে—না, চারদিকের চাল ড্যামেজড; এখন তোলা মোটেই সম্ভব নয়; একটু নাড়াচাড়া পেলেই আবার ধ্বসবে। সিওর টু বাম্প এগেন।

—তা হলে? বসন্ত প্রশ্ন করে।

মিঃ মিত্র জবাব দেয়—চারদিকে প্রোটেক্‌টিং ওয়াল তুলতে হবে, প্রপ দিয়ে সেফ করে তবে অন্য কোন কথা। নইলে আবার বিপদ ঘটতে পারে।

অর্থাৎ ওদের মৃতদেহ দুটো ওই খানেই পড়ে পচবে, গলে গলে যাবে ওই জমাট বিশ ফিট কয়লার স্তরের নীচে, তারপর তোলা হবে কঙ্কাল দুটোকে।

জীবনে যারা আলো বাতাস পায় নি, মৃত্যুর পরও তাদের সেই কঙ্কাল শেষ আলোর স্পর্শ থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে।

বসন্তের পিঠে হাত রেখে বলে ওঠে মিঃ মিত্র,

—তোমার আপনার লোক ?

বসন্ত কথা বলল না, অন্ধকারে চুপ করে চেয়ে থাকে মাত্র ; চোখে-মুখে পড়েছে এক ঝলক আলো ; মিত্র সাহেবের কঠিন মুখে করুণ একটু সমবেদনার আভাষ। ভারি গলায় বলে ওঠে,

—কিছুই করবার উপায় নেই। ভেরি রিস্কি।

—কিন্তু এই বে-আইনী কাষ যারা করে তাদের কৈফিয়ৎ ?

মিঃ মিত্র কি বলতে গিয়ে থেমে গেল। একটি নীরব মুহূর্ত !

মিঃ মিত্র দাঁড়াল না, ওর কথার জবাব দেওয়া যায় না। জবাব না দিয়েই চুপ করে ফিরে গেল মিঃ মিত্র। ওদের সামনে সান্ত্বনা জানাবার ভাষাও তার নেই।

শরণ সিং হেঁকে ওঠে—তফাৎ যাও সব লোক।

—দে না শালাকেও ফেলে। কে যেন বলে ওঠে।

শরণ সিং নিরাপদ দূরত্ব থেকে দাঁড়িয়ে সিংহ বিক্রমে হাঁক পাড়ে—হট যাও, সব কোই কাম মে যাও।

কে গর্জন করে—চোপ বে শালা। কুত্তাকা বাচ্চা।

কোলিয়ারির জমাট দেওয়ালেরও কান আছে। কোন রন্ধ্রপথে চকিতের মধ্যে সংবাদটা বাইশশো ফিট উপরে উঠে এসে বিদ্যুৎবেগে আকাশে আকাশে ছড়িয়ে যায়, ছড়িয়ে যায় আশেপাশের ধাওড়ার মধ্যে, খাদে ধ্বস নেমেছে। ধ্বস নেমেছে এমন একটি জায়গায়, যেখানে কেউ কাষ করতে চায় নি, এক কথায় সবাই প্রতিবাদ জানিয়েছে, অথচ জোর করে তাদের মতের বিরুদ্ধে সেই খানেই কাষ করতে পাঠানো হচ্চে।

অন্য সিফ্‌টের, অন্য কোল ফেসের মালকাটারা এসে জড় হয় অফিসের সামনে। গুজব ওড়ে হাওয়ায় ; নানান গুজব। কেউ বলে, সবাই মরে গেছে ; কেউ বলে, না পাঁচজন। মাখন, বসন্ত সবাই মরেছে। বুধনকে ধরে ওরা আটকে রেখেছিল। লালাজীর গোলমাল তখনও মেটে নি, বারুদের স্তূপের মত হয়ে আছে সকলে। তারপর আবার এই ঘটনা শুনে ফুঁসছে ওরা।

লালাজী বেগতিক দেখে সঙ্গে সঙ্গে ওকে ছেড়ে দিয়ে নিজে সটকেছে অফিস থেকে।

দু'একজন উৎসাহী মালকাটা পিটে নামতে যাবে, বাত্তিঘরের বাবুর উপর হুকুম এসেছে বাত্তি দেওয়া হবে না বে-টাইমে। অর্থাৎ নামতে দেওয়া হবে না কাউকে।

সেখানেও কোলাহল, নানান তর প্রশ্ন।

—কি হয়েছে তাহলে?

বাত্তিঘরের বাবু জবাব দেয়—আদার ব্যাপারী জাহাজের খবর রাখি না বাবা। ছোটবাবু, ম্যানেজার সাব ওদের কাছে যা। আমি অত শত জানি না।

পত্রপাঠ জবাব মেলে মালকাটার কাছ থেকে।

—হ, তা তুমি জানবে কেনে হে লাগর? ইয়েতে বাঁশ দিতেই জানো।

ভেংচি কাটে কে—বাত্তি নেহি মিলেগা। লাল বাত্তি জ্বালায়ে গা, দেখো না?

মালকাটারা চটে গিয়ে মুখ আলগা করে ফেলে। পিট মাউথে এসে জমেছে পালোয়ান সিং দলবল নিয়ে। দুই পক্ষ যেন যুধ্যমান। দু চারজন মেয়েছেলেও এসে জমেছে; সৌরভী পান চিবুতে চিবুতে এসে দাঁড়ায় নিমগাছের নীচে। শরণ সিং উঠে আসে পিট থেকে।

—কি হয়েছে?

—য্যাদা কুছ নেহি, স্রিফ বাম্পিং; মাইনর এ্যাকসিডেণ্ট।

সৌরভী পিচ্ ফেলে বলে ওঠে—মর রক্ত খাগীর ব্যাটা! কুছ নেহি হুয়া! তবে সগোষ্ঠী গোরে গেলেই ভালো হতো—না রে খটাস চোখো?

লালাজী যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে; তার উপর থেকে চোটটা গিয়ে ওই দিকেই পড়ে।

ফস্টার ইনক্লাইণ্ড পিট থেকে উঠে সবে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। সোজা খাড়াই, চার ইঞ্চিতে এক ইঞ্চ গ্রেডেশন। সামনেই মিত্র সাহেবকে দেখে একটু হাসি এনে সম্ভাষণ জানায়, মিত্র সাহেবের মুখটা গম্ভীর থমথমে। ফস্টারের পিছনে ছিল সার্ভেয়ার মিঃ মালেক।

তাকেই জিজ্ঞাসা করে মিঃ মিত্র—দু'নম্বরে ওই ফল্টি রক বোরিং না করে গ্যালারি নিয়ে যেতে বলেছিলেন আপনি?

সোজা প্রশ্ন। ফস্টারের মুখের দিকে চাইল মালেক, দুটি মানুষের মাঝে একটা জানাজানি আছে। মিঃ মিত্র একটু কঠিন সুরেই বলে ওঠে,

—এর জন্য আইনত তুমিই দায়ী মালেক; সম্পূর্ণ দায়ী।

ফস্টার চুপ করে থাকে, যেন কিছুই জানে না এ সম্বন্ধে। সার্ভেয়ারের রিপোর্টেই কোলিয়ারি চলেছে। মিঃ মালেক জবাব দেবার কোন কিছুই পায় না। ফস্টারকে এ সম্বন্ধে সে বলেছিল কিন্তু ফস্টার মৌখিক হুকুম দিয়েছে মাত্র।

—দুটো লোক মারা পড়েছে সেখানে। ভেন্টিলেশন নেই, এয়ারস্যাফট-এ ধ্বস জমে আছে। এখুনিই একটা ব্যবস্থা করা দরকার।

—এ্যাকসিডেণ্ট? মালেক যেন শিউরে ওঠে।

ফস্টারও চুপ করে কি ভাবছে। এদিকে লালাজীর রেশনের দোকানের গণ্ডগোল চলেছে, উত্তেজিত মালকাটারা আর একটা খোরাক পেয়ে গেছে। ওদের এইখানেই একতা, যতই ঝগড়া বিবাদ নিজেরা করুক না কেন—বাঁচবার জন্য সংগ্রাম যেখানে, সেখানে মোটামুটি তারা একজোট, দু'চার জনকে বহুকষ্টে কর্তৃপক্ষ কিনে নেয়, তারাই থাকে এদের দলে।

ফস্টার দাঁড়াল না, তখুনি এগিয়ে যায় পিটের দিকে। এদিকে ওদিকে উত্তেজিত জনতার ভিড়; গেটম্যান সাহেবকে স্যালুট করে দরজা খুলে দিল; চুপ করে সাহেব গিয়ে জলঝরা ডুলিতে উঠলো।

মালেকের ফর্সা টকটকে মুখে কে যেন একতাল সিন্দুর লেপে দিয়েছে। অসহায়ের মত মিত্র সাহেবকে বলে ওঠে,

—আমাকে মুখে অর্ডার দিয়েছিল ফস্টার। নইলে আমি রিপোর্ট করেছিলাম।

—লিখিত পড়িত হুকুম না নিয়ে ভুল করেছেন আপনি।

মালেক মাথা নাড়ে—ঠিকই বলেছেন। এখন সে পুরোপুরি অস্বীকার করবে।

—এ্যাণ্ড ইউ উইল বি রেসপন্‌সিবল।

মাথা নাড়ে মালেক, এতদিনের পুরানো সার্ভেয়ার; সে জানে, কি থেকে কি হতে পারে। কিন্তু এতবড় ভুল কখনও করেনি। ফস্টারের কথায় সে বিশ্বাস করেছিল, কিন্তু বেশ বুঝেছে বিপদের সময় ফস্টার তার দিকে ফিরেও চাইবে না; নিজের গা বাঁচিয়ে যাবার চেষ্টাই সে করবে!

মিঃ মিত্র কর্তব্য স্থির করে ফেলেছে। তার বিদ্যাবুদ্ধি যতটুকু, তাতে বুঝেছে যে এভাবে চলা কোনদিক থেকেই নিরাপদ নয়। এতগুলো মানুষের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে তারা। নাহলে এতবড় একটা কোলিয়ারিতে ওই মারাত্মক ভুল ঘটতো না। এয়ার প্যাসেজ বন্ধ হয়ে আসছে। গ্যাস জমছে তিলে তিলে। প্রতিকারের কোন পন্থাই নেয় নি কোম্পানী।

বসন্তের কথা মনে পড়ে—কৈফিয়ৎ। এর কৈফিয়ৎ কোম্পানী দেবে না।

রেজার মিঃ মিত্রকে ঢুকতে দেখে মুখ তুলে চাইল। ডিরেক্টার ইন্‌স্‌পেকসনে আসছে। তার আগেই কাগজপত্র রেডি রাখতে চায়। ফস্টার ক'খানা বিল ভাউচারে সই করছে। মিঃ মিত্র রেজিগ্‌নেশন লেটারখানা এগিয়ে দিয়ে বলে ওঠে,

—আমি এই রিস্ক নিয়ে কাজ করতে রাজী নই মিঃ ব্লেজার। এ ভাবে কায করা কোলিয়ারি অ্যাক্টে বে-আইনী। ক্রাইম। আই এ্যাম সরি—আই কুইট।

ব্লেজার চমকে ওঠে। ফস্টার চেয়ার ছেড়ে উঠে পায়চারি করছে। মিঃ মিত্র বহু দিন থেকে চেষ্টা করেছে। এর আগেও আর একটা স্যাফ্‌ট ওপন করার কথা বলেছিল। লাখো টাকার মেসিনারি আনবার অর্ডার দিতে টাকা থাকে—টাকা থাকে না এয়ার প্যাসেজ, সামান্য বাতাস প্রবেশ করাবার জন্য পথ একটা তৈরি করতে।

ফস্টার জবাব দেয়—তোমার ইচ্ছে।

আর একজন বিলেতী সাহেব পোষবার ব্যবস্থা পাকা হয়ে রইল। পিয়ার্সন এসেছে, আবার কেউ আসবে। মিঃ মিত্রর কথায় ব্লেজার উঠে আসে চেয়ার থেকে।

—তুমি যাবেই?

—হ্যাঁ, মনস্থির করে ফেলেছি।

একটি মুহূর্ত। ব্লেজার—ফস্টার ওর দিকে চেয়ে আছে। পাথরের মত শক্ত অনমনীয় ওই লোকটিকে টলানো যাবে না। ব্লেজার হাত বাড়িয়ে দেয়,—বন্ধুর মতই বিদায় নিই মিঃ মিত্র। উইস ইউ গুড লাক।

ফস্টার রেজ্জারের এই ভদ্রতাটুকুও সহ্য করতে পারে না! হেলমেটটা তুলে নিয়ে বের হয়ে গেল পিট মাউথের দিকে। নীচে কায চলেছে, একবার দেখা দরকার।

অতল অন্ধকারের মাঝে ধ্বস জমে আছে সরু পথটায়, খালের গভীরতা ছাপিয়ে স্তূপীকৃত কয়লার ছোট বড় চাঁইএ গ্যালারির মুখ বন্ধ করে দুজনের সমাধি স্তূপ রচিত হয়েছে। ফস্টার এগিয়ে যায়; মিত্র সাহেবের উপর রেগে উঠেছে। বিশ্বাসঘাতক লোক। বিপদের সময়ও ঝগড়া করে।

—ক্লিয়ার ইট। ফস্টারের হুকুমে ওরা ফিরে চাইল।

দু'চারজন ধার পাশ থেকে চাঁইগুলো ঠেলে তুলছে; ফাঁকা জায়গা, খুঁটি বসানো সম্ভব নয়; হাঁ করে ঝুঁকে রয়েছে আলগা চালটা—যে কোন মুহূর্তে আবার ধ্বস নামবে। কিন্তু উপায় নেই; এ পথ খোলা রাখতেই হবে। বাতাস যাতায়াত করবার পথ, বায়ু স্রোত রুদ্ধ হলেই গ্যাসের পরিমাণ বাড়তেই থাকবে।

এমনিই অতর্কিত ধ্বসে কয়েকটা জায়গা থেকে বেগে জমা গ্যাস-পকেট থেকে গ্যাস বেরুচ্ছে। নীরব নিস্তব্ধ আঁধারে শোনা যায় ক্রুদ্ধ সাপের গর্জনের মত শব্দ—

—হিস্-স-স্। হিস্···স্ স্।

টুপ টাপ জলকণা ঝরছে। সবই আছে।

বৃষ্টি, বর্ষা—ভাপসা গরম—গ্যাস, সব কিছু।

শরণ সিং মিলিটারি কায়দায় হুকুম দেয়; নিজেই মাঝে মাঝে সেফ্‌টি ল্যাম্পটা নামিয়ে রেখে ওদের সঙ্গে একটা প্রপ্‌ ধরে এগিয়ে দেয়, নয়তো কয়লার ঝুড়িগুলো তুলে দেয় ওদের মাথায়।

মানিক মাঝি বলে—কাজের লাঠি গো, বাপ দাঁড়িয়ে রইছে কিনা তাই এত কাজের চোট। হলা গেল ঘর তো লাঙল তুলে ধর। দেখবে তখন শালার মেজাজ। যেন তাতা ফাল।

ফস্টার বসন্তকে ডেকে নিয়ে গিয়ে কথা কইছে। বসন্ত বলে চলেছে, —সবটাই বে-আইনী কাজ চলেছে সাহেব। ভেন্টিলেশন স্যাপ্ট থেকেও কয়লা

তুলছো। বাতাসটুকুও বন্ধ করে দিতে চাও তোমরা; নট ওনলি ব্রিচ অব ল, বাট ক্রাইম। এতগুলো লোকের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছো।

ফস্টার ওর কথায় মনে মনে চমকে ওঠে। সাধারণ মালকাটার মত কথাবার্তা তো নয়ই; বেশ মার্জিত, ভদ্র, অথচ কঠিন আইনের কথা। এতবড় মারাত্মক ভুল যদি মাইনিং ইনস্পেক্টার বা কর্তৃপক্ষের কানে পৌঁছে, বিপদ হবে। চুপ করে কি ভাবছে ফস্টার। ধূর্ত ফিচেল ইংরেজ হঠাৎ বলে ওঠে অসহায় কণ্ঠে,

—কাজ জানা লোক পাচ্ছি কই?

এ যেন অন্য মানুষ। সেই দর্প অহংকারের লেশ মাত্র নেই। কাদায় পড়া হাতীর মত অসহায় অবস্থা ওর।

বসন্ত জমাট অন্ধকারে ওর দিকে চেয়ে থাকে, ধূর্ত ইংরাজ কি বলতে চায়। ইঙ্গিতময় ওর কথা।

বসন্ত বলে ওঠে—পুরোনো মালকাটাদের পরীক্ষা দেবার জন্য তৈরি করো; অন্তত সর্দারশিপ্ পাশ করিয়ে নাও। কাজের লোকদের চান্স না দিয়ে বাজে লোক প্রমোশন পেলে এই সবই হবে।

—তুমি আসবে?

ফস্টার সোজা কথাটাই বলে ফেলে। একটু থেমে বলতে থাকে,

—দেখো, তুমি কাজের লোক, মনে হয় এসবের কিছু জানো টানো। সবচেয়ে দরকার পপুলার হবার ক্ষমতা, সেটা তোমার আছে। তোমাকে মানে অনেকেই। ইউ উইল বি হেল্প্‌ফুল। তা ছাড়া আর একটা ফিউচার আছে। তুমি যদি বলো—

—নেহি! বসন্ত জবাব দেয়। ওর অভিসন্ধি বুঝেছে, মুখ চাপা দিতে চায় সাহেব।

বসন্ত হাসছে মনে মনে। ফস্টারও থেমে গেল। কথাটা সোজা ভাষায় নিজে প্রকাশ করে যেন একটু লজ্জায় পড়েছে। সামলে নিয়ে এগিয়ে গেল ওদের দিকে। ধূপ্ ধাপ্ গাঁইতি চলেছে, প্রপগুলো লাগায় চালে। ফস্টারের মুখে একটা থমথমে গাম্ভীর্য। ওদের কাজ দেখছে। আবছা আলোয় একবার বসন্তের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সরে গেল। ওর নীল চোখদুটো জ্বলছে অপমানের জ্বালায়।

বসন্ত একাই দাঁড়িয়ে আছে। বাতাসে ভেসে আসে ওদের গাঁইতি শাবলের শব্দ। অন্তত গ্যালারিটা খোলা থাক, বাইশশো ফিট গভীর পাথরের নীচে শান্তিতে থাক দুচার দিন ওই ফকির আর মালু।

ফকিরের সেই শুকনো হতাশ কালো মুখখানা মনে পড়ে। ঘর বসত করতে গিয়ে সর্বস্ব হারিয়ে প্রতারিত হয়ে এইখানেই ফিরে এসেছে বিশ্বস্ত বন্ধুর মত। সেই দুঃসহ জ্বালা ভুলিয়ে দিয়েছে এই মৃত্যুপুরী! মালু! ব্যর্থ যৌবনের বুক ভরা হতাশা থেকে সেও নিষ্কৃতি পেয়েছে।

ওরা শান্তি পাক। ব্যর্থ বঞ্চিত জীবনের শেষ সমাপ্তি ওদের অতল অন্ধকারের মধ্যেও প্রশান্তিময় হোক। সাপের রোজা সাপেই মরে—বাঘের রোজা বাঘেই।

মালকাটা কোলিয়ারির অতল থেকে কোনদিন আর ফিরল না—এতো স্বাভাবিক ঘটনা।

—ক্যা হোতা হায় হিঁয়া!

এক ঝলক আলো মুখে পড়তেই চমকে ওঠে বসন্ত; শরণ সিং এগিয়ে আসে। ব্যাটা ওৎ পেতে ছিল। মনে মনে একটা আতঙ্ক। নারকুলিয়াও বলেছিল, ও নাকি ওভারম্যান হবার জন্য সাহেবকে ধরেছে। ফস্টারকে কথা বলতে দেখে মনে হয়।

—ক্যা বোলা সাব? প্রশ্ন করে শরণ সিং।

কঠিন স্বরে জবাব দেয় বসন্ত—তোমার সাহেবকেই শুধিয়ো।

—কাম মে চলো? শরণ সিং যে ওর উপরওয়ালা সেই কথাটাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

বসন্তের আজ কাজে মন লাগে না; চোখের উপর দুটো জীবন্ত মানুষ—বহুদিনের সঙ্গী বন্ধু, এক নিমিষে চলে গেল অন্য জগতে; কোথায় যেন কোন দুঃখই নেই তাদের জন্য। একবার চুপ করে দাঁড়াল তারা।

আবার চাবুক মারা করে শরণ সিং-এর দল এসে ঠেলে নিয়ে যায় তাদের ওই সমাধির উপর আরও কয়লার স্তর নামিয়ে কায চালু রাখতে।

কাজ! মনের কোন কোমল বৃত্তির ঠাঁই এখানে নেই।

তিন টাকার বিনিময়ে আলো—হাওয়া—মনুষ্যত্বের ক্ষীণ চিহ্নটুকু থেকেও বঞ্চিত করেছে ওরা।

বসন্তের মনে একটা পুঞ্জীভূত প্রতিবাদ। সরে যাচ্ছে চুপ করে ওখান থেকে। কাজই করবে না আর। হঠাৎ বাধা পেয়ে থমকে দাঁড়াল।

—কাঁহা যাতা হ্যায় এ্যাই লাটসাবকা বাচ্চা! শরণ সিং গিয়ে ওর ঘাড়টা ধরে ফেলে হিঁচড়ে দাঁড় করিয়েছে ওকে।

দপ্ করে জলে ওঠে বসন্তের সারা মন। সজোর ঝাঁকানিতে ঘাড় ছাড়িয়ে নিয়ে রুখে দাঁড়াল। অন্ধকার গ্যালারি, চারিদিকে মৃত্যুর পরওয়ানা, গ্যাসের ছোট বড় ব্লোয়ার থেকে ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা যায়। তারই মাঝে যুধ্যমান দুটি মানুষ—দুটি মতবাদ।

শরণ সিং ওর ঝটকার চোটে ছিটকে গিয়ে জমাট দেওয়ালে মাথা ঠুকে নয়ানজুলীর জলেই আছড়ে পড়ে; ভাগ্যিস মাথায় ছিল লোহার মাইনিং হেলমেট, নইলে বোধ হয় নারকুলিয়ার মতই সাঁকতোড়িয়া হাসপাতালে গিয়ে শয্যা নিতে হতো ওই প্রচণ্ড ধাক্কায়। হেড লাইটের কাঁচ ভেঙ্গে চুর হয়ে যায়, নিভে গেছে আলোটা।

—ক্যা বোলা?

রাগে থর থর করে কাঁপছে বসন্ত; বুঝে নিয়েছে ওর ক্ষমতা। ইচ্ছে করলে এই অন্ধকারে ভিজে পাথরে মাথা ঠুকে খুলি ফাটিয়ে দিতে ওর বিশেষ অসুবিধে হবে না।

গড় গড় বয়ে চলেছে হিম জল; হাঁটু ভোর জল আড় বাঁধা দিয়ে নেমে চলেছে আরও নীচে পাম্পিং কেবিনের দিকে। শরণ সিং ঝেড়ে পুঁছে ভূতের মত উঠে দাঁড়াল।

বসন্ত দাঁড়িয়ে আছে নির্বাক নিস্তব্ধ হয়ে। পরাজিত শরণ সিং কথা বলে না, চুপ করে ডেভিস ল্যাম্পটা তুলে নিয়ে এগিয়ে গেল গ্যালারি ধরে। মনে মনে ফুলছে সে। আজ পরিষ্কার বুঝতে পারে নারকুলিয়াকে কারা মেরেছে। বাঁক ঘুরে বেগে এগিয়ে চলে স্যাফটের দিকে। মাঝে মাঝে পিছন ফিরে চায়, তার পনেরো বছরের কোলিয়ারি জীবনের একচ্ছত্র আধিপত্য থেকে নির্মম আঘাতে ও ছিটকে পায়ের তলে ফেলেছে তাকে। আজ দয়া করে ছেড়ে দিয়েছে।

নোতুন ডিরেক্টার আসছেন কোলিয়ারি দেখতে। তাই নিয়েই সমারোহ পড়ে গেছে। এজেন্ট মিঃ ব্লেজার মনের জ্বালা চেপে রেখে ডিরেক্টার্স বাংলো

তৈরি রাখবার হুকুম দেন। কলকাতা থেকে সোজা গাড়িতে আসছেন তাঁরা। রেজার নিজের বিজনেস পাকা করে ফেলেছে। এনাদার স্টেপিং স্টোন। মিত্র সাহেবের মত সেও একদিন বের হয়ে যাবে।

দামোদরের বালির ইজারা। অফুরান সরবরাহ। তুলে শেষ করতে পারবে না। টন পিছু ফাঁকা রয়্যালটির মুনাফা। রেজার অসুবিধা বুঝলে চিনতোড় কোল কন্সার্ন ছেড়ে দিয়ে নিজের বাংলোতে উঠে যাবে। শেষ কিছুদিন কাটিয়ে যেতে চায় মাত্র। যেতে তাকে হবেই—বিলেত থেকে কয়েক লক্ষ টাকার মেসিনারি সিপমেণ্ট হবার সঙ্গে সঙ্গেই সেও সরে পড়বে। ব্যাঙ্ক থেকে শুধু টাকাটা জমা পড়ল কিনা খবর পাবার জন্যেই বসে আছে সে। কোনরকমে সেই কটাদিন কাটাতে হবে। মিত্র সাহেবের কাগজখানা ড্রআরে রেখে উঠে পড়ে। তেতে পুড়ে ফস্টার পিট থেকে ওঠবার আগেই অফিস থেকে চলে যায় রেজার ওদিককার ব্যবস্থা দেখাশোনা করতে। অফিসে অপেক্ষা করছে ইউনিয়নের বাবুরা। স্বয়ং ইয়াকুব সাহেবও এসেছে, দাড়িতে মেহেদী রং। ফুর ফুর করে আতর সুবাসিত দাড়ি উড়ছে বাতাসে। মেজবাবু সিগারেট ফুঁকছে একটার পর একটা। রেজার যাবার সময় ইচ্ছে করেই সিগারেটের টিনটা ফেলে গেছে। মেঝেতে দাঁড়িয়ে লালাজী। বাইরে ঘুর ঘুর করছে পাঁচু।

ইউনিয়ন থেকে নোতুন ডিরেক্টারকে অভ্যর্থনা জানাবার ব্যবস্থা করবার ভার নিয়েছে লালাজী। স্থান—সময় জানার দরকার। লালাজী কানে জল দিয়ে কানের জল বের করবার স্বপ্ন দেখছে। নোতুন রেজিং কনট্রাক্টর হয়ে লালাজী ভোল বদলে ফেলতে চায়।

মনে মনে ভাবছে অন্য কথা, ডিরেক্টার একেবারে ছোকরা। বড় লোকের ছেলে, অন্য কোন ব্যবস্থাও রাখবে কিনা ভাবছে। কোলিয়ারির সব মেয়েদের মুখগুলোই চেনা লালাজীর। একটার পর একটা মনের সামনে ভেসে ওঠে।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল ওর চিন্তা ধারা।

ফড়িং সরকারের মেয়ে! নাম কি জানে না। ফড়িং সরকার পয়সা পেলে সব কিছু করতে পারে! কিন্তু কি ভেবে থামল! একেবারে এতদূর এগোনো ঠিক হবে না।

মেজবাবু বলে চলেছে—তাহলে হাটতলাতেই আয়োজন করা যাবে।

বিরাট সভা হোক। আশেপাশের সব কোলিয়ারি থেকে আসবে লোকজন।

ইয়াকুব সাহেব মনে মনে কি ভাবছে।

হঠাৎ ঘেমে নেয়ে উঠে ফস্টারকে ঢুকতে দেখে। ওরা চেয়ে থাকে ওর দিকে। ফস্টারও চিন্তায় পড়েছে। রুমাল দিয়ে মুখ গাল মুছে চেয়ারে বসে বেল টেপে। বেয়ারা ওয়াটার কুলার থেকে কাটগ্লাসের পাত্রে ঠাণ্ডা জল এনে ধরল। দম দিয়ে সমস্ত জলটা গিলে একটু ঠাণ্ডা হয় ফস্টার। ওদের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

এদিকে গোলমাল ধুঁইয়ে উঠছে কোলিয়ারিতে। বাইরে অফিসের ময়দানে জমায়েত হয়েছে মালকাটার দল। তাদের চিৎকার কাঁচের দরজা ভেদ করে কানে আসে না—তবে দেখা যায় তাদের উদ্ধত মুখগুলো।

এই সময়েই আসছেন নোতুন ডিরেক্টার! ঘাড়ের উপর আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে।

ক্ষুব্ধ অপমানিত হয়ে ফিরেছে ফস্টার। নিজে যেচে গিয়ে প্রস্তাব করেছিল। বসন্তকে প্রমোশন দিতে চেয়েছিল, গালে চড় খেয়ে ফিরে এসেছে। একটা সাধারণ মালকাটার এই অপরিসীম দুঃসাহসে বিস্মিত হয়ে উঠেছে ফস্টার। কোত্থেকে এই শক্তি পায় তারা জানে না।

মেজবাবু বলে ওঠে—এ গুড ওভেশন দিতে চাই ডিরেক্টারকে। তোমাকে রিসেপসন কমিটির চেয়ারম্যান করতে চাই।

লালাজী কুলোর মত দুই হাতের চেটো ঘসতে ঘসতে বলে ওঠে সদ্যশেখা দুটো ইংরাজী—ইয়েস স্যার। কাইণ্ড স্যার।

লালাজী গড়ুর পক্ষীর মত যোড়হাত করে দাঁড়িয়ে আছে।

বাইরে থেকে ভেসে আসে ওদের চিৎকার।

লালাজী ফর্দ করছে মাংস, আপেল, ডিম, সুইটস্, ফাউল—বাকিটা যোগান দেবে ইয়াকুব সাহেব। অবশ্য বিল পেমেণ্ট হবে লালাজীর গদি থেকে।

কোলিয়ারির মাটি যেন কেঁপে ওঠে। কাঁচের দরজার ফাঁক দিয়ে জেগে ওঠে মালকাটাদের চিৎকার—ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

বিক্ষোভ ফেটে পড়ে। অন্যায় অত্যাচার আর সহকর্মীদের অপমৃত্যু তাদের ক্ষেপিয়ে তুলেছে। সেই আগুন ঝরে পড়ে ওই চিৎকারে।

যদু পতিতুণ্ডীর মিটিং থেকে ওই কথাগুলো শিখেছে তারা। নিজেরাই এগিয়ে এসেছে প্রতিবাদ জানাতে। নেতারা কর্তাদের এয়ার কণ্ডিসনড্ ঘরে বসে সিগারেট ফুঁকছে, আর তাদেরই গলায় ছুরি লাগাবার ফলাও আয়োজন করছে। একক নিঃসঙ্গ মালকাটার দল স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই এগিয়ে এসেছে মোকাবিলা করতে।

একটা উঁচু ঢিবির উপর উঠে দাঁড়িয়েছে বসন্ত। কয়লামাখা সারা গা, মুখে কয়লার কালি, ময়লা শার্টের পিছনদিকটা ফর্দাফাঁই হয়ে ঝুলছে, তার সতেজ কণ্ঠস্বর ভেসে ওঠে,

—একটু আলো হাওয়ার পথ বন্ধ করে ওরা কয়লা তুলছে। আমাদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। ওদের মারাত্মক ভুল আর গাফিলতির জন্য আজ দুজন মরেছে; গ্যাস ভর্তি মাইনে এখনও কায চালাচ্ছে তারা, কোন প্রতিকারই করেনি।

বুধন বলে ওঠে—আলো বাতাস ত নাই; খেতে দেয় বরার দানা। কাঁকর আর খুদ পচা।

ফস্টার জানলা খুলে শুনে চলেছে; বাতাসে ধ্বনি প্রতিধ্বনি তোলে বসন্তের কথাগুলো। পাঁচু—মদন দূর থেকে শুনছে। ভিড়—শুধু ভিড়। মেজবাবু, ইয়াকুব সাহেবের মিটিংএ এমন স্তব্ধ হয়ে ওরা বসে থাকে না। বসন্তের উদাত্ত কণ্ঠস্বর ধ্বনি প্রতিধ্বনি তোলে; গুহ্য তত্ত্ব ও জানে; শিউরে ওঠে ফস্টার। বসন্ত বলে,

—সম্পূর্ণ বে-আইনী কায করে চলেছে ওরা। পিটের মধ্যে ওদের মৃতদেহ চাপা আজ এখনও, বাতাসের পথ বন্ধ; তাও খোলার ব্যবস্থা নেই। দরকার হয় মাইনস্ অফিসেও প্রতিনিধি পাঠাবো আমরা। কোলিয়ারির ভেন্টিলেশন স্যাফ্‌টও আধা বন্ধ অবস্থায় পড়ে আছে।

—কায বন্ধ করবো আমরা!

—এখুনি।

গর্জন করে ওঠে জনতা। ভিড় বাড়ছে। শুধু ভিড়।

হঠাৎ দরজা খুলে শরণ সিংকে ঢুকতে দেখে চমকে ওঠে সকলে। মাথার টেপ ল্যাম্পটা চূর্ণ বিচূর্ণ; হাত, পা, মুখ জায়গায় জায়গায় ছড়ে গেছে; প্যাণ্ট শার্ট সব ভিজে জ্যাবজেবে। হাতের কনুইটা ছড়ে গিয়ে রক্ত ঝরছে; শার্টটা ছেঁড়া হাতের কাছে, ঝুলছে।

উত্তেজিত ভাবে এগিয়ে আসে শরণ সিং, ফস্টার অবাক হয়ে গেছে ওর ভয় পাওয়া চাহনি দেখে।

ভাঙ্গা গলায় বলে ওঠে—নারকুলিয়া সাবকো কৌন মারা অব মালুম হুয়া সাব। দেখিয়ে পিটমে আজ হম্‌কোভি পাকড়া!

চমকে ওঠে ফস্টার—কৌন?

অন্ধকার পিটের মধ্যে হিংস্র মালকাটা জঙ্গলের বাঘের চেয়েও বীভৎস।

শরণ সিং বাইরের দিকে হাত বাড়িয়ে দেখায়।

—ওহি হারামজাদ!

বসন্তের উত্তেজিত মূর্তির দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে দেখায় শরণ সিং। ফস্টারের গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে। ওর সতেজ কণ্ঠস্বর, বলিষ্ঠ দেহ, আর কঠিন প্রতিবাদমুখর মনের পরিচয় সে পেয়েছে। ওর দ্বারা সব কিছুই সম্ভব।

চিনতোড়ের জীবন ধারা বদলে দিতে পারে সে। হাজারো মালকাটা চেয়ে আছে ওর দিকে।

কি ভাবছে ফস্টার। হিংস্র—ক্ষমতালোভী শয়তান।

একবারে ওর কণ্ঠরোধ করে দেবার মত সামর্থ্য তার আছে। ডিরেক্টার আসছে, এ সময় কোন গোলমাল সহ্য করবে না সে।

শরণ সিং সৌরভীর ব্যবহারে একটু আশ্চয হয়।

—হায় হায়! একেবারে ছিঁচে ফেলাইচে গো!

শরণ সিং নাইট সিফ্‌টেই বেরুবে। দুপুরটা একটু বিশ্রাম নিয়ে যাবে। ক্লান্তিতে ভেঙ্গে আসে সারা দেহ। সৌরভী ওর কথাগুলো শুনে চলেছে। মরদের মত কথা বলে শরণ সিং।

—কোন শালা ক্যা করেগা? ঠাণ্ডা বানা দেগা আজই উস্‌কো। ফস্টারভি বোলা!

সৌরভী কি ভাবছে। এখানের ব্যাপার সে জানে। হাড়ে হাড়ে জানে।

আবছা সন্ধ্যার অন্ধকার নামছে। দামোদরের ওপারের বনসীমায় নামছে ফিকে আঁধার। দু'একটা তারা ফুটে ওঠে নিকানো আকাশ কোলে।

হালকা পায়ে স্বৈরিণী বের হয়েছে। নানা দরজায় তার থানা। বহুজন মন নিয়ে তার কারবার। হাসি আর লাস্যের মোহ রাঙানো ছলনাময়ী।

কোলিয়ারির অন্ধকার অতলের প্রহরীদের মনের রং ফোটে তার হাসির ছটায়; তাদের বীভৎস কামনার আগুন ছটা ধরায় তার হাতের আয়না বসানো চুড়িতে।

কেষ্ট মিস্ত্রীও চমকে ওঠে—গৌরীর দিকে চেয়ে। হাসি আর পূর্ণতার আভাসে ভরে উঠেছে মেয়েটা। এ যেন অন্য কোন গৌরী। ঘরের নিশানা আনে। একপাশে একটা তুলসীমঞ্চ, ছোট গাছের নীচে পিদিমটা রেখে গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করছে গৌরী; বৈকালে সামান্য প্রসাধন সেরে ক্ষার কাচা কাপড় পরেছে। কপালে সিন্দুরের একটা ফোঁটা।

প্রদীপের আবছা আলোয় সুন্দর হয়ে ওঠে সেই লাজবতী মূর্তি। মাঝে মাঝে ওর দিকে চেয়ে কেষ্ট অবাক হয়ে যায়—চিরকালের অচেনা সে। নিজের উপরই আক্ষেপ হয়। কি কষ্টে রেখেছে তাকে। একমুঠো ভাত আর কাপড়ের জন্য বন্দী হয়ে আছে তার ঘরে—নিরাশ্রয়া নিরাভরণা লক্ষ্মী। চারিদিকে প্রাচুর্য, অর্থ সম্পদের ছড়াছড়ি। সেই ছড়ানো অর্থকে ছিনিয়ে ঘরে তোলবার স্বপ্নই যত অনর্থ বাধায় তার জীবনে। জুয়া, মদ আর তাতেই বাড়ে জ্বালা।

—কি দেখছো? হাসে গৌরী।

কেষ্ট মিস্ত্রী বলে—তোকে। কি ছিরিই করেছি তোর!

—বেশ আছি গো।

গৌরী কেষ্টর খাবার তৈরি করতে থাকে। নাইট সিফ্‌টের চাকরি।

কেষ্ট বলে ওঠে—চটকলেই চলে যাবো গৌরী। হাতের কায জানি, যেখানেই যাব সেইখানেই ভাত। এ পোড়া মাটিতে আর থাকবো না।

—সেই ভালো!

গৌরীও তাই ভাবে মনে মনে। এই মাটিই যেন তার সংসারের সব সুখ শান্তি কুরে কুরে নিঃশেষ করছে। কেষ্ট আজ অন্য মানুষ।

মিটি মিটি তারা জ্বলা রাত্রি; বাতাসে ভেসে ওঠে দামোদরের বালিচরে রাতজাগা পাখির ডাক; ভেসে আসে শাল ফুলের গন্ধস্নাত বাতাস, চুপে চুপে

হারানো বনরাজ্য থেকে পথিক এসে ঢুকছে রাত্রি গভীরে এই রাজ্যে। স্পর্শে তার শুদ্ধ গহিন শান্তি।

বসন্ত এগিয়ে আসছে ধাওড়ার দিকে। মনে তার চিন্তার জালবোনা।

যদু মাহাতো, মাখন, মানিকদের ওখান থেকে ফিরছে মিটিংএর পর। কাল সকালেই তারা মাইনস্ ইন্‌স্‌পেক্টারের কাছে যাবে শোভাযাত্রা করে। তারপর দরকার হয় কায বন্ধ করবে, তাদের হাতের চরম অস্ত্র তুলে ধরবে। শেষ অস্ত্র ধর্মঘট।

বন্ধ হোক কোলিয়ারি ; শেষ মোকাবিলাই করবে তারা।

গুরু দায়িত্ব, শত শত মালকাটা ছেলেপুলে নিয়ে পথে বসবে। নীচেও নিশ্চিত মৃত্যু, উপরেও তাই। সেই কথা ভেবেই তারা শপথ নিয়েছে এই কাযের।

সারা কোলিয়ারিতে একটা চাপা উত্তেজনা! ধুঁইয়ে উঠছে বিক্ষোভের ক্ষীণতম শিখা। কর্তৃপক্ষও অনমনীয় হয়ে রয়েছে। থাকবেও।

বসন্তও তা জানে। এ ছাড়া পথ নেই।

ঘন অন্ধকার নেমেছে। ধাওড়ায় ফিরেই আবার কাযে যেতে হবে। নাইট সিফ্‌টেই চলবে শলা পরামর্শ! প্রতিটি মানুষ, কর্মী, সবাই জানুক, প্রস্তুত হোক এর প্রতিবাদ করতে। বাতাসে ভেসে আসে দূর থেকে রেডিওর সুর।

নীরব নিস্তব্ধ বাতাসে কেঁপে ওঠে সুরটা।

এ সময় এখানে ও সুর শোনে নি। হঠাৎ সুরের উৎসটার সন্ধান পায়, নোতুন ডিরেক্টার এসে উঠেছেন ডিরেক্টার বাংলোয়। ওপাশের টিলার মাথায় নীল আলো জ্বলছে দূরে। সুরের ঝরনা সেইখানেই।

শান্তি আর প্রাচুর্যভরা জীবন ; সুর সেইখানেই মানায়। হাল্‌কা চটুল ওই সুর। চাঁদ, ফুল আর তুমি-আমির মাতামাতি।

পথের বাঁকে উৎরাই দিয়ে নেমে চলে ধাওড়ার দিকে পায়ে চলা পথ ধরে।

গাছ গাছালির জড়াজড়িতে ঠাঁইটা অন্ধকার, দূর থেকে এক ফালি আলো ছিটকে এসে পড়েছে। হঠাৎ সৌরভীকে আসতে দেখে দাঁড়াল। হাঁপাচ্ছে মেয়েটা। গায়ের কাপড় চোপড় ঠিক নেই, দুচোখ জ্বলছে তার।

—যেও না! যেও না ওদিকে।

সৌরভীর কণ্ঠে একটা চাপা আতঙ্ক। বসন্ত দাঁড়াল।

—ওদের লোকজন ধাওড়া ঘিরে রয়েছে। তুমি পালাও!

হঠাৎ কি ভেবে বসন্তের হাতটা ধরে ফেলে। কাঁপছে সৌরভী। লাস্যময়ী নারীর দুচোখে কামজ আত্মনিবেদনের আকর্ষণ এ নয়। দুচোখে ওর উৎকণ্ঠা। অন্ধকারে ওকে ছেড়ে দিতে চায় না, ওই ক্ষুধার্ত বুভুক্ষু ডালকুত্তাদের সামনে।

—আমার ওখানে চল। কেউ জানবে না। শুধু রাত্রিটা থেকে কাল সকালেই নদী পার হয়ে চলে যাবে।

বসন্ত কি ভাবছে। হাসে স্বৈরিণী—বিশ্বাস করছো না? বদনাম হবে হয়তো, কিন্তু প্রাণে বাঁচবে। দোহাই তোমার, দেরী করো না। ওরা জানলে আর কিছুই করবার থাকবে না। রাতের অন্ধকারে তোমাকে মুছে ফেলবে একেবারে এখানের মাটি থেকে।

বসন্ত কি ভাবছে! মালুর কথাগুলোই মনে পড়ে। সেই মালুই ফিরে এসেছে মৃত্যুর অন্ধকার হতে ওই সৌরভীর রূপ ধরে। ওরা এক জায়গায় যেন এক! একই স্বপ্ন, একই প্রীতি আর ভালবাসার বিভিন্ন প্রকাশ রূপ রূপান্তরে। মৃত্যুপুরীর কঠিন মৃত্তিকায় ছড়ানো ধ্বংসের মাঝে ওরা জীবনের সাধনা করে চলে; নীলকণ্ঠের মত যত গরল, যত বিষ নিজের কণ্ঠে নিয়ে অমৃতের স্পর্শ বিলিয়ে যায়।

—কি ভাবছো?

কাছে, আরও কাছে এগিয়ে আসে সৌরভী। দুচোখে ওর নেশা লাগানো ডাক। পথের বাঁকে বাঁকে এমনি কত প্রীতির পসরা পায়ে ঠেলে এসেছে যাযাবর বসন্ত, আজও সেই বিবাগী মন হারায় নি। রাত নির্জনেও জেগে ওঠে মনের মাঝে বেপরোয়া সেই মানুষটি।

—ওদের সব কিছুরই শেষ দেখবো আমি। এতদিন শুধু এড়িয়েই গেছি। আজ মুখোমুখি দাঁড়াবো।

সৌরভী পথ আগলে দাঁড়ায়—না, না, জানো না ওদের!

—জানি! ওদের মুখোস কেউ খোলেনি। আজ খোলবার চেষ্টাই করবো।

বসন্ত দাঁড়াল না। নীচু পথটা দিয়ে ধাওড়ার দিকে এগিয়ে চলে। পিছনে পড়ে রইল সৌরভী। অসহায় সেই স্বৈরিণী। বসন্তকে ধরা যায় না, ওরা ধরা দিতে আসেনি। কি ভেবে দৌড়তে থাকে সৌরভী সুড়ি পথ

বেয়ে ; পিছল পথটার দুদিকে বনতুলসীর জঙ্গল। তারই মাঝ দিয়ে হরিণের মত লাফিয়ে অন্ধকারে নেমে চলেছে মেয়েটা।

লাইনে কয়েকটা গাড়ি সান্টিং করছে, ইঞ্জিনের এক ঝলক আলো এসে পড়েছে বসন্তের উপর। কয়েকটা ছায়ামূর্তিকে দেখা যায় দূরে। বসন্ত এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ একটা চাঞ্চল্য জাগে ওদের মধ্যে।

অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে সৌরভী। রাতের আঁধারে কেঁপে ওঠে ওর সাবধানী চিৎকার।

জমাদার পালোয়ান সিং নিজেই এই কাযের ভার নিয়েছে। শরণ সিং-এর গায়ে হাত তোলার শোধ নিতেই নয়, ফস্টারকে চিন্তামুক্ত করবার কাযও তার। সহযোগী হয়েছে গালকাটা। আসল নাম তার ওই চিহ্নে ঢাকা পড়ে গেছে। চোখের উপর থেকে দীর্ঘ একটা গভীর ক্ষতের দাগ গালের নীচে পর্যন্ত নেমে এসেছে। বীভৎস চেহারা, আবছা অন্ধকারে দেখলে আঁৎকে উঠবে যে কেউ। বুলডগের মত থ্যাবড়া মুখ, নাকটা ঢুকে গেছে। পিট পিট করে চোখ দুটো কোটরের ভিতর থেকে। মাঝে মাঝে সাপের মত ধারাল জিবটা বের করে নাকের ডগা ছুঁইয়ে ঠোঁটে বুলিয়ে নেয়।

ফস্টারের বাংলোতেই থাকে লোকটা। খায় দায় আর ঘুমোয়। বিশেষ কায পড়লে তার ডাক পড়ে! সাপের চেয়ে ক্রুর, শিয়ালের চেয়েও কৌশলী—বাঘের মত হিংস্র ওই গালকাটা। মাংসল পেশী বহুল বেঁটে লোকটা হঠাৎ বাতাসে কিসের গন্ধ পেয়ে আঁধারে বলে ওঠে,—

কে যেন আসছে!

পালোয়ান সিংও সাবধানী দৃষ্টি মেলে দেখে, পথের ওই দিক থেকে এগিয়ে আসছে তাদের শিকার, বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এই দিকেই আসছে। ধাওড়ায় নামবার মুখে থমকে দাঁড়াল বসন্ত।

হঠাৎ টর্চের আলো ঝলসে ওঠে। ছুটে আসছে দুজন দুদিক থেকে। এক-মুহূর্তেই বসন্ত কর্তব্য স্থির করে নেয়। দুহাতে দুটো ধারাল পাথর তুলে নিয়ে দৌড়তে শুরু করে।

টিলার পাশ থেকে উঠছে একটা চিৎকার। নিস্তব্ধ রাত্রির বুক চিরে সজাগ প্রহরীর মত সৌরভী চিৎকার করছে। গর্জন করে ওঠে গালকাটা।

পথ থেকে নেমে সেও পিছু নেয় বসন্তের।

পাথরে পাথরে লাফ দিয়ে ছুটছে বসন্ত; ক্ষিপ্র গতিতে ছুটছে ওর পিছনে গালকাটা—পালোয়ান সিং দুজনেই।

একটা টর্চের তীক্ষ্ণ ঝলকে মাঠ ভরে ওঠে; বসন্তের সমস্ত শরীরের রক্ত মাথায় উঠেছে।

একটি মুহূর্ত! দূরে টিলার উপরে জ্বলছে ডিরেক্টার্স বাংলোয় ফ্লোরেসেণ্ট আলো; ডিরেক্টার সাহেব সপরিবারে উঠেছেন ওই খানে। রেডিওগ্রামের সুর ওঠে বাতাসে।

বসন্ত দৌড়তে থাকে সাইডিং লাইন ধরে ওই দিক পানে।

ওরাও টের পেয়ে গেছে। গালকাটা বুলডগের মত দৌড়চ্ছে পিছু পিছু, পালোয়ান সিং আর দুজন চলেছে ওই দিক থেকে; স্টেশনের সাইডিংএ কয়েকটা মালগাড়ি দাঁড়িয়ে; বসন্ত বাতাসে তীব্র একটা শব্দ শুনে মাথাটা নুইয়ে বসে পড়ে—একটা পাথর সশব্দে মালগাড়িতে লেগে ঠিকরে পড়ল ওদিকে। কাছেই একটা পায়ের শব্দ; গালকাটা লাফ দিয়ে এসে ওকে ধরবার উপক্রম করেছে।

বসন্ত পাশ কাটিয়ে দৌড়তে থাকে।

ইঞ্জিনটা হাঁপাচ্ছে—যে কোন মুহূর্তে টানতে থাকবে ওই গাড়িগুলো, থেঁৎলে পিষে যাবে দেহটা।

সামনে রক্তলোলুপ ওই গালকাটার হাতে লোহার উদ্যত রডটা থেকে বাঁচবার কোন উপায় নেই, সেই গাড়ির নীচেই ঢুকে পড়ে বসন্ত। মাথার কাছে একটা আঘাত এসে লেগেছে—মাথাটা সরিয়ে নেয় তখুনি, লোহার রডটা এসে ঠেকে গেল মালগাড়ির এক্সিলে, আগাটা এসে লেগেছে মাত্র। চোখের সামনে জমাট অন্ধকার নামে।

একটা ভিজে অনুভূতি। জামার খুঁটটা ভিজে গেছে রক্তে, উষ্ণ তাজা রক্ত। গালকাটা গুঁড়ি হয়ে গাড়ির নীচে থেকে বের হচ্ছে, বসন্ত অন্ধকারে ওর ন্যাড়া মাথাতেই সজোরে হাতের পাথরটা দিয়ে আঘাত করে।

একবার! দুবার!

অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে সে, বসন্তের দুহাত ভিজে ওঠে রক্তে।

কয়েক মিনিটের জন্য চুপচাপ; হঠাৎ ওপাশ থেকে পালোয়ান সিং-এর বিশাল দেহটা এগিয়ে আসে।

দুচোখ জ্বলছে ওর। বসন্ত ক্লান্ত দেহটা টেনে নিয়ে ছুটছে। বুক ভাঙা চড়াই। আলগা পাথরে পা পড়লেই হড়কে যাবে নীচে। তবু থামবার উপায় নেই।

সামান্য পথ বাকী, তাকে যেতেই হবে।

রক্তলোভী ওই শয়তানদের মনোভাব বুঝতে আর বাকী নেই; একবার ধরতে পারলে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে তারা; রাতের অন্ধকারে তার মৃতদেহ অতলে তলিয়ে যাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে।

হাঁপাচ্ছে বসন্ত; পালোয়ান সিং টিলার নীচে থেকে উঠে আসছে; টর্চের আলোয় টিলার গায়ের ঝুপি জঙ্গল উলসে উঠে; পিছনে নীরব মৃত্যুর মত ধাওয়া করে আসছে গালকাটা, মালগাড়ির ইঞ্জিনটা তীক্ষ্ণ বাঁশী বাজিয়ে চলতে শুরু করছে। চার নম্বর পিটে বাজছে দশটার ভোঁ।

কোথাও কোন পরিবর্তন নেই। কিন্তু বসন্ত ছুটেছে সামনে, পিছনে তার নিশ্চিত মৃত্যুর স্পর্শ। পালোয়ান সিং ওকে ধরে ফেলবে, হঠাৎ একটা লাথি খেয়ে পালোয়ান সিং গড়িয়ে পড়ে টিলার গায়ে; আলগা পাথর ওই বিশাল বপুর ওজন রাখতে পারে না। কুমড়োর মতো গড়াচ্ছে পালোয়ান সিং।

লাফ দিয়ে উঠছে গালকাটা, রক্ত ঝরছে মাথায় নাকে; জিবে করে মাঝে মাঝে ওই নোনতা স্বাদ নিয়ে ক্ষেপে উঠেছে হিংস্র পশুর মত সে।

মরিয়া হয়ে উঠেছে ওরা। খাস ম্যানেজার সাহেবের ইজ্জৎ, তাদেরও পেশার বদনাম। যেমন করে হোক ওকে ধরতেই হবে। শক্ত মুঠিতে ওর টুঁটি টিপে নিঃশেষ করে দেবে একেবারে।

আঁধারে অল্প নীচু কম্পাউণ্ড ওয়ালটার দিকে ছুটে আসে বসন্ত; বাঁচবার সঙ্কল্প তার মনে। প্রাণভয়ে সে দৌড়চ্ছে, আর ওরা তাড়িয়ে আনছে চাকরির জন্য।

তবু গালকাটা এসে পড়েছে, পিছু পিছু পালোয়ান সিংও।

বসন্ত একলাফে কম্পাউণ্ড ওয়ালটার উপর উঠে এদিকের বাগানে লাফ দিয়ে পড়ে ছুটতে থাকে। ক্ষেপে উঠেছে গালকাটা, পালোয়ান সিং। বাগানের বুকে ঝুপ ঝাপ শব্দ। তারাও নেমেছে বাগানে।

ঘন ঝোপ ঝাড়—পুরোনো গাছের ভিড়; তারই আবছা আঁধারে ছুটে চলেছে বসন্ত। ঘামে নেয়ে উঠেছে, কপাল থেকে চুইয়ে পড়ছে রক্ত; জামাটা ভিজে গেছে।

মিঃ চ্যাটার্জি বাংলার অন্যতম প্রধান ব্যবসায়ী। নিজের চেষ্টায় সাধারণ একজন ইঞ্জিনিয়ার থেকে বিরাট কনট্রাকটারি ফার্ম করেছেন ; ভারত-বিখ্যাত ফার্ম, দুজন রিটায়ার্ড আই, সি, এস, তাঁর পি, এ। কোটি টাকার কারবার। বিরাট কারখানা চলছে লোহার হেভি মেসিনারি তৈরির, ছোট খাটো শিল্পনগরীর স্থাপয়িতা তিনি।

নিজের জীবনে শুধু অর্থ-প্রতিপত্তি আর প্রতিষ্ঠাই চান, অন্য কোন দিকে তাঁর দৃকপাত নেই। কোলিয়ারিও কিছু কিনেছেন সম্প্রতি, ছেলেও ইঞ্জিনিয়ার ; মাইনিং সাইড দেখা শোনার ভার পড়েছে তাই নিমেষের উপর।

গ্লাসগো থেকে ফিরে নিমেষ নিজেই এসব গুছিয়ে নিয়েছে। বেশ কিছু দিন নিউ ক্যাসলে ছিল ; ফ্রান্স, জার্মানি, বেলজিয়ামের খনি অঞ্চলেও কাটিয়ে এসেছে। ব্লেজার আর ওপাশে ফস্টার বসে, নীল শেড দেওয়া আলোটার ম্লান জ্যোতিতে ঘর ভরে উঠেছে ; নিমেষ চ্যাটার্জি ফাইভ-ফিফটি-ফাইভ টিন থেকে সিগারেট নিতেই ফস্টার যেন তৈরি ছিল, লাইটারটা জেলে এগিয়ে আসে।

— থ্যাঙ্কস্। নিমেষ সিগারেটে একটা মৃদু টান দিয়ে ধন্যবাদ জানায়।

ফস্টার যেন ভরসা দেয় বসকে।

—আমাদের পিটের সব ব্যবস্থাই কয়েকমাসের মধ্যে মোস্ট মডার্ন করে তুলতে পারবো। মেসিনারি সব এসে যাচ্ছে ফরেন থেকে।

কি ভাবছে নিমেষ।

ব্লেজার বলে চলেছে—ইট উইল বি মোস্ট মেকানাইজড পিট ইন দিস্ ফিল্ড।

ওপাশে ঘরের পর্দাটা দুলছে হাওয়ায়, হালকা হাসির শব্দ কানে আসে ; পিয়ানোর মৃদু সুরটা থেকে থেকে নিঃশব্দ পরিবেশে মাধুর্যের কণা ছিটিয়ে দেয় ; মধুর স্বপ্নময় পরিবেশ। বাতাস গোলাপ ফুলের সৌরভে আমোদিত।

হঠাৎ কি যেন ভারি জিনিস পড়ার শব্দ! কয়েকটা উত্তেজিত কণ্ঠের চিৎকার ভেসে আসে, একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে কে! শব্দটা এগিয়ে আসছে।

নিমেষ উঠে দাঁড়ায়, ব্লেজার, ফস্টারও। চমকে ওঠে ফস্টার। মালকাটাদের আক্রমণ নাকি ?

—হোয়াট ইজ ইট ? চিৎকার করে ব্লেজার। ফস্টার আর্তনাদ করে ওঠে।

—সেন্ট্রি !

গেট থেকে হুইসল বেজে ওঠে। ভারি বুটের শব্দ, কাঁকর ঢাকা পথ বেয়ে ছুটে আসছে ওরা। মূর্তিমান ধ্বংসের মত সাজানো ড্রইং রুমের পুরু কার্পেটে একপোঁচ কাদার ছাপ এঁকে সামনে এসে দাঁড়ায় বসন্ত; কপালের রক্ত নাক গাল দিয়ে গড়াচ্ছে, জামাটা ভিজে উঠেছে। হাঁপাচ্ছে সে। পিছু পিছু এসেছে গালকাটা, পালোয়ান সিং! পালোয়ানের হাঁটু, হাত, কনুই ছড়ে গেছে। মাথার পাগড়ি নিখোঁজ।

—সাব!

পালোয়ান সিং থমকে দাঁড়াল। ফস্টার, ব্রেজার নির্বাক। কর্তব্যপরায়ণ গালকাটা লোহার রডটা তুলেছে সেইখানেই।

পাশের ঘরের স্বর থেমে যায়, নিমেষ স্তম্ভিত! দরজা দিয়ে ছুটে আসে আকাশী রং-এর শাড়ি পরা মেয়েটি! দুচোখে তার বিস্ময়।

—দেবুদা! এসব কি?

বসন্তকে চেনা যায় না। কয়লার ধুলো ওর গায়ে, জামা প্যান্টে, কপালের রক্তটা একপাশে জমাট বেঁধে গেছে—অন্যপাশ থেকে তখনও চুঁইয়ে পড়ছে রক্ত।

নিমেষ স্বপ্ন দেখছে।

—তুমি! এষা!

ব্রেজার, ফস্টার পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। ওদের সামনে যেন বিষধর সাপ দেখেছে তারা—কিংবা সুন্দরবনের কুখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার। হাতে নাতে ধরা পড়ে আঁৎকে উঠেছে ফস্টার।

—এ সব কি মিঃ ব্রেজার? নিমেষ ওই বুলডগের মত লোকটার হাত থেকে রডটা কেড়ে নিতে বলে সেন্ট্রিকে। একটা চেয়ারে বসে পড়ে হাঁপাচ্ছে বসন্ত। নিমেষের কথায় জবাব দিয়ে ওঠে,

—তোমার নিমকের মর্যাদা রাখতে এরা কত সিন্‌সিয়ার দেখছ নিমেষ! ফেইথফুল, অফুলি ফেইথফুল! কি বল স্যার ফস্টার?

এষা এতক্ষণ চুপ করে ছিল বিস্ময়ের ঘোরে; যেন ছায়াছবির চরম নাটকীয় মুহূর্তের সে একজন নীরব দর্শক মাত্র। ওই গালকাটা শয়তানের দিকে চেয়ে ভয়ে শিউরে উঠেছে, বসন্তের কপাল দিয়ে তখনও গড়িয়ে পড়ছে

রক্তধারা, কালিমাখা বিবর্ণ একটা চেহারা! ক্রমশ নিজেকে ফিরে পায়, বেশ কঠিন স্বরেই প্রশ্ন করে এষা।

—এরা কি চায় দাদা? এখানে কেন?

বসন্ত হাসতে থাকে—নোতুন মুনিবকে সেলাম দিতে এসেছে। কাষ হাসিল করতে পারলে অবশ্য এরা আসতো না—কি বল মিঃ গালকাটা? খুব ফস্‌কে গেছি হাত থেকে, নয় মিঃ ফস্টার? কথা বলো—মুখ নীচু করছো কেন?

ফস্টারের লালচে মুখ সিন্দুর গোলা টকটকে হয়ে ওঠে। ব্লেজার ঘনঘন ঘড়ির দিকে চায়, গল্প করবার মত পরিবেশ মুছে গেছে। নিমেষও উঠে দাঁড়ায়।

ব্লেজার তখনকার মত বলবার কোন কথা পায় না। আপাতত সরে পড়াই নিরাপদ।

—গুডনাইট মিঃ চ্যাটার্জি!

—গুডনাইট!

ব্লেজার আর ফস্টার গাড়ি বারান্দায় রাখা গাড়ির দিকে এগিয়ে আসে। পালোয়ান সিং,—গালকাটাও আসছে পিছু পিছু। তাদের করণীয় কিছু নেই, শিকার শুধু পলাতকই নয়—নাগালের বাইরে চলে গেছে, বেশ জখম করে দিয়েছে উল্টে।

ফস্টার পিছনের দরজাটা খুলে হুকুম করে ওদের—বৈঠো উধার।

ওরা দুজনে সামনের সিটে বসে—ফস্টার ষ্টিয়ারিং ধরেছে। ড্যাশবোর্ডের ক্ষীণ লাল আলোয় দেখা যায় তার মুখের শিরাগুলোয় বিরক্তির রেখা পরিস্ফুট, মুখ বুজে গাড়ি চালিয়ে যায় সে।

ব্লেজারকে বাংলোয় পৌছে গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে চলতে থাকে ফস্টার জি-টি রোডের দিকে; তীরবেগে রাতের আঁধারে চলেছে গাড়িটা এক ঝলক আলো জেলে। দুপাশের গাছগুলোর ছায়া ঢেকে ফেলেছে পথটাকে।

—সাব! কোথায় যেন চলেছে তারা।

ফস্টার নীল আভা ঢাকা স্পিডোমিটারের দিকে চেয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলে ওঠে—সাট আপ্। মসৃণ চিকণ একটানা শব্দ!

জি-টি রোডের বুকে চাকার শব্দ তুলে গাড়িটা পাক খেয়ে চলেছে বরাকর ইষ্টিশানের দিকে; নিশুতি পথের ধারে গাড়িটা থামিয়ে হুকুম করে সাহেব।

—গেট ডাউন বোথ অব ইউ, ইউ বাস্টার্ড।

সুড় সুড় করে গাড়ি হতে বের হয়ে আসে তারা। প্যান্টের পকেট থেকে হাতপুরে দলাপাকানো কিছু নোট বের করে দুজনের হাতে তুলে দিয়ে কঠিন স্বরে বলে ওঠে ফস্টার,

—সিধা দেশ মে চলা যাও, হপ্তা ভোর রহেগা। মৎ আনা। সমঝা?

অবাক হয়ে যায় গালকাটা, মাথা নাড়ে—জী সাব। ফস্টার দাঁত কিড়-মিড় করে চাপা কণ্ঠে শাসায়,

—ইফ আই সি, ইউ নো। স্যাল স্যুট ইউ।

কাঁপছে ভয়ে গালকাটা, পালোয়ান সিং। ওদের চেয়ে বেশি হিংস্র ওই ফস্টার। এখন নিঃশব্দে সরিয়ে দিতে চায় তাদের এই রাতের অন্ধকারে। কশুর! কায হাসিল করতে পারেনি, ওই তাদের কশুর।

—গো, স্টেশন চলা যাও, রাতকো দেড় বাজে ট্রেন। হিঁয়াসে আভি চলা যানা।

ওরা পায়ে পায়ে ইস্টিশানের দিকে এগিয়ে চলে; রাস্তার পাশে গাড়ি রেখে পায়চারি করছে ফস্টার; সিগারেট ধরিয়ে ঘন ঘন টান দেয়; গলার কাছে গরম কবোষ্ণ স্পর্শ; উত্তেজিত তন্ত্রীগুলো দপ্‌ দপ্‌ করছে। নিস্ফল প্রচেষ্টা! সব কিছু প্রকাশ পেয়ে গেল! মাথাটা তেতে উঠেছে। গলা শুকিয়ে আসে।

একটু পানীয় হলে চলতো! এত রাত্রে বরাকরে কোথায় ও জিনিস মেলে তা জানে ফস্টার। গাড়িতে উঠে স্টার্ট দেয় আবার।

এথার কাছে সবটাই হেঁয়ালি বলে মনে হয়; বসন্ত কোন জবাবই দেয় না।

স্নান করে সাবান ঘসেও এতদিনের ময়লা ওঠানো যায় না; নাকের ভাঁজে—কানের ফাঁকে টুকরো রয়ে গেছে জমাট কালির; ডাক্তার ব্যাণ্ডেজ করে দিয়ে গেছে মাথার ক্ষতটা। বসন্ত চুপ করে থাকে।

—রেস্ট নেন! ডাক্তার বলেন।

হাসে বসন্ত—বাংলোর নয়, ধাওড়ার প্রেশক্রপ্‌শান করুন। ওইখানের লোক আমি।

বহুদিন পর এমনি নরম সোফায় বসেছে বসন্ত; সারা গায়ে পোলিও-ফোমের নরম স্পর্শ। নিমেষের প্রশ্নে মুখ তুলল, তারিয়ে তারিয়ে টানছিল ফাইভ-ফিফটি-ফাইভ সিগারেট পা দুটো কোচের উপর রেখে।

নিমেষ কথা বলে—তুমি এখানে, এইভাবে?

বসন্ত জবাব দেয়—এই কথাটা তোমাকেই প্রশ্ন করবো ভাবছিলাম নিমেষ।

নিমেষ কথা বলে না; বরুণোদয় চ্যাটার্জির প্রথমা স্ত্রীর সন্তান ওই দেবেশ; বসন্ত নামটা কেন নিয়েছে সে-ই জানে না। ওর মা ছিল সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে, বরুণ বাবু সেদিন ছিলেন একজন সাধারণ লোক; অর্থ, প্রভাব, প্রতিপত্তি কিছুই ছিল না। তাই সাধারণ পরিবেশের মধ্যেই মানুষ হয়েছিল দেবেশ; হঠাৎ ঠিকেদারী করে যেদিন খ্যাতির শিখরে উঠেছিলেন মিঃ চ্যাটার্জি সেদিন সেই সমাজে দেবেশের মায়ের ঠাঁই হ'ল না। গ্রাম্য সাধারণ শিক্ষিতা মেয়েকে সমাজে কক্‌টেল পার্টি, ইভনিং ড্রাইভ, আউটিংএ নিয়ে যাওয়া চলে না।

তার জন্য মাসমাহিনার মত বৃত্তি বরাদ্দ করে শহরের উপকণ্ঠে পুরোনো বাড়িতে রেখে চলে গেলেন দক্ষিণের নোতুন বাড়িতে। দেবেশ মায়ের সেই দিনের কান্না ভোলেনি। পরিত্যক্তা নারী একমাত্র সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদে।

—তুই ওদের বাড়ি যাস না দেবু, ওদের তুই কেউ নোস্। কেউ নোস। মায়ের সেই কান্নাভেজা অনুরোধ কঠিন হয়ে তার অবচেতন মনে দাগ কেটে বসে।

দেবু একটার পর একটা পরীক্ষা পাশ করেছে কৃতিত্বের সঙ্গে; বরুণবাবু আসেন মাঝে মধ্যে, যেন নেহাৎ দয়া করতে আসেন। পোষাকুকুরকে আদর করে মাংস খাওয়ানোর মত এ খেয়াল। বলেন তিনি—বিলেত যাক দেবু।

কঠিন কণ্ঠে বাধা দেয় মা—তুমি বিলেত থেকে ফিরে এসে স্ত্রীকে ভুলেছো; ও এইবার মাকে ভুলুক এই তুমি চাও? যদি পারে নিজের ক্ষমতায় যাবে, তোমার সাহায্যে নয়।

—বীণা! বরুণবাবু স্ত্রীকে বেশ কড়া স্বরেই বলে ওঠেন।

বীণা মরিয়া হয়ে উঠেছে—তোমার আরও ছেলেপুলে হয়েছে শুনেছি, তাদের দিয়েই সুখ মিটোও, এখানে আর কেন?

দেবু আই-এস-সি পাশ করে ধানবাদে মাইনিং কলেজে ভর্তির চেষ্টা করছে। অপরিচিত—সাধারণ একটি ছেলে। পিছনের কোন পরিচয়ই সে মানে নি। মায়ের চোখের জল—পুঞ্জীভূত অসহায় ঘৃণারই সঞ্চার করেছে তার মনে।

মহানির্বাণ রোডে নমিতাদের বাড়ি মাঝে মাঝে যায় দেবেশ। মধ্যবিত্ত সংসার, সাধারণ পরিবার; কলেজের পরিচয়। ক'দিনেই বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। নমিতার মাও মুগ্ধ হয় দেবেশকে দেখে, দীর্ঘ বলিষ্ঠ সুন্দর চেহারা। চোখে মুখে বুদ্ধির দীপ্তি। এতবড় ব্যবসাদারের ছেলে—নাম ডাক হাঁক, কিন্তু দেবেশের চালচলনে তার কোন ছাপই নেই। ঋজু শপথের মত বলিষ্ঠ কঠিন একটি ছেলে।

এষা হঠাৎ তাকে দেখে ওদের ওই খানেই কলেজের এক বান্ধবীর সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে। ঘরের এত লোকের মধ্যে ওর উপরই সর্বপ্রথম দৃষ্টি পড়ে। বলিষ্ঠ উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করছে দেবেশ

এবার আসোনি তুমি বসন্তের পল্লব মর্মরে
পুষ্পদল চুমি।

ওর মাথার কোঁকড়ানো চুলগুলো এসে পড়েছে কপালে; একটা মিষ্টি দীপ্তি সৌরভের মত ঘিরে রেখেছে তাকে। মুগ্ধ বিস্ময়ে ওর দিকে চেয়ে থাকে এষা।

নমিতা চুপে চুপে বলে ওঠে—মস্ত বড়লোকের ছেলে। মিঃ চ্যাটার্জি—বরুণোদয় চ্যাটার্জির ছেলে ও!

চমকে ওঠে এষা! নমিতা ওর পরিচয়টাও জানে নি। এষা নমিতার দিকে চেয়ে থাকে। মধুগন্ধ ভরা ওই মিষ্টি পরিবেশে সেদিন এষার চোখে নমিতার মনের সব দুর্বলতা ফুটে উঠেছিল। চোখের তারায় তারায় তারই সন্ধান! বান্ধবীরা বলে—নমিতা ভাল ছেলেকে পাকড়াও করেছে। হিসেবী মেয়ে।

এষা কথা বলেনি। তার মনে ঝড় উঠেছে। অন্য এক ঝড়। এতদিন কানাকানি শুনেছে বাড়িতে মায়ের কাছে, বাবার মুখেও—তাঁর আগেকার স্ত্রী ছিলেন, তার একটি ছেলেও আছে। কিন্তু কি যেন গভীর রহস্যের মত সেই পরিচয়; মায়ের কাছে শুনেছিল—কি যেন কলঙ্কের কালিমাখা কাহিনী। ওর ঘৃণ্য জন্ম ইতিহাস। তাই বাবা নাকি কোন সম্পর্ক আর রাখেননি।

কথাটা শুনে সেদিন চমকে উঠেছিল এষা। মাকেও বিশ্বাস করেনি!

আজ মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা করে। আশ্চর্য মিল। বাবার মতই টিকলো নাক—তেমনি বলিষ্ঠ গড়ন, দৃষ্টি ; নিকট সাম্য ফুটে ওঠে কণ্ঠস্বরে।

বের হয়ে এসে ট্রাম লাইনের কাছে দেবেশকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে যায় এষা। সারা মনে কি এক পাওয়ার আনন্দ। হারানো জিনিস খুঁজে পাওয়ার তৃপ্তি ; বিস্মৃতির আঁধারে যাকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছে বাবা মা, আঁধার ভাঙ্গা তারার মত ম্লান দীপ্তিতে সে সমুজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে।

প্রণাম করতেই অবাক হয়ে যায় দেবেশ।

—আপনি, একি !

—ছোট বোন দাদাকে প্রণাম করে না ?

পরিচয় দিতেই দেবেশও চেয়ে থাকে ওর দিকে। খুসির আভা ওর সারা মনে। পরক্ষণেই ম্লান হয়ে যায় সেই দীপ্তি—তোমার বাবা মা জানেন ?

—সব বিষয়েই তাঁদের কথা মানতে হবে এমন কোন কথা নেই ? একজনের অপরাধে অন্য জন পাবে শাস্তি ? চলো আমাকে বড়মায়ের কাছে নিয়ে যেতে হবে, আজই।

দেবেশ এড়াবার পথ পায় না। শুধু বাড়ির কথাই নয়—নমিতার সম্বন্ধে দুর্বলতার সংবাদও জেনে গেছে সে। হাসছে এষা—চলো, কোন ট্রামে উঠবো ?

বীণা অবাক হয়ে যায় এষাকে দেখে। আদর করে বুকে টেনে নেয়।

—এলে শেষ পর্যন্ত। মাকে মনে পড়লো ?

রোগজীর্ণ চেহারা, এককালে রূপবতী ছিল। মায়ের পয়সার অভিশাপ ঢাকা মাংসল রূপের বিকৃত ভঙ্গী থেকে অনেক সুন্দর ছিল বীণা। আজও চোখের সেই স্নিগ্ধ চাহনিটুকু রয়ে গেছে। শত দুঃখ অবহেলাতেও মুছে যায় নি সেই দীপ্তি।

—একবার তাঁকে আসতে বলবি মা ? বড় দেখতে ইচ্ছে করে। কবে আছি কবে নেই, যাবার আগে শেষ দেখাও পাবো না ?

এষা বাবার উপর যেন সব শ্রদ্ধা হারাতে বসেছে। একজন নারীকে এমনি করে দুঃখ দিতে যে পুরুষ পারে—হোক না কেন বাবাই, নিজের মেয়েও তাকে ক্ষমা করতে পারে না।

ঘাড় নাড়ে এষা—বলবো। নিশ্চয়ই আসবেন তিনি !

বরুণোদয় চ্যাটার্জি দ্বিতীয় পক্ষের শ্বশুরের পয়সাতেই বড় হয়েছেন। তাই বোধ হয় মাকে একটু ভয় করে—ভাবে এষা। মা বেশ চটে ওঠে এবার দেবেশদের ওখানে যাওয়া নিয়ে।

মোটা মাংসল দেহ, নড়তে চড়তে কষ্ট হয় মায়ের। দেহানুপাতে গলাটাও তেমনি। বেশ সতেজ কণ্ঠেই জানিয়ে দেয় এষাকে—ওসব চলবে না।

এষা ওই মায়ের মেয়ে, এক জায়গাতে সেও বেপরোয়া। প্রতিবাদ করে দৃঢ় কণ্ঠে—এ তোমার অন্যায় বাপি। পয়সা টাকা তোমার কাছে চায়নি। একবার দেখতেও যাবে না অসুস্থ একটা মানুষকে ?

মিঃ চ্যাটার্জি চুরুট টানা বন্ধ করে মেজেতে পায়চারি করেন নীরবে। মেজের দামী বোখারার কার্পেটের উষ্ণতা ভেদ করে যেন মার্বেলের হিমস্পর্শ ফুটে উঠছে, পায়ের পাতা দিয়ে সারা দেহের অনুপরমাণুতে সংক্রমিত হচ্ছে সেই স্পর্শ ; ডিকটোফোনে আজকের কনফারেন্সের স্পিচটা রেকর্ড করে যেতে হোত—তাও কেমন ইচ্ছে হয় না। একটা মুখ ! বীণার কথা, দেবেশের কথা বার বার মনে পড়ে। অতীতের ঘন অন্ধকারের মাঝে আবার ডুবে যায়, হারিয়ে যায় তারা।

হেভি মেসিনারির একটা বড় শিপমেন্ট এসেছে, আজই রাত্রে বোম্বে যেতে হবে। লাখো লাখো টাকার ব্যাপার, জানলার ফাঁক দিয়ে বাইরের বাগানের দিকে চেয়ে থাকেন। দমকা ঝড়ে পাতাবাহারের রঙীন পাতাগুলো শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে ঝরে পড়ছে একটার পর একটা।

হঠাৎ কি যেন যুক্তি খুঁজে পান মনে মনে। চুরুটের একটান ধোঁয়া দেহ মনকে আবার উষ্ণ করে তোলে। মিঃ চ্যাটার্জি জবাব দেন,

—এখন যাওয়া সম্ভব নয় এষা, বোম্বে থেকে ফিরে এসে সময় পেলে নিশ্চয়ই যাবো। যাওয়া তো কর্তব্য।

মনকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন তিনি। এষা কথা বলে না।

বাবার কাছে লাখো টাকার মুনাফাই বড় ; অন্য কোন দিকে দৃষ্টি নেই। স্বর্ণমৃগয়ায় বের হয়েছে একালের শ্রেষ্ঠী পুত্র ; নিষ্ঠুর প্রাণহীন সেই খেলা !

মা বাবার হয়ে বলবার চেষ্টা করে—সেখানে আর না যাওয়াই ভালো, সে-ই তো কোন সম্পর্ক আর রাখেনি। রাখবার দরকারও নেই বোধ হয়।

—মা ! এষা অস্ফুটস্বরে প্রতিবাদ করে ওঠে ওই কুশ্রী ইঙ্গিতের। বাবা কথা বলেন না, বের হয়ে যান মাথা নীচু করে।

বাবা এড়িয়ে গেলেন প্রসঙ্গটা। অপ্রিয়, অহেতুক এই প্রসঙ্গ।

কয়েক দিন পর দেবেশদের শহরতলীর ছোট বাড়ির দিকে যায় এষা। শহরের কোলাহল নেই ; আশেপাশে তখনও গাছগাছালির ভিড় ; আম নারকেলগাছের সবুজ চিরোল পাতায় সকালের গিনি গলা রোদ স্পর্শ মাখায় ; পাখি ডাকে। রকমারি পাখি।

ঘাসে ঘাসে শিশিরের মুক্তো ঝরানো আভা।

পায়ে পায়ে বাড়িটায় এসে ঢুকলো এষা। কোন সাড়া শব্দ নেই। নিশ্চুপ প্রাণহীন বাড়িটা অসীম স্তব্ধতায় ডুবে আছে। সব কোলাহল সাড়া প্রাণস্পন্দন ওর হারিয়ে গেছে চিরদিনের জন্য। চাতালের উপর একটা কম্বল পেতে বসে আছে দেবেশ, থমথমে মুখে জমাট বিষণ্ণতার ছোঁয়া ; একক নিঃসঙ্গ সে এই বিরাট পৃথিবীতে।

—বড়দা ! চমকে ওঠে এষা।

সবশেষ হয়ে গেছে একরাত্রেই ; সামান্য ক্ষীণসূত্রটুকুও নিঃশেষে মুছে গেছে। দেবেশ আজ মুক্ত স্বাধীন। সারা মনে একজনের প্রতি অসীম অপমানের প্রতিশোধ নেবার জ্বালা ; এষাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে।

—কাঁদিস না এষা ; আমার জীবনে কান্নার ঠাঁই নেই। মা যাবে তা জানতাম, তবে একজনের জন্যই এত আগে গেলেন তিনি, এই ভাবে।

এ অন্য কোন দেবেশ, শোকের স্তব্ধতার মাঝেও সত্যের দীপ্তিমাখা নিবাত নিষ্কম্প একটি স্থির শিখার উচ্ছ্বরণ।

এষা ওই একক মানুষটির জন্য মনে মনে দুঃখ পায় ; এমনি করে সব হারাতে কাউকে দেখেনি। একজন পারে দেবেশের হাহাকার ভরা মনে পূর্ণতার প্রসাদ এনে দিতে। কি ভেবে পরদিন এষা নমিতাদের বাড়ি যায়। তাকে সংবাদটা জানানো দরকার।

নমিতাদের বাড়ি গিয়েই বিস্মিত হয় নিমেষকে সেখানে দেখে। নমিতার মা খুব আদর করে ভীমনাগের সন্দেশ নমিতার তৈরি বলে খাওয়াচ্ছে।

মাঝে মাঝে হাসিতে ফেটে পড়ে নমিতা; দেবেশের প্রকৃত পরিচয় তারাও পেয়েছে বোধহয়, কাঞ্চন বাইরে ফেলে কাঁচ নিয়ে এতদিন ভুলেছিল মেয়ে; আজ সেই ভুল সুদে আসলে শোধই করছে তারা।

এষা নিমেষকে এখানে দেখবে কল্পনা করে নি। এষা দূর থেকে ওকে দেখতে পেয়েই এগিয়ে যায়।

—এতদিন পর? যাক্ মনে পড়ল তাহলে।

এষা বলে ওঠে—দেবেশ বাবুর মা মারা গেছেন।

—তাই নাকি! ভেরি স্যাড নিউজ! নমিতার এনামেল করা মুখে ক্ষণিকের জন্য একটি পোঁচ কালো ছায়া নামে। ঝেড়ে ফেলে জবাব দেয়,

—তাহলে বেশ; এসো তুমি! চমৎকার বাজনা শোনাব তোমায়। নৃপেন বাবু বেহালা বাজাবেন।

ওদের আনন্দমেলায় এষার মন টেকে না।

জীবনের বহু বিচিত্র প্রকাশ। একজন এত শীঘ্র অপরকে ভোলে কি করে ঠিক বুঝতে পারে না এষা। সেই সকালে নমিতার চোখে দেবেশকে ঘিরে যে স্বপ্নলাগা অনুভূতির সুর ছিল আজ তার বিন্দুমাত্র অবশেষ নেই।

স্বর্ণমৃগয়ায় বের হয়েছে একালের শ্রেষ্ঠীপুত্র; এও তার শিকার।

নমিতারা যা চায় দেবেশ তার অধিকারী নয়। নিজেও তা চায় না।

নমিতার মা এগিয়ে আসে—এলে, চা খেয়ে যাও।

নিমেষের সামনে ধরা পড়তে চায় না এষা। চুপ করে বের হয়ে গেল। দেবেশের জীবনে ওদের ঠাঁই নেই। নিঃসঙ্গ একক মানুষটিকে কোথায় বিশাল বিশ্বের ভিড়ে হারিয়ে ফেলেছিল তার পরই। বাড়ি ছেড়ে চলে যায় দেবেশ।

কিছুদিন পর মিঃ চ্যাটার্জি সেই বিগতা স্ত্রীর বাড়িখানাকে রিমডেল করে বিরাট গ্যারেজ ওয়ার্কশপ গড়ে তোলেন। সবাই ভুলে গেছল তার কথা; অতীতের অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া একটি নামে পরিণত হয়েছিল দেবেশ।

এষাই ভোলেনি!

হঠাৎ এই রাতের অন্ধকারে বিস্মৃত যুগ দীর্ণ করে আবির্ভাব হয়েছে সেই মানুষটির। ঝড়ের মত দুর্মদ। মৃত্যু তাকে হানা দিয়েও পারেনি বিপর্যস্ত করতে; হাজারো মৃত্যুকে জয় করেছে সে। উদ্দাম বেপরোয়া একটি যুবক!

নিমেষ ভয় পেয়ে গেছে। পরাজয়ের ভয়—হারাবার ভয়।

অর্জন না করেই প্রভূত সে পেয়েছে, অযাচিত অন্যায় পাওয়া। পাবার যোগ্যতা তার নেই ; সেই কুড়িয়ে পাওয়া সম্পদ হারাবার ভয়। দেবেশের সারা মনে জীবনের কাঠিন্যের মাঝে অর্জন করা অফুরান মাধুর্য। নিভৃতে সে সাধনা করেছে সেই অমৃতের।

জীবনকে কৃপণের মত মাটির তলে রুদ্ধ সঞ্চিত করে রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করতে চায়নি একলা, ছড়িয়ে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছে অফুরান প্রীতি ভালোবাসার চাঞ্চল্য তার পথের দুদিকে।

একজন টানে নিজের কেন্দ্রের দিকে ; অন্যজন বিরাট বিশ্ব মানসের দিকে ছড়িয়ে দিয়েছে নিজেকে।

এষা আজ দেবেশকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে। ওই কালিমাখা প্যাণ্ট জুতো, শিরাবহুল হাত, শক্ত চোয়াল ঢাকা মানুষটিকে ঘিরে যে ঋজু শপথের মত একটা ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছে নিমেষ তার সামনে বেমানান, অনেক দুর্বল, নিষ্প্রভ।

দেবেশ চারিদিকে চেয়ে দেখছে। দামী সোফা সেট ; পায়ের নীচে শক্ত পাথর ঠেকে না—নরম কার্পেটের উষ্ণ অনুভূতি কেমন যেন ক্লান্তি আনে।

ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখে রাত নটা বাজে।

রাতের পালি শুরু হতে দেরি নেই। এতক্ষণ বোধ হয় মানিক, মাখন সর্দার আরও অনেকেই বের হয়েছে পথে।

অন্ধকারে প্রহরীর মত ঘুরছে সৌরভী ; বিচিত্র সেই রহস্যময়ী!

হঠাৎ এষার কথায় আবার এই পরিবেশে ফিরে আসে।

—এখানে কি করছিলে এতদিন? নাম বদলে? এষার প্রশ্নে এদিকে চাইল দেবেশ। সিগারেটটা পান্‌সে ঠেকছে ; ময়লা প্যাণ্টের পকেট হাতড়ে কয়েকটা ভাঙা—আস্ত বিড়ি বের করে দেশলাই ঠুকে ধরিয়ে টানতে থাকে। একটা ভরসা ফিরে আসে ওই কড়া উষ্ণ ঝাঁঝে।

এষা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে—খুব উন্নতি হয়েছে দেখছি। এই শিখছিলে বুঝি?

—হ্যাঁ, তোমাদের কোম্পানী হপ্তাহে আঠার টাকা মাইনে দেয়, তাতে এর বেশি ওঠা যায় না। অবশ্য বিড়িও ভাল জিনিস।

—পোশাক টোশাক আর নেই ? থাকতে কোথায় ? এষা রুদ্ধ বিস্ময়ে ওর দিকে চেয়ে থাকে।

নিমেষ কথা বলে নি, নিবিষ্ট দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করছে ওকে। নিস্পৃহ কণ্ঠে দেবেশ বলে ওঠে,

—ধাওড়ায় ; তা থাকতে দিল কই সে আস্তানায় ; কাল সকালে দেখিয়ে আনবো। শুনলাম দোর ভেঙ্গে তছনছ করে জিনিসপত্র ছিটিয়ে ওরা বের করে দিয়েছে আমাকে ; রাতারাতি অন্য জগতেই পাঠাবার ব্যবস্থা সারা হয়ে গিয়েছিল, নেহাৎ আমিও মালকাটা হয়ে গেছি তাই বোধহয় ঠিক কায়দা করতে পারেনি। এসে তোমাদের আশ্রয়ে পৈতৃক প্রাণটা বাঁচালাম। হাজার হোক আপন জন। কি বল ?

হাসছে দেবেশ, তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ ফুটে ওঠে ওর কণ্ঠে।

এষার চোখ ছলছল হয়ে ওঠে ; ওর কথা বর্ণে বর্ণে সত্যি তা বুঝতে পেরেছে।

নিমেষ এগিয়ে আসে—এইভাবে এখানে কোলিয়ারিতে থেকে লেবার ক্ষেপানো তোমার অন্যায়। এ তোমার 'প্লানড এটাক'।

হেসে ফেলে দেবেশ—প্রাণ খোলা দরাজ হাসি, এষা ওর দিকে চেয়ে থাকে। দেবেশ অসহায় একটি যুবক নয় ; কঠিন জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে আজ নিবিড় কঠিন একটি ব্যক্তিত্ব তাকে ঘিরে উঠেছে। তেজস্বিতা আর বুদ্ধির দীপ্তির মত একটি তীক্ষ্ণ ঋজুতা ওর মুখে চোখে।

বসন্ত জবাব দেয়—ফস্টার আর রেজার বলেছে বুঝি ? ওই সুন্দ আর উপসুন্দ ! নিজের বিজনেশ ইনটারেস্ট নিজেই দেখো ; সোজা কথায় তোমার জন্য ওরা কষ্ট করে কুসুম শয্যা পেতে রাখে নি, রেখেছে কণ্টক শয্যা বিছিয়ে ; একটা বারুদের স্তূপের উপর এনে হাজির করেছে তোমাকে—শুধু তোমাকে নয় ; ইংরেজ এদেশ ছেড়ে যাবার পর যাতে শান্তিতে কেউ ব্যবসা করতে না পারে, বাঁচতে না পায়, তার জন্যই এই পথ নিয়েছে। স্করচড আর্থ পলিসি। শ্রমিকের মন দিয়েছে বিষিয়ে—মালিককে প্রলুব্ধ করে তুলেছে। ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে চলেছে ওরা।

নিমেষ কথাগুলো যেন বিশ্বাস করতে পারে না—মানে ?

—মানে অতি সোজা ; মালিক চায় রেজিং বাড়াতে, পয়সার দরকার

তার ; শ্রমিক চায় শুধু বাঁচতে। বাঁচবার মত নিরাপত্তা, দুবেলা স্ত্রীপুত্র নিয়ে দুমুঠো ডাল-ভাত সংস্থানের জন্য কোলিয়ারির নিরাপত্তার উপরই নির্ভর করে ; সেখানে মালিকের স্বার্থ আর মজুরের স্বার্থ এক। মালিকপক্ষ, তোমার সুন্দ-উপসুন্দের দল সেই নীতি মানে নি এতটুকুও—মানতে চায় নি ; তাই প্রাণ হাতে করে আঁধার টিলা টপকে এইখানে ছুটে আসতে হয়েছে আমায়। ওরা জানে সেই অন্যায়ের ব্রহ্মাস্ত্র আমার হাতে !

—সেই ব্রহ্মাস্ত্র ব্যবহার না করে তুমি প্রাণ ভয়ে দৌড়ে এসে আশ্রয় নিয়েছো এইখানে! নিমেষ কথাটা বলে ওর দিকে চাইল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। দেবেশের চোখ দুটো দপ্ করে জ্বলে ওঠে একটি বার মাত্র।

এষা চমকে ওঠে। কঠিন কঠোর মানুষটির মুখ থেকে হাসি নিঃশেষে মুছে যায় ; একটা ঋজুতা ফুটে ওঠে ওর দৃষ্টিতে।

দেবেশ বলে ওঠে—এর জবাব এখন থাক। ভাঙতে আমি চাইনি ; গড়তে চেয়েছিলাম। সবাই শান্তিতে থাকুক, যতটুকু প্রাপ্য তাদের দাও ; আলো, হাওয়া, দুমুঠো ভাত—আর বাঁচবার মত নিরাপত্তাটুকু কেড়ে নিও না নিমেষ।

নিমেষ ওই লোকটির দিকে চেয়ে আছে, ওই ডাক ও কণ্ঠে বেমানান। বলে ওঠে নিমেষ,

—মিঃ চ্যাটার্জি বলে ডাকলেই খুশি হব।

দেবেশ কথা বলে না, সোফা থেকে উঠে দাঁড়াল। এষা হতবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকে।

নিমেষ পায়ের নীচে মাটি ফিরে পেয়েছে। পুরু কার্পেটের উপর পায়চারি করতে করতে বলে ওঠে,

—কোন অন্যায় আমি সইবো না, বলে দিও ওদের।

হাসছে দেবেশ। বিচিত্র অদ্ভুত হাসি। নিমেষের গাম্ভীর্যভরা কণ্ঠস্বর ওর হাসির তোড়ে ভেসে যায়।

—বেশ, তাই বলবো। তুমিও এই অন্যায়ের প্রতিকার করো। নইলে তারাও এই সব সহ্য করবে না !

—শাসাতে এসেছো এইখানে ? ভীরু কাওয়ার্ড !

—শাসাতে নয়, মুখোস খুলে দিতে এসেছি। ভণ্ডামির মুখোস।

এষা এগিয়ে যায়—দেবুদা!

দেবেশ চুপ করে। নিমেষ শোনায়—এরপর এখানে না থাকলেই খুশি হবো।

এষা চমকে ওঠে; নিমেষ যেন ক্ষেপে গেছে। বের হয়ে যাচ্ছে বসন্ত, শক্ত কঠিন হয়ে উঠেছে তার মুখ।

পিছনে তার নিশ্চিত মৃত্যুর পদধ্বনি; অন্ধকার বন্ধুবিহীন বন্ধুর পথে একা সে।

হঠাৎ মনে পড়ে একা সে নয়; মাখন, মানিক, যদু মাহাতো, স্বৈরিণী সেই লাস্যময়ী নারী, কেষ্টার শীর্ণ সুন্দর বৌ, কতজনকে মনে পড়ে।

ওদের চেয়েও তারা আপন, চেনা জানা। সেই তার জগৎ।

—কোথায় যাবে দেবু দা? এষা এগিয়ে আসে। এই রাত নির্জনে জেনে শুনে তাকে ওদের হাতে ছেড়ে দিতে পারে না।

বসন্ত দরজার মুখে কাকে ঢুকতে দেখে থমকে দাঁড়াল।

কোথায় যেন ঝড় উঠেছে। কেঁপে উঠছে গাছ গাছালি—আর্তনাদ করে রাতজাগা পাখির দল।

—নমিতা!

হারানো সেই অতীত নিঃশেষে বদলে গেছে। লুণ্ঠন করে নিয়েছে ওই স্বর্ণ শিকারীর দল দেবেশের সব কিছু। বৃষ্টিঝরা নির্জন রাতের অন্ধকারে শ্বাপদ লালসা লোলুপ পৃথিবীর পথে ওকে ঠেলে দিয়েও তৃপ্ত হয় নি তারা।

শেষ আঘাত হানে! নমিতার বেশ বদলে গেছে। বদলে গেছে তার ভিতর বাহির। দামী সিল্কের শাড়িতে রূপ ফেটে পড়ছে। দেবেশকে চিনতে পারেনি, ইচ্ছে করেই চিনতে চায় নি।

এগিয়ে গিয়ে নিমেষের পাশে দাঁড়াল। প্রশ্ন করে সে।

—মাথা ধরা কমলো?

নমিতা কলকণ্ঠে বলে ওঠে—কমবে কি? যা চিৎকার শুরু করেছো তোমরা। ইস্! ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছো নাকি তাই দেখতে এলাম।

দেবেশ আর দাঁড়াল না।

অন্ধকারেই পা বাড়ায়। টলছে মাটি, কাঁপছে আকাশের তারা। বাতাসে একটা চাপা গর্জন। বৃষ্টিঝরা জমাট অন্ধকার ফুঁড়ে একটা প্রচণ্ড শিখা আকাশের বুকে লাফ দিয়ে ওঠে।

প্রচণ্ড শব্দ!

গুরু গুরু কাঁপছে মাটি! এক মুহূর্তেই আলোগুলো সব নিভে যায়। নিষ্প্রদীপ ধ্বংসপুরী। লালাভ শিখা উঠছে তিন নম্বর পিট থেকে। প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দটা দূর প্যানচোত পর্বতসীমায় ধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলে ছেয়ে ফেলেছে নৈশাকাশ।

তিন নম্বর পিটে বিস্ফোরণ ঘটেছে।

একটি মুহূর্ত! মাখন, মানিক, কেষ্ট মিস্ত্রী, বুধন, আরও কত চেনা-অচেনা মুখের ভিড়। অন্ধকার নিরন্ধ্র পুরীর মধ্যে মৃত্যুর কালো ডানা মেলা পদধ্বনি শোনে।

অনুভব ক'রে অন্ধকারেই ছুটছে বসন্ত পিটের দিকে। কলরব, কান্না জেগে ওঠে আঁধার ছাওয়া চিনতোড়ে। জেনারেটারও ফেল করেছে ওই বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে। ষ্টিম সাইরেনটা বাজছে একটানা দীর্ঘ কান্নার সুরে।

রাত্রির সিফ্‌টের কাষ শুরু হয়েছে। অনবরত নামছে উঠছে লিফট্‌ ছুটো।

বুধন এই গোলমালে পালোয়ান সিং-এর হাত থেকে ছাড়া পেয়েছে। কাঁকর মেশানো চালের প্রতিবাদ করা নিয়ে আন্দোলন কোম্পানী চালাতে চায় নি আর। মাখন, বুধন, মদনা, ন্যাপাল সকলেই আশ্চর্য হয়। তাদের পালিবদল হয়ে গেছে এ সপ্তাহে। রাতপালি।

মাখন চুপ করে থাকে, বসন্তকে দেখতে পায় না।

ফকির আর মালু গেছে—বসন্তও নেই। আটজনের তিনজন বাদ।

—বসন্ত কোথায় গেল রে?

বুধন ঘাড় নাড়ে—কে জানে। সাঁঝ বেলাতেই দেখেছিলাম বটে।

—তারপর?

—জানি না গো। পালাই গেল নাকি?

—উঁহু। পালাবার ছেলে সে নয়। মাখন মাথা নাড়ে। এতকাল কোলিয়ারিতে এসে মানুষ চিনেছে। দালাল সে নয়, ভীতু তো নয়ই। তবে কি কাসুন্দির খাদের মত কোন ঘটনা ঘটেছে? রাতের আঁধারে দুজনকে ধরে ধ্বসা খাদের খোপের ফাঁকে ফেলে দিয়েছিল। ওঠবার কোন উপায়

নেই, অতল অন্ধকারে বিষাক্ত গ্যাস আর জলে হেজে পচে মরে গেছল তারা; সামান্য বাতাসে উঠেছিল তাদের মৃত্যুর ক্ষীণ সংবাদটুকু।

কোন প্রমাণ ছিল না—নিঃশব্দে চলে গিয়েছিল তারা এই আলোর জগৎ থেকে।

পটলা বলে ওঠে—চল কেনে গো? ডুলি খালি যেছে যি।

ওদের বদলা নতুন দুজনকে নিয়েছে দলে, তাদের ভাবনার ততো কিছু নেই; বসন্তকে মাখন যতটুকু চিনেছে ওরা ততটুকু চেনে নি। তাছাড়া মায়া দয়ার সময় এখানে নেই। আগে নামতে পারলে ভালো কয়লা কাটতে পাবে, পিছনে গেলে সেই বাতিল জায়গা মিলবে।

—চল।

মাখন একটা চিন্তা মনে নিয়ে উঠল ডুলিতে। মাথার উপর ভারি ষ্টিলের উঁচু ফ্রেমটা পরিষ্কার দেখা যায় না, আবছা হিজিবিজি কাটা একটা বিকট দৈত্যের মত মনে হয় আলো আঁধারিতে।

শরণ সিং ওভার টাইম খাটছে দুপালি। পয়সা তার চাই। দিন রাতের অধিকাংশ সময়ই সে থাকে মাটির নীচে। গায়ের রংটা ইট চাপাপড়া ঘাসের মত ফ্যাকাসে, চোখদুটো নীলাভ হয়ে উঠেছে, কয়রা চোখ।

উঠে এসে একপাক সৌরভীর ওখানে যাহোক কিছু খেয়ে আর খানিকটা গলায় ঢেলে বুঁদ হয়ে খাদে নামে। পাঁড় মাতাল—হাতে লোহার বালা, দাড়ি গোঁফ ঠিকই আছে। শিখ সে। তামাক খাওয়া তার ধর্মবিরুদ্ধ, তাই জল পথেই চলে। বোতল নিয়ে যাবার আইন নেই, তাই পেটে পুরে নিয়ে নামে কোলিয়ারির নীচে।

স্যাপ্টের পাশে মেন গ্যালারিতে একটা শালকাঠের পুরু তক্তা রাখা, বেঞ্চির মত। সেইখানে বসে মালকাটাদের এখানে ওখানে পাঠাচ্ছে ডিউটি মাফিক।

মাখনের দলকে নামতে দেখে এগিয়ে আসে সে। আলোর ঝলকে চারিদিক খোঁজে; বসন্তকে দেখতে না পেয়ে বলে ওঠে,

—উয়ো লাটসাব কাঁহা?

—মালুম নেহি। মাখন জবাব দেয়।

কি ভাবছে শরণ সিং; মনে মনে যেন খুশিই হয়।

—দো নম্বর ইনক্লাইনমে যাও।

মাখনও বিস্মিত হয়, ভাল জায়গা, হাওয়া আছে। কয়লাও ভালো। মাখন হঠাৎ প্রশ্ন করে।

—মিত্রসাব ক্যা কাম ছোড় দিয়া ?

মিত্র সাহেব বিশেষ কারণে যেন কায ছেড়ে দিয়েছেন, কথাটা বেশ ছড়িয়ে পড়েছে। ওদের কাছে শরণ সিংই সব, তাই খবরটা তাকেই জিজ্ঞাসা করে। শরণ সিং জবাব দেয় নিস্পৃহ কণ্ঠে,

—নেহি জানতা। পরক্ষণেই গলা তুলে হুকুম দেয়—যাও, আপনা কাম মে যাও।

আজ কোলিয়ারির একচ্ছত্র অধিপতি সে। গতকালের ঘটনাটা মনে পড়ে—অন্ধকার গ্যালারির মধ্যে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বসন্ত আর সে। কঠিন আঘাতের চিহ্ন আজও তার নাকে, চোখের নীচে আঁকা আছে। কিন্তু ?

মনে মনে খুশিই হয়, আপদ যেন বিদায় হয়েছে। বুক ফুলিয়ে সে আজ কোলিয়ারি রোঁদে বেরোয়।

—এ্যাই হারামজাদ, গ্যালারিকা পাশ বাড়তি হো যাতা হায়।

কয়লা বেশি কাটবার জন্য ওরা গ্যালারির প্রস্থ বাড়িয়ে ফেলে, ফলে দু পাশের পিলারের জোর কমে যাবার সম্ভাবনা। কয়েকজন মালকাটা গ্যালারির দু পাশে চূনকাম করছে, কয়লা চুরি বন্ধ করতে। কাটলেই ধরা পড়ে যাবে।

দশ মিনিট ঢালু বেয়ে নেমে গিয়ে প্রায় আঠারো শো ফিট নীচে তারা থামল ; কাযে লাগতে হবে এইবার। দরদরিয়ে ঘাম ঝরছে, হাওয়া একটুও যেন নেই। নাকের ভিতর সুড় সুড় করছে অজস্র কয়লার ধুলোয়—থিক থিক করছে বাতাস।

মাখন গ্যালারির উপরের বাতাসে আঙুল মেলে কি যেন ধরবার চেষ্টা করছে হাত বুলিয়ে।

—কি গো ? ন্যাপলা কাশতে কাশতে বলে ওঠে।

ধমকে ওঠে মদনা—ঘং ঘং করে ফাটা কাঁসর বাজছেই একতালে। থামা দিকিন বাপু।

হাসে ন্যাপলা—হঃ ডাক্তোরের বাপ লারলেক, থামাবো আমি কিসকে ?

সাঁকতোড়ের বিষ্টু ডাক্তোর কল দিয়ে দেখে শুনে বললেক—ইখান থেকে কায কাম ছেড়ে চলে যা তুই। বুকটো ঝাঁঝরা হয়ে গেছে বটে।

—তবে ?

—হুঁ হে, ঘরে যেয়ে কেঁদপাকাটি চুষবো নাকি ?

তীব্র কাশির ধমকে জীর্ণ শরীরটা কেঁপে ওঠে, সরলপুঁটির বুকে জিরি জিরি কাঁটার মত হাড় পাঁজরাগুলো ফুলে ওঠে, ঠেলে ওঠে চামড়ার পাতলা আবরণ ভেদ করে; থু থু করে খানিকটা গয়ের তুলে ফেলল গ্যালারির গায়ে; এমনিতেই ঘামছে, কাশির পর ক্লান্তিতে হাঁপাচ্ছে সে। বসে পড়ে ভিজে পাথরের উপর, নীরব নিস্তব্ধ অন্ধকারে জল বয়ে যাবার শব্দ শোনা যায়; দূরে কোন কোণে হলেজ লাইন দিয়ে গড় গড়িয়ে গাড়ি নামছে—তারই শব্দে কাঁপছে মাটি।

ন্যাপলা সামলে নিয়ে বলে ওঠে—কুথায় আর ফিরবো কাকা, যি কটাদিন বাঁচি ইখানেই থাকি। বাঁচতে মন চায় না গো।

মাখন গ্যালারির চালে হাত বুলিয়ে চলেছে, গম্ভীর মুখে ফুটে ওঠে চিন্তার রেখা।

—কি দেখছো গো ? ই যে শালা সব্বোনাশা গরম। হাওয়ার পথ টৈ কি কিলা এখনও বুজে আছে, না হাওয়া টানা থামাই দিছে শালোরা ?

—মানে ? রং চালাকি নাকি ইটো ?

এখান থেকে মাইল দুয়েক দূরে একজস্ট ফ্যান বসানো; কোন কারণে বন্ধ হলে ফোন করেই এ পিটের মুখে জানায়, বিশ পঁচিশ মিনিটের মধ্যে কোলিয়ারি থেকে সবাইকে তুলে নিতে হবে। কিন্তু সে রকম কিছু ঘটেনি।

মাখন আঙুলে হাওয়ার ক্ষীণতম গতিবেগ টের পাচ্ছে—তবে ঈষদুষ্ণ সেই প্রবাহ। তবে কি বাতাস নয়! বাতাসের চেয়ে হালকা সেই মৃত্যুবিষ 'মিথিন'!

উপরের স্তরে গিয়ে চালে ঠেকে থাকে, 'পকেট' হয়ে জমছে তিলে তিলে সেই গ্যাস।

কেষ্ট বাইরে আবছা আঁধারে বিশেষ তেমন দেখতে পায় না; রাতকানা রোগে ধরেছে। আঁধারে থেকে থেকে চোখের স্বাভাবিক এই দৃষ্টি ক্ষমতা অনেকেই হারিয়ে ফেলে; চেনা পথ—খানিকটা আভাসে, খানিকটা আন্দাজ আর আলোর নিশানা দেখে চলাফেরা করে।

পিটের নীচে পৌঁছে গেছে কখন হুঁশ নেই তার। তখনও মনে হয় গৌরীর চোখের সেই হাসি মিলোয় নি; তার দেহের সজীব ছোঁয়া, আজই গৌরীকে নিঃশেষে কাছে পেয়েছিল সে। নবীন সেই নেশার স্বাদ সারা মনে।

কেবল্ টানা হচ্ছে পাম্প কেবিন পর্যন্ত, নতুন আর একটা সাড়ে পাঁচশো হর্স পাওয়ার টারবাইন পাম্প বসছে। একটায় কুলোয় না। দুটো কোলিয়ারির মধ্যে এইটেই সবথেকে নীচু, এক নম্বর পিটের জলও ঢালু বয়ে নেমে এসে এখানে জমছে, মাটির নীচে যেন ছোটখাট একটু পুকুর; বুক ভোর কোথাও সাঁতার জল জমেছে সেইটুকুতে; সেইখান থেকে পাম্প করে উপরে জল তোলা হচ্ছে।

কেষ্ট আলোটা অফ্ করে কেবল্‌গুলো টেনে নিয়ে চলেছে। ভারি সিসের পাত মোড়া কনডুইড কেবল্; কোথাও একটু ছিদ্র দিয়ে যেন জীবন্ত তার বের হয়ে না থাকে; একটা কাট আউট থাকবে তাও কেসিং-এর মধ্যে; গজ গজ করে কেষ্ট।

—শালা, এই বাদলার রেতে মাগ ছেড়ে ঘর ছেড়ে এসে দে হাজিরা। পেচ্ছাব করে দিই চাকরির মুখে।

ওপাশ থেকে নটাই বলে ওঠে—যা বলেছিস মাইরি, রেতের বেলায় মগের মুলুকে সোমত্ত বৌটা ছেড়ে আসি, বাঘের মুখে ছাগল ফেলে আসার মত। কে জানে। কোনদিন কুন শালা দেবে সব্বনাশ করে।

কেষ্ট স্প্যানার দিয়ে জয়েণ্টটা খানিকটা আলগা করে বলে ওঠে,

—মাগটাকে থাদে সঙ্গে করে আনবি ইবার; ঠায় পাহারা দিবি। তুই বড় সৎ—তাই তুর মাগও সতী হবে না রে? আসছে জম্মে ধম্মের যাঁড় হবি নির্ঘাৎ।

কেষ্ট হঠাৎ হাতের কায বন্ধ রেখে কি যেন ভাবছে। একটা উষ্ণ স্পর্শ—গৌরী; আজ রাত্রে হঠাৎ যেন গৌরী খুব খুশি হয়ে উঠেছিল।

—কি হয়েছে রে?

গৌরী কথা কয় না, ওর চোখের উপর ভেসে ওঠে বসন্তের সেই পালানোর দৃশ্য, ধাওড়ার বাইরে থেকে সেও দেখেছে দৃশ্যটা; পিছু পিছু দৌড়চ্ছে ওকে ধরবার জন্য গালকাটা, আঁধারে সে-ই ছুড়েছিল একটা ধারালো মড়মড়ি পাথর; গালকাটা কেমন আর্তনাদ করে বসে পড়ে লাইনের উপর; বসন্ত ততক্ষণে অনেক দূর চলে গেছে।

গৌরী গুঁড়ি হয়ে বনতুলসীর ঘন ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ে তানিদের মকাই খেতে এসে পৌঁছে।

—হাসছিস কেনে?

অকারণেই হাসে গৌরী, হেসে কেষ্টর গায়ে গড়িয়ে পড়ে কুটো বাটা হয়ে। নিটোল স্পর্শ; কেঁপে ওঠে কেষ্ট; গৌরীকে এমন করে নিঃশেষে বহুদিন পায় নি। গৌরীও যেন আজ নিঃশেষে তুলে দেয় নিজেকে ওর হাতে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত কোন অন্যমনে। আঁধারে কোথায় পাখি ডাকছে।

ভোঁ বাজে! মধুর মুহূর্তটুকু শেষ হয়ে আসে। আবার সেই দমবন্ধ হওয়া গুমোট গরমে নির্বাসন।

—কি হল রে? নটাই তাগাদা দেয়।

—গুষ্টির মাথা, শালা ঘেমে উবুরি চুবুরি হয়ে গেলাম যে! কোথা থেকে কোথায় এলাম তাই ভাবছি। দূর শালার চাকরি! নিয়ামৎপুর বাজারে এর চেয়ে সাইকেল রিক্সা চালানো ভালো।

—তাই করবি নাকি?

—তবু আলো হাওয়া তো পাবো। ভাবছি মনে মনে।

—শুধু ওই ভাবনাই হবেক, কাযে ঘোড়ার ডিম; ঢের শালাকে দেখলাম কুন বন্ধু গেল নাই কিলা এ মাটি ছেড়ে।

পালির কায চালু হয়ে গেছে, যে যার কাজে লেগেছে। গুরু গুরু শব্দে বেঁটে চ্যাপটা হলেজ ইঞ্জিন চলছে এক ঝলক আলো ফেলে লাইন দিয়ে, পিছনে ওর বাঁধা খালি টিবিং ওয়াগনের সারি। গুড় গুড় করে ইনক্লাইণ্ড পথ বেয়ে নেমে চলেছে—লাটাইএর সুতোর মত খুলছে 'কেবল্ ড্রাম' থেকে হলেজ রোপ; স্যাপটের মুখ থেকে প্রায় ছশো ফুট নীচে গিয়ে কোল ফেসে থামে। সেখান থেকে কয়লা বোঝাই হয়ে উপরে উঠে আসবার মুখে টেনে আনা হবে।

গিজ গিজ শব্দ করে চলেছে স্যাপটের কাছে ইঞ্জিন স্টেশনের হলারটা, শরণ সিং তক্তার উপর বসে আলোয় পকেট থেকে কালিমাখা নোটবুক বের করে হিজি বিজি হিসাব দেখছে। এ হপ্তায় আদায় উশুল বেশি হয়নি। সৌরভীর কথাগুলো মনে পড়ে—তুই মুখপোড়া লোকের সঙ্গে ঝগড়াই করবি। এমন করলে কায কারবার হয়? সৌরভী গজ গজ করে।

—কোলিয়ারির কাষ দেখছে ! বেশি লাভ হলে ওরা দেবে তুকে রাজ্যি-পাট ? তাই দিনরাত লোকের পিছনে লেগে থাকবি, হ্যাঁরে দেড়েল ?

সৌরভীর পুরু ঠোঁটে কেবল ধারাল স্ুঁচলো কথা ; তবু শরণ সিং কোথায় যেন আটকে পড়েছে ওইখানে। শরণ সিং ওকে জড়িয়ে ধরে বলে,

—সাদীই কর সৌরভ।

সৌরভী ওর দাড়ির ঘসটানি থেকে মুখ সরিয়ে নিয়ে জবাব দেয়,

—মর ; কারুর দিন যায় এমনি তুর ? কটা আর আছে রে তুর ?

—ধ্যাৎ! মাইরি! কসম! শরণ সিং নিজেকে ভুলে যায়। কবে জলন্ধরে কোথায় বিয়ের যোগাড় করেছিল, কিন্তু টাকার অভাবে বিয়ে হয়নি। ওদের সমাজে মেয়ে পাওয়া ভার। পুরুষের তুলনায় মেয়ের সংখ্যা ঢের কম। তাই শরণ সিং আজও একাই রয়ে গেছে। সৌরভীর ভালবাসা—একটু স্পর্শ তাকে কেমন আত্মহারা করে তোলে।

ঘন্টি বাজছে। উপর থেকে আসছে সঙ্কেত ; কোন কয়লার টব এখনও এসে পৌছে নি হলেজ স্টেশনে, মাল লিফ্‌টটা ঠায় দাঁড়িয়ে। বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল শরণ সিং ; গ্যালারির ও প্রান্তে হলেজ স্টেশনে গিয়ে ধমক পাড়ে—ক্যা হুয়া ?

অপারেটার জবাব দেয়—নেহি মালুম।

—দো ঘন্টি লাগাও। শরণ সিং নিজেই বেল টিপতে থাকে। কোলফেসে সঙ্কেত করতে থাকে মুন্সীকে ; মাল পাঠাবার সঙ্কেত।

—শালা হারামজাদ, নিদ্ আগিয়া সবকোইকো।

হেলমেটটা মাথায় চাপিয়ে ডেভিস ল্যাম্প হাতে লাঠি বগলে ওয়াকিং রোড ধরে এগিয়ে যায় সে বেগে ; পাথরে পাথরে পা দিয়ে নেমে চলেছে শরণ সিং দ্রুতগতিতে ; মেজাজ সপ্তমে চড়ে উঠেছে।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। বার কয়েক একটু জলবার ক্ষীণ চেষ্টা করেই দপ্ করে হাতের সেফ্‌টি ল্যাম্পটা নিভে গেল নিমেষের মধ্যে। শরণ সিংএর মুখ থেকে অস্ফুট আর্তনাদ বের হয় ; বাতাসের সেই গতিটুকুও অনুভব করা যায় না ; গ্যালারির চাল বরাবর হাত চালাতে অবাক হয়ে যায় ; বেশ উষ্ণ হালকা ভাসা ভাসা একটা অনুভূতি !

সমস্ত শরীরের রক্ত যেন মাথায় উঠে পড়ে, কি ভেবে উপরের দিকে উঠতে

থাকে ; এক—দুই—তিনবার পা ফেলেছে, মনে হয় কার প্রচণ্ড হাসির শব্দে কেঁপে উঠেছে সমস্ত কোলিয়ারি! বেগে পিছন দিক থেকে তাকে কে ধাক্কা দিয়ে ছিটকে ফেলল পাথরের উপর ; কাঁপছে থর্ থর করে পাথর কয়লার স্তর, ঝুর ঝুর করে খসে পড়ছে কুচো কয়লা চাল—গ্যালারির গা থেকে ; যে কোন মুহূর্তে ধ্বস নামবে হুড়মুড়িয়ে। রুদ্ধ করে দেবে সব কিছু!

গরম একটা আগুনের ঝলক নাচতে নাচতে বায়ু তরঙ্গে ভর করে বেগে উঠে গেল মেইন স্যাপ্টের দিকে। শক্ত পাথরের উপর উবু হয়ে পড়ে আছে শরণ সিং।

উঠেই সেও ছুটতে থাকে মেইন স্যাপ্‌টের দিকে। গ্যাস এক্সপ্লোশন হয়েছে নীচে কোথাও ; আবার হবে, এখুনিই হোক, দশ মিনিট আধঘণ্টা পরেই হোক। একমাত্র পালান ছাড়া পথ নেই। পথ! অন্ধকার পুরীতে মৃত্যুর প্রহরা জেগেছে! ছুটছে আতঙ্কিত মালকাটার দল। কোথায় ধ্বস নেমেছে। শব্দটা গুমরে ওঠে রন্ধ্রে রন্ধ্রে!

হো হো বইছে জলধারা ; তোড়, গর্জন অস্বাভাবিক বেড়ে উঠেছে।

ছিটকে পড়েছে মাখন একটা টবের নীচে ; বুধনের হাত থেকে কে গাঁইতিটা কেড়ে নিয়ে ওকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় নয়ানজুলির খাদে হাঁটু ভোর জলে। সারিবন্দী খালি টবগুলো লাইন থেকে আশমানে উঠে চালের গায়ে লেগে নীচে আছড়ে পড়ে এ ওর ঘাড় মুড়ের উপর, বুকের মধ্যকার সমস্ত নিঃশ্বাস বায়ুটুকু পর্যন্ত নিঃশেষে বার হয়েছে ; সমস্ত গ্যালারিটা একটা বায়ুশূন্য স্থানে পরিণত হয়। শূন্য হাত পা নাড়ান যায় না ; প্রচণ্ড আকর্ষণে হাত-পাগুলোই বোধ হয় ছিটকে যাবে।

আর্তনাদ করে ওঠে মাখন —গ্যাস!

তার কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে যায় বুক কাঁপানো প্রচণ্ড শব্দে। নীচের সেই চাপাপড়া গর্তটা থেকে নীলাভ শিখা উঠছে—ফকির আর মালুর আত্মা জেগে উঠেছে সর্বনাশা বিক্ষোভের রূপে।

এক মুহূর্ত! চড় চড় করে একটা শব্দ!

—পালা, যে দিকে পারিস।

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে থাকে তারা, পিছনের ফাটলটা সশব্দে ধ্বসে পড়ে ; ফিনকি দিয়ে গ্যাস পকেট থেকে বের হচ্ছে বিষাক্ত গ্যাস, আগুনের

সংস্পর্শে এসে ব্লোপাইপের মত সবেগে বের হচ্ছে নীলাভ শিখা; তীক্ষ্ণ একটা শব্দে!

ছুটছে ওরা; সারা কোলিয়ারির নীচে প্রাণ নিয়ে দৌড়াদৌড়ি পড়ে গেছে। কাঁপছে অতল অন্ধকার। মাখনা চেঁচিয়ে ওঠে,

—একটা বাতি জ্বেলে আয় তারই আলোয়।

হুড়মুড় করে এসে পড়ে জলে; নয়ানজুলির জল জমে গেছে; মাথার উপর কোথায় জলস্তরের বাঁধন ফেটে জল নামছে বেগে; গা মাথা ভিজে যায়, এ আগুন তবু নেভে না; বাতাসের সংস্পর্শে এলে জলের উপরই আলেয়ার মত দপ্ করে জ্বলে ওঠে।

কোথায় একটা চাপা আর্তনাদ—বাঁচাও।

ধ্বসের নীচে চাপা পড়েছে লোকটার সর্বাঙ্গ, মুখ খানিকটা বের হয়ে আছে, চিৎকার আর্তনাদ করে চলেছে প্রাণপণে; ওরা পিছনের দিকে চায় না—ওই পাথর ঠেলে তুলতে হবে না, খানিকক্ষণের মধ্যেই নেমে আসবে শান্ত আঁধার ঘেরা প্রশান্তি ঢাকা মৃত্যু।

—বীরসা মুণ্ডা!

হলেজ স্টেশনের মুখে এসে থমকে দাঁড়াল ওরা; স্যাপ্‌ট আর আস্ত নেই; ধ্বসে পড়েছে ওর ধার বাঁধান কাঠ—সিমেণ্টের স্তূপ নীচে। উপরে ওঠবার—বাঁচবার, প্রাণভরে আলো আর বাতাসের ইশারা আনা একমাত্র পথটা পরিণত হয়েছে জল-সমুদ্রে!

দামোদরের জলস্তরের সঙ্গে উপরের জলস্তরের নিবিড় যোগ কোথাও আছে। দুই পাথরের স্তরের মধ্যে বন্দী জলধারাকে এতদিন সিমেণ্টএর জমাট পুরু আস্তরণ দিয়ে প্লাগ করে রেখেছিল ওরা; বন্দী জলস্তরের বন্ধন হঠাৎ বিস্ফোরণের সেই প্রচণ্ড আঘাতে ফেটে চৌচির হয়ে খসে পড়েছে। স্যাপ্‌ট দিয়ে প্রবল বেগে নামছে দামোদরের জলধারা, অফুরান উন্মাদ জলধারা। ওই জমাট প্রচণ্ড জলস্রোত ঠেলে লিফট আর উঠবে না; নামতেও পারবে না।

বন্দী—রুদ্ধ হয়ে গেছে তারা; পিছনে ওই বেড়া আগুন এগিয়ে আসছে।

—মাখনা! ইধার আও! জলদি!

শরণ সিং ওপাশের লোহার গেটটায় লাথি মারছে দমাদম্। বেপরোয়া

মানুষটা প্রাণের ভয়ে উন্মাদ হয়ে গেছে।' এই একমাত্র মুক্তির পথ। ওরা গিয়ে ধাক্কা দিতে থাকে।

পাম্পরুম ডুবে গেছে; নিভে গেছে কোলিয়ারির অঞ্চলে সমস্ত বাতি; নিবিড় আঁধার ঘেরা রাজ্যে হো হো শব্দে জল নামছে, ওদিকে রন্ধ্র মুখ দিয়ে এগিয়ে আসছে আগুনের শিখা।

বাঁচবার পথ আছে! একটা ক্ষীণ আশার আলোর মত জেগে ওঠে পথটা।

তিন নম্বর পিট থেকে সোজা ঢালু পথ নেমে এসেছে কয়লার স্তর ধরে; বাতাস আসছে ওই দিয়েই; ওই রন্ধ্র পথ দিয়ে পালানো যেতে পারে; হয়তো তিন নম্বরের স্যাপ্ট দিয়ে মুক্তি পথ পাবে। অনেক উঁচুতে জল উঠতেও দেরী হবে!

—গাঁইতি; একটা গাঁইতি! মাখন গর্জন করছে।

প্রাণভয়ে ছুটেছে সব ফেলে দিয়ে, কেবল কোমরের বেল্টে বাঁধা ব্যাটারি আর বাতিটুকু নিয়ে; চাবি বন্ধ দরজায় সমবেত ভাবে লাথি মারতে থাকে কটি রুদ্ধ প্রাণী।

দম বন্ধ হয়ে আসে; বাতাস বেগে ঠেলে- আনছে তাদের; আগুন আর জলের সমবেত তাড়া খেয়ে নিদারুণ ভয়ে যেন পাতালপুরীর অবশিষ্ট বাতাসটুকুও পালাবার পথ খুঁজছে।

ছিটকে পড়ে দরজাটা। হুড়মুড়িয়ে ওরা ভিতরের গ্যালারিতে ঢুকলো।

উপরের দিকে উঠেছে পথটা।

তক্তা, পাথরের কয়লার চাঁই যা হাতের কাছে ছিল তাই দিয়েই ওই রন্ধ্র পথটা বন্ধ করছে তারা।

শরণ সিং ঠেলে আনে জলে ভাসা তক্তা কখানা; লোহার পাত দেওয়া দরজাটা বন্ধ করে বাতাসটুকুর বেরুনোর পথও রুদ্ধ করবার চেষ্টা করে।

—কোই ভাগো মৎ; পহেলি বন্ধ করো ইস্ গ্যালারিকো; সিল করো; নেহি তো ইসমে ভি আগ্ লাগ জায়েগা। জিন্দা আগ্ সে মরেগা সবকোই। এ অন্য কোন শরণ সিং। শাসনের স্বর উবে গেছে ওর কণ্ঠ থেকে। ভয়ে কাঁপছে সেই স্বর।

বাতাসের চেয়ে হালকা মিথিন গ্যাস। উপরের চড়াইএর দিককার পথে উঠে গিয়ে চালের মাথায় মাথায় 'পকেট' হয়ে থাকবে। আগুন কাছেই,

এবং তার ফল কি হবে তা জানে ওরা। নির্মম বিস্ফোরণে ফেটে পড়বে সবকিছু।

কতক্ষণ এভাবে যুদ্ধ করেছে জানে না তারা; ক্লান্তি আর জমাট আতঙ্কে নির্বাক হয়ে গেছে সবাই; লোহার চাদরের দরজাটায় হাত দেওয়া যায় না, তেতে উঠছে ধীরে ধীরে।

—মাখন! শরণ সিং ওর দিকে চাইছে, অসহায় ব্যাকুল কণ্ঠে ফুটে ওর আর্তনাদ; আগুন এসে ধরেছে দরজার বাইরে।

অচেনা পথ; এদিকে সাধারণত কেউ হাঁটে না, যোগাযোগটা আছে মাত্র। বন্দী বাতাস—আঁধারে গর্জন করছে, রন্ধ্রমুখে গ্যাসের ফিন্‌কি। হিস্‌-স্‌-স্‌। মেতে উঠেছে নির্বাক অন্ধকার ধ্বংসের আনন্দে।

তেতে উঠেছে বাতাস; সব গতিপথ তার স্তব্ধ। বুক ভাঙা চড়াই ধরে অন্ধকারে জল ঠেলে এগোতে থাকে তারা; ফিনকি দিয়ে লোহার দরজা ঠেলে জল ঢুকছে।

উঠতে আর পারছে না। কাশছে ন্যাপলা খক্‌ খক্‌ শব্দে।

হাঁপাচ্ছে, তবু শীর্ণ দেহটা নিয়ে টপকে টপকে পাথরে উঠছে; জল ডোবা পাথর; নীচেকার জল ঠেলে রয়েছে; এদিকে এই স্তরের চুইয়ে পড়া জমা জল নিকাশ অভাবে আরও জমতে শুরু করেছে।

—কত দূর। পথের যেন শেষ নেই। আছাড় খেয়ে পড়ে, উঠে আবার ছোটে কটি প্রাণী। জবাব দেবার ক্ষমতা বা সময় নেই।

—আগিয়া! ওহি তো তিন নম্বরকা হলেজ লাইন।

অনেক দূর এসে গেছে তারা।

মাখন থমকে দাঁড়াল। পরিত্যক্ত পুরী। জনমানব নেই। আঁধার ঢাকা থমথমে রাজ্য। মাত্র কটি প্রাণী টলতে টলতে চলেছে। ভিজে গেছে সর্বাঙ্গ। হাঁটু ভেঙ্গে আসছে।

—এর চেয়ে মরাই ভালো ছিল শালার! কেষ্ট মিস্ত্রী হাঁপাচ্ছে।

কণ্ঠস্বরটা যেন দেওয়ালে ঘা খেয়ে ফিরে আসে। উত্তপ্ত ঝলসানো বাতাসে আঁধারে কতক্ষণ চলেছে তারা জানে না, এ পথের যেন শেষ নেই। সময় ও কালের হিসাবও করেনি তারা; তাড়া খেয়ে প্রাণ নিয়ে পাতালপুরীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে লুকিয়ে চলেছে।

মুক্তি!

স্যাপ্টের কাছে এসে পড়েছে তারা; আলো—বাইরে বোধ হয় রাত্রির আঁধারে হিম হাওয়া বইছে; উঁচু নীচু উপত্যকার কোলে দিগন্তসীমায় আলোর মালাপরা জগৎ। আবার ধাওড়ায় ফিরবে—ঘুম! ঘুমে ঢেকে যাবে তাদের ক্লান্তি!

ছুটছে স্যাপ্টের দিকে; হেড লাইটের আভায় মনে হয় একটা লিফ্‌ট নামানো রয়েছে। একটি মুহূর্ত! এক মুহূর্তের দেরীতে সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে।

—আমাকে! আমাকে ফেলে যাসনি তোরা।

ন্যাপলা হাঁটতে পারছে না—হাঁপাচ্ছে কুকুরের মত; বুকের ব্যথাটা গলা ঠেলে উঠে আসছে। শীর্ণ দেহখানা টেনে নিয়ে গিয়ে শূন্য লিফ্‌টটার উপর আছাড়ে পড়ে।

হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায় তারা।

দূরে একটা গর্জন—মুহূর্ত মধ্যে এতটা রন্ধ্র পথ পেরিয়ে তেড়ে আসছে উত্তপ্ত অগ্নিশিখা; সেই সামান্য লোহকপাটের বাধা ভেঙ্গে ফেলে তিন নম্বরের স্তরেও আগুন ধরেছে। জমাট গ্যাসের সন্ধানে ছুটছে অগ্নিশিখা। কেঁপে ওঠে চারিদিক।

পাথরের স্তর; দাঁড়ানো লিফ্‌টটা সশব্দে আছড়ে পড়ে নীচের পাথরে; তাল গোল পাকিয়ে যায় একটা প্রচণ্ড শব্দে!

ধোঁয়া—আর ধুলো! অন্ধকার! রুদ্ধশ্বাসে কটি প্রাণী শেষ আর্তনাদ করে ওঠে।

—মাদনা বোঙা!

মাটি থেকে পনের শো ফিট নীচের ক্ষীণ যোগসূত্রটুকু বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ঝুলছে তেল কালিমাখা ছিঁড়ে পড়া ষ্টিলরোপটা।

হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে বুধন—ফুল ডুংরীতে আর ফিরবো নাই গো।

কয়েকটি অসহায় প্রাণী সারা রাত প্রাণপণ পরিশ্রম করে এসে বাঁচবার শেষ সীমানায় মৃত্যুকে দেখে নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

হু হু বইছে আগুনে হাওয়া; ক্রমশ সেই গতিপথও রুদ্ধ হয়ে যায়।

—স্যাপ্ট শিল করেছে মনে লাগে। মাখন ধরা গলায় বলে ওঠে।

শরণ সিং স্তব্ধ হয়ে গেছে। তার বিশ্বাস, এত দিনের ধারণা বদলে যাচ্ছে। বাঁচতে দিলে না ওরা। এতদিন তাদের হয়েই যুদ্ধ করেছে এদের সঙ্গে—যারা আজ মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়েও তাকে ত্যাগ করেনি।

উপর থেকে ছিটকে পড়ে স্যাপ্ট দিয়ে বালি মাটির টুকরো; চাদর চাপা দিয়ে সিল করছে তারা; শরণ সিং ভাবছে—একই মৃত্যুর দ্বারে এসে বসেছে তারা সকলে।

—আ · আ···উ···উ···!

প্রাণপণে স্যাপ্টের নীচে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে নিজেদের অস্তিত্ব জানাবার চেষ্টা করে মাখন; গলা ফাটানো, প্রাণ কাঁপানো নিষ্ফল চিৎকার। প্রেতাত্মা কাঁদছে অন্ধকার অতলে।

কিন্তু লোহার চাদর ভেদ করে দীর্ঘ স্যাপ্টের জলোপাথরে ঘা খেয়ে সেই শব্দ মানুষের কানে পৌঁছে না। বন্ধ করে দিয়েছে সেই সামান্য পথটুকুও।

—বুঁজাই দিলেক! মেরে ফেলালেক উয়ারা!

কেষ্ট হাঁপাচ্ছে—হুঁ ত কি। মর ইবার বোতলে ইন্দুর মরা হয়ে। শালোদের কোলিয়ারি পুড়ে যাবেক যি, তোরা পোড় কেনে, তোদের হাড় পোড়াই ওরা কয়লা বলে বিচে ফাঁক করে দিবেক।

শরণ সিং চারিদিক দেখছে। বাঁচবার শেষ চেষ্টা তবুও করবে সে। ওদের জবাব দেওয়া হয়নি।

ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েছে তারা লাইনের উপর, তির তিরিয়ে জল উঠছে। আসছে আগুনের শিখা।

একটুক্ষণের মধ্যেই এখানে বুকজল জমে যাবে। দামোদরের জলস্তরে ফাটল জমেছে—জলে ডুবে যাবে কোলিয়ারির সমস্ত স্তর। বাতাস থাকবে না, শুধু জল আর জল। নিশ্চিত বীভৎস সেই মৃত্যু।

কেষ্ট বলে ওঠে—দাঁড়িয়ে মরতে হবেক জানলে ওই খানেই থাকতম। এত হুজ্জুতি করলাম কিসকে?

—জল যি হাঁটু লেয় লেয়। মাখন আর্তনাদ করে ওঠে।

শরণ সিং স্যাপ্টের গায়ে লোহার সিঁড়ির মত একটা বস্তুর খোঁজ পেয়ে চিৎকার করে ওঠে—ইধার আও। জলদি।

পথ একটা যেন পেয়েছে। পথ না হোক একটু আশ্রয়। ওই জলের

হাত থেকে বাঁচবে তবু। পুরোনো ওভারম্যান, এমনি কিছু একটা পরিত্যক্ত সিম আছে সে জানতো।

এ অঞ্চলে কয়লার তিনটে স্তর আছে।

একটা পাঁচশো ফিটের নীচে ; সেটাকে বলে বেগুনিয়া সিম ; তার নীচে প্রায় চৌদ্দশো ফিটের মাথায় দ্বিতীয় স্তর—রামনগর সিম ; সবচেয়ে নীচের স্তরে তারা আছে—সেইটাতেই কায করছিল তারা ওই পিটে।

'লায়েকডি সিম' নামেই সেটা পরিচিত।

উপরের দিককার স্তরে কয়লা কাটাই হয়ে গেছে, সেখানেও খালি গ্যালারি পড়ে আছে। আছে বাতাস—জলের চাপ এত হয়তো নেই। বাঁচবার শেষ প্রচেষ্টা। ওই শূন্য, পরিত্যক্ত স্তরে পৌছাবার জন্য একটি জরুরি পথ আছে ; সিঁড়ির মত ; তাই দিয়ে উঠছে তারা।

ন্যাপলা কাশছে—থু থু করে বের হয় তরল পদার্থ ; নোনতা স্বাদ। রক্ত !!

ঘেমে উঠেছে, কাঁপছে সারা দেহ ; নীচে থই থই করছে জল ; আবছা আঁধারে কয়েকটা প্রেতের মত কঙ্কাল উঠছে উপরে ; বাতির ক্ষীণ আলো আঁধারিতে মনে হয় অন্য কোন জগতের জীব তারা।

চোখ বুজে হাত দিয়ে ভিজে সিঁড়ির রডটা চেপে ধরে সামলাবার চেষ্টা করে ন্যাপাল।

কেষ্ট বলে ওঠে—তু মরবি নাই ন্যাপলা ; ঝাঁঝরা বুকটো তোর লোহায় তৈরি, লিভ্ভয়ে উঠে যা।

জলের একটু উপরের কয়লা স্তরের শূন্য গ্যালারিতে এসে গড়িয়ে পড়ে ওরা। দাঁড়াবার সামর্থ্য নেই, গড়াগড়ি দিচ্ছে পাথরের উপর ; ভিজে নেয়ে উঠেছে, শরীর বইছে না। উত্তেজনা, হতাশা আর ক্লান্তিতে নুইয়ে পড়েছে তারা।

—বাতি নিভিয়ে রাখ, কটো আছে বাতি ?

মাখন গুণে গুণে বাতিগুলো জমা করে, আটটা। মাত্র আটজন এখনও টিকে আছে তিনশো প্রাণীর মধ্যে। কেষ্ট বলে।

—কে জানে আরও কুনশালা কুনস্থঁদে উঠে রাজত্ব করছে।

গলা ছাড়িয়ে চিৎকার করে—কুন শালা আছিস নাকি রে ?

শব্দটা গ্যালারির বোজা জলে ধাক্কা খেয়ে গম্ভীর কণ্ঠের ধমকের মত ফিরে আসে। ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে ওরা—বন্দী কটি প্রাণী। কোন দৈত্যরাজ

তাদের বন্দী করে রেখেছে, যে কোন মুহূর্তেই ওদের এক লহমায় বিরাট মুখে পুরে প্রাতঃরাশ শেষ করবে।

সারি সারি কাৎ হয়ে আছে শরণ সিং, মাখন, হ্যাপলা, মদনা, বুধন, নামো ধাওড়ার দুজন। কেষ্ট গ্যালারির মুখে জলের নিশানা দেখছে, আরও উঠে এলে তাদেরও এই ঠাঁই ছেড়ে উপরের দিকে পালাতে হবে।

রামনগর স্তর থেকে প্রায় আড়াই শো ফিট উপরে উঠেছে তারা, তবু জল পিছু ছাড়ে নি।

— শালা দামোদর কি ঠেলে ঢুকেছে গো কোলিয়ারিতে! ই যি নোতুন প্যানচোত বাঁধ হয়ে গেল। প্যানচোতের ভাই ব্যান—

—থামবি কেষ্ট! হাঁপাচ্ছে মাখনা—কেবল মুখ খিস্তী।

— হ্যাঁ, লয় কি করবো ইখানে? রামের বাপ কৌশল্যাও ইখানে আসতে লারবেক। ই কি ঠাকুর-দেবতার থান? ই শালা দৈত্যিদানার রাজ্যি। যে পূজোর যে মন্তোর।

বাঁশীটা বাজছে। ধ্বনি প্রতিধ্বনি তোলে মেঘঢাকা দূর আকাশে। কত আশা নিরাশার কান্নাভরা ওই সুর; কত জনের কত মনের শেষ আশার দীর্ঘশ্বাস জড়িয়ে অতল থেকে উঠে বিরাট অসীমে ছড়িয়ে গেল। দু একটা আলো জলে উঠেছে এমার্জেন্সি জেনারেটার থেকে।

সারা ধাওড়ায় সাড়া জেগেছে। কান্না আর আর্তনাদের সাড়া অতল অন্ধকারের বুক চিরে। ওরা সবাই ছুটছে পিটের দিকে।

ভাতের হাঁড়ি নামানো রইল উনুনের পাশে, ছেঁড়া কাঁথা তালাইএর শয্যা ছেড়ে বৌ-ঝিরা উঠেছে—কচি কাঁচাগুলোকে বগলে নিয়ে কতকগুলোকে টেনে হিঁচড়ে ছুটছে কাঁদতে কাঁদতে। কিল্লিবিল্লির দল দৌড়েছে আগে, ঝড়ের আগে বাঁশপাতা কুটো ওঠার মত।

সারা পিটটা পরিণত হয়েছে চুম্বকে, লোহার খুদে পেরেকের মত টেনে নিচ্ছে সব প্রাণকেই। তখনও যেন গুরু গুরু কাঁপছে তার বুক।

কোলিয়ারির মাঠ ছেয়ে গেছে; গেটটা বন্ধ; পাহারা বসেছে। বাইরে জমা হচ্ছে মালকাটা—মেয়ে, মরদ, ছা-বাচ্ছা, বুড়ী সকলেই। ওদের কান্না আর চিৎকারে কান পাতা দায়।

আঁধার ভেঙে ওঠে ওদের চিৎকারে।

এষা অবাক হয়ে যায়; প্রথমেই সব আলো নিভে গেছে। আকাশ বাতাসে জেগে উঠেছে একটানা বীভৎস সাইরেনের সুর। নমিতা শিউরে ওঠে,

—এ কোথায় এলাম এষা? মাটির নীচে সব জায়গাই নাকি ফাঁপা। এখানেই কিছু হবে নাকি?

—হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। আঁধারেই জবাব দেয় এষা।

নিমেষ ফোনটা তুলে কনেকশন পাবার চেষ্টা করছে।

—আলো! বেয়ারা! নমিতার ভীত আর্ত কণ্ঠস্বর জেগে ওঠে। প্রাণের ভয় তারই বেশি; অনেক পেয়েছে সে। এই অযাচিত অফুরান পাওয়ার আনন্দ সে হারাতে চায় না অকালে। তাই দেবেশকে দেখেই সরে গিয়েছিল; চিনতে চায় নি। এড়িয়ে যেতে চায় নমিতা তার আগেকার সেই সামান্য পরিচয়; আজ রাণীর আসনে বসে অতীতের অপরিচিত মেয়েটিকে টেনে আনতে চায় না সামনে।

—আলো!

ইতিমধ্যে বেয়ারা কয়েকটা পাঞ্চ লাইটের ব্যবস্থা করে। আবছা আলোয় ভরে ওঠে ঘরখানা। দেবেশ নেই। বেয়ারাই জবাব দেয় এষার কথার।

—বসন্ত পিটের দিকেই গেছে!

নিমেষ তৈরি হয়ে নেয়; চোখ মুখে তার উত্তেজনার আভাষ। প্রথম দিন এসেই এমনি বিপদের মধ্যে পড়বে কল্পনা করতে পারেনি। দেবেশের সঙ্গে দেখা হবার সঙ্গে সঙ্গেই এই বিস্ফোরণ।

ম্নেজার সঠিক কিছু বলতে পারে না। নিমেষের মনে হয় দেবেশের কথায় সত্যি কিছু ছিল। নইলে অযথা এতবড় এক্সপ্লোশন ঘটতে পারে না।

—গাড়ি রেডি।

নমিতা বাধা দেয়—যেও না। এ সময় যেও না তুমি!

এষা চুপ করে থাকে। দেবেশকে চেনে না ওই নমিতা; সে ছুটেছে সেই বিপদের মুখে; নমিতা বাধা দেয় তার নিমেষকে। অর্থ আর প্রাচুর্য ভরা ভবিষ্যৎ, নিশ্চিত নির্ভরতাকে জড়িয়ে ধরে থাকতে চায় নমিতা—স্বার্থপর কোন নারী। সরে গেল চুপ করে এষা।

—কোন ভয় নেই ডারলিং। এখুনি ফিরে আসবো।

ওর ঠোঁটে হালকা স্পর্শ বুলিয়ে নিমেষ গাড়িতে উঠল।

বাতাস ছেয়ে গেছে ওদের কান্নায়। সব হারানোর কান্না আর বেদনার আর্তনাদে।

অগ্নিশিখা পিটের মুখ থেকে আকাশে লাফিয়ে উঠছে; যেন একটা দৈত্য জলন্ত লকলকে জিবটা বের করে আকাশের অসীম থেকে আহার্যটুকু টেনে সাপ্‌টে মুখে পোরবার জন্য হাঁ হাঁ করছে।

অপিস, পিটে যাবার গেটটায় ইতিমধ্যে এসে জুটেছে অনেকেই। পথে, টিলার গা দিয়ে উঠে আসছে আবছা অন্ধকারে ধাওড়ার লোক জন।

—খবরদার! হাঁক পাড়ে পাহারাদার।

কে কার কথা শোনে। ওরা এসে থমকে দাঁড়িয়েছে বাধা পাওয়া রুদ্ধ জলস্রোতের মত অপিসের মেন গেটে, ক্রমশ ভিড় বেশি জমছে।

বরাকরের চড়ির মাথা থেকেই ফস্টার দেখতে পায় দৃশ্যটা। দামোদরের ধারে আঁধার কালো বনসীমার মাথায় তিন নম্বরের চিমনি দেখা যায়; নীলাভ শিখাটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। প্রথমে ভেবেছিল বার্নপুরের ব্লাস্ট ফার্নেসের লাল আভা, মেঘে তারই বর্ণালী! টুকরো ছেঁড়া মেঘগুলোতে লাল আবিরের রং ধরেছে। লাল ধোঁয়ার ছাপ মাখা আকাশ।

প্রচণ্ড শব্দে সচকিত হয়ে ওঠে ফস্টার। এক্সপ্লোশন!

রাস্তার পাশে ওদেরই কোলকনসার্নের একটা ছোট কোলিয়ারি। তাদের ওখানে গিয়েই সংবাদটা পায়। তার অনুমান সত্য।

চতুর ধুরন্ধর ফস্টার পরবর্তী অধ্যায়ের কথা ভাবছে। সামাল দিতে হবে সবদিক। কয়েকবার ফোন করবার চেষ্টা করেও যোগাযোগ করতে পারে না। কাম তবু বন্ধ থাকে না তার।

গাড়ির পিছনের সিটে কেরিয়ারে মালপত্রগুলো তুলতে থাকে। যে কোন এ্যাকসিডেন্ট হোক না কোন কোলিয়ারির মানুষের হিসাবের ব্যাপারে খাতি-গুলোই একমাত্র প্রথম পথ। হুঁশিয়ার ফস্টার মালপত্র নিয়ে টপ স্পিডে এগিয়ে যায় রাস্তাটা ধরে।

জনারণ্য শুরু হয়েছে। ক্রন্দনরত বেবশ জনতা দৌড়চ্ছে মরি কি পড়ি এই ভাবে। হর্ন দিতে দিতে গালাগাল পাড়ে ফস্টার।

—শালা শূয়ারকা বাচ্চা। হটো এ্যাই!

পিট মাউথে ব্লেজার স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আপাতত করণীয় কিছুই নেই। হতভম্ব হয়ে গেছে সে। নতুন আমদানী করা ইঞ্জিনিয়ার রবার্টস্ পিয়ার্সনও রয়েছে। ঝলকে ঝলকে উঠছে নীল শিখা; একটানা শোঁ শোঁ গর্জনে কাঁপছে খাদের মুখের কংক্রিট প্লাটফর্ম; মিত্র সাহেব সব সম্বন্ধ চুকিয়ে দিয়েই চলে যাচ্ছে। হঠাৎ এই এ্যাকসিডেণ্ট হতে সেও এসে পড়ে। হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির হয় বসন্ত।

কাছে যাবার উপায় নেই। বাইশশো ফিট অতল থেকে পাতালপুরীর অগ্নিশিখা ঠেলে উঠে আসছে। বিষাক্ত জমাট সাদা ধোঁয়া—নাকে মুখে ঢুকে কাশতে থাকে সকলেই। কানফাটানো ক্রুদ্ধ গর্জন! থর থর কাঁপছে হেড গিয়ার—ঝুলন্ত লিফটটা।

ফস্টার বাত্তিঘরের সামনে গাড়ি থেকে নেমেই ভিতরে চলে যায়। র‍্যাকে থরে থরে সাজানো কেবল্ ল্যাম্পগুলো; থার্ড সিপ্টের র‍্যাকটা একেবারে খালি! চমকে ওঠে ফস্টার! পুরো তিনশো প্রায় গেছে নীচে।

—জলদি করো ম্যান।

বাত্তিবাবুও নিজেই হাত লাগিয়েছে। ফস্টার দরজা বন্ধ করে নিজেই প্যাকখুলে সন্থ আনা কেবল্ ল্যাম্পগুলো র‍্যাকে সাজিয়ে রাখে; খালি রইল মাঝে মাঝে।

হুকুম করে—হিসাব, আউর নম্বর ঠিক রাখিয়ে। এ্যাটেনডেন্স রেজিস্টার? ম্যানেজ ইট ম্যান কুইক।

বাত্তি গুনতি শুরু করে; পঁচাশিজন নীচে গেছে বাত্তি নিয়ে।

সব মেরামত করা যাবে না। ফস্টার সামাল দিয়ে ছুটতে থাকে খাদের দিকে।

অপিসের সামনের মাঠে শূন্য পড়ে আছে ডিরেক্টারকে অভ্যর্থনা জানাবার অসমাপ্ত প্যাণ্ডেল। সব মাথায় উঠে গেছে, থমকে দাঁড়াল ফস্টার। লালাজীও তদারক করছিল কায কর্মের; বলে ওঠে ফস্টার,

—চেয়ারগুলো সাজিয়ে রাখো পাঁচু; সাম ফ্লাওয়ার—গার্লেণ্ড!

ইধার উধার ফেঁক্‌কো রাখো। জাস্ট গিভ সাম্ কলার—মেক আপ অব এ মিটিং। ক্লিয়ার! সমঝা?

লালাজীর বুদ্ধি সাফ; ঠিক বুঝে নেয়।

ফস্টার সিঁড়ি টপ্‌কে পিট প্লাটফরমে উঠে চলেছে।

মিত্র সাহেব বলে ওঠে—কিছু করবার উপায় নেই ব্লেজার। তিন নম্বর পিট থেকে কেউ উঠতে পারবে না। নো লিভিং ক্রিচার ইজ হিয়ার। কোলিয়ারির ভিতর আগুন ধরে গেছে।

—তাহলে? রেসকিউ?

—তার আর কোন পথ এখানে নেই। একমাত্র চেনা জানা লোক যদি কেউ থাকে তিন নম্বরের বন্ধ পথে হয়তো যেতে পারে উঠে; ওই স্যাফ্‌টটা চালু রাখবার চেষ্টা করো। সেই পথেই কেউ যদি যায় তবেই কিছু করা যাবে। নয়তো—

বসন্ত জানে নতুবা কি হয়েছে! ব্লেজার পিট হেড থেকে নীচের সঙ্গে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করে; ফোনের হাতল ঘুরিয়েই চলেছে। কোন রিং হচ্ছে না। দীর্ঘ পথের মধ্যেখানে কোথাও জলে ডুবে গেছে না হয় পুড়ে ছাই হয়ে গেছে ক্ষীণ তারটা।

—ডেড লাইন। হতাশ ভাবে ফোনটা নামিয়ে দেয়।

তিন নম্বর পিট থেকেও লোকজন তুলে ফেলা হয়েছে। সেখানকার মালকাটারা ছুটে এসেছে হন্ত দন্ত হয়ে। লিফট্‌টা চালু রাখবার ব্যবস্থা রয়েছে মাত্র।

উতপ্ত হাওয়া বের হয়ে আসছে। জমাট ধোঁয়ার মাঝে মাঝে লিকলিকে জিব মেলে নীলাভ শিখাটা উঠছে; যেন এক সাপটে পাতালের মধ্যে টেনে নিয়ে ফেলবে সারা আঁধার ঢাকা আকাশটুকুকে। রুদ্ধ বন্দী কোন দৈত্য লাফ দিয়ে উঠেছে মুক্তির আনন্দে।

বাইরের হাওয়া তীর বেগে ঢুকছে ভিতরে ভীষণ শব্দে!

ভিতরের আগুন ওই হাওয়ার সংস্পর্শে মেতে উঠেছে। ব্লেজার বলে ওঠে,

—ইউ স্যাল সিল দিস পিট!

মিত্র সাহেব কোন কথা বলে না, এ ছাড়া পথ নেই। আগুন নিভবে না, যতক্ষণ ভিতরে হাওয়া যাবে জলতে থাকবে ওই আগুন। এক স্তর থেকে অন্ত

স্তরে ছড়িয়ে পড়বে। যদি কেউ কোথাও বেঁচে থাকে তারাও মরবে ; ধ্বংস হয়ে যাবে কোলিয়ারি। কোটি টাকার সম্পত্তি।

দামোদর থেকে স্যাকসন পাম্প—টারবাইন বসেছে। বড় বড় পাইপে জল এনে ঢালা হচ্ছে কোলিয়ারির ভিতরে। ডুবিয়ে দিতে হবে—ভর্তি করে দিতে হবে সব গ্যালারি জলে ; আগুনও নিভবে, সেই সঙ্গে নিশ্চিন্ত হবে আগুন লাগার সব কারণ, প্রমাণ।

এনকোয়ারি কমিশনের করবার কিছুই থাকবে না।

ঝিমি ঝিমি নেমেছে বৃষ্টি। লালাভ আলোয় ওদের মুখগুলো বীভৎস হয়ে ওঠে। নিমেষ একপাশে দাঁড়িয়ে দেখছে। লোহার চাদর ফেলে তারপর বালির বস্তা চাপাচ্ছে ওরা। পিটের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হল।

গর্জন করে বাইরে রুদ্ধ জন সমুদ্র—তিনশো গিয়া, তিনশো দো বানাও। পয়লা ফস্টার, দোসরা শালা ব্লেজারকো পিটমে ফেক দেও।

গেটে দমাদম আঘাত হানে তারা। ক্ষিপ্ত উন্মাদ জনতা রাতের আঁধারে মারমুখী হয়ে উঠেছে। গুরু গুরু গর্জন ওঠে মাটির নীচে মৃত্যুপুরী থেকে ; উন্মত্ত জনতার বুকের আগুন গন গন করে ওঠে গেটের বাইরে।

ফস্টার পকেট থেকে বোতল বের করে গলায় ঢালে।

ফাঁক দিয়ে উঠছে সোঁ সোঁ ধোঁয়া, কালো জমাট ধোঁয়া ; সাদা ধোঁয়া। ক্রমশ গাঢ়তর হচ্ছে তার রং। অতলে আগুনের ঝাঁঝ কমছে।

মিত্র সাহেব মিথিনোমিটার—পোলারাইজারের কাঁটার দিকে চেয়ে আছে। লাল নীল কাঁটাগুলো সব যেন ক্ষেপে উঠেছে ; বেপরোয়া গতিতে এদিক ওদিকে নড়া চড়া করে।

ব্লেজার উতলা হয়ে চেয়ে আছে মিত্র সাহেবের দিকে।

—এখনও আগুন জ্বলছে। তিন নম্বর পিটে বোধ হয় ঢুকছে আগুন। ওই দিকেই বেরবার পথ খুঁজছে রুদ্ধ বন্দী অগ্নিস্রোত।

ব্লেজার যেন ফাঁসির হুকুম দিচ্ছে—ক্লোজ দ্যাট পিট। উস্‌কো ভি বন্ধ করো। সমস্ত বাতাস যাবার পথ নিঃশেষে রুদ্ধ করে দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে তারা।

এমনি সর্বনাশ হবে তা জানত মিঃ মিত্র। বসন্ত স্তব্ধ হয়ে বসে আছে! ঘামে, কয়লায় আর বালিতে ভরে গেছে তার মাথা গা।

অসহায় স্তব্ধ একটি মানুষ। ধ্বংসপুরীর সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছে!

ক্লান্ত জনতা ক্রমশ ঝিমিয়ে আসে। শ্মশানের ধারে বসে যেন চিতাভস্ম পাহারা দিচ্ছে ওরা। মাঠটা ছেয়ে গেছে জনতায়। ক্ষীণ কান্না উঠছে করুণ সুরে।

গৌরী স্তব্ধ হয়ে বসে আছে একটা চিরোল গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে, কান্না জমাট বেঁধে উঠছে সারা মনে। সন্ধ্যার সময়েই মানুষটা এল। আজ যেন সম্পূর্ণ বদলে গেছে কেষ্ট।

হাসিমাখা চাহনি। তৃপ্তির আভা সারা মনে। ক্ষণিকের আশা বুদ্বুদের মত মিলিয়ে গেছে নিঃশেষে। নীল আভা উঠছে কেঁপে কেঁপে; ওই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল কত আশা—কত ভবিষ্যতের নীল স্বপ্নসাধ।

এক ফালি আলো দূরে ক্ষীণ নিষ্প্রভ জ্যোতি মেলেছে।

প্রথম রাত্রি মৃত দেহ আগলে বসে আছে রাত্রির শেষ যামের প্রতীক্ষায়।

একটা সুর উঠছে। জমাট অন্ধকার; মেঘঢাকা আকাশ; নীচে থেকে উঠে আসে দামোদরের মত্ত গর্জনধ্বনি, সোঁ সোঁ বইছে বাতাস। মৃত্যুর জগতে প্রাণের ক্ষীণ স্পন্দনের মত সুরটা জেগে ওঠে।

—না পোড়াইও রাধা অঙ্গ
না ভাসাইও জলে।
মরিলে তুলিয়া রেখো
তমালের ডালে॥

সৌরভী গান গাইছে। মিষ্টি সুরেলা কণ্ঠস্বর। দুঃখের চিতাভস্ম থেকে একটি ক্ষীণ দীপ্তির মত সুরটা উঠছে।

—মর, গান বের হয় তুর? কে যেন বলে ওঠে।

হাসে সৌরভী—কাঁদবো আর কত বল; কান্না ফুরিয়ে যায়; এ ফুরোয় না।

বুড়ী চুপ করে চেয়ে থাকে।

—জল! একটু জল কুথা পাই বাছা!

দামোদরের জল অনেক নীচে, সেখানে যাবার আগেই সব তেষ্টা মুছে যাবে তার। এ ওর মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। কেঁদে কেঁদে বুক শুকিয়ে গেছে বুড়ীর।

—ন্যাপলা ওঠে নি গো? নেরো শরীর। কাশের রোগী, তাকেও যম লেবার জন্য যেতে উঠেছে মা?

সৌরভী উঠে পড়ে জলের সন্ধানে—বসো তুমি, দেখি জল কোথায় পাই। মড়ারা হুড়মুড়িয়ে জল ঢালছে খাদে, ইদিকে হাজার লোক তেষ্টায় গেল সেদিকে নজর নাই।

গেটে সেন্ট্রি দাঁড়িয়ে আছে। সৌরভীর অবাধ গতি। এসে পড় পড় করে তার ওয়াটার বটলটা ধরে টানতে থাকে। চমকে ওঠে লোকটা—এর আগে দু একজন জলের সন্ধানে এসেছিল। হাঁকিয়ে দিয়েছে তাদের। সৌরভী বলে ওঠে—মলো! তিনশো জুতো গুনে খায় ফুলের ঘায়ে মুচ্ছো যায়। ডরিয়ে কাঁটা হয়ে গেলে যি হে। উটো দাও, এনে দিচ্ছি এখুনি।

সিপাহী পুঙ্গব কি ভেবে হাতছাড়া করে ওটা—ফিরিয়ে দিয়ে যাবে কিন্তু। আভি।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ।

ন্যাপলার মা কাঁদছে, ঘেঙিয়ে ঘেঙিয়ে কাঁদছে নাকি সুরে। ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে স্বর। মাঝে মাঝে দু একজন নতুন কেউ এসে জুটছে। তার সতেজ প্রথম কান্নার সংক্রমণে এদের ক্ষীয়মান হতাশার স্বরও কান্নায় ফুটে ওঠে। ক্রমশ কমে আসছে।

—নাও গো।

বুড়ীর দিকে তুলে দেয় জলের পাত্রটা

—আমাকেও একটু দেবে বাছা? আবছা অন্ধকারে এগিয়ে আসছে মূর্তিটা।

সৌরভী অবাক হয় ফড়িং সরকারের মোটা গিন্নীকে দেখে; এক রাতের মধ্যেই কেমন শুকিয়ে গেছে। পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে আহ্লাদী। একই বাজের আঘাতে সকলের ঘর পুড়েছে।

রাত কত জানে না সৌরভী; একটা তারার দেখা নেই। অন্ধকার ঝিম ঝিম বৃষ্টিনামা রাত, তিরোলগাছের ঘন পাতার নীচে ওদের টেনে নিয়ে গিয়ে বসায় সৌরভী।

অনেকক্ষণ থেকে একটা ছেলে কাঁদছে। কার বাচ্চা ছেলে। কঁকিয়ে কঁকিয়ে গলা কাঠ হয়ে গেছে।

সৌরভী এগিয়ে যায়, মালকাটার বৌ, কুমীরের মা!

শ্রান্তি ক্লান্তিতে এত দুঃখের মাঝে এলিয়ে পড়েছে। তন্দ্রামগ্ন পুরীতে একা সে-ই যেন অতন্দ্র একটি জাগর আত্মা। মেয়েটাকে ঠেলে তোলে।

—আচ্ছা যাহোক লো! ছেলেটা গেল যি। মাই দে! এত দুখেও ঘুম আসে তুর? বলিহারি যাই!

মেয়েটা বাচ্ছাকে বুকের কাছে টেনে

চুপ করে ছেলেটা।

রাত্রির শেষ প্রহর। ক্লান্ত বিপর্যস্ত জনতা ঘুমের আবেশে দুঃখকে ভুলেছে। একটা ক্ষীণ অনুভূতির মত অসীম শূন্যতা তাদের মনের সব রূপ রসকে আচ্ছন্ন করে তুলেছে।

—এ্যাই!

জড়াজড়ি করে বসে আছে ছায়ামূর্তির দল ঠাঁই ঠাঁই, মাঠে, দেওয়ালের ধারে, চাতালে। মানুষগুলো প্রতীক্ষা করছে কবে হবে রাত্রি ভোর, কখন রেসকিউ শুরু হবে! মৃত অর্ধমৃত গলিত আহত পঙ্গু কতকগুলো উঠে আসবে। কেউ ফিরবে হাসিমুখে আপন জনকে সঙ্গে নিয়ে, কেউ ফিরে যাবে তাকে ওই অতলে সমাধিস্থ করে। হাসি কান্না—আলো আঁধারির ছায়া ঘেরা জগৎ।

—এ্যাই!

একটা ঝুপড়ি গাছের নীচে জমাট অন্ধকারে কাকে ডাকতে দেখে থমকে দাঁড়াল সৌরভী।

ও ডাকের অর্থ বোঝে! লাস্যময়ী স্বৈরিণী আজ ক্ষেপে উঠেছে।

মুখ বুজে এগিয়ে যায়। পাঁচু নিকিরি একটা বোতল নিয়ে বসেছে; মাটির ভাঁড়ে ঢেলে চলেছে পানীয়।

একটু বিস্মিত হয় সৌরভী। পাঁচু নিকিরি আজ মানুষ হয়ে উঠেছে। খাদে নামতে হয় না, ওই মৃত্যুপুরী থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে দালালি করে বেড়ায়। কিসের বিনিময়ে তাও জানে সৌরভী।

—বস না মাইরী। এইখানে!

একটা বিশ্রী ইঙ্গিত করে পাঁচু। নর্দমার এঁঠো পাতা স্বর্গে উঠেছে।

থমকে দাঁড়াল সৌরভী। বলে ওঠে,

—নিজের কাঁথা পরকে দিয়ে দৈবক মরে ঘুঁটে কুড়িয়ে। যা না পিশেচ

সেইখানে। দেখগা তোর মোটা কাঁথা পেতে লালাজী বাদলার রাতে নাক ডাকাচ্ছে। আর তুই? কুকুরের মত শুঁকে বেড়াচ্ছিস এঁঠাই ওঠাই।

পাঁচু নিকিরি লালাজী হবার স্বপ্ন দেখে। অমনি দোকান দেবে সে। না হয় ইউনিয়নের পাণ্ডা হবে, পতিতুণ্ডির মত গাড়ি হাঁকাবে। তাজা পানীয়ের ঝাঁঝ তখনও মাথায়। গর্জন করে ওঠে সৌরভীর কথায়।

—এ্যাও। চোপরও!

আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল। হঠাৎ এক লাদা থু থু এসে পড়ে নাকে চোখে।

সৌরভী হরিণের মত ক্ষিপ্রগতিতে সরে যায় লোকের ভিড়ে। গজগজ করতে থাকে পাঁচু।

হাসছে সৌরভী।

জীবনের বিচিত্র প্রকাশ। নিজেই কত দেখছে!

পূবদিকে পাহাড়ের গায়ে একফালি আলোর আভাস ফুটে ওঠে!

ডাকছে ঘুমভাঙ্গা পাখপাখালি, মাঠ ভর্তি স্তব্ধ জনতার তন্দ্রা ছোটে। ক্রুদ্ধ দামোদরের গর্জনধ্বনি চাপা পড়ে মানুষের কলরবে।

বসন্তকে দেখে এগিয়ে যায় সৌরভী; কপালের ব্যাণ্ডেজটা দেখে চমকে ওঠে।

বসন্তের ওদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। ক্রন্দন মুখর জনতার দিকে চেয়ে আছে। মাথা নাড়ে বসন্ত।

খুশিতে উপছে পড়ে সৌরভী, ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসে। বসন্ত বেঁচে আছে! কাল রাত্রের আক্রমণের চিহ্ন ওর মাথায়। তবু বসন্তকে শেষ করতে পারেনি। সেই দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা—ডাগর চাহনি ভরা চোখ!

ভিড় ঠেলে এগিয়ে যায় ওর দিকে।

তার রাত্রি জাগরণ সার্থক হয়েছে!

নিজের উপর নিজেরই ধারণা বদলে যায়; শরণ সিং নয়—অন্য কারোর জন্যই তার মনে নেমেছিল এই জমাট অন্ধকার। জনতা জেগে ওঠে।—কতজন গেছে?

—কখন খাদে নামবা হে?

বসন্ত উচ্চস্বরে কি বলবার চেষ্টা করছে। ওর গলা তবু শেষ অবধি পৌঁছে না।

ঘুমন্ত জনতা জেগে ওঠে অধীর প্রতীক্ষায়। রেসকিউ দল এসে পড়লেই এবার খাদের নীচে নামবে তারা। কেউ হাসিমুখে ফিরবে, কারও রাত্রি জাগা, পথ চাওয়া হবে ব্যর্থ।

ন্যাপলার মা কাঁদচে। ঘুমভেঙে সকালের আলোয় আবার সেই অসাড় দুঃখানুভূতি জেগে ওঠে।

মণ্টার চায়ের দোকান থেকে বড় কেটলিতে করে চা বিক্রি করতে এসেছে। সারা রাত্ত হিম আর বৃষ্টির মধ্যে কাটিয়ে অর্ধমৃত হয়ে উঠেছে লোকগুলো।

গৌরী স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। কাঁদতে জানে না যেন।

ন্যাপলার মা খ্যান খ্যান করছে ; সৌরভী ভাঁড়ে করে চা-টা হাতে নিয়ে মুখ খিঁচিয়ে ওঠে।

—মরণ, চোপ্প রাত বসে রইলাম শেষ মেষ তোর এই পচা চা খেতে? পান আছে রে—কেওড়া গোলাপ দোক্তা!

গৌরী চুপ করে বসে আছে। রাস্তায় দেখেছে সৌরভীকে ঘুরে বেড়াতে সাজ বেশ করে। আজও সারারাত্রি শ্মশান জাগিয়েছে তাদের সঙ্গেই। চারিদিকে ওর সন্ধানী দৃষ্টি। রাতের অন্ধকারে বহু ভূত প্রেত ঘুরে বেড়ায় শ্মশানে। এখানেও তা দেখেছে গৌরী।

সৌরভীর কড়া নজরে আর তীক্ষ্ণ জিবের সামনে দাঁড়াতে পারেনি তারা। গৌরীর দিকে নজর পড়তেই এগিয়ে আসে।

—চা একটুন খা বৌ। এখন থেকে কান্‌ছিস কেনে? মালকাটা মিস্ত্রীর পরান কয়লার চেয়েও দড়। ঠিক কুনঠিঁয়ে আটকে আছে। উঠে আসবেক। লে চা খা।

পরক্ষণেই ধমক দিয়ে ওঠে চা ওয়ালাকে—কচুমুয়ো ছোঁড়া কুথাকার ; চা দিছে দেখ কেনে? এট্টুকু, তাও তো ঘোড়ার ইয়ে। ঠিক করে ভাঁড় ভর্তি কর।

সৌরভীকে সবাই ভয় করে। কচিকাঁচা ছেলেগুলো কাঁদছে। বাইরে থেকে আসছে লোকজন। চিনতোড়ের মধ্য রাস্তা—বসতি ভর্তি হয়ে গেছে ওদের ভিড়ে। সাগ্রহে চেয়ে রয়েছে জনতা।

লাল গাড়ি দুখানা ঘণ্টা বাজিয়ে এসে পৌছল। পথ ছেড়ে দেয় সকলে, রেসকিউ পার্টির গাড়ি আসছে। ব্যস্ত সমস্ত জনতা ঠেলে ঢুকতে যাবে, পিট

ফটকে পাহারাওয়ালারা বাধা দেয়। জলের তোড়ের মত কলরোল ওঠে। কেউ কেউ গাছে উঠে পড়েছে।

পিটে নামবে এইবার। সারা রাত্রির প্রতীক্ষা সার্থক হতে চলেছে। ঘরে ফিরে আসুক মালকাটা। মালকাটা বউ বুকচিরে মাদনা বোঙার থানে রক্ত দেবে। আকাশ পিদিম দেবে শালবনের সাঁইতলায়।

ব্রেজার, মিঃ মিত্র সকলেই নিবিষ্ট মনে পিটের উপর সারবন্দী কয়েকটা যন্ত্রের দিকে চেয়ে রয়েছে। রেসকিউ পার্টি তৈরি হলেই ওরা পিটের ঢাকনা ওই পুরু লোহার চাদর সরিয়ে নিয়ে লিফ্‌টে নামবে।

মিঃ মিত্র হতাশ হয়ে চেয়ে রয়েছে পোলারাইজারের দিকে! গ্যাসের চিহ্ন তখনও আছে বেশই, তবে টেম্পারেচার কমেছে। সবকিছুই স্তব্ধ হয়ে আছে, যেন আগামী ঝড়ের পূর্বাভাস!

ভোর হয়ে আসছে। লাল আবিরের আভা পড়ে দামোদরের গেরুয়া জলে; ফুলে ফেঁপে উঠেছে নদী; সেও যেন এই সর্বনাশা মাতনে জেগে উঠেছে।

অধীর প্রতীক্ষা করছে তারা পিটের মুখে। মৃত্যু পুরীতে নামবার প্রস্তুতি চলেছে। বসন্ত এগিয়ে যায়—আমিও যাবো নীচে।

ফস্টার চমকে ওঠে—ইউ! হোয়াট ননসেন্স?

বসন্ত জবাব দেয়—তোমার প্রাণের দাম আছে সাহেব; আমার নেই। আমি বিপদ জেনেই নামতে যাচ্ছি।

নিমেষ কি ভাবছে। এতদিনের পর একটা হারানো প্রশ্ন আবার জেগে উঠেছে। মিঃ চ্যাটার্জি মাঝে মাঝে ওকে বলে—তার খোঁজ খবর করো; বড় অবিচার একটা করেছি জীবনে। তার প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই।

কিন্তু কোন সন্ধানই কেউ পায় নি তার।

আজ সেই সমস্যা জেগে উঠেছে বড় হয়ে। যাকে অবজ্ঞাত পরিত্যক্ত হারানো বলে জানতো, সেই প্রতিদ্বন্দ্বী কোন অলক্ষ্যে থেকে বলদৃপ্ত হয়ে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। নিমেষ চুপ করে থাকে; খালি লিফ্‌টটা উঠে আসছে; এলেই ওরা নামবার জন্য তৈরি হবে।

গ্যাস মাস্কটার স্ট্র্যাপ দুটো কোমরে বাঁধছে বসন্ত।

নিমেষ সরে দাঁড়িয়ে আছে দূরে। হঠাৎ মাটি কেঁপে ওঠে; একটা চিৎকার!

—হুঁশিয়ার! হাজারো মত্ততাণ্ডব গর্জে ওঠে। ঝন ঝন করে কেঁপে ওঠে শক্ত ইস্পাতের ফ্রেমটা; পিটহেড গিয়ার অবধি ঝনঝনিয়ে ওঠে প্রচণ্ড শব্দে। শিল করা পিটের মাথার ফ্রেম ওয়ার্কটা তালতোবড়ানো করে ছিটকে তুলেছে শূন্যে; লোহার চাদর, বালির বস্তার চিহ্নমাত্র নেই; ধূ ধূ বের হয়ে ওঠে অগ্নি শিখা!

কে যেন প্রতীক্ষা করছিল মুখ বুজে ওদের শেষ চেষ্টা ব্যর্থ করে দিতে। নিষ্ঠুর হাসির শব্দ ওই অগ্নিশিখার প্রচণ্ড ঝলকে! সারা কোলিয়ারির বুকে আগুন লেগেছে। মত্ততা ওর কমেনি।

হু হু আসছে গরম হাওয়া; চাপা পড়া দৈত্যটা আবার তার সর্বশক্তি একত্রিত করে ঠেলে তুলেছে সব বাধা; গ্রাস করতে চায়—পুড়িয়ে ছাই করে দিতে চায় সে সমস্ত স্তরটাকে। এগিয়ে আসছে মাটির নীচের আগুন উপরের দিকে।

বিন্দুমাত্র হাওয়া যেন কোনদিক থেকে না ঢোকে, এই স্যাপ্টকেও বন্ধ করতে থাকে! ওই ধ্বংসপুরীতে কোন মানুষ আর বেঁচে নেই।

ধ্বসে পড়া হেড গিয়ারের বিকৃত ফ্রেমটার ঢগে প্রচণ্ড বেগে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে বাইশ শো ফিট নীচে থেকে চূর্ণ লিফ্‌টটা; কাৎ হয়ে ছেতরা পড়া লিফ্‌ট থেকে গড়িয়ে আসে একটা মৃতদেহ—পুড়ে ঝলসে কয়লার মতই কালো হয়ে উঠেছে মৃতদেহটা। চমকে ওঠে বসন্ত! একজনকে উৎক্ষিপ্ত করে দিয়েছে।

ফড়িং সরকারের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন দেহটা কে যেন পাতালপুরী থেকে প্রচণ্ড গতিবেগে ছিটকে ফেলেছে এইখানে।

ব্লেজার অস্ফুট কণ্ঠে বিড় বিড় করে ওঠে। তাড়াতাড়ি এসে মৃতদেহটা চাপা দিয়ে গুদাম ঘরের মেঝেতে জমা করে। নিষ্ঠুর নৃশংস অপমৃত্যু!

—পিট বন্ধ করো। সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। রেসকিউ পার্টির গাড়িও ফিরছে। তাদের করবার কিছুই নেই।

বাইশশো ফিট নীচে ওরা ফেলছে বালির বস্তা; আর হোস পাইপে উপর থেকে ঢালছে দামোদরের ঘোলা জল; বালি সিমেন্টের বস্তা ফেলে স্যাপ্টটার মুখ পাকাপাকি ভাবে বন্ধ করে দিয়ে কোলিয়ারি জলে ভরে দিতে হবে।

নিমেষ চুপ করে দেখছে। উদ্ধারের দুটো পথই বন্ধ করে দিতে হ'ল। ধ্বংস যজ্ঞ দেখে শিউরে উঠেছে সে।

বসন্ত ছটফট করছে। অসহায় নিস্ফল সে আর্তি; বাইরের উত্তেজিত কণ্ঠের চিৎকার থেমে গেছে। সামনে মৃত্যুর অখণ্ড স্তব্ধতা; সমবেত মেয়েদের, বাচ্চাদের হাজারো কণ্ঠের চিৎকার—করুণ কান্নায় পরিণত হয়। বাতাসে আকাশে সেই কান্নার সুর; এতগুলো লোকের সামনে পৃথিবীর অন্তরে হত্যা-কাণ্ড অনুষ্ঠিত হল, অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে রইল তারা।

পিট তবু বাঁচুক। রুজি রোজকার হবে বাকি অপরের; মালিকের কোটি কোটি টাকা মুনাফার ক্ষেত্র অটুট থাকুক। অবশ্য এ ছাড়া করবার কিছুই নেই।

হাজারো মানুষ কাঁদছে! বাতাসে কান্নার রোল। অসীম দিগন্তে, দামোদরের উন্মাদ জলরাশিও স্তব্ধ হয়ে গেছে। বসন্ত যেন উন্মাদ হয়ে গেছে। হু হু ওঠা অগ্নিশিখার দিকে বালির বস্তাগুলো ছুঁড়ছে।

—নে নে খা! খা কত খাবি!

মাখন, বুধন, মদনা, কেষ্ট, ন্যাপাল, আরও কত চেনা অচেনা মুখের ভিড়। শরণ সিংকে মনে পড়ে। ওর জীবন থেকে সবাই খসে গেল। অসহায় একা সে এই বন্ধুর মৃত্যু মুখর উপত্যকায়।

একজন মালকাটা বালির বস্তা ফেলবার ফাঁকে চোখের জল চাপতে পারে না; হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে—নোকরী ছোড় দেগা বাবু; কভি নেহি রহেগা হিঁয়া! ভিখ মাঙ্গকে খায়ে গা।

রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। পিট বাঁচানোর জন্য যুদ্ধ, আগুনে আর মানুষে।

ক্রমশ বশ মানছে, তৃপ্ত ক্লান্ত হয়েছে সর্বগ্রাসী বৈশ্বানর। জমাট কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে আকাশে; বিষাক্ত পূতিগন্ধময় সেই ধোঁয়া অতল ঠেলে উঠছে। ঝলক দিয়ে ওঠে ধূম জাল ভেদ করে ক্ষীণ অগ্নিশিখা; বড় ট্রেলার পাম্প বসেছে টিলার গায়ে, দামোদর থেকে আট ইঞ্চি পাইপ ভর্তি জল ঠেলে ঢুকছে পিটে; ঘেমে নেয়ে উঠেছে বসন্ত; কাল পিটে কাযে নামার পর থেকে না খেয়েই রয়েছে। ফস্টার, ব্লেজার মাঝে মাঝে ফ্লাস্ক থেকে তরল পানীয় গলায় ঢালছে। নতুন আমদানী করা ইঞ্জিনিয়ার রবার্টসের চক্ষুলজ্জার বালাই নেই, তোবড়ানো হেড গিয়ারের ফ্রেমে বসে প্যাণ্টের হিপ্‌ পকেট থেকে চ্যাপ্টা বোতল বের করে খানিকটা গলা ভিজিয়ে উঠে এসে আবার মিথিনোমিটারের রিডিং দেখছে। পিট থেকে সোজা উঠে আসছে ধোঁয়া।

বিষাক্ত, কাশি আনা ধোঁয়া ; গলার কাছে জ্বালা ধরায় ; বসন্ত কাশছে খক্ খক্ করে।

নিজের হাতেই বালির বস্তা ঠেলে ফেলে একটার পর একটা পাতাল পুরীতে, তারই ভাই বেরাদারদের সমাধিতে যেন মাটি ফেলছে মুঠো মুঠো।

টেম্পারেচার ফল করছে। মিত্র সাহেব চেয়ে রয়েছে ক্রমনিম্ন পারাটার দিকে ; কোলিয়ারির রন্ধ্রে রন্ধ্রে জল যাচ্ছে; জ্বলন্ত কোল ফেসের আভা নিভে আসছে ধীরে ধীরে।

ধোঁয়ার রং বদলায়—ঘন সাদা চাপ চাপ ধোঁয়া বন্ধ হয়ে উঠে আসছে কালো ধোঁয়া ; পরিমাণেও অপেক্ষাকৃত কম, ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়। আগুনের সোঁ সোঁ গর্জন আর নেই, ঝর ঝর শব্দে জল নামছে স্যাপ্‌ট দিয়ে।

দুপুরের খর রোদ মেঘলা আকাশ ঠেলে উঠেছে। ঝিকমিক করছে হাজারো মানিক দামোদরের ঢেউ-এর মাথায়, নীল ধোঁয়াচ্ছন্ন প্যানচোত পাহাড় কোলে শাল মহুয়ার বন স্তব্ধ হয়ে চেয়ে আছে এই বীভৎস হত্যালীলা-ক্ষেত্রের দিকে।

দলে দলে আসছে নতুন লোক ; যাত্রী। যেন কোন তীর্থক্ষেত্রে আসছে! মৃতের পরিজনরা তখনও ছিটিয়ে রয়েছে, কাঁদছে। কান্নার শব্দ তখনও থামেনি ; বাতাসে গুমরে ওঠে ক্লান্ত কান্নার স্বর। ফস্টার চিৎকার করে ওঠে—স্টপ দেম।

কিন্তু ও হুকুম মানবার মত অবস্থা সকলের নেই।

রণক্লান্ত তারা ; নিমেষ ফিরে গেছে হাঁটাপথে বাংলোয় ; সেখানে পুলিশ বসেছে পাহারা দিতে ; বসন্তকে চেনা যায় না—ধোঁয়া, ধুলো আর ঘামে সর্বাঙ্গ ভরে উঠেছে তার।

আগুন নিভে গেছে। ধোঁয়াও বের হয় না। ফস্টার রবার্টসকে জড়িয়ে ধরে আনন্দে লাফাতে থাকে। বিসদৃশ দৃশ্য। জড়ানো স্বরে বলে চলেছে,

—লেট আস গেট ডাউন, এণ্ড গিভ হার এ লেশন্।

ব্রেজার ওদের ঠেলে গাড়িতে তুলে দেয়—বাংলোমে লে যাও দোনো কো।

এ অবস্থায় পিটে নামা যায় না, কিন্তু মদের ঘোরে আর আগুন নেভানোর আনন্দে তারা বেটোর বেহেড হয়ে উঠেছে।

চুপ করে কি ভাবছে ব্রেজার। এর পর আসল কাণ্ডই বাকি ; প্রেস

রিপোর্টার, এনকোয়ারি কমিশন—কৈফিয়ৎ—ক্ষতিপূরণ দেবার প্রশ্ন, নানা ঝামেলা উঠবে। এই তার সূত্রপাত।

বানের আগে খড়কুটোর মত এসে জুটেছে প্রেস ফটোগ্রাফারের দল। এখানে ওখানে ছবি নিচ্ছে। পাহারাদার পুলিশের নিষেধও শোনে না তারা। কি ভেবে ব্লেজারই ডেকে আনে তাদের। সারা দেশের সামনে নানা খবর ছড়াবার সুযোগ না দিয়ে ওদের মুখ বন্ধ করার প্রচেষ্টাই করে সে।

ব্লেজার ওদের নিয়ে ঘুরছে চারিদিক। নানান জনের নানা প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে।

বসন্ত অবাক হয়ে যায়। মুখ বুজে সেও রয়েছে ওদের সঙ্গে।

ফস্টার ইতিমধ্যেই সব আয়োজন করে রেখেছে। অফিস মাঠের একদিকে চেয়ার বেঞ্চি ছড়ানো, সামিয়ানা—সতরঞ্চি কে যেন পেতে রেখেছিল। সামনে একটা ছবিতে শুকনো ফুলের মালা, উলটে পড়ে আছে ধূপদান ; ফুলদানী।

রিপোর্টারদিকে ঘুরে দেখাচ্ছে ব্লেজার।

—ক্যাজুলটি ? নাম্বার অব ডেথ ?

ব্লেজার জবাব দেয়—খুব বেশি নয় ; হাফ ওয়ার্কিং ডে ছিল কাল ; কোলিয়ারির প্রতিষ্ঠাতা মিঃ লাঞ্চকেপের জন্মতিথি উৎসব, হাফ সেট কায হচ্ছিল। তাতেও কিছু কামাই। সঠিক ফিগার বাতিঘর থেকে পাওয়া যাবে।

কোলিয়ারি ইনস্‌পেক্টর সাহেবও দলবল নিয়ে এসে পড়েন ; খাতাপত্র বাতির হিসাব নেওয়া হয় ; থরে থরে র‍্যাকে বাতি নম্বর হিসাবে সাজানো আছে চার্জারে ; মাত্র আশি-পঁচাশিটা নেই।

হতভাগাদের সঙ্গে তারাও আশ্রয় নিয়েছে মাটির নীচে।

—গড ব্লেশ দেম।

মাথা নীচু করে ব্লেজার রুমাল দিয়ে মুখ মোছবার চেষ্টা করে। চুপ করে ল্যাম্পরুম থেকে বের হয়ে এল তারা মিঃ লাঞ্চকেপের স্মৃতিসভার পরিত্যক্ত প্যাণ্ডেলে।

—মিটিং চলবার সময়ই এ্যাকসিডেণ্ট হয় নীচে। নইলে আরও ক্যাজুলটি হতো।

মিত্র সাহেব, বসন্ত দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কানে আসে ফস্টার, ব্লেজারের দল কেমন বেমালুম মিথ্যা কথা বলে চলেছে। নিমেষ স্নান করে লাঞ্চ সেরে

ফিরেছে। সেও অতিথিদের নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চুপ করে শোনে কথাগুলো। কতদূর সত্য তা সেও জানে। তবু নিমেষ সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে। যা বলবার তোড়ের মুখে জবাব দিচ্ছে ব্লেজার।

—কাওয়ার্ড! মিত্র সাহেব গজ গজ করতে থাকে। অফিসিয়ালি সে এ কোলিয়ারির কেউ নয়। তাই বলবারও কিছু নেই। তার রেজিগনেশন কালই অ্যাকসেপ্‌ট করেছে ব্লেজার।

একজন রিপোর্টার বলেন নোট নিতে নিতে,

—যারা মারা গেল, তাদের জন্য একটা স্মৃতি-স্তম্ভ রাখা দরকার।

ব্লেজার সায় দেয়—অব কোর্স ; ব্ল্যাক স্টোনের উপর ইনস্‌ক্রিপশান সমেত একটা ভালো মেমোরিয়াল অবশ্যই আমরা রাখবো এখানে। মে গড ব্লেশ দোস্‌ পুওর সোল্‌স্‌।

বাইরে কান্না তখনও থামেনি। ফড়িং সরকারের আধপোড়া মৃতদেহটা চট চাপা পড়ে আছে চুনের গুদোমে ; বাতাসে একটা চিমসে গন্ধ। চুন চাপা দিয়েও একটা দিনও পার করতে পারছে না তারা ; রাতের আঁধারেই যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে।

ব্লেজার ওদের সরিয়ে নিয়ে গেল নিজের এয়ার কনডিশনড অফিসরুমের দিকে। নিমেষ চলছে আগে আগে।

বসন্তের কানে আসে একটা ছোট ছেলের চিৎকার, ফড়িং-এর স্ত্রী, মেয়ে, ছোট ছেলেগুলোও গেটে ভিড় করেছে। ফুঁপিয়ে কাঁদছে ছেলেটা।

ক্ষীণ আর্তনাদ ; মঞ্জরী, আদু কাঁদছে।

বসন্ত সরে গেছে সেখান থেকে। লালাজী এগিয়ে যায় কি ভেবে।

অতল পিটের এককোণে পরিত্যক্ত গ্যালারির মধ্যে বসে আছে কয়েকটি প্রাণী ; কোন প্রাগৈতিহাসিক জীব। মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবার জন্য গুহার অন্ধকারে আশ্রয় নিয়েছে! মিট মিট জ্বলছে একটা আলো।

এখানে স্থান কালের হিসাব নেই। অখণ্ড আঁধার ঢাকা চির রাত্রির রাজ্য। সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত দিয়ে এর বুকে মহাকাল দিন রাত্রির হিসাব আঁকেনি। নীলাভ হয়ে আসে বাতির আলো। ওল্ডহ্যাম কোম্পানীর টেপ

ল্যাম্পের একটির আয়ু নিঃশেষ হল। সুইচটায় একটা শব্দ ওঠে মাত্র ; শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আলোর ঝলক আর ওঠে না।

কেষ্ট বলে ওঠে—পেন্সিল লিছে উ! দাও দিন—টবাং করে উটোকে খাদের জলে ফেলাই দিই।

বাতি হারানো মানেই খাদের একটি প্রাণের বেহিসেবী গরমিল। মাথনা বাধা দিয়ে ওঠে—না।

শরণ সিং আজ বদলে গেছে। যাদের এতকাল ভেবেছিল জানোয়ার তাদের সঙ্গে মৃত্যুর মুখোমুখি এসে থমকে দাঁড়িয়ে যেন নতুন করে তাদের চিনতে পারে। পকেটে ছিল ওর রাতের খাবার—একতাল রুটি, আলুসিদ্ধ আর ভেণ্ডির ছেঁচকি।

কেষ্ট বলে ওঠে,

—কার কি আছে জমা কর বাবা ; বাগ্দীর বামুন আমি। সব ধরে দিই বাবা পাতাল ফোঁড়ের পূজোয়।

রুটিই বেরুল কিছু, আর ঝিঙে ভেণ্ডির চচ্চড়ি ; হ্যাপলা বলে ওঠে,

—কেটোটা উখাদেই ফেলাই আইচি কাকা। ভাত আর চিংড়ির ঝাল দেওয়া ছিল গো।

কেষ্ট গজরাতে থাকে—যা কেন্নে লিয়ে আয় সিথান থেকে। শালার খং খং গলার বাত্তই আছে, আর মিছে কথার ঝুড়ি। ফুটুনি মারছিস—বলদিকি ভাত ছিল কিনা? কুন শালী তুকে ভাত রেঁধে দিবেক র‍্যা? বুড়ী মা না ডবকা ছুঁড়িটো? ফর ফর করে বেড়াচ্ছে সি শালী চোপ্পদিন।

হ্যাপলা ঠেলে ওঠে—আমার বৌকে শালী বলবি না কিন্তু।

—তবে কি আমারই বৌ বলবো? কেষ্ট সাফ জবাব দেয়।

শরণ সিং বিরক্ত হয়ে ওঠে—এ্যাই কিস্‌টা।

কেষ্ট বলে চলেছে—আজ না হোক কাল বেরুবোই, বেরিয়ে যেয়েই ধাওড়া থেকে লোতুন বৌকে নিয়ে ধুলো পায়ে ঘরে ঢুকবো কিন্তুক। তুমোদের সবারই নেমন্তন্ন রইলো।

আবার বেরুতে পারবে—আলো বাতাসে ভরা পৃথিবীতে। নামো ধাওড়ার ধারে অর্জুনগাছের ছায়াঘন পথটা দিয়ে যাবে তারা ; মুক্তির মধুর এই স্বপ্নটুকু ফুটে ওঠে কেষ্টর কথায়। হাসছে তারা! ক্ষীণ আনন্দের ক্ষণিক প্রকাশ।

রুটি ক'খানা মাখনই ভাগ করে দেয়—বেশি নয়, জনাকি একখানা করে চিবো।

—জল! নামো ধাওড়ার গনা মাঝি চিন্তায় পড়ে যায়।

বুধন বলে ওঠে—সারা দামোদরের জল আইছে বটে, খা কেনে যতো পারিস।

আঁধারে ওদের রুটি চিবোনোর শব্দ ওঠে, মিট মিট জ্বলছে একটি ক্ষীণ আলো।

যতটুকু না জেলে পারে তাই করছে তারা। ওগুলো নিঃশেষ হয়ে গেলে? ভাবতে পারে না মাখন।

তার আগে তারা বাঁচবেই—বাঁচতেই হবে। পৃথিবীর আলো হাওয়ায় পৌছাবে এই প্রাণবায়ুর সীমিত সঞ্চয় নিঃশেষিত হবার আগেই। এ অন্ধকারের শেষ তারা দেখবেই।

এখানে আজও সূর্য ওঠে। মেঘ ঢাকা আকাশ ফাটিয়ে প্রকাশ পায় সূর্যের রক্তিমাভা, সবুজ শালবন সীমা—প্যানচোত পাহাড়ের বুকে মাথায় আটকে পড়া ধোঁয়াটে কালো মেঘজাল রাঙিয়ে দেয় লাল আভায়। ওরা ঠায় বসে আছে রাস্তার দুপাশে গাছের নীচে লালাজীর পরিত্যক্ত চালায় জল কলের বাঁধানো চাতালে। চোখে মুখে রাত্রি জাগার নিবিড় কালো ছায়া।

ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে রেসকিউ পার্টি; এখনও এ্যাকসিডেণ্টের কোন সরজমিন তদন্তই করতে পারেনি কর্তৃপক্ষ। পিটের মুখ সিল করা; ঘুমন্ত পৃথিবী, যারা নীচে ছিল নিশ্চিত মৃত্যুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তাদের সম্বন্ধে। স্তিমিত হয়ে গেছে ওদের প্রচেষ্টা। কান্না থেমে গেছে; থেমেছে ওদের সাগ্রহ প্রতীক্ষা। বন্ধ পিটের সামনে দুচার জন দাঁড়িয়ে থাকে হতাশ ম্লান চাহনিতে।

মালকাটাদের উত্তেজনা কমেছে—ক্লান্ত পরিশ্রান্ত তারা। সামনে আর এক সমস্যা। বাঁচবার প্রশ্ন। দুবেলা দুমুঠো ভাতের চিন্তা।

বটগাছের নীচে বসে জটলা করছে—কতদিন লাগবেক চালু হতে?

ভাবনা ঢুকছে তাদের; কাল পর্যন্ত ছিল তাদের সহকর্মীদের বাঁচানোর দাবী, নিরাপত্তার ব্যবস্থার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল তারা। এই অপমৃত্যু থেকে প্রাণ বাঁচানোর সংগ্রাম। আজ তারা সকলেই মৃত, নিখোঁজ।

এবার ভাবনা পড়েছে তাদের; খাদ তছনছ হয়ে গেছে। ডুবে গেছে সমস্ত কোলিয়ারি, পাম্প করে জল তুলে—সাফ করতে অনেক হাঙ্গামা। ফার্স্ট সিফ্‌টের ফায়ারম্যান তারিণী বলে ওঠে—তা মাসখানেক তো বটেই?

—চার হপ্তা? এঁ্যা!

—চার হপ্তার মজুরী দেবে না কোম্পানী। খাবি কি ইবার?

—দিবেক নাই তো কাম দিক উরো; খাদ কি আমরা ধ্বসাইচি? রং চালাকি নাকি?

ধিকি ধিকি নিভু নিভু আগুন যেন দপ্‌ করে জ্বলে ওঠে। মদন লস্কর ক'দিনেই বুঝেছে ওদের স্বরূপ; দলের নামে যা তা লিখিয়ে দিয়েছে কাগজ-ওয়ালাদিকে। ফস্টারের রাতদুপুরে বাতি আনার কথাও জানে সে। সে নীচে থাকলে তাকেও বেমালুম হজম করে দিতে ওদের বাধতো না এতটুকু।

এতদিন অকারণেই লালা আর ফস্টারের দালালি করছে। ওই বিস্ফোরণ তার মনের ভিতটুকুকেও নাড়া দিয়েছে। ফুঁসছে মনে মনে।

—এই বেলা চেপে ধর, মালিক আছেন। ফয়সল্লা করে নে। নাহলে খাবো কি! দরকার হয় দল বেঁধে সব্বাই যাবো। সোজা আঙ্গুলে ঘি ওঠে না বুঝলা মামু?

—ঠিক কথা; কাম মজুরী চাই, যারা মরেছে তাদের ট্যাকা দিতে হবেক।

—নাহলে?

—এমনিই মরছে যদি তিনশো মরদ; বাকি যি কটা তারাও মরবো; ওদের কাম চালু করতে দিব নাই, বোঙার কিরা।

যদু মাহাতো ময়লা গামছা দিয়ে মুখ মুছতে থাকে। মাখন নেই। সে থাকলেও হত এ সময়। ঠাণ্ডা মাথার লোক। চারিদিক থেকে তাদের যেন পিষে ফেলবার আয়োজন চলেছে।

—তালকুই-এর মেজবাবু, আসানসোলের ইয়াকুব সাহেব আইছে সালিশীতে

শোনলাম। মদন লস্কর একে একে সব ফাঁস করে দেয়। দপ্ করে জ্বলে ওঠে আগুনের মত একজন মালকাটা,

—উদিকে মানি না। উরো কে? মালকাটার দুঃখ্ কি জানে? কেমন করে বুকফেটে মরে খাদের নীচে জানে উরো? হুরুকে যেতে বলে দে, নাহলে ছাতু হয়ে যাবেক। হুঁ।

বসন্তকে আসতে দেখে যদু মাহাতো উঠে বসল। এগিয়ে আসছে বসন্ত, ক্লান্ত পরিশ্রান্ত কালিমাখা চেহারা; যেন শ্মশান থেকে ফিরছে চিতাভস্ম মেখে।

কালো ধোঁয়া—কালি ঝুলি বালি ভর্তি চেহারা; প্যান্টের ভাঁজে ভাঁজে ময়লা জমেছে, চুলগুলো উস্কো খুস্কো; ঘুম নেই দুরাত্রি; এসে ওদের কাছেই একটা পাথরে বসে পড়ল সহজ ভাবেই।

—এক লোটা জল!

কে একজন পাশের কল থেকে এনে দেয়; মুখে চোখে একটু জল বুলিয়ে গলার কাছে ঢালতে থাকে জলটা। গিলে চলেছে একটানা শব্দ তুলে। এক মিনিটেই শেষ করে দেয় ঘটির জলটা। ঠক্ করে পাথরের উপর পাত্রটা নামিয়ে রেখে মুখ দিয়ে একটা তৃপ্তির অস্ফুট শব্দ তোলে। উত্তেজনার ঘোরে এতক্ষণ টের পায়নি। খিদের চেতনা ফিরে আসে। নাড়ি জ্বলছে—অসহ্য জ্বালায়।

—দুদিন খাওয়া জোটেনি। আছে কিছু? হ্যাঁরে মণ্টা?

মণ্টার ভুজার দোকানে দুদিনে ধুলো শুদ্ধ বিক্রী হয়েছে, দূর দূরান্তর থেকে এসেছে মালকাটার আত্মীয় বন্ধুর দল। ছোট জায়গা—খাবার দাবার নেই। ভুজা চিড়েই খেয়েছে আর ঠায় পথের ধারে বসে আছে, যদি জ্যান্ত কি মৃত উঠে আসে তারা। এখনও তাদের ভিড় কমেনি—বাড়ছেই।

মণ্টা ঘাড় নাড়ে—উঁহু। কলাই সেদ্ধ আছে শুধু।

—তাই দে।

প্যান্টের পকেট হাতড়ে গোটা কয়েক পয়সা বের করে দেয়।

মাথার ব্যাণ্ডেজটা ময়লা হয়ে উঠেছে; টিস্ টিস্ করছে একটা ব্যথা, এতক্ষণে সেটা বুঝতে পারে। ধোঁয়ার গন্ধ তখনও নাকে আছে—সুড় সুড় করে ওঠে গলাটা।

কাসছে বসন্ত।

যদু মাহাতো অবাক হয়ে যায়; শালপাতার ঠোঙায় কলাই চিবোচ্ছে —ধাওড়ায় যাবে না?

—ও ধাওড়ায়? তা ঘরটা আছে না পালোয়ান সিং তুলে ফেলেছে?

বসন্ত হাসছে। ওরা জেনেছে পালোয়ানের কাহিনী। এ রকম ঘটনা প্রায়ই ঘটে কোলিয়ারির এখান সেখানে। কিন্তু এইটা চাউর হয়ে গেছে সর্বত্র। বসন্তকে ওরা আটকাতে পারেনি। পালোয়ান সিং, গালকাটার আক্রমণ থেকে বেঁচেছে ওই বসন্ত।

—কেউ বাঁচবে না নীচে? যদু মাহাতো তখনও আশা ছাড়েনি।

চুপ করে থেকে ঘাড় নাড়ে বসন্ত—আশা কম। বাঁচার কথা নয়; সারা খাদ জলে থই থই করছে। উপরের সিম অবধি আগুন ধরে ছিল।

—চালু হতে কতদিন লাগবে? সকলের মনে উৎকণ্ঠা।

সামনে ওদের উপবাসের দিন, যারা মরেছে তারা তো গেছেই, ওরা আলো বাতাসের দেশে উপবাস দিয়ে মরবে শুকিয়ে। বসন্ত চিন্তিত মনে জবাব দেয়,

—তা প্রায় মাস খানেক।

—খাবো কি এ্যাদ্দিন?

—মালিকদিকে বলো; দরকার হয় আদায় করে নিতে হবে।

—কিন্তু কে বলবে আমাদের কথা? মাখনা ছিল, সে তো—

চুপ করল যদু মাহাতো, বহুদিনের পুরোনো বন্ধুর কথা মনে পড়ে। মালকাটার বন্ধুত্ব—শত বিপদের বন্ধনে নিবিড় অন্তরময় সেই পরিচয়। চুপ করে বসে আছে বসন্ত—নির্বাক বেকার মালকাটার দল, চারিপাশে হারানো তিনশো লোকের শোকবিহ্বল অসহায় পরিবার স্বজন।

নিজেদের কথা জানাবার ভাষাও নেই। রুদ্ধ মুখ আগ্নেয়গিরির মত বুকের মধ্যেই ফুঁসে ওঠে অগ্নিশিখা, বাইরে তার প্রকাশ শুধু চোখের তীব্র চাহনিতে, বুক জ্বলছে—জ্বলে পুড়ে খাক হচ্ছে তারা।

—বিড়ি আছে? কে এগিয়ে দেয় একটা বিড়ি আর দেশলাই।

কয়েক দিন পর বিড়ি টানছে বসন্ত। হাত পা মেলে দিয়েছে টান টান করে। ক'দিনেই জীবনের সমস্ত কিছু ওই কোলিয়ারির অতলের মত উল্‌টে পাল্‌টে গেছে।

মায়ের কথা মনে পড়ে; নিষ্ঠুর বঞ্চনার দাগ সারা মুখে চোখে; ব্যর্থ নীরব কান্না ফুটে ওঠে তার কথায়। ব্যর্থ বঞ্চিত অপমানিত একটি নারী—তারই মা।

নিজের পরিচয়টা আজ যেন তার কাছে নিদারুণ একটা অভিশাপ আর ব্যঙ্গের মত মনে হয়। পড়তে পারেনি—কয়েক বৎসর মাইনিং পড়ে ছেড়ে দিতে হয়েছে; কোন কোলিয়ারিতে অ্যাপ্রেনটিস থেকে যদি পরীক্ষা দিতে পারে—সেই স্বর্ণমৃগের সন্ধানে মত্ত সে।

নিমেষকে দেখে মনে হয় আলোর পরিচয়; বিনা পরিশ্রমে আজ এতগুলো কোলিয়ারির সর্বময় কর্তা। শুধু তাই নয়, জীবনের সব কিছু উপভোগ—প্রাচুর্যের মাঝে সে দাঁড়িয়ে।

এই হাজারো জনতাকে আজ নিশ্চিত মৃত্যু আর অসহায়তার মুখে রেখে ওই কয়েকশো প্রাণকে টিপে বন্দী করে মেরে ওর প্রাসাদের ভিত গড়ে উঠছে, গড়ে উঠছে তার গজদন্ত মিনার।

চারিদিকে বুভুক্ষু জনতার ক্রন্দন—কোলাহল। বসন্তের মনে ঝড় উঠেছে। ওরা সবাই চেয়ে রয়েছে বসন্তের দিকে। একমাত্র ওই যেন পারে এই বিপদের সামনে দাঁড়াতে। বলে ওঠে—বৈকালে এসো ধাওড়ায়; যা হয় ভেবে চিন্তে ঠিক করবো।

মানুষের সমস্ত শোক দুঃখের একটা সীমা আছে কোনখানে। তাই বোধ হয় ওরা সব হারিয়েও খিদে তেষ্টাকে ভুলতে পারেনি। পাথরের এড়ো চুলো করে মাটির হাঁড়ি কিনে কাঠকুটো কুড়িয়ে ভাত চাপিয়েছে; একদিকে সদ্য-বিধবা কোন দেহাতী মেয়ে চোখের জল মুছে অন্যহাতে শালপাতায় ভাত ঢালছে, লাল চালের ভাত; দুটো পেট ডিগডিগে ছেলে হুমড়ি খেয়ে সেই ধোঁয়া ওঠা গরম ভাতে থাবলা দিয়ে বেশি করে মুখে তোলবার চেষ্টা করছে আর চেঁচাচ্ছে নিষ্ফল প্রচেষ্টার যন্ত্রণায়।

বসন্তের সঙ্গে যদু মাহাতো আর মদনকে দেখে মেয়েটা এগিয়ে যায় ভাত ফেলে; ছোট ময়লা কাপড়টা দিয়ে মাথায় একটু ঘোমটা তোলবার চেষ্টা করে বলে ওঠে,

—কিছু টাকাকড়ি দিবেক নাই গো? সি তো গেল, দুটো ছেইলা নিয়ে কিই বা খাই?

ছোট ছেলেটা গরম ফ্যান চুমুক দিয়ে খাচ্ছে তারিয়ে তারিয়ে, কোমরের ঘুনসীতে একটা ফুটো পয়সা বাঁধা।

ওদের দেখে ন্যাপলার বুড়ী মাও এসে হাজির হয়; শিরা ওঠা কাঠি কাঠি হাত দিয়ে ন্যাড়া কপাল চাপড়ে হাঁক পেড়ে কাঁদতে থাকে—যোয়ান মরদ ব্যাটা বাবু, তোমারই মতন। মরামুখও দেখতে পেলাম না; তারই পয়সা কি ছুঁতে আছে—মরার পয়সা।

কাঁদতে থাকে, কান্না ভিজে গলায় বলে—তবু আইছি বাছা, পেট বড় বালাই। মরা ছেলে বিচে পেট পালতে আইচি!

কান্না—আর আর্তনাদ।

বসন্ত যেন দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না—ভাবছে এর শেষ কোথায়!

এষা কদিন নিবিড় উৎকণ্ঠায় কাটিয়েছে। টিলার উপর থেকে দেখা যায় পিটের আগুন। আগুনের শিখা—আর জমাট ধোঁয়া বের হচ্ছে ঝলকে ঝলকে, যেন পৃথিবীর নীচে কোন ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়ে ঠেলে উঠতে চায়; ওই ধোঁয়া আর আগুনের শিখা তার লাভাপ্রবাহের ভূমিকা মাত্র।

হাজারো কণ্ঠের কোলাহল ওঠে। ভোঁ-টা বাজছে বিকট স্বরে। সকালের ঘুমভাঙ্গানোর, ওদের কাযে ডাকবার মত সেই শান্ত প্রকম্প স্বর এ নয়; সর্বনাশা ধ্বংসের কান্না। প্যানচোত পাহাড় সীমায় ঠেকে ফিরে আসছে সেই আর্তনাদ, আকাশে আকাশে তারই প্রতিধ্বনি।

নিমেষ, দেবেশ দুজনেই ওইখানে রয়েছে।

গেটের আশেপাশে প্রহরীর সংখ্যা বৃদ্ধি হতে দেখে নমিতা ভয় পায়।

—কি ব্যাপার এষা?

—ঠিক তো জানি না, এখানের ব্যাপারই আলাদা। কাল রাতেই তার একটু নমুনা দেখেছি। প্রাণের কোন দাম নেই। বুলডগের মত এরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখানে মৃত্যু কখন কাকে ধারাল নখ দাঁতে ছিঁড়ে টুকরো করে নেবে কে জানে!

নমিতা চুপ করে থেকে বলে ওঠে ভীতকণ্ঠে—আমার বড় ভয় করছে ভাই? ওকে আসতে বলবো ফোন করে?

হাসে এষা—না, তার দরকার নেই; এতগুলো পাহারাদার রয়েছে। তাছাড়া এখন ওদের আসা উচিত হবে না। সকলেই কোলিয়ারির মুখে; নীচে মরছে কত লোক, মালিক হয়ে একটু দাঁড়িয়েও কি দেখবে না?

চুপ করে যায় নমিতা; দেবেশের মুখখানা মনে পড়ে এষার। কঠিন পরিবর্তিত মানুষ। কয়েক বৎসরেই জীবন তার কাছে নতুন কি দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে, যে দৃষ্টি নিজেরও নেই তার। সেও ছুটেছে! তার আধঘণ্টা আগে এসেছিল ক্লান্ত পরিশ্রান্ত আহত হয়ে; কিন্তু কর্তব্যের সময় সব শ্রান্তি ঝেড়ে ফেলে সেও গিয়ে দাঁড়িয়েছে ওদের মধ্যে। চোখে তার বেদনা ভরা আর্তি; নিজেকে ওদেরই একজন বলে জেনেছে। জানাটাই স্বাভাবিক। এষা ভাবতে পারে না—একটি মানুষের জীবনে এত নীরব বঞ্চনা জমা আছে। সমাজ—নিজের বাবা পর্যন্ত বিনা অপরাধে তাকে পরিত্যাগ করেছে, অবশ্য এতে তার মনে কোথাও কোন ক্ষোভ নেই। বিনা প্রতিবাদে সে মেনে নিয়েছে এই কঠোর জীবন।

হাসি দিয়ে সমস্ত দুঃখকে ঢাকতে চায় সে, মনে পড়ে ওর কথা।

—আঠারো টাকা হপ্তার মালকাটা; বেশ আছি। তবে কতদিন আছি জানি না। কবে দেখবো গ্যাস—না হয় বাম্পিংএ খতম হয়ে গেছি।

কাঁপছে পায়ের নীচেকার পাথুরে মাটি; গুরু গুরু শব্দ। নমিতা ভীত শীর্ণ মুখে বলে ওঠে—শুনেছি কোলিয়ারির তলায় সব ফাঁক, এই বাড়িও বসে যাবে নাকি?

—কি করে বলি? এষা জবাব দেয়।

—তবে আমরা আছি কেন এখানে? না ভাই, সখ মিটেছে বেড়ানোর, চল কলকাতায় ফিরে যাই।

নমিতা মধ্যবিত্ত সংসার থেকে এসে পড়েছে প্রাচুর্যের মাঝে; তাই বোধ হয় আঁকড়ে ধরে থাকতে চায় তার এই অসাবধানী পাওয়াটুকুকে; জীবনে সে উপভোগ, অপব্যয় করতে চায়; তারই জন্য ভালবাসে জীবনকে—নিমেষকে, নিজেকেও, কৃপণের ধনের মত।

এষা দারোয়ান পাঠিয়েও দেবেশের কোন খবর করতে পারে না, বলে দেয় তাকে,

—বসন্তবাবুর নাম করবি। ওই যে কোলিয়ারিতে কায করে।

নিমেষ বাংলোয় ফিরে আসতেই এষা জিজ্ঞাসা করে—দেবুদাকে আনলে না ?

—উঁহু, এল না সে। উপরে উঠে গেল নিমেষ নমিতার সঙ্গে। কয়েক ঘণ্টা ছিল সেখানে, ক্লান্তি আর পরিশ্রমে যেন ভেঙ্গে পড়েছে। তাকে না বিরক্ত করে এষা দারোয়ান পাঠায় কোলিয়ারিতে।

সেও কয়েকবার খুঁজে এসেছে; কোন বার দেখা পেয়েছে—কখনও দেখাই পায় নি। এসে জবাব দেয়,

—কাম আভিতক্ ফিনিস নেহি হুয়া।

—এত কি চাকরি করে আঠারো টাকা হপ্তায় যে নাবার খাবার সময় নেই ?

দারোয়ান সেলাম করে বলে ওঠে—নেহি মালুম মেমসাব।

—তোদের ফস্টার সাহেবকে বলগা গিয়ে।

দারোয়ান তার আগেই পিট হেডে ফস্টারের মদ খেয়ে রবার্টকে জড়িয়ে ধরে বল নাচের দৃশ্য দেখে গেছে। হাতযোড় করে বলে ওঠে—মাপ কিজিয়ে, উতো বেহুঁশ হ্যায়।

এষা হেসে ফেলে—বাঃ, বেশ কায হচ্ছে তাহলে। ওই বসন্তবাবুও কি—

জিব কেটে ফেলে দারোয়ান—নেহি মেমসাব। আচ্ছা আদমী হ্যায় বসন্ত; সাচ্চা আদমী!

—যা তুই। এষা তাকে বিদায় করে ভাবতে থাকে।

সময়ে না খেয়ে না দেয়ে এইভাবে জীবনের এতটা বছর কাটিয়েছে; তাকে হঠাৎ যত্ন নিয়মের মধ্যে আনা শক্ত। তাই বোধ হয় ইচ্ছে করেই পালিয়ে বেড়াচ্ছে সে।

দিনরাতই ফোন আসছে। পিট থেকে, আসানসোল থেকে, কলকাতার অফিস থেকে বাবাও ঘনঘন কল করছেন, সংবাদপত্র অফিস থেকেও ঝামেলা আসছে। তার উপর আসে বিভিন্ন লোকজন।

বাড়িটা যেন কারখানায় পরিণত হয়েছে।

কি ভেবে বৈকালে সেদিন নমিতাকে নিয়ে বের হয়, নমিতার ভয় যায় না।

—কেউ কিছু বলবে না তো ?

—চল না। আমিতো যাচ্ছি সঙ্গে।

এরা ওকে জোর করে গাড়িতে তুলে ক'দিন পর প্রথম ঘুরতে বের হয়। দারোয়ান সিপাই এগিয়ে আসে।

ফিরিয়ে দেয় এরা—থাক, তোমাদের দরকার হবে না।

বসন্তের পরিচয় তার মনে মস্ত সাহস আর নির্ভর আনে।

তিনদিন পর ধাওড়াতে পা দিয়েই অবাক হয়ে যায় বসন্ত ; কেষ্টর বৌ কাঁদছে ক্ষীণ ক্লান্ত স্বরে। ওপাশের ঘরের ক'জনই তালা বন্ধ করে চাবি নিয়ে কায করতে গেছে খাদের নীচে ; ও তালাচাবি আর কোনদিনই খুলতে আসবে না তারা ; দেশ থেকে ক'জন এসেছে ওদের খবর নিতে, পথেই ঘুরছে তারা ; মাঝে মাঝে কাচ্চাবাচ্ছাগুলোকে নিয়ে দাওয়াতে এসে বসে থাকে ; ছাতু ভিজিয়ে খায়, আবার পথে নামে। আবার শুরু হয় পরিক্রমা।

—গৌরী !

ধড়মড়িয়ে ওঠে ডাক শুনে। নাঃ, সে আর ফিরবে না কোনদিন। তাকে ছেড়ে যাবার জন্য এত চেষ্টা করেছিল, সেই কেষ্টই এতখানি ব্যথা দেবে ভাবতেও পারেনি। মমতামাত্র—তবু মন কাঁদে !

বসন্তের ডাকে উঠে এল গৌরী। ক'দিন ঘরটা গোছানো হয় নি। জলও পড়ে আছে সেই বাসি হয়ে। ঘরময় পালোয়ান সিংএর দল যেন তাণ্ডব বাধিয়ে গেছে।

—কোন খবর নাই ? মলিন পাণ্ডুর কান্না ভেজা চোখ মেলে চেয়ে থাকে গৌরী।

মাথা নাড়ে বসন্ত ; বেশ জানে এই এ্যাকসিডেণ্টে ভিতরের সব কিছু পুড়ে খাক্ হয়ে গেছে। একটি প্রাণীও বেঁচে নেই। তবু সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে।

—কাল থেকে পাম্প শুরু হবে। দেখা যাক নীচে নেমে কি অবস্থায় আছে।

যেন আজই উদ্ধার কায সারা হবে। অথচ বসন্ত জানে অন্তত পিটে নামতে তিন সপ্তাহ লাগবে। ততদিন কেউ বাঁচবে না। যদিও কেউ টিকে থাকে, অনাহার আতঙ্ক আর ওই বিষাক্ত পরিবেশে তারাও ফিরে আসবে না।

চারপাই-এর নীচে একটা থলিতে কিছু মকাইএর দানামাত্র পড়ে আছে। সেইগুলোই এগিয়ে দেয়—নিয়ে যাও তুমি।

—আপনার ? গৌরী বলে ওঠে।

—চলে যাবে কোন রকমে।

বেশ জানে বসন্ত ঘরে দানামাত্র সঞ্চয় রেখে যায়নি কেষ্ট। ক'দিন হয়তো উপোসই দিয়েছে গৌরী, তবু কারও কাছে হাত পাতবে না। খাটিয়ার নীচে বালিশের ওয়াড়ের ভিতর একটা কাগজের খামে কিছু সঞ্চয় ছিল। বসন্ত হাত দিয়ে দেখে সেখানে কিছুই নেই।

পালোয়ান সিংএর লোকজনেরই কায ; কোথাও কিছু খুঁজতে তারা বাকি রাখেনি। নইলে এতদিন ছিল—আজ সেই খামখানা থেকে টাকা নিতে কে আসবে ?

চুপ করে কি ভাবছে বসন্ত ; উনুনে একটা প্যানে সিদ্ধ হচ্ছে মকাইএর দানাচূর্ণ ; খিদে বেশই লেগেছে ; নুন দিয়ে আপাতত ওই খেতে হবে।

বাইরে থেকে ওদের কান্নার শব্দ আসে। শোকে কাঁদছে—কাঁদছে ক্ষুধায়, হতাশায়। পৃথিবীর বুকজোড়া কান্নার ঐক্যতানে ওদের স্বরও মিশে গেছে।

রাস্তায় একটা গাড়ি থামার শব্দ ; ছোট জানলা দিয়ে দেখতে পায় এষা আর নমিতা আসছে ওই দিকেই। ওদের চারিদিকে ছেঁকে ধরেছে নেংটো বুভুক্ষু ছেলেগুলো।

—একটা পয়সা মায়ি, দুদিন ভুখা আছি।

—এ মেমসাব।

ঝকঝকে পোশাক--দামী সেন্টের গন্ধ ছিটিয়ে আভিজাত্য ঘোষণা করে ওরা আসছে সর্বহারার দেশে। দারোয়ান লাঠি উঁচিয়ে তাড়া করে।

—এ্যাও।

একটা ছেলে উবু হয়ে বসে পা ধরতে যায় ওদের।

—সব্বাই খাদে মইছে গো ; আমার বাপ দাদা সব্বাই।

বসন্ত দেখেছে সারা ধাওড়ার দুঃখের ইতিহাস ; তার কাছে এই ভিক্ষা-বৃত্তির ঘটনা পুরো জানা নেই ; ওর কাছে কেউ বিশেষ হাত পাততে আসে না। জানে ও তাদেরই মত। একজন পৃথক শ্রেণীর লোককে দেখেই ওরা

এষা ওকে জোর করে গাড়িতে তুলে ক'দিন পর প্রথম ঘুরতে বের হয় দারোয়ান সিপাই এগিয়ে আসে।

ফিরিয়ে দেয় এষা—থাক, তোমাদের দরকার হবে না।

বসন্তের পরিচয় তার মনে মস্ত সাহস আর নির্ভর আনে।

তিনদিন পর ধাওড়াতে পা দিয়েই অবাক হয়ে যায় বসন্ত; কেষ্টর বৌ কাঁদছে ক্ষীণ ক্লান্ত স্বরে। ওপাশের ঘরের ক'জনই তালা বন্ধ করে চাবি নিয়ে কায করতে গেছে খাদের নীচে; ও তালাচাবি আর কোনদিনই খুলতে আসবে না তারা; দেশ থেকে ক'জন এসেছে ওদের খবর নিতে, পথেই ঘুরছে তারা; মাঝে মাঝে কাচ্চাবাচ্ছাগুলোকে নিয়ে দাওয়াতে এসে বসে থাকে; ছাতু ভিজিয়ে খায়, আবার পথে নামে। আবার শুরু হয় পরিক্রমা।

—গৌরী!

ধড়মড়িয়ে ওঠে ডাক শুনে। নাঃ, সে আর ফিরবে না কোনদিন। তাকে ছেড়ে যাবার জন্য এত চেষ্টা করেছিল, সেই কেষ্টই এতখানি ব্যথা দেবে ভাবতেও পারেনি। মমতামাত্র—তবু মন কাঁদে!

বসন্তের ডাকে উঠে এল গৌরী। ক'দিন ঘরটা গোছানো হয় নি। জলও পড়ে আছে সেই বাসি হয়ে। ঘরময় পালোয়ান সিংএর দল যেন তাণ্ডব বাধিয়ে গেছে।

—কোন খবর নাই? মলিন পাণ্ডুর কান্না ভেজা চোখ মেলে চেয়ে থাকে গৌরী।

মাথা নাড়ে বসন্ত; বেশ জানে এই এ্যাকসিডেণ্টে ভিতরের সব কিছু পুড়ে খাক্ হয়ে গেছে। একটি প্রাণীও বেঁচে নেই। তবু সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে।

—কাল থেকে পাম্প শুরু হবে। দেখা যাক নীচে নেমে কি অবস্থায় আছে।

যেন আজই উদ্ধার কায সারা হবে। অথচ বসন্ত জানে অন্তত পিটে নামতে তিন সপ্তাহ লাগবে। ততদিন কেউ বাঁচবে না। যদিও কেউ টিকে থাকে, অনাহার আতঙ্ক আর ওই বিষাক্ত পরিবেশে তারাও ফিরে আসবে না।

চারপাই-এর নীচে একটা থলিতে কিছু মকাইএর দানামাত্র পড়ে আছে। সেইগুলোই এগিয়ে দেয়—নিয়ে যাও-তুমি।

—আপনার? গৌরী বলে ওঠে।

—চলে যাবে কোন রকমে।

বেশ জানে বসন্ত ঘরে দানামাত্র সঞ্চয় রেখে যায়নি কেষ্ট। ক'দিন হয়তো উপোসই দিয়েছে গৌরী, তবু কারও কাছে হাত পাতবে না। খাটিয়ার নীচে বালিশের ওয়াড়ের ভিতর একটা কাগজের খামে কিছু সঞ্চয় ছিল। বসন্ত হাত দিয়ে দেখে সেখানে কিছুই নেই।

পালোয়ান সিংএর লোকজনেরই কায; কোথাও কিছু খুঁজতে তারা বাকি রাখেনি। নইলে এতদিন ছিল—আজ সেই খামখানা থেকে টাকা নিতে কে আসবে?

চুপ করে কি ভাবছে বসন্ত; উনুনে একটা প্যানে সিদ্ধ হচ্ছে মকাইএর দানাচূর্ণ; খিদে বেশই লেগেছে; নুন দিয়ে আপাতত ওই খেতে হবে।

বাইরে থেকে ওদের কান্নার শব্দ আসে। শোকে কাঁদছে—কাঁদছে ক্ষুধায়, হতাশায়। পৃথিবীর বুকজোড়া কান্নার ঐক্যতানে ওদের স্বরও মিশে গেছে।

রাস্তায় একটা গাড়ি থামার শব্দ; ছোট জানলা দিয়ে দেখতে পায় এষা আর নমিতা আসছে ওই দিকেই। ওদের চারিদিকে ছেঁকে ধরেছে নেংটো বুভুক্ষু ছেলেগুলো।

—একটা পয়সা মায়ি, দুদিন ভুখা আছি।

—এ মেমসাব।

ঝকঝকে পোশাক—দামী সেণ্টের গন্ধ ছিটিয়ে আভিজাত্য ঘোষণা করে ওরা আসছে সর্বহারার দেশে। দারোয়ান লাঠি উঁচিয়ে তাড়া করে।

—এ্যাও।

একটা ছেলে উবু হয়ে বসে পা ধরতে যায় ওদের।

—সব্বাই খাদে মইছে গো; আমার বাপ দাদা সব্বাই।

বসন্ত দেখেছে সারা ধাওড়ার দুঃখের ইতিহাস; তার কাছে এই ভিক্ষা-বৃত্তির ঘটনা পুরো জানা নেই; ওর কাছে কেউ বিশেষ হাত পাততে আসে না। জানে ও তাদেরই মত। একজন পৃথক শ্রেণীর লোককে দেখেই ওরা

চিনতে পারে ; আজ তাই ছুটেছে তাদের কাছে ক্ষুধার তাড়নায়। তিনদিন আগেও কেউ যেত না এভাবে। উঁচু মাথা নোয়ায় নি তারা।

—তোমরা? এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা জানায় বসন্ত।

নমিতা ব্যাগ খুলে ওদের দিকে কয়েকটা আনি দুয়ানি ছুঁড়ে দিয়েছে। একটুকরো মাংসের উপর লাফ দিয়ে পড়া একপাল কুকুরের মত ঝটাপটি বাধিয়েছে ওরা।

—এ্যাই, মারছিস কেন ওকে?

হাসছে নমিতা, কে একজনের হাত মুচড়ে কি কেড়ে নিয়ে দৌড় মারে।

—আট আনায় এমন সার্কাস দেখা যায় না, কি বল? বসন্তের কথায় হাসি বন্ধ হয়ে যায় নমিতার। কৌতুক উপভোগ করছিল—বসন্তের সন্ধানী চোখের দৃষ্টি এড়াতে পারেনি সে।

—বসতে দিই কোথায়? ময়লা বিছানা—তাও পালোয়ান সিংএর দল চটকে দলে ন্যাতা করে দিয়েছে। গৌরী?

গৌরী চোখের জল মুছে দুটো মোড়া এনে হাজির করে। এষা চেয়ে থাকে ওর দিকে। বৃষ্টি ধোয়া যুঁই ফুলের মত একটা করুণ বেদনা ওর সারা মুখে চোখে।

—ওর স্বামীও খাদে ছিল সেই রাত্রে!

—তাই নাকি? ইস্। চমকে ওঠে এষা।

গৌরী আড়ালে সরে গেল, সব হারানোর লজ্জা অপরিচিত ওদের সামনে প্রকাশ করতে বাধা পায়।

—একা ওরই সর্বনাশ হয় নি এষা, প্রায় তিনশো লোক মারা পড়েছে। কোম্পানী হিসাব দিয়েছে মাত্র পঁচাত্তর জনের।

—বাকি অন্য সকলের?

—তারা নাকি কাযে অনুপস্থিত ছিল, খাতায় তাদের নামও নেই।

—কিন্তু তারা গেল কোথায়?

বসন্ত চুপ করে কি ভাবছে। নমিতা চেয়ে আছে ওর দিকে। হঠাৎ সে বলে ওঠে,

—কে জানে, বোধ হয় কোথাও ফুর্তি করতে গেছে। আসবে দু'একদিন পর। সত্যিই নামে নি তারা।

চমকে ওঠে বসন্ত নমিতার কথায়, জিজ্ঞাসা করে,—তাহলে তারা মরেনি ?

নমিতা সাফ জবাব দেয়—উঁহু।

পায়চারি করছে বসন্ত। হু হু বাতাস বইছে। ছোট জানলাটায় তারই চিহ্ন, শ্রান্তি ক্লান্তিতে ছেয়ে আসে শরীর ; ছোট সানকিতে কালো জাবনাটা ঢেলে নুন ছিটিয়ে ফুঁ দিয়ে ঠাণ্ডা করতে করতে বসন্ত বলে ওঠে—এর জবাব আমার আছে নমিতা, এখন প্রকাশ করলে তোমার স্বামীর পক্ষে সুবিধা হবে ; ওটা আপাতত তোলা থাক। তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক, তারা বেঁচে থাকুক, তাদের ছেলেপুলেগুলো অমনি কুকুর শিয়ালে পরিণত না হয়ে অন্তত দুবেলা আমার মত মকাই সেদ্ধ আর ধাওড়ার হাওয়া খাক, আর তোমার কোম্পানীর জয়গান করুক।

এষা ওই কালো জাবনাটা ওকে খেতে দেখে অবাক হয়ে যায়—ওকি ?

হাসে বসন্ত—খেতে খুব চমৎকার, পুষ্টিকর। তিনদিন কিছু জোটেনি, বেশ লাগছে। একটু টেস্ট করবে ? কিন্তু দিই কিসে ? একটা প্লেট—

—থাক। এষা রাগে যেন ফেটে পড়ে—এ ভাবে না থাকলেও চলে তোমার।

বসন্ত জবাব দেয়—নিশ্চয়ই। রেজারই তো আজই বলছিল তোমার প্রপার্টির শেয়ার ইচ্ছে করলে আমাকে দিতে পারো, কয়েক লাখ টাকা নাকি দেবে।

নমিতা প্রশ্ন করে—কি বললে তুমি ?

হাত দিয়ে মকাই সেদ্ধর শেষ গ্রাস মুখে পুরে বসন্ত তারিয়ে তারিয়ে চিবুতে থাকে ; একটা ঢোক গিলে বলে—সম্পত্তি ! যার দখলই পেলাম না তাকে বেচি কোন আক্কেলে। এক একবার ভাবি দোব নাকি ব্যাটাকে ফাঁসিয়ে—আমার সম্পত্তি বলতে তো এই খাটিয়া আর ওই সানকি, এনামেলের সসপ্যান, আর মাটির কুঁজো ; নিক্ না ব্যাটা—কয়েক লাখ টাকা দিয়ে। কি বল এষা ?

এষা কথা বলে না ; বসন্ত এনামেলের গ্লাশে জল গড়িয়ে বেশ তৃপ্তি ভরে খেয়ে পকেট হাতড়ে বিড়ি বের করে ধরাল। এতক্ষণ যেন এ জগতে ছিলই না সে। উবু হয়ে মেজেতে বসে প্রশ্ন করে—হঠাৎ কি মনে করে এই বাংলোয় পদার্পণ ?

এষা বেশ ঝাঁঝালো স্বরে বলে ওঠে—দেব দর্শনে এলাম। তোমার এতবড় ত্যাগ মহত্বের কথা দেশে প্রচার করবো বলে।

একটু থেমে এষা বলে ওঠে—চল এখান থেকে।

বসন্ত হাসছে—নইলে কি ধরে নিয়ে যাবে ? তা পারো অবশ্য। সেই

রাতের মত গালকাটাকে বলে দেখতে পারো ; তবে বাছাধন সহজে রাজি হবে বলে মনে হয় না।

পা দোলাতে থাকে নিশ্চিন্তে, এ মানুষের উপর রাগ করবে, না অভিমান করবে বোঝে না এষা ; ওর হাসি তামাসার মধ্যে একটি কঠোর প্রতিবাদের কাঠিন্য মেশানো আছে এটা বেশ বুঝতে পারে। কি ভেবে বলে ওঠে বসন্ত,

—যাবো, যেতেই হবে। তবে আমার দাবী নিয়ে নয়, এষা ; দুপাশে যাদের দেখে এলে ধাওড়ায়, ওদের জন্যই যেতে হবে।

এষা ব্যাগ থেকে একটা চিঠি বের করে, সুদৃশ্য দামী খাম।

—বাবার চিঠি। তোমার খবর চেয়েছেন।

—বাবা! রীতিমত বিস্মিত হয়ে যায় বসন্ত। হঠাৎ যেন মনে পড়ে।

—ওঃ মিঃ চ্যাটার্জি। বিগ বস্! কথাটা মাঝে মাঝে ভুলে যাই এষা, আমারও বাড়ি ঘর ছিল—মা, বাবা, সবকিছু।

চুপ করে থেকে বলে ওঠে—তবু লোভ নেই এষা ; সামান্য পাওয়ার বদলে আমি অনেক বড়কে দেখেছি—অনেক কিছুই পেয়েছি। এদের বন্ধুত্ব, প্রীতি, ভালবাসা, ঘৃণা, লাঞ্ছনা, এরাই আমার স্বজন, এদের মৃত্যু আমারও মৃত্যু। ঐ আমার কালাশৌচ—সবকিছু। সব নিয়ে অখণ্ড আমার জীবন। এষা, আমার প্রাপ্যের বেশি নিতে গেলে অপরকে বঞ্চনা করতেই হবে।

—তুমি কাওয়ার্ড, ভীরু। নমিতা জবাব দেয়।

এষা ওর দিকে চাইল, বসন্ত হাসছে। বেশ সহজ ভাবেই বলে ওঠে,

—ঠিক ওটা নই, অন্য কিছু। নইলে কয়েক লাখ টাকা ছেড়ে দিতাম না ; এবং সেটা যে আমার ন্যায্য প্রাপ্য তা বিগ বসও জানেন, ব্লেজারের অ্যাটর্নিও জানে। যাক ও কথা।

নমিতার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বলে ওঠে,—কিছু আছে এষা—টাকা-কড়ি? তোমার পালোয়ান সিং আমাকে নিঃস্ব করে গেছে ; এই দেখ—। ফুটো তুলোঝরা বালিশের মধ্য থেকে শূন্য খামখানা বের করে আনে।

—কত চাই?

—যা দেবে কিছুই থাকবে না, বিশ পঁচিশ পঞ্চাশ যা আছে দাও। তবে শোধ দিতে পারব না কিন্তু, আঠারো টাকা হপ্তার মালকাটা ; কোথায় পাবো বলো?

টাকাগুলা হাতে নিয়ে গৌরীকে ডাকে বসন্ত—দরজার কাছে এসে দাঁড়াল গৌরী, সমস্ত টাকাটাই তার হাতে তুলে দেয় বসন্ত—আমার বোন দিয়ে গেল, তুমি কিছু রাখো, বাকি ওই যে ধাওড়ার দাওয়ায় বসে আছে বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে ওরা, ওদের দিও। কে দিল যেন জানতে না পারে, বুঝলে ?

মাথা নাড়ে গৌরী।

—তোমার জন্য রাখলে না ? এষা আগাগোড়া ব্যাপার দেখে প্রশ্ন করে।

পকেট থেকে পাঁচটা টাকা বের করে আর খাটিয়ার নীচে মকাইএর অর্ধেক থলিটা দেখায় বসন্ত—সাতদিন নিশ্চিন্ত চলবে, পরে দেখা যাবে।

এষা উঠে পড়ল, নমিতা অস্বস্তি বোধ করছে। গুমোট ঘরটা বিড়ির ধোঁয়ায় থিকথিক করছে। দম বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম। বসন্ত টান টান হয়ে ঝুলে পড়া বাবুই দড়ির খাটিয়ায় শুয়ে পড়ে, ক্লান্তিতে চোখ বুজে আসে।

কে এল আর গেল তার হিসাব রাখে না, কিছুক্ষণের মধ্যেই নাক ডাকতে থাকে নিশ্চিন্ত আরামে। যেন আশেপাশে তার কিছুই হয় নি। দুদিন দুরাত্রির দুঃসহ ক্লান্তি ঘুমের গভীরে অবগাহন করে ধুয়ে নিতে চায় সে।

নমিতা চুপ করে বসে আছে গাড়িতে, এষা বলে ওঠে,

—জীবনে সে কোন দিন ক্ষমা করতে পারবে না বাবাকে।

নমিতা কথা কইল না, নিজের মনে নিজেকেও কোথায় অপরাধী বলে ভাবে নমিতা। চোখের সামনে বসন্তের কঠিন জীবনটা তাকে নিষ্ঠুর ভাবে আঘাত করেছে। মাথা নীচু করে ক্লান্ত হতাশ পদক্ষেপে চলেছে মালকাটা—বেকার কর্মহীন। ওপারের শালবন সীমায় গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি নেমেছে।

স্তব্ধ দিগন্ত। পৃথিবীর শেষ সীমা রচনা করেছে ওই দূর নীল পর্বতসীমা পাথরের কঠিন বেষ্টনী দিয়ে, তবুও বর্ষার ছোঁয়া লেগে ঘন সবুজ তার সর্বাঙ্গ, বর্ষার ধারা ব্যর্থ হয়নি ওর প্রস্তরশাসনেও।

স্তব্ধ শান্ত অন্ধকার পুরী। মাঝে মাঝে গ্যালারির গায়ে জল লেগে ছপ. ছপ্ শব্দ হচ্ছে, একফালি আলো তীক্ষ্ণ তির্যক রেখায় আঁধার ফুঁড়ে নিথর

জলের উপর পড়েছে একটুখানি জায়গায়, জলের বুক থেকে ধোঁয়া উঠছে ক্ষীণ পাতলা রেখায়।

খক্ খক্ খক্! কাসছে ন্যাপলা।

বসে থাকবার সামর্থ্য তার নেই, পাথরে মাথা দিয়ে পড়ে আছে। মাঝে মাঝে উপর থেকে চুঁইয়ে পড়ছে বিন্দু বিন্দু জল। অতিষ্ঠ হয়ে একটু নড়ে শোবার চেষ্টা করে মাত্র, পারে না। অস্ফুট গোঙানির শব্দ ওঠে নিস্তব্ধ বাতাসে।

—কষ্ট হচ্ছে ন্যাপলা? মাখন শুকনো কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে।

কেষ্ট কাঠি পুঁতে রেখেছে জলের নীচে; সেইটাই পরীক্ষা করছিল। জলের মাপ নামছে অল্প। ওদের কথায় বলে ওঠে,

—আর একটা দিন সবুর কর, বালিজুড়ির হাসপাতালে গিয়ে দোতলার বারান্দায় শুয়ে শুয়ে দেখ কেন্নে যত পারিস দামোদরের তেমাথা; আর টাটকা লেবু—ফল ফুলুরি খাবি এন্তার। ফুটফুটে মেম দিদিমণিদের দেখবি ড্যাব ড্যাব করে।

ন্যাপলা জবাব দেয় না—বুক পিঠ যেন সেঁটে এক হয়ে গেছে! জল—জল আর জল। চুবে উঠেছে। নীচে জলের ভিজে বাতাস, মাথার উপর থেকে চুঁইয়ে পড়ছে জল। সর্দি, শ্লেষ্মা আর কাশি—ত্র্যহস্পর্শ যোগ ঘটেছে। কাশতে কাশতে হঠাৎ থেমে যায়—তরল নোনতা স্বাদ মাখা কি বেরিয়ে আসে খানিকটা।

কান্না ভেজা কণ্ঠে সে আর্তনাদ করে ওঠে।

হাঁপাচ্ছে—উপরে লিয়ে চল আমাকে। কুনদিন আর আসবো নাই খাদে। ভিক্ষে মেগে খাবো সেও ভালো, মরে যাবো ইখানে মাখন কাকা। একটু আলো, একটু হাওয়া! সকালের রোদ!

বিড় বিড় করছে মুমূর্ষু লোকটা; এই বন্দীপুরী থেকে মুক্তি চায় সে।

শরণ সিং চুপ করে পড়ে আছে; হেলমেটটা চিৎ করে নামান; কেষ্ট তাতেই খানিকটা জল এনে ওর মুখে চোখে দিতে থাকে। ন্যাপলা স্থির হয়ে পড়ে আছে।

—জ্বর, গায়ে ধান দিলে যে খই ফুটবেক গো।

শরণ সিং দাড়ি চুলকোচ্ছে—ক্যা কিয়া যায়ে গা?

করবার কিছুই নেই। রুটি কখানার আয়ু শেষ হয়ে আসছে। জলে ভিজে ডাব পাকিয়ে গেছে কখানা রুটি।

দিন ঘণ্টার হিসাব সব গুলিয়ে গেছে, একাকার হয়ে গেছে। তিনটে বাতি নিভেছে; চব্বিশ ঘণ্টা করে জ্বলে এক চার্জে, তিনটে পর পর নিভেছে। রুটি ঠেকেছে মাত্র চারখানায়; মাখন খানিকটা করে আটার ডেলা তুলে দেয় ওদের হাতে।

—নে চিবিয়ে জল খা। তারপর কি হবেক বোঙা জানে।

বুধনের নীল চোখ জ্বলছে। ন্যাপলা পড়ে থাকে—না, খাবো নাই, উপরে লিয়ে চল আমাকে।

—যাবি। কে বলে ওঠে।

—এখুনি যাবো, ঠেলে উঠতে চায় ন্যাপলা। চোখ দুটো জ্বরের তাড়সে করমচার মত লাল হয়ে উঠেছে—জ্বলছে ধক্ ধক্ করে।

—এ্যাই! শরণ সিংএর ধমক খেয়ে বসল আবার।

কে জানে বাইরে বোধ হয় এখন রাত্রি; নীরব নিস্তব্ধ রাত্রি, তারায় ঢাকা আকাশ; পাহাড়ের মাথায় চাঁদ উঠেছে; দূরে দূরে জ্বলছে আলোর মালা।

বাতাস, রাতের বাতাস কাঁপে গাছে পাতায়, ছায়াঘন কেলিকদম গাছে ফুটেছে বর্ষার জল পেয়ে গোল গোল কদম ফুলগুলো।

একটা সুর উঠছে অন্ধকারে, বুধন কোমর থেকে ছোট বাঁশীটা বের করে ফুঁ দিচ্ছে। কান্নার মাঝে আনন্দের ছোঁয়া লাগা সুর।

উঁচু নীচু হয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে সুরটা। মহুয়া ফুলের গন্ধ আর লাল পথের স্বপ্ন আনা সুর; মন ছুটে যায়। শালবনের দূর থেকে বার বার কে ডাক দিয়ে যায় তারাজ্বলা প্রদোষ-আলোয়।

দিগন্ত সীমাপারে হারিয়ে যাওয়া উধাও বিবাগী মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

পথ ঢেকে গেছে শালফুলের চূর্ণ কণায়; বাতাসে শনশন শব্দ, চিকণ পাতাগুলো দমকা হাওয়ায় এ ওর গায়ে লুটিয়ে পড়ছে।

ন্যাপলা উৎকর্ণ হয়ে শোনে; নদীপারের ডুংরি ছেড়ে এসেছিল কোন স্বর্ণ মৃগয়ায়, আজ সেই পাপের জন্যই যেন বন্দী হয়ে গেছে; একটু আলো, একটু বাতাস—ফুলের সৌরভ যেন সারা মনে সে মিশিয়ে নেয় ওই সুরে সুরে।

বুকের ব্যথাটা কমে আসছে। নিঃশ্বাস নিতে আর কষ্ট হয় না।

চোখ বুজে চুপ করে পড়ে থাকে ; মাটি ! নরম সবুজ ঘাসে ঢাকা শ্যামলা পৃথিবীর এইটুকু স্পর্শ পেতে চায় সে। দু হাত দিয়ে প্রাণপণে আঁচড়াচ্ছে—নখে বিঁধে যায় শুধু পাথর আর পাথর।

সারা মন চায় শিশির ভেজা একটু সবুজ স্পর্শ, ঘাসের মাথায় মাথায় মানিক-জ্বলা একটুকু শিশির কণা ! সুরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে—রন্ধ্রপথে, জলের বুকে।

কেষ্ট গুম হয়ে বসে কি ভাবছে—কেন জানে না বার বার গৌরীকে মনে পড়ে ; সেই ডাগর চাহনি ; যেন বনের হরিণ ; দূর সবুজ বনের আড়াল থেকে বার বার তার দিকে চায়।

থামল বুধন ; সুরটা তখনও দূর রন্ধ্রপথে জলের বুকে ধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলে ফিরে আসে।

কেষ্ট বলে—বিয়ে করেছিস র‍্যা, এই বুধন।

—উঁহু।

—তবে রং ধরেছে ? ছুঁড়িটো কেমন রে ? বেশ ডবকা ?

লজ্জায় মাথা নুইয়ে আসে বুধনের—হিঃ।

—তবে আর কেনে উঠে গিয়েই ঝুলে পড় ; এক জালা মদ—একটা বরা ; আর ভাত।

—হুঁ ! তিন গণ্ডা লাগবেক ট্যাকা। তা জমাইছি।

—তবে আর কেনে ? চল তুর, তোর বাপেরও বিহা হুব উঠে গিয়েই। ঘর বাঁধবি ধাওড়ার পাশেই।

—উঁহু ! ফুলডুংরিতে ফিরাই যাবো।

—কেনে রে, ডবকা বৌ বিহাত হয়ে যাবেক নাকি ?

—ইখানে থাকবো নাই। চিনকুটী ছেড়ে ঘরে যাবো।

—ঘর ! বার বার সুর কেটে যায়। মাখন চুপ করে চেয়ে থাকে ওর দিকে। হুগলী জেলার কোনখানে ঘর বাঁধবে সে। সবুজ মাটি—হলুদ বন, রূপোলী নদী। একটা গরু পুষবে—চালে লতিয়ে উঠবে ঝিঙে লতা। সকালের ম্লান আলোয় ফুটে উঠবে হলুদ ঘন ফল।

এখন বোধ হয় বৈকাল।

ঠিক সময় হিসাব করতে পারে না ; কেষ্ট আনমনে ঢিল ছুঁড়ছে গ্যালারির জলে। কুপ কাব শব্দ ওঠে নিস্তব্ধতার বুকে।

—কিষ্টো ? মাখন বিরক্তি ভরা ফ্যাঁসফেসে গলায় হাঁক পাড়ে।

কেষ্ট হাসে—কেনে গো মামা। ঘুমের ব্যাঘাত হছে ? তা ঘুমোও, উপরে তো ঘুম ভালো হয় না। বড়ো মশা আর মাছি।

একটা শব্দ ওঠে জলে, জীবন্ত কি যেন বস্তু নড়ছে ছপ ছপ করে। উৎকর্ণ হয়ে ওঠে তারা—যেন মৃত্যুপুরীতে বিদেহী কোন আত্মা এগিয়ে আসছে তাদের দিকে ; আতঙ্কে ভয়ে স্তব্ধ হয়ে যায় তারা ; শরণ সিং উঠে বসে। নীলচোখের তারা দুটো জ্বলছে।

—কি যেন নড়ে উঠল মনে হছে !

—চুপ দে ! মাখন ফিস ফিস করে বলে। কণ্ঠে তার জমাট ভয়ের ছাপ।

আবার সব চুপচাপ। একটা স্তব্ধ আতঙ্ক বাসা বেঁধেছে আঁধারে ; আলোটা নিভিয়ে দিয়ে বসে আছে জড়াজড়ি করে। হ্যাপলাও স্তব্ধ হয়ে গেছে। কি এক নিবিড় আতঙ্কের ছায়া নামে আঁধারে আঁধারে মাটির অতলে।

নিমেষ চুপ করে বসে আছে। কখনও এমন সমস্যার সামনে সে পড়েনি। ব্লেজার, ফস্টার, রবার্টও এসেছে। কোলিয়ারি ফ্লাডেড করে দেওয়া হয়েছে। প্রথমত আগুন নেভানোর জন্য এবং দ্বিতীয়ত তদন্তকারীদের সামনে থেকে দুর্ঘটনার সমস্ত প্রমাণ ভাসিয়ে দেবার জন্যই। ব্লেজার নিমেষকে কথাটা বলে। ভাবছে নিমেষ, চারিদিক থেকে গোলমাল যেন কালো মেঘের মত ছেয়ে আসছে।

কিন্তু পিট পাম্প করে আবার কায শুরু করতে প্রায় একমাস লেগে যাবে। ততদিন কাযও বন্ধ।

—এত মালকাটার মাইনে দিতে হবে ?

নিমেষের প্রশ্নে ফস্টার বলে ওঠে, বসিয়ে মাইনে দিতে রাজি নয় সে।

—কোলিয়ারির কয়েক লক্ষ টাকা লোকসান হয়েছে ; তারপর কম্পেন-সেশন দিতে হচ্ছে, দে স্হুড কনসিডার।

বিবেচনা করার কথা ওদের নেই। বসন্তকে দেখেছে নিমেষ। ঋজু শপথের মত মানুষটি। ফস্টার বলে ওঠে,

—ইউনিয়ন থেকে একটা চাপ এলে কিছু থোক সাহায্য দিয়ে আপোশ করবার জন্য ব্যবস্থা করছি। মেজবাবুও করবেন সেটা। কিন্তু—

ফস্টার থেমে গেল। এখানে ইউনিয়ন কর্তৃপক্ষকে দিয়ে কায উদ্ধার করতে গেলে গোপনে কিছু নৈবেদ্য লাগবে। এই কথাটাই প্রকারান্তরে জানিয়ে দেয়।

নিমেষ বলে ওঠে—তা দিতে হবে। কিন্তু কায চাই।

ফস্টার সিগারেট টানতে টানতে একটা চাল বাতলায়—তাছাড়া ওদের কোয়ার্টার ফ্রি দেবার প্রস্তাব করতে হবে। আমরা কিছু আলাপ আলোচনার পর তাই মঞ্জুর করবো চাপ এলে।

—এত কোয়ার্টার ফ্রি? নিমেষ অবাক হয়ে যায়; বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। দালালের চেয়ে মালিক।

হাসে ফস্টার—কিন্তু মাইনাস ওয়াটার এণ্ড লাইট। পরে ওয়াটার চার্জ, লাইট চার্জ ইত্যাদি বাবদ কিছু আদায় করতে হবে; তাতেই কষ্টিং পুষিয়ে যাবে। ইউ স্যাল নট লুজ এনিথিং ইন দি লং রান্।

নিমেষ ওর দিকে চেয়ে থাকে, খুদে পিট পিটে চেহারার লোকটির মাথায় এ সব বুদ্ধি গিজ গিজ করছে। ব্লেজার চুপ করে বসে আছে, শেষ মহড়া নেবে সে। ফস্টার এই উত্তেজনা চাপা দেবার জন্যই বলে ওঠে,

—ইন দি মিন টাইম, উই সুড পে সাম কম্পেনসেশন ফর দি ডেড। লিস্টও তৈয়ার হয়ে গেছে। এ সময় অন্তত একটা সহযোগিতার মনোভাব দেখাতে হবে।

ফোলিও ব্যাগ থেকে টাইপ করা ডুকপি লিস্ট বের করে। নারকুলিয়া হাসপাতাল থেকে ফিরে এসেই কাযে হাত দিয়েছে। যাদের কেউ আছে—বলবার, আপত্তি তোলবার, তাদেরই মুখ বন্ধ করা হয়েছে। বাকি সবগুলোকে বেহিসেবী খাতে রাখা আছে। তাদের ব্যাপারের এখনও তদন্ত চলছে। ক্রমশ চাপা পড়ে গেলে তদন্তও চাপা পড়ে যাবে -যতটুকু ফাঁকি দিতে পারা যায়।

নিমেষ তখনই জানিয়ে দেয়—ওদের মাইনের সম্বন্ধে আমার আপত্তি আছে।

বসন্ত, যদু মাহাতো চেয়েছিল সব সমস্যার আলোচনা একসঙ্গেই হোক। হাজারো লোক যারা এসেছিল আত্মীয় স্বজনের খোঁজে তাদের ক্ষতিপূরণ এবং বাকি দু'সিফ্‌টের মালকাটার হপ্তার প্রশ্ন একসঙ্গেই আলোচনা করা হোক। কিন্তু ফস্টার তার চেয়েও চালাক।

রবার্ট নতুন এসেছে এদেশে। সে বলে,

—নিউক্যাসল অন টাইনে সেবারকার এ্যাকসিডেন্টে কর্তৃপক্ষ ওদের দাবী মঞ্জুর করেছিল। ওরাও মজুরী পাবে—পাওয়া উচিত।

ফস্টার থামিয়ে দেয় ওকে—ইট ইজ নট ইংল্যাণ্ড মাই ডিয়ার, ইট ইজ ইণ্ডিয়া। ডোণ্ট ফরগেট ইট।

অর্থাৎ সাদা এবং কালো চামড়ার মধ্যে আইনগত পার্থক্য আছে এবং থাকবেই। এসব ব্যাপারে কোন কথা না বলাই ভালো। ব্রেজার চুপ করে থাকে; তার এজেন্সির টার্ম শেষ হয়ে আসছে। সেই কটা দিন পরে কোম্পানী যাকে যা দেবে দিক, তার কিছু যাবে আসবে না। সে বলে,

—কিল টাইম, টেক টাইম এনি হাও।

নিমেষ এসবের বোঝে কিছু; টাকাটা অন্তত ভাল করেই বোঝে। এতবড় লোকসানের পর এতগুলো বাড়তি টাকা দিতে সে নারাজ।

ব্রেজার বলে ওঠে—গত বছরে রেজিং হয়েছে প্রায় ষাট লক্ষ টন। প্রতি টনে খরচ খরচা বাদ দিয়ে প্রায় ছটাকা লাভ থাকেই; এবার কোলিয়ারি চালু হলে তার থেকে বেশি রেজিং হবে। অন্তত সত্তর লক্ষ টন। নিট লাভ অন্তত চারকোটি টাকা থাকবে। তার তুলনায় যদি কয়েক লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হয়, ছাট ইজ নেগলিজিবল্।

রবার্ট অবাক হয়ে গেছে এ দেশে এসে। সোনার দেশ ভারতবর্ষ। মাটিতে এখানে সোনা ফলে—মাটির নীচেও। তাদের দেশে শক্ত গ্রানাইট মেটামরফিক রকের কয়েক হাজার ফিট কাটলে তবে সামান্য প্রশস্ত কয়লার স্তর মেলে। চারফিট, দশফিট, বড়জোর পঁচিশ ফিট অবধি, তাও অনেকক্ষেত্রে লিগনাইট শ্রেণীর বাজে কয়লা; কোথাও কোথাও সমুদ্রের নীচে তিন চার হাজার ফিট নীচেও নেমেছে সেই স্তর; হামাগুড়ি দিয়ে কোনরকমে সেই কয়লা কেটে তুলতে হয়।

কিন্তু এখানে কয়লার স্তর কোথাও মাটির পাঁচ দশ ফিটের মধ্যে থেকেই শুরু হয়েছে। উপরের শক্ত পাথর ডিনামাইট দিয়ে ব্লাস্টিং করে উড়িয়ে দিয়ে পুকুরের মাটি তোলা করে ওঠানো হয়; বাকি যা ঢালু ইনক্লাইণ্ড বা চানকপিট আছে তাও সাধারণত পাঁচশো থেকে হাজার দেড়েক ফুটের মধ্যেই। দুটো স্তর নিয়ে কয়লা তোলে। এক একটা স্তরে জমা কয়লার পরিমাণও বিস্ময়কর। প্রায় পঁচিশ ফিট থেকে শুরু করে একশো ফিট পর্যন্ত চওড়া

সেই স্তর ; কয়লা তুলে শেষ করতে পারে না। অল্প খরচে যা পারে তুলে আনে—অর্ধেকের মত ; তারপরই পড়তা বেশি খরচের মধ্যে কয়লা তুলতে হলে সেই পিট পরিত্যাগ করে গিয়ে অন্যত্র আবার কোলিয়ারি খোলে। এদিকের জমানো অর্ধেক কয়লা উপরে আর ওঠে না ; ধ্বসে চাপা পড়ে—বুজে উঠে সে কয়লা, মানুষের নাগালে আর আসে না। দেশের অমূল্য সম্পদের এমনি অপব্যয় করে এরা।

দেখে অবাক হয়েছে রবার্ট ; চেষ্টা করলেই এর থেকে কর্তৃপক্ষ অনেক বেশি রোজকার করতে পারে—মালকাটাদের এই সামান্য দাবী মিটিয়েও অনেক থাকবে তাদের, কিন্তু সেটার রেওয়াজ এখানে নেই।

চুপ করে সিগার টানছে।

টাইপ হয়ে চলেছে ওপাশের ঘরে। দুজন টাইপিস্ট বসেছে। কর্তৃপক্ষ এবং মাইন্‌স বোর্ডকে অ্যাকসিডেন্টের পুরো রিপোর্ট দিতে হবে। মিঃ মিত্র এসে ঢোকে, কদিন কথা পাড়বার সময় পায়নি। আজ তৈরি হয়ে এসেছে।

—আমার বিলগুলো ক্লিয়ার করে দাও ফস্টার ; আমি আজই চলে যাবো ভাবছি।

নিমেষ ওর দিকে চেয়ে থাকে ; ব্লেজার যেন দেখতেই পায়নি ওকে।

নিমেষই বলে ওঠে—বসুন।

ফস্টার অবাক হয়ে গেছে—মানে ! কোথায় যাবেন ?

তার চেয়ে বিস্মিত হবার পালা মিত্র সাহেবের,—কেন আমার রেজিগ্‌-নেশন অ্যাকসেপট্ করেছো, আমি তো এখন নন-এন্‌টিটি।

ব্লেজার কাগজ থেকে মুখ তুলে চাইল—পিটপিটে চোখে তার ঘনপলক পড়া নির্বাক চাইনি। পাইপের ছাই ঝেড়ে বেশ স্থির কণ্ঠে প্রশ্ন করে,

—তুমি রেজিগ্‌নেশন দিয়েছিলে ?

—অ্যাণ্ড ইউ অ্যাকসেপ্‌টেড ইট। মিত্র সাহেবের চোখ মুখ ঝাঁ ঝাঁ করছে চাপা রাগে।

—আমি ! অব অল পারসনস্ আমি ?

—ইয়েস।

—এ সময় ও প্রশ্ন উঠতেই পারে না মিঃ মিত্র। এখন আপনি নিজেকে

বাঁচাবার জন্য এই কথা যে বলছেন না—কি করে বিশ্বাস করি। এ ব্যাপারে আপনারও দায়িত্ব আছে, আপনি চার্জে ছিলেন।

মিঃ মিত্রের সামনে যেন কোলিয়ারির ধ্বস নামছে। কোনদিকে বেরুবার পথ নেই। দুদিক থেকে ঠেসে ধরেছে জমাট কালো পাথর—হাওয়াটুকু পর্যন্ত রুদ্ধ। শেষ শক্তি একত্রিত করে মিঃ মিত্র বলে ওঠে—আমার রিপোর্ট কোনটাই মানোনি তুমি। দিনের পর দিন আমি জানিয়েছি কোলিয়ারির অবস্থার সম্বন্ধে, আমার লগবুকে তার কপি আছে। কিন্তু সেই নির্দেশ মত কোন কাযই হয় নি, সেই কারণেই আমি প্রতিবাদ হিসাবে পদত্যাগ করেছি এবং তুমিই এজেন্ট হিসাবে সেটা মঞ্জুর করেছিলে।

—হ্যাভ ইউ গট দি কপি অব অর্ডার? ব্লেজার স্পষ্ট আইনের কথা বলছে।

তাড়াতাড়িতে ওটা নেওয়া হয় নি, তারপরই একটা ইন্‌টারভিউ দিতে চলে গিয়েছিলেন মিঃ মিত্র। ফিরে এসে ওটা আর নেওয়ার সময় ছিল না।

ব্লেজার হাসছে, নিমেষ এসবের কিচ্ছু জানে না। তবে অনুমান করতে পারে কোন একটা গণ্ডগোল ঘটেছে। ব্লেজার পাইপে তামাক পুরে বুড়ো আঙ্গুলের টিপ দিয়ে ঠাসছে ফাইন কাট ট্যাবাকো; যেন অতি তুচ্ছ একটা ঘটনা, মনের কোথাও রেখাপাত করেনি তার।

মিঃ মিত্র স্তব্ধ হয়ে গেছে। ব্লেজার বলে ওঠে,

—টেক ইট ইজি মিঃ মিত্র; অ্যাকসিডেণ্ট ইজ অ্যাকসিডেণ্ট। ডোণ্ট গেট নার্ভাস। ইউ উইল ল্যাণ্ড নো হোয়্যার।

অর্থাৎ তাকেও জালে জড়িয়ে ফেলতে চায় ওই ধূর্ত শয়তান। মিঃ মিত্র জানে কোলিয়ারি রেগুলেশন। এতবড় অ্যাকসিডেণ্টের তদন্ত হবেই এবং জনমতকে চাপা দেবার জন্য অন্তত শাস্তি কাউকে দিতেই হবে।

ওরা নিজেদের গা বাঁচাবার জন্য যা হোক কিছু একটা করবেই। নইলে তার রেজিগ্‌নেশন মঞ্জুর করে কয়েক দিন পরই সোজা অস্বীকার করে বসতো না।

—ইট ইজ এ কনস্‌পিরেসি মিঃ ব্লেজার। অফিস বুকে এনট্রি করে সেই চিঠি তোমাকে পাঠিয়েছিলাম।

—মে বি, কিন্তু সেটাকে মঞ্জুর করা হয়েছিল কিনা আই ক্যাণ্ট রিমেমবার।

চুপ করে নেমে এল মিঃ মিত্র। সকালের রোদ মলিন বিবর্ণ হয়ে

উঠেছে। পথে পথে বিবর্ণ ক্লান্ত মুখ; কেউ যেন তাকে চেনে না। এতদিন কোলিয়ারিতে কায করেছে—চেষ্টা করেছে সাধারণ মজুরের ভালোর জন্যই। মালিকের বিরুদ্ধে কথাও বলেছে, কঠিন কথা।

আজ সেই সব কিছুরই জবাব দিতে প্রস্তুত হয়েছে ব্লেজারের দল। কোলিয়ারির অতলেই নয়—তার মনেও শুরু হয়েছে একটা প্রচণ্ড আলোড়ন। কিছুই করবার তার নেই।

ফড়িং সরকারের দ্বিতীয় পক্ষের সম্বন্ধি খবরটা পাবা মাত্র ছুটে এসেছে। কেবল ছোঁ ছাঁ ভাব। ছাপোষা লোক, ঘরে পোষ্য অনেক; ফড়িং সরকার বেঁচে থাকতে দু একবার এসেছিল কিন্তু ওর ভাব গতিক সুবিধার নয় দেখে বোনাই-এর সঙ্গে ছোড় ছাড়ই হয়ে গেছল তার। ফিচকেল লোক—আসানসোল কোর্টে মুহুরীগিরি করে, অবসর সময়ে এটা সেটা পাঁচ কাযে থাকে। দড়ির মত পাকানো দেহ, গোল গোল চোখ দুটো ভাঁটার মত ঘুরছেই।

এসে বালি কাগজ আর একটা পেন্সিল নিয়ে হিসাব করতে শুরু করে। যোগ বিয়োগ দিয়ে মন্তব্য করে—কয়েক হাজার বটে! নাবালকের সম্পত্তি বাবা! ভূতেও হাত দেবে না।

মঞ্জরী দাদার দিকে চেয়ে থাকে; নস্থ মিত্তির এদিক ওদিক চেয়ে স্বর নামিয়ে বলে,

—সেই ছেলেটা কোথায়? সেটা আবার ভাগ বসাবে নাতো? তারপর ওই ধিঙ্গী আইবুড়ো মেয়ে তোর গলায়! ধুতে বাছতে তোর আর ওই কচি-ছেলেটার ভাগ্যে থাকবে কি বল?

মঞ্জরী কদিনেই স্তব্ধ হয়ে গেছে। অসহায় একা নারী। সেই তেজ কি তাপ আর নেই। শুকিয়ে গেছে গতর। দাদার কথায় বলে ওঠে,

—তুমি যা ভাল বোঝ কর বাপু! ওসব আমার আসে না। নাহলে তোমাকে ডাকতাম?

নস্থ কদিনেই কায জমিয়ে নিয়েছে। মুহুরীগিরি করে কি হয়? তার চেয়ে লালাজীর রাণীগঞ্জের তেলকল ধানকলে যদি চাকরি পায় সুরাহা হবে সবদিক থেকেই।

লালাজীও ক'দিন থেকে বাড়িতে আসছে। অভয় দেয় মঞ্জরীকে।

—আপনি চুপসে বসিয়ে থাকেন। সরকার বাবু আমার দোস্ত ছিলেন। টাকা উকার বন্দোবস্ত্ সব করিয়ে দেবে ফস্টারকে বলে কোই ফিকির সে।

নস্থ মিত্তির হুকুম করে—কই রে, লালাজীকে চা এনে দে।

—আবার চা কেনে ?

আহ্লু চা নিয়ে আসে। লালাজী দেখছে ওকে।

মনে মনে কি ভাবে। রাণীগঞ্জের কাছে একটা কোলিয়ারি সস্তায় পাচ্ছে। যো সো করেই হোক লালাজী কিনবে সেই কোলিয়ারি।

পুরুষ্ট গড়ন, কালো মাজা মাজা রং। আহ্লুর প্রথম যৌবন যেন উপ্ছে উঠছে। মাথা নীচু করে ওর জ্বলন্ত দৃষ্টির সামনে থেকে সরে আসে সে।

লালাজীই কথা শুরু করে—সাহেবকে ভি বলেছে। রুপেয়ার সব বন্দোবস্ত করেছি। এক টাইম হামরা সাথ যাকে ব্যস লে লেনা। ক্যায়া মিত্তির বাবু?

নস্থ মিত্তির গলে পড়ে—তা আপনার দয়াতেই হল লালাজী।

—আরে রামজী কা ইন্ছা। আচ্ছা ভাইজী আব চলে। রাম রাম।

লালাজীকে বাড়ির সীমানা অবধি এগিয়ে দিয়ে গেল নস্থ মিত্তির। ফিরে গিয়ে মঞ্জরীকে গলা নামিয়ে কি বলে ফিস ফিস শব্দে। আহ্লু সরে গেল সেখান থেকে।

কদিন আগে এসেছিল ভক্তি। ফড়িং সরকারের শেষ কাযও করতে পায়নি। নস্থমামা সাত তাড়াতাড়ি গলা পচা মৃতদেহটা লালাজীর মারফৎ আনিয়ে মুক্তিকে দিয়ে মুখাগ্নি করিয়ে দেয়। ভক্তি কোন কথা বলেনি, নস্থ-মামাই সাত তাড়াতাড়ি বলে ওঠে,

—ওর শেষ ইচ্ছা বাবা ; ত্যজ্যপুত্রের হাতে আগুন পানি নিতে চায়নি সে। আহা! পুরুষ ছিল হে, একটা তেজী পুরুষ।

নস্থমামা জের টানে—তালে কাজ কর্ম সুন্দরচকে ভালোই চলছে বল। আমি তো ওদের নিয়ে যাচ্ছি। শিয়ারশোলে গিয়েই শেষ কায করাবো। তবে আমি অকৃতজ্ঞ নই হে ; হোক না সে ফড়িংএর সৎমেয়ে, তবু তার ভার আমি নিলাম ; ঘরের খেয়ে থাকুক, মেয়ে তো নয়, মা লক্ষ্মী !

আহ্লুর প্রশংসায় ফেটে পড়ে নস্থমামা। ভক্তি কথা বলেনি। দামোদরে স্নান সেরে আবার সুন্দরচকেই ফিরে যায়।

আদু কাঁদছে। মঞ্জরী, নস্নুমামা সান্ত্বনা দেয়।

—তোর ভাবনা কি বাছা। জলে ফেলে তো দেয় নি কেউ তোকে।

ভক্তি তবু স্থির থাকতে পারে না। একটি মাত্র সম্পর্ক। আদু তার আপন বোন। বিরাট পৃথিবীতে তারা মাত্র দুজন। একবার ভাবে এনে তুলবে তাকে এইখানেই। দু ভাই বোনে যেমন করে হোক দিন কাটাবে। কিন্তু মঞ্জরী ওকে ছাড়তে রাজি নয়। পেট খোরাকিতে ঝি মেলা দায়।

আজও এসেছে ভক্তি। বাড়িতে পা দিয়েই দেখে মঞ্জরী কাপড় চোপড় ছেড়ে তৈরি হয়েছে। নস্নুমামা কোঁচকানো দোমড়ানো একটা নেপথলিনের গন্ধমাখা পাঞ্জাবী আর চাদর চাপিয়ে কোথায় বেরুতে যাবে, সামনেই ওকে দেখে একটু বিরক্ত হয়, মঞ্জরীও। ঠিক যেন সন্ধান পেয়ে বাগড়া দিতে এসেছে।

বিরক্তি চেপে রেখে অভ্যর্থনা জানায়—এসো বাবা।

আদু একটা কম্বলের আসন পেতে দেয় দাদাকে।

ওদিকে নস্নুমামার সঙ্গে চোখে চোখে মঞ্জরীর কি ইশারা হয়। দুজন দুদিকে বের হয়ে গেল একটু পরেই। আদু বলে ওঠে,

—টাকা আনতে গেল অপিসে।

কথা কয় না ভক্তি। একটু চুপ করে থেকে বলে ওঠে,

—তুই সুন্দরচকে চল আদু। ওইখানেই থাকবি।

কি ভাবছে আদু। লালাজীর সেই দৃষ্টি তখনও যেন সারা মনে জ্বালা ধরায়। নস্নুমামার হাসি কথাগুলোও কেমন ট্যারা বাঁকা। অজানা ভয়ে শিউরে ওঠে মাঝে মাঝে। এত কি হাসি গল্প হয় তাও জানে না সে, ওই লালাজীর গদিতে নাকি চাকরি করবে নস্নুমামা।

একটু ভেবে বলে ওঠে আদু—তোমাকে চিঠি দোব, যদি অসুবিধা হয় নিয়ে এসো। এত করে বলছে, না গেলে কি ভাববে।

ভক্তি মাথা নাড়ে।

জানে। ওরা কোন সম্বন্ধই আর রাখবে না তার সঙ্গে। নস্নুমামা বোনকে নিয়ে যাচ্ছে—ওর টাকার জন্মই। সেগুলো যতদিন থাকবে ততদিন ভক্তিকে তারা পুছবে না।

অভ্ররোদ গেরুয়া হয়ে আসে। ওরা তখনও ফেরেনি টাকা নিয়ে। ফেরবার আগেই পথে নামে ভক্তি।

জনশূন্য পথ; দু'চার জন আসা যাওয়া করছে। বাকি ভিড় জমিয়েছে অফিসে। আঁকড় গাছের পত্রহীন ডালে ফুলের মঞ্জরী; কাঁটার বুকে ফুল ফুটেছে কেয়া ঝোপে। বদলে গেছে চিনতোড়। সেই হাসি আনন্দ উচ্ছল বসতি এ নয়। বুক চিরে ওঠে ক্ষীণ কান্নার সুর। কাঁদছে এখানের মানুষ—মাটি, আকাশ, বাতাস।

দীর্ঘশ্বাস সেই পল্লব মর্মরে।

হঠাৎ পথের ধারে গৌরীকে দেখে থমকে দাঁড়াল। ক'দিনেই বদলে গেছে। সুন্দর চেহারায় এসেছে মালিন্যের ছাপ, চোখে জমাট কান্না!

—তুমি!

দুটি মানুষ; সব হারানো দুটি মন। কেষ্টও ফেরে নি নীচে থেকে। মানুষটার সব শেষ হয়ে গেল—বিনিময়ে পেয়েছে মাত্র কতকগুলো দলামোচা পাকানো নোট।

কেঁদে ফেলে গৌরী—আজ একটু আশ্রয় আর দুমুঠো ভাতের সমস্যাই বড় হয়ে উঠেছে গো। যাবো কোথায়?

কি ভাবছে ভক্তি। মনের মাঝে একক নিঃসঙ্গ একটি মানুষ হাহাকার করে ওঠে। বাতাসে বাতাসে দীর্ঘশ্বাস, ফুলে ওঠে দুর্বার বিক্ষোভে গেরুয়া দামোদর। সব বাঁধন আগল ভেঙ্গে ফেলতে চায় সে।

—পরে দেখা করবো গৌরী। তোমার কথা মনে রইল।

গৌরী কথা বলে না।

অন্য দিন তার সব ছিল, সেদিন হেসে অভ্যর্থনা জানিয়েছে। আজ সব হারিয়ে মাথা নীচু করে কাঙ্গালের মত হয়েছে গৌরী। সারা ভুবনের রং তার মুছে গেছে। ঝরে গেছে সব ফুলদল।

—এসো!

ভক্তি চলে গেল চড়াই-এর পথে।…

কোলিয়ারির পাতালের বিক্ষোভ এসে ঠেকেছে ওদের মনে। কয়েক দিনের মধ্যেই বসন্ত যোগাযোগ করেছে বিভিন্ন কোলিয়ারির কর্মীদের সঙ্গে; একা চিনতোড়ের বিপদ এ নয়; সমস্ত মালকাটা শ্রেণীর এ দাবী; এক-

জায়গায় আদায় করতে পারলে সমবেতভাবে চাপ দিয়ে সেই সুবিধা তারা সর্বত্র নিতে পারবে।

এভাবে কেউ চিন্তা করেনি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিক্ষিপ্ত ভাবে আন্দোলন করেছে তারা। সমবেত প্রচেষ্টার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু কেউ এগিয়ে আসেনি।

হাটতলার মাঠে বিরাট জনসমাবেশ ; কয়েকটা পিটের চাকা নিশ্চল হয়ে আছে, রোদের আভায় ঘূর্ণায়মান চাকাগুলো আর ঝিলিক তোলে না ; তিন নম্বর পিটের নুইয়ে পড়া ফ্রেমটাকে তুলে ফেলে নতুন হেডগিয়ার বসানো হচ্ছে। নীরব দিগন্তে ওয়েলডিং করার তীক্ষ্ণ শব্দটা একঝাঁক মেসিনগানের বুলেটের মত পট্‌ পট্‌ শব্দে বিঁধছে। আবার সব নীরব।

মেজবাবুও তার দলবল নিয়ে লেগেছে। বেশির ভাগ সংগৃহীত হয়েছে ওই নবাগত লোকজন—মালকাটার স্ত্রী-পুত্র নিয়ে। টিলার উপর নীচে বসে দাঁড়িয়ে শুনছে তারা ; মাইকে ঘোষণা করছে মেজবাবু উদাত্ত কণ্ঠে। —তোমাদের ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য আমরা সংগ্রাম করে জয়ী হয়েছি ; তাছাড়াও কোম্পানী যে ক'দিন পিট বন্ধ থাকছে সে কদিন বিনা পয়সায় রেশন দেবার ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়েছে। এ জয় আপনাদের সকলেরই। ইউনিয়নের জয়।

গর্জে ওঠে মদন লস্কর—মাইনে কই হে কিলা? রেশন, মুফোৎ হাত চাটবো নাকি ?

পতাকা উড়ছে কাঁচা বাঁশের মাথায় ; কে একজন মালকাটা বসেছিল, বলে ওঠে—খুব দিচ্ছে শালারা ; হপ্তার রেশন! কেনে পুরোরোজ দিতে হবেক ; বলুক কেনে পাথর ভাঙ্গতে, খাটাক—খাটবো ; তবু পুরোহপ্তা চাই।

—এ্যাই চুপ দিয়ে শোন। বুড়ো ধমক দিয়ে ওঠে। শুকনো বিবর্ণ চেহারা, মাথার চুলে ধুলো আর খড়কুটোর টুকরো লেগে রয়েছে। ধমক দিতেই মালকাটার দল গর্জে ওঠে লোকটাকে একসঙ্গে।

—ট্যাকা লিতে এসেছিস, ছেলেকে পুতে রেখে? হুরুকে যা ট্যাকা যা দিছে লিয়ে। আমাদের চাল ফাল দিলে চলবেক নাই। পুরোরোজ দিতে হবেক হ্যাঁ।

জোর গলায় হেঁকে ওঠে—দালালী করতে হবেক নাই মেজবাবু, তুমি থাম কেন্নে। পালোয়ান সিং এর দল এখনও ছড়িয়ে রয়েছে এদিকে। লোকটার ঘাড় ধরে হিড় হিড় টেনে নিয়ে যায় গালকাটা।

—বড় লম্বা লম্বা কথারে তুর ; তুব শেষ করে।

জনতা ক্ষেপে ওঠে—মাগনা নাকি হে ? তিনশো লুক মেরে বলে একশো, আবার তুমি আইছ শেষ দেখাতে ?

ভেঁদা মাঝি হেঁকে ওঠে—কে কাকে শেষ দেখাছে হে টুঁয়াই কাকা ? বল কেন্নে উকেই খেঁয়ে লি।

তুচার জন সোরগোল তোলে। বেগতিক দেখে গালকাটা সরে গেল। মেজ-বাবু মাইকে গলা তোলে—ভাই সব, চুপ করে শোন। আমরা কোম্পানীকে বিনা ভাড়ায় ঘর দিতে বাধ্য করিয়েছি।

মদন লস্কর ফোড়ন কাটে—ঘরে থাকবো কাকে লিয়ে হে ?

তারপরেই আর মেজবাবুর বক্তৃতা শোনা যায় না। ওদিক থেকে গণ্ডগোল উঠেছে। তু'চারটে ঢিল পড়ে। একটা গোলমাল দেখেই মেজবাবু আর পাঁচু নিকিরি সব ছেড়ে ছুড়ে গিয়ে লালাজীর মোকামে ঢুকেছে। একটা হট্টগোল ওঠে চারিদিকে।

জনস্রোত এগিয়ে আসছে। ওরা বিক্ষোভ জানাতে চলেছে পথে পথে। একা চিনতোড়ের মালকাটা নয়—আশেপাশের বহু জনতাও মিশেছে তাদের সঙ্গে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনস্রোত মিশে জলস্রোতে পরিণত হয়েছে। ওদের সামনে মেজবাবুর ওই সাজা রাজার সিংহাসন খড়কুটোর মত ভেসে যায়।

ওরা এসে অপেক্ষা করছে। আজকে মালিকপক্ষের সঙ্গে আলোচনার পর ওরা শোভাযাত্রা নিয়ে বের হবে।

হাটতলার সাজানো আসর ভেঙ্গে যায়। মালকাটারা বের হয়ে গিয়ে ওই বিরাট জনস্রোতের সঙ্গে মেশে।

মেজবাবু লালাজীর দোতলা থেকে চেয়ে দেখে।

—হ্যাঁরে ফেরা যাবে ?

পাঁচু জবাব দেয়—আজ্ঞে এখন না বেরুনোই ভালো। কি জানির কথা বলা যায় না।

মেজবাবু গজ গজ করে—না বাপু ; ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোতে আর নেই। এদিকে বদনাম, ওই দিকেও বদনাম। শাঁখারীর করাত—আসতেও কাটে, যেতেও কাটে !

পকেটে তখনও ফস্টারের দেওয়া টাকাগুলো রয়েছে। কয়েকশো।

এত টাকা নিয়ে পথে বেরুনো নিরাপদ নয়। ওদিকে পাঁচুও ভাগ চেয়ে বসবে দেখলে। বোধ হয় এই শেষ টাকা পাওয়া—ফস্টার মেজবাবুর দাম বুঝে ফেলেছে। অন্য কোন নেতা ধরবার চেষ্টা করছে তারা।

চিনতোড়ের কায বোধ হয় শেষ হয়ে আসছে। জনতা তখনও বসে আছে মাঠ ছেয়ে।

নিমেষের টেবিলে ছড়ান কাগজ পত্র; ব্লেজার, ফস্টার দুজনেই রিপোর্টটা শুনছে। কয়েকটা কাগজে ছবি বের হয়েছে; হেডলাইনে ছাপা হয়েছে চিনতোড়ের সংবাদ।

ভারতের বৃহত্তম খনি-দুর্ঘটনা। হতাহতের সংখ্যা অনুমান পঁচাশি জন, তারপর ছোট টাইপে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সব কাগজেই প্রায় এক রকম সংবাদ; কেবল একটা কাগজে বের হয়েছে হতাহতের সংখ্যা প্রায় তিনশো। এক সিফটের সর্বনাশের সংবাদ।

—হাও ডু দে স্কুপ দিস নিউজ ফস্টার? এভরি ডিটেলস্ ইজ দেয়ার। নিমেষ ওদের দিকে কাগজখানা তুলে ধরে। বাংলায় লেখা—অনুবাদ করে শোনায় নিমেষ। প্রায় সঠিক সংবাদ, এমন কি মালকাটাদের হপ্তাবন্ধ করার কথার উল্লেখও করেছে।

নিমেষ জোর গলায় বলে—কেউ এখান থেকে এই সংবাদ দিচ্ছে।

—আই থিঙ্ক সো।

—তাকে কি খুঁজে বের করতে পারো না? নারকুলিয়া?

নিমেষ যেন ক্ষেপে উঠেছে; সেই রাত্রের ঘটনাটার সাক্ষী সে। বুঝে ফেলেছে এদের বুদ্ধির দৌড়। তর্জন গর্জনই সার; কায কতটুকু করতে পারে তা জেনে ফেলেছে সে।

ওরা এমনি করে সারা দেশের সামনে সমস্ত তথ্য প্রকাশ করবে। মায় এয়ার স্যাম্পেলের টেস্ট রিপোর্ট অবধি।

স্লিপটা আসতে একটু অবাক হয়ে ওঠে নিমেষ। বসন্ত এসেছে আলোচনা করতে। বেয়ারার পিছু পিছু তারা ঢুকলো। ব্লেজার-ফস্টার কাগজখানা চাপা দিয়ে চেয়ে থাকে; যদু মাহাতো—বনমালী, আরও দুজনকে সঙ্গে নিয়ে বসন্ত এগিয়ে আসে।

চকচকে মোজাইক করা মেজে; নীল কাঁচের জানলা। বাইরের হাওয়া ধুলোর পথ রুদ্ধ; নিস্তব্ধতার মাঝে গুরু গুরু চাপা গর্জন করে চলেছে এয়ার কণ্ডিশনিং মেশিন, ঘরের ভিতর ঢুকে ওরা যেন কেমন ঘাবড়ে গেছে। যদু মেজেতেই বসল কজনকে নিয়ে, বাড়তি চেয়ারও নেই। ইচ্ছে করেই নিমেষ এটা করিয়েছে—বসন্ত দাঁড়িয়ে থাকে। বসলো না মেজেতে। ব্যাপারটা দেখে মাত্র।

—ইয়েস। ফস্টার নাক বাড়িয়ে কথা বলতে আসে।

বসন্ত পরিষ্কার ইংরেজীতে জবাব দেয়—আর ইউ অথরাইজড টু স্পিক মিঃ ফস্টার?

নিমেষ প্রসঙ্গটা চাপা দেবার চেষ্টা করে, রাগে অপমানে ফস্টারের মুখ চোখ লাল হয়ে উঠেছে। নিমেষ বলে ওঠে,

—হ্যাঁ, ম্যানেজার হিসেবে উনিই শুনবেন যদি বক্তব্য কিছু থাকে তোমাদের।

কাগজখানা এগিয়ে দেয় বসন্ত ওর দিকে। ফস্টার পড়তে থাকে। অখণ্ড স্তব্ধতা। ঝনঝন শব্দে বেজে ওঠে ফোনটা; মাইনস্ বোর্ড থেকে রিপোর্ট চাইছে।

নিমেষ জবাব দেয়—আজই পাঠাচ্ছি।

ওরা যেন অবিশ্বাস করছে এদের রিপোর্ট ওই সংবাদপত্রের বীভৎস তথ্য-গুলো বের হবার পর। আরও কত হুকুম আসে।

নাহলে কম্‌পেনসেশন দেওয়ার রিটার্নখানাও আজই চাইত না। সেটা এখনও অফিস থেকে ফেরৎ আসে নি। তাছাড়া কারচুপিও করবার যেটুকু আছে সেটা করা দরকার; বাজে টিপসই জুটিয়ে নিতে দেরী হবে না।

ওদের দাবীর কাগজখানা পড়ে ফস্টার বলে ওঠে—ইম্‌পসিবল।

এককথায় ঝেড়ে ফেলে দিতে চায় সবকিছু বিলকুল।

বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়, সূর্যের চেয়ে বালির তাপ।

বসন্ত এগিয়ে যায়—এই আমাদের দাবী।

—তাই মানতে হবে? নিমেষ জেরা করে কঠোর সুরে।

যদু মাহাতো, বনমালী রায়ের প্রথম থেকেই ওদের কথাবার্তাগুলো ভালো ঠেকে না। বসন্ত শান্তভাবে জবাব দেয়,

—অন্যায় নাহলে নিশ্চয়ই মানবেন, অবশ্য যদি কোলিয়ারি চালাতে চান।

ব্লেজার বলে ওঠে—ভয় দেখাচ্ছো ?

—মোটেই নয়, সত্যি কথা। দাবী যদি না মানো, মীমাংসা না কর, আমরা বাধ্য হবো অন্য পথ নিতে এবং তার জন্য এই এলাকার সমস্ত কোলিয়ারিই হয়তো বন্ধ হয়ে যাবে। কোলমাইন ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন, মাইন্‌স বোর্ডকেও এই মেমোরেণ্ডামের কপি দিয়েছি। তাদের কাছেও জবাব দিতে হবে তোমাদের। লুকিয়ে অসতর্ক ভাবে কোন পথ নিচ্ছি না, ক্লিয়ার নোটিশ দিয়ে মীমাংসার সব চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর, আমরা শেষপথ নোব।

নিমেষ দামী সেক্রেটারিয়েট টেবিলের উপর আলতো ভাবে আঙুল দুটো দিয়ে ঘা মারছে ধীরে ধীরে। মনের চাঞ্চল্য চেপে রাখতে পারছে না। দেবেশের কঠিন চাহনির দিকে চেয়ে থাকে, অজ্ঞাত অপরিচিতের ভিড় থেকে উঠে এসে আজ সে হাজারো জনের পুরোভাগে দাঁড়িয়েছে তার সামনে। দুটি যুধ্যমান মতের লড়াই।

মতামত জানায় নিমেষ।

—তিন হপ্তার মাইনে বসিয়ে দিতে পারবো না, তোমাদের ইউনিয়ন সেক্রেটারি তালরুইএর চৌধুরী বাবুকে সোজা বলে দিয়েছি। ফ্রি রেশন আর ফ্রি কোয়ার্টার স্যাংশন করেছে কোম্পানী, ইউনিয়নও সেই শর্ত মেনে নিয়েছে।

লালাজী, ইয়াকুব, মেজবাবুর চক্র। মাথায় ওই যদু পতিতুণ্ডি! এইভাবে তারা বঞ্চিত করেছে মালকাটাদের।

—কাদের ইউনিয়ন ? কে তার সভ্য ? বসন্ত গলা চড়িয়েই বলে ওঠে।

—সাজা রাজা গো। বনমালী বলে।

—গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল। জানলাম নাই, শুনলাম নাই বলে ইউনিয়ন মীমাংসা করে গেছে। উ সব মানি না, মানবো নাই। সোজা কথা। ব্যস! ফিরি ফিরতি কথা বলতে হবেক আমাদের সাথে।

যদু মাহাতো বেশ জোর দিয়ে কথাগুলো বলে ওঠে।

নিমেষ মেজেয় বসা ওই লোকটির দিকে চাইল। শপথের মত ঋজু ওর সর্বদেহ, পাকানো কঠিন চেহারা; বনমালী রায় কোলিয়ারি অঞ্চলে জনপ্রিয় নেতা; যদু পতিতুণ্ডির কলকাতাইয়া রাজনীতিকে মানে না সে। ভাল করেই জানে যদু পতিতুণ্ডির ইতিহাস। ছোট বড় কোলিয়ারির মালিকদের কাছে তার মাসিক বরাদ্দ আছে। টাকাটা কখনও নিজে না হয় মেজবাবুর মত

লোক মারফৎ কমিশন বাদ দিয়ে তার কাছে পৌঁছে পার্টির চাঁদার নামে। এর বিনিময়ে তার বিচিত্র রহস্যময় কার্য কলাপও কিছু ঘটে মাঝে মাঝে। কোন কোলিয়ারির মাল বেশি রেজিং হল, তেমন লোকাল সেল পাচ্ছে না, হঠাৎ আশপাশের কয়েকটা কোলিয়ারিতে ছুতোয় নাতায় বাধলো ধর্মঘট; বেশি চাহিদায় তাদের মালগুলো চড়া দরে বিক্রী হয়ে স্টক ক্লিয়ার হয়ে যাবার পরই অদৃশ্য হাত এসে ধর্মঘট ভেঙ্গে দিল, আবার চালু হল সব কোলিয়ারিই।

মাসকাবারি বরাদ্দের প্রতিদান দেয় জননেতা!

সেই যদু পতিতুণ্ডীর বিরুদ্ধে বনমালী রায় উঠে পড়ে লেগেছে।

একই সুরে নিমেষ জবাব দেয়—ইউনিয়ন এই শর্ত মেনেছে।

বসন্ত বলে ওঠে—যে ইউনিয়নকে শ্রমিকরাই মানে না, সেই ইউনিয়নের অস্তিত্ব কোনখানে? কাগজ কলমে? মালিকের দপ্তরেই তার অফিস।

—ডিজলভ দি ইউনিয়ন, দেন কাম। ব্লেজার বলে ওঠে।

বসন্ত উঠে পড়ে, মীমাংসার পথে ওরা যাবে না। এতবড় দায়িত্ব, তবু এ ছাড়া পথ নেই। শেষ বারের মত জানিয়ে দেয়,

—তোমরাই গড়েছ ইউনিয়ন বাইরে থেকে নেতা এনে। সে ইউনিয়নকে তোমরা মানতে পারো। আমরা মানি না। আমাদের দাবী জানিয়ে গেলাম। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে উত্তর পেতে চাই। নইলে এর পর যা ঘটবে সমস্ত দায়িত্ব তোমাদের।

নিমেষ চুপ করে বসে থাকে। ওরা উঠে পড়েছে। বসন্ত দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলে ওঠে,

—মিঃ ব্লেজার, আই লাইক টু মিট ইউ।

ব্লেজার একটু চমকে ওঠে; কদিন আগেই বলেছিল ওকে কথাটা। কিন্তু নিমেষের সামনে ওটা এড়িয়ে যেতে চায়। বলে ওঠে,

—এ সম্বন্ধে আলোচনা করতে আমরা প্রস্তুত। আমার অফিসে—বাংলোয় আসতে পারো।

বসন্ত কথা বলল না, নিঃশব্দে ভারি দরজাটা ঠেলে বের হয়ে গেল—দামী স্প্রিং বসানো দরজা। আবার নীরবে এসে লেগে গেল এয়ার টাইট হয়ে। ঘরের অখণ্ড স্তব্ধতা বিক্ষুব্ধ হয় না।

ওদের আসার সংবাদ পেয়ে এরা বারান্দাতেই ছিল। বের হয়ে আসতে

ওদের দিকে এগিয়ে আসে। নমিতা উঠে গেল সিঁড়ি দিয়ে উপরে, এসব আলোচনায় থাকতে চায় না সে। বসন্তের মুখে চোখে থমথমে একটা নীরব গাম্ভীর্য।

এইবার সেই কঠিন অগ্নিপরীক্ষার সামনে দাঁড়াতে হবে তাকে। একদিকে নিয়মিত উপবাস, কান্না—অন্যদিকে বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম। হাজারো জনতার মুখে নিশ্চিহ্ন আশার আলো।

—কিছু মীমাংসা হল ? এষা প্রশ্ন করে।

চমক ভাঙ্গে বসন্তের, বলে ওঠে—কোন আপোশ মীমাংসাতেই রাজি নয় ওরা ; জানে না—একটা স্ফুলিঙ্গ থেকে সারা কোলিয়ারির সর্বনাশ হয়েছে। এই তুচ্ছ আন্দোলনও উপরের জীবন ছারখার করে দিতে পারে। আগুন নিয়ে খেলছে নিমেষ।

বসন্তের মুখে চোখে দৃঢ়তা। কঠিন শপথের মত একটি মানুষ। ওকে দেখে চমকে ওঠে এষা। এ অন্য কোন দেবেশ ?

—তুমি বলেছ ও কথা ? এষা প্রশ্ন করে।

বসন্ত বলে ওঠে,

—দাদা হিসেবে কোন পরিচয়ই ওর সঙ্গে নেই এষা ; বসতেও বলে না মইলে ? আমি একজন মালকাটা শ্রমিক—ও সেই হাজারো মালকাটার প্রভু। সম্পর্ক সেইখানেই। যার অনেক আছে হারাবার ভয় তারই, যার কিছু নেই তার ভয় কোনখানে বল ? সে মরিয়া। তাদের নিয়ে খেলছে নিমেষ। পারো তুমি বুঝিয়ে বল।

এষা চুপ করে কি ভাবছে। সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। এর জবাব একদিন পেতেই হবে নিমেষকে, মিঃ চ্যাটার্জিকে, তা জানতো এষা। কিন্তু এভাবে—এই পথে, অতি প্রিয় আপনজনের হাত থেকে সেই নিষ্ঠুর শাস্তির বিধান আসবে তা ভাবতেও পারেনি স্বপ্নে।

নিমেষ পায়চারি করছে। ম্যেজারের সঙ্গে দেবেশের কথাটা ঠিক বুঝতে পারে না নিমেষ। মিটমাট আপোশের কথা তার সামনেই বলতো, তবে কি অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে পিছনে ?

ব্লেজারকে বিশ্বাস করতে পারে না নিমেষ। ধূর্ত কৌশলী লোক। এজেন্সি চলে যাবার আগে বোধহয় একটা কিছু অঘটন ঘটিয়ে যেতে চায়। মিঃ মিত্রকে এত সহজেই বিপদের মাঝে টেনে আনবে—তাও ভাবেনি নিমেষ। চুপ করে দেখেছে সব ঘটনা—তাই বিস্মিত হয়েছে ব্লেজারের ব্যবহারে।

এষার কথায় ফিরে চাইল। ব্লেজার, ফস্টার চলে গেছে একটু আগেই।

এষা এগিয়ে আসে।

—একটা মীমাংসা করা উচিত ছিল তোমার।

ব্লেজারের কথা ভেবে সামান্য ভয়ের রেশ যেটুকু ছিল মনে, এষার কথায় আবার তা মিলিয়ে যায়। আত্মসম্মান জ্ঞান টনটন করে নিমেষের।

—ওই বাফুনের সঙ্গে? গ্যাসে ভর্তি বেলুন আশমানে উঠেছে। গ্যাস বের হয়ে গেলেই আর খুঁজে পাওয়া যাবে না ওর অস্তিত্ব।

—এতদিন খুঁজে পাওনি। কিন্তু তিলে তিলে ও দুর্বার শক্তি সংগ্রহ করে আজ দাঁড়াচ্ছে। ওকে বাধা দিতে পারবে না। জানো না—ওর হাতে কি অস্ত্র আছে?

—ধর্মঘট? ব্যঙ্গের স্বরে বলে ওঠে নিমেষ।

—ওটা তো উপরি পাওনা; তার চেয়ে হাজার গুণ বেশি শক্তি তার; ভরসা এই—তা ওর মত লোকের হাতেই রয়েছে, প্রয়োগ সে করবে না।

—কি বলছিস তুই এসব! নিমেষ চমকে ওঠে। ওরা যেন একটা কিছু ব্যাপার চেপে যাচ্ছে। ব্লেজারকে অবিশ্বাস করে নিমেষ; দেবেশের সঙ্গে একটা যে কোন মীমাংসা করা যেতে পারতো। চ্যাটার্জি এণ্ড সন্স (প্রা) লিঃ-এর অন্যতম ডিরেক্টার নিমেষ চিন্তায় পড়ে।

সামান্য পরিমাণ টাকা দিলেই সব মিটে যায়—কিন্তু তবু সম্মানে বাধে তার। ওই বাউণ্ডুলে অপদার্থ দেবেশের সঙ্গে আপোশ করতে রাজি নয়; কোন হুমকিতেই টলবে না সে।

সিগারেটের ধোঁয়ায় গলা জ্বলছে; নমিতাও এসে ঢোকে চুপ করে। এই সব গোলমালের বাইরে সে। ভালো লাগে না। অসহ্য!

হাজারো জনতা চলেছে টিলার নিচে দিয়ে, ওরা এই মীমাংসার আশায় চুপ করেছিল। ব্যর্থতায় গুমরে উঠেছে। গর্জনে ভরে ওঠে আকাশ বাতাস। দামোদরের জলস্রোতের মত বয়ে চলেছে, কণ্ঠে তাদের দৃপ্ত ঘোষণা।

হাটতলায় মেজবাবুর আগেই পণ্ড হওয়া মিটিংএর আসরের রঙ্গীন কাগজের শিকলগুলো ছিঁড়ে নেংটো ছেলের দল মালার মত পরেছে গলায়।

বেকার মালকাটার দল গিয়ে ভিড়ছে ওই দলে—ওই শোভাযাত্রায়। ক'দিন পর নিস্তব্ধ চিনতোড়ের ছায়াঘন পথ আবার ওদের গর্জনে ফেটে পড়ে। লোহার কুলীর ঘরে কে কাঁদছে, বুড়ীর ছেলে গেছে খাদে আর ফেরেনি। সারা কোল ফিল্ড অঞ্চল যেন ভেঙ্গে পড়েছে। আশপাশের সব কোলিয়ারির লোকই শোভাযাত্রায় যোগ দিয়েছে। ভক্তির চুলগুলো তেল অভাবে দড়ি পাকিয়ে গেছে—বাতাসে উড়ছে ময়লা উত্তরী; বাবার ছিন্নভিন্ন দেহটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে, কালো কয়লার মত ঝামাপোড়া, বিকৃত হয়ে উঠেছে আরও কত দেহ।

ওদের কণ্ঠে সেও কণ্ঠ মিলিয়ে প্রতিবাদের স্বর তুলেছে।

স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রয়েছে নিমেষ, এষা, নমিতা। নীচের খাড়া পথ বেয়ে চলেছে জনস্রোত—মুখে চোখে তাদের প্রতিবাদের দীপ্তি—কণ্ঠে দামোদরের মুক্ত প্রবাহের কল্লোল গর্জন। জনতার আগে বসন্তের মাথার ব্যাণ্ডেজটা দেখা যায়; বলিষ্ঠতম হাতটা মাঝে মাঝে আকাশে উঠছে।

—ওদের বাধা দিতে পারবে তুমি?

এষার কথায় ফিরে চাইল নিমেষ; এতকাল উপরের তলায় ছিল, এত মুক্ত প্রাঙ্গণে জীবনের প্রকাশ সে দেখেনি। বন্ধুর পার্বত্য মৃত্তিকা, দুর্মদ নদী—আর অজানা পাতালের রাজ্যে এসে বিচিত্র জীবনের রুদ্রপ্রকাশ দেখে থমকে দাঁড়িয়েছে নিমেষ।

কথা কইল না; রোদ মাখা পাহাড় সীমার দিকে চেয়ে থাকে; উঁচু মাথা তুলে নিরাসক্ত চিত্তে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়সীমা; মনে হয় উঁচু—যে যত উঁচু, সে ততই নির্বিকার; উদাসীন।

জানলা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে এসে বসল নিমেষ। বসতে পারে না, কি ভেবে ফোনটা তুলে এক্সচেঞ্জকে বলে—কোলকাতা। পুট মি টু ক্যালক্যাটা ট্রাঙ্ক।

প্রকৃতির অন্ধকার অতলে গুমরে গুমরে উঠছে একটা স্বর—ক্ষীণ একটা রেখার মত ম্লান একফালি আলো। করুণ কান্নার মত স্বর। আলোটা জেগে

আছে একটা উঁচু খাঁজ কাটা জায়গাতে ; নীচে গড়াগড়ি যাচ্ছে কয়েকটা দেহ ; হ্যাপলার কাশি থেমে গেছে। ওদের মুখ ঠোঁট শুকনো ; ফাট ধরেছে।

—হ্যাপলা !

কোনরকমে তাকে নাড়া দিতে গিয়ে ওর গা থেকে হাতটা সরিয়ে নিল মাখন। চমকে ওঠে। হিম গা - জল ঝরছে উপর থেকে তবু নড়ে না আর। বেঁচে গেছে—মরে বেঁচেছে হ্যাপলা।

কতক্ষণ আগে মরেছে জানে না। একদিন ! দুদিন !

কতদিন ? ছটা বাতি নিভে গেছে। ছ দিন ছ রাত্রি। এখন উপরে বোধহয় সকাল। দামোদরের পারঘাটে এসে জমেছে দুচার জন হাটুরে ; হাটতলায় মণ্টার দোকানে কাঁচা কয়লার উনুন জ্বলছে—চেপেছে ফুলুরি বেগুনির কড়াই। কুকুরগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে সেই সকালের আলো আর বাতাসে মিষ্টি সোনা রোদে।

শরণ সিংএর দাড়ি-চুলের বাঁধন খুলে পড়েছে। আবছা অন্ধকারে ওর কোটরাগত চোখ দুটো জ্বলে ধকধক করে নিদারুণ আতঙ্কে। কাঁদছে সে ইনিয়ে বিনিয়ে আপন ভাষায়—কিথে যান্দা এ।

সেই দোর্দণ্ড প্রতাপ ওভারম্যান হাওয়া বের হওয়া বেলুনের মত চুপসে গেছে।

পাশেই পড়ে আছে হ্যাপলার মৃতদেহ, প্রাণের স্পন্দন আর কাশির শব্দ থেমেছে। ওর দিকে চাইতে পারে না।

কেষ্ট আর বুধন কি ভেবে ওর শীর্ণ কাঠির মত দেহটা তুলে নিয়ে গিয়ে স্যাপ্টের মুখে ছেড়ে দেয় নীচে থই থই জলে। টলছে তারা—কদিন রুদ্ধ তারা, তাদের জীবনী শক্তিটুকুকেও কুরে কুরে নিঃশেষ করেছে অতল অন্ধকার।

হাঁফাচ্ছে কেষ্ট—যা, বেঁচে গেলি শালা।

মৃতদেহটা অল্প অল্প করে ভাসতে ভাসতে চলে যাচ্ছে বাঁকের দিকে ; আঁধারে দেখা যায় না আর।

—কৌন যাতা হ্যায় ?

ওভারম্যান শরণ সিং লাফিয়ে সোজা হয়ে ওঠে, কোলিয়ারির দণ্ডমুণ্ডের ভূতপূর্ব মালিক।

কেষ্ট ওকে ধরে বসায়—শালো ক্ষেপে যাবেক নাকি রে ?

—পাকড়ো উস্‌কো, ভাগতা হ্যায়। ভাগতা হ্যায়।

ঘনঘনে গলাটা অনাহারে দুশ্চিন্তায় ফ্যাসফেসে হয়ে উঠেছে।

আর্তনাদের মত ধ্বনি, যেন শেষ ব্যাকুল আর্তনাদ!

নিস্তব্ধ চেতনার মত একটা অসাড় ভাব ঘিরে ধরেছে ওদের; জ্ঞান আছে অথচ কিছু করবার মত শক্তি কুলিয়ে উঠছে না। পেটের মধ্যে একটা অসহ্য যন্ত্রণা—মোচড় দিয়ে উঠছে সর্বাঙ্গ; দম বন্ধ হয়ে আসে—ভিতর থেকে প্রচণ্ড বেগে কি যেন গলা মুখ দিয়ে বের হয়ে আসতে চায়; কিন্তু আসে না, সারা শরীর ভরে ওঠে ঘামে।

বিন্দু বিন্দু ঘাম। শরণ সিং জ্যামুক্ত ধনুকের মত ছিটকে পড়ে গেল পাথরের উপর।

আবার একটা আচ্ছন্ন ভাব।

—শুয়ে পড় সিংজী, খামোকাই চেঁচিয়ে দুবলা হয়ে পড়বা।

—চোপ রও উল্লুকা পাঁঠ্‌ঠে; কোলিয়ারি শোনেকে জাগা থোড়াই হ্যায়। কাম করো; ঠিকসে কাম বাজাও। দো ঘণ্টি, এ্যাই হলেজম্যান—শালা হারামিকা বাচ্চা; নিদ আগিয়া সবকো!

খপ্‌ করে হেলমেটটা তুলে মাথায় চাপিয়ে বাতির কেব্‌ল গুঁজতে থাকে কোমরে; মাখনা ওকে প্রচণ্ড এক ধাক্কা মেরে ছিটকে ফেলে।

—ক্ষেপে গেছে ব্যাটা নির্ঘাৎ।

অতর্কিত ধাক্কায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে কাঁদছে কঙ্কালটা; শীর্ণ কান্না।

—ভালো যাত্রা লাগাইছে বটে। এ কিষ্ট।

কেষ্ট বুধনের কথায় জবাব দেয়—তু বাঁশীটো ফুঁক কেনে। লাগতাই দংসিড়িং, বিহার গান বাজা, ছাথ উটো নাচ লাগাইবেক।

বাঁশীটা খুঁজতে থাকে বুধন! সবুজ বনসীমা আর প্রথম আলোর স্বপ্ন ক্ষীণতর হয়ে উঠেছে! মনে হয় দূর, বহু দূর সেই জগতের সন্ধান!

অস্পষ্ট একটা শব্দ, জলে কি নড়ছে। নড়ে মাঝে মাঝে। তবে এ তত জোরে নয়।

কান পেতে শোনে কেষ্ট। এগিয়ে যায় জলের ধারে। ঠাণ্ডা হিম জল। আঁধারে কেষ্ট কি হাতড়াচ্ছে!

—হঠাৎ চুপ করে যায় মাখন; আবছা একফালি আলোয় দেখা যায়

ন্যাপলার প্রাণহীণ দেহটা জলের টানে ভাসতে ভাসতে এসে গ্যালারির মুখে ঠেকেছে। পাথরের মত স্থির চোখ ছুটো দিয়ে যেন চেয়ে আছে ওই জীবন্মৃত কয়েকটি প্রাণীর দিকে—মৃত্যুর জগৎ থেকে আনা পরোয়ানা ওর ওই নিষ্পলক চোখের দীপ্তিতে।

—কিষ্টো। শিউরে উঠেছে মাখন। মরে গিয়েও ন্যাপলা অতন্দ্র প্রহরীর মত ঘিরে রয়েছে এইখানে।

শালা! একটা লগি দিয়ে বিকৃত দেহটা ঠেলে সরিয়ে দেয় কেষ্ট—শালা নিমকহারাম কুথাকার।

ভিজে ফুলে ঢোল হয়ে উঠেছে দেহটা; চোখ ছুটো ঠেলে বের হয়েছে—মৌন স্তব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ওদের দিকে, বুভুক্ষু সে দৃষ্টিপাত। একটা আতঙ্কের জমাট ছায়া নামে।

—পাইছি গো! একটা অস্ফুট চিৎকার করে ওঠে কেষ্ট। আনন্দে ফেটে পড়ে সে। ছুহাত দিয়ে কি যেন ধরে আনছে আবছা আঁধারে হাঁটু জল ভেঙ্গে। নড়ছে পদার্থটা।

—মাছ। ঢের আছে। শালা নদীর জলও ঠেলে ঢুকছিল খাদে গো, লইলেই সমুদ্দীরা কোথেকে আসবেক?

বন্ধ খাদের বুক থেকে সামান্য বাতাসের আশায় ওরা এইদিকে ঠেলে এসেছে। আরও ক'টা ধরে কেষ্ট, বুধনও নেমেছে।

শরণ সিং ধড়ফড়ে জীবন্ত মাছটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে কান্না থামিয়ে; হঠাৎ একটা মাছ ছোঁ মেরে মুখে তুলে মুলোর মত কামড় বসায় জোরে, কচকচ করে চিবুতে থাকে খানিকটা মাছের টুকরো।

কেষ্ট অবাক হয়ে চেয়ে থাকে; ওর সারা শরীরে একটা বিজাতীয় ঘৃণা জেগে ওঠে; কি যেন ঠেলে আসছে গলার কাছে তাল পাকিয়ে; পরক্ষণেই সামলে নেয়—জিবে একটা শুষ্কতা আসে; খিদে! বিচিত্র শূন্যতা জেগে ওঠে দেহের মধ্যে। বুধন চিবুচ্ছে—সেও একটা কামড় দেয়; নরম মাংস—একটু নোনতা আস্বাদ। দাঁত ছুপাটি দিয়ে চেপে ধরে টুকরোটাকে, নরম মাছের টুকরোটা চিবুচ্ছে। মন্দ লাগে না।

একটু স্থির হয়ে বসল মাছের টুকরোগুলো শেষ করে; হেলমেটটা খুলে জল খাচ্ছে শরণ সিং।

—পিও! খানিকটা জল এগিয়ে দেয় কেষ্টর দিকে।

কোথায় যেন বেশ একটু জোর পায়। মাখন বলে ওঠে—আর আছে রে?

—আছ! কেষ্ট ভরসা পেয়েছে—নাই মানে, জিইয়ে রেখেছি তুমার লেগে। খাও কেনে কত খাবা।

একটা অস্ফুট আর্তনাদ। নামো ধাওড়ার গোকুল কাঁপছে। শালপাতার মত ফ্যাকাশে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে তার মুখ; নাকমুখ ঠেলে বের হয়ে আসে বমি; হঠাৎ কেমন স্তব্ধ হয়ে ঢলে পড়ে।

পাথরে মুখ ঘসছে সজোরে।

—গোকুল! মাখন আর্তনাদ করে ওঠে।

ঠ্যালা দিতেই প্রাণহীন দেহটা টলে পড়ে গ্যালারির দেওয়াল থেকে ভিজে পাথরের উপর। একবার গড়িয়ে একটু জলের ধারে এসে স্তব্ধ হয়ে গেল।

হিমস্নাত স্তব্ধতা!

জীবনের বৃন্ত থেকে খসে পড়ল একটি দল। বর্ণহীন, গন্ধহীন।

মাখন, কেষ্ট চুপ করে যায়; বুধন বাঁশী নামিয়ে চেয়ে আছে ওই প্রাণহীন দেহটার দিকে।

জমাট আঁধারের মাঝে প্রকট হয়ে ওঠে নিকট মৃত্যুর পদধ্বনি। আঁধারে আঁধারে মিশে গেল তার প্রাণবায়ু, রুদ্ধ বন্দী জীবনের শেষ মুহূর্তে!

—মরেও পালাতে পারবি না শালো ইখান থেকে; পথ হারিয়ে গোলক-ধাঁধায় ঘুরেই মরবি ওই শালার মত। উর কাপড়ে দুটো কয়লার চাঁই বেঁধে ফেলে দে বুধনা, উ শালো যেন ডর দেখাতে আর না আসে।

ক্ষীণ আলোটা মিটিমিটি জলছে। জেগে আছে মৃতের জগতে একটি সজীব প্রহরী। ক্লান্তি আর হতাশা ছেয়ে আসে আঁধারের মত গাঢ় হয়ে। ঘুম! আচ্ছন্ন মদির নেশার মত একটু স্পর্শ আনে ওদের মনে।

বর্ষার ধারাপাতে সুজলা মাটির বুক ঠেলে জেগেছে সবুজ ধানের চারা, বাতাসে মাথা নাড়ে শাল মহুয়ার গাছগুলো; ধানসিড়ি নদীর ধারে দাঁড়িয়ে বুধন; ডুংরি থেকে বুধনী এসেছে জামবাটিতে করে মুড়ি আর মহুল সিদ্ধ নিয়ে; বাতাসে কাঁইবীচি ভাজার খরাগন্ধ।

—হাঁ করে ভালছিস কি রে?

মেঘের পর মেঘ জমেছে পাহাড়ের গায়ে, পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ। বৃষ্টির ধারা নামে

তীর গতিতে। ভুংরির ঘোলা জলের নদীটায় টুংটাং বাজছে নূপুরের ছন্দ ; একটা বড় অর্জুন গাছের আড়ে দাঁড়িয়ে গা বাঁচাবার চেষ্টা করছে বুধনী ; ভিজে কাপড়খানা চেপে বসেছে যৌবন পুষ্ট নধর দেহের ভাঁজে ভাঁজে। কালো মাজা রং যেন বৃষ্টিধোয়া কচি শালগাছ।

—ওই, ভিজবি নাই নাকি ?

—চুল জ্যাবজেবে হইছে—এ্যাই বুধন। কৃত্রিম কোপে চোখ মটকে শাসিয়ে ওঠে বুধনী।

কে কার কথা শোনে। বুধন ওর হাত ধরে টেনে গাছের আড় থেকে বের করে আনে মুক্ত আকাশের নীচে। পট পট বিঁধছে গায়ে মুখে বৃষ্টির ধারা, বুধনী সেই আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্যই যেন ওর বুকে মাথা রেখে একটু আশ্রয় চায়।

হঠাৎ ধড়মড়িয়ে উঠে বসে বুধন। নাঃ। চারিদিকে জমাট অন্ধকার ; মেঘ ভাঙ্গা একটু মিঠে আলো, জলে ভেজা মাটির সোঁদা গন্ধ কোথাও নেই।

গ্যালারির চাল বেয়ে জল পড়ছে টুপ টাপ শব্দে। বন্দী! বন্দী সে!

সারা মন দুঃসহ ব্যর্থতার বেদনায় ভরে ওঠে ; পায়ে পায়ে গিয়ে খাদের নীচের দিকে চাইল।

উপর থেকে আলোর চিহ্ন নেই, হাওয়া যেন জমাট বেঁধে গেছে। হাঁপাচ্ছে, হাঁটতে গেলে হাঁপাচ্ছে সে।

তবু···সে বাঁচবে। তার জীবনের সমস্ত শক্তিটুকু দিয়ে সে যুঝবে এই মৃত্যুপুরীতে।

মনে পড়ে পাহাড়কোলে ঝাঁকড়া বটতলার তেল সিন্দুর মাখানো মাদনা কুদরো বোঙাকে—মুরগী, জোড়া মুরগী মানত করে।

—কি রে হাঁকপাক করছিস কেনে ? এ্যাই বুধনা ?

মাখনের ঘুম আসে নি ; ঘুমুতে পারে না। একটু জায়গায় বন্দী তারা ; নড়বার শক্তিটুকুও অযথা নড়ে অপব্যয় করতে চায় না ; চোখের সামনে দেখছে মৃত্যুর ছায়া ধীরে ধীরে কালো ডানায় আঁধার জড়িয়ে নামছে।

হ্যাপলা গেছে—নামো ধাওড়ার গোকুল! শরণ সিং কেমন যেন হয়ে গেছে। ঠায় বসে আছে। কেউ সইতে পারে না এই তিলে তিলে মৃত্যুর পদধ্বনি, জীবনের সমস্ত শক্তিটুকু ধিকি ধিকি জ্বলে নিভে আসছে ধীর গতিতে ;

এই অবস্থায় হঠাৎ উন্মাদ হয়ে যায় মানুষ। প্রচণ্ড আক্ষেপে একবার প্রতিরোধ করতে যায় সেই নিশ্চিত মৃত্যুকে, কিন্তু সমস্ত সঞ্চিত শক্তিটুকু এক দমকায় নিভে যায়।

কেউ হয়তো মেনে নেয় এই মৃত্যুকে—কান পেতে শোনে তার পদধ্বনি; তার হিম ডানার মৃদু স্পর্শ, তিলে তিলে ঢলে পড়ে স্তব্ধ চিরপ্রশান্তির বুকে।

বুধন এসে বসল পাথরের উপর, আঁধারে ওর ক্লান্ত নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যায়।

—চুপ করে শুয়ে থাক, ওরা কোলিয়ারিতে পাম্প বসাবেই, আর কটা দিন!

কেষ্ট বলে ওঠে—সিংজী, সৌরভীর ঘরেই যাবা তো উঠে, না অন্য কুথাও?

—ক্যা! সৌরভী! কৌন হ্যায় সৌরভী?

—চিনতোড়ের সৌরভীকে ভুলেছো বাবা? ইতো ভাল কথা নয়। এতো কাল যে ওই লিয়েই বেঁচে ছিলা সিংজী।

—ক্যা! কৌন হ্যায় তুম? নীল চাহনি কোটর ঠেলে জ্বল জ্বল করে বের হচ্ছে। জ্বালাময় সেই দৃষ্টি।

—হম্ জলন্ধর যায়েগা। হামরা ঘর, ক্ষেতি। হম পাঞ্জাব যানে বালা হ্যায়।

—সিংজী? এ্যাই! ছেঁড়া জামাটা পিছন থেকে ধরে ফেলবার চেষ্টা করে কেষ্ট। উঠে বসেছে মাখন। কিছু করবার আগেই সমস্ত শক্তি একত্রিত করে শরণ সিং ছুটে চলেছে সামনের দিকে।

—সিংজী! ক্ষীণ কণ্ঠ ফাটিয়ে আর্তনাদ করছে কেষ্ট।

আলগা কয়লার চাঁই ধ্বসার শব্দ। গ্যালারি থেকে স্যাপ্টের তিনশো ফুট গভীর জলের অতলে কয়লার আলগা স্তূপ সমেত ধ্বসে পড়েছে শরণ সিং। ক্ষীণ আলোটায় দেখা যায় গ্যালারির ধারে বদ্ধ জলরাশির ঢেউ আঘাত করে ফিরে আসে।

ছপ্ ছপ্ শব্দ। কে যেন হাসছে অট্টহাসিতে। জমাট আঁধার ঘেরা রন্ধ্রে রন্ধ্রে সেই শব্দ ধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলে ফিরে আসে।

আলোটা ক্ষীণতর হয়ে একটা মৃদু শব্দ তুলে নিভে গেল। গ্রাস করে ওদের জমাট নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। তিনটি প্রাণী মৃত্যুর দ্বারে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। শেষ বাতিটুকুও পুড়ে গেল।

কেষ্ট বলে ওঠে—না থাক আলো, চোখই জলছে ইবার।

বুধন, মাখন কথা কয় না। জলের শব্দটা তখনও ঘুরে ফিরে আসছে। বাতাসে একটা বিশ্রী গন্ধ, ভ্যাপসা—গোকুলের মৃতদেহ পচে উঠছে; আর একজন ওদের দলে যোগ দিল।

সমান ভাগ হয়ে গেছে। ওরা তিনজন—এদিকে এরাও তিনজন। জাগ্রত প্রহরীর মত মৃত্যুর দ্বারে এসে জীবনের ক্ষীণ আলোটুকু ঢেকে রেখে চলেছে।

পায়ের কাছে কি যেন ঠোকর মারছে জলে। খপ্ করে ধরে ফেলে বুধন, একটা মস্ত শোল মাছ—তাজা।

উঠে এল উপরে ; ক'দিনই বেশ খোরাক জুটছে। মাছগুলোও টের পেয়ে গেছে, এখানেই তাদের আহার্য জুটবে। আজও একজন গেল। হাসে কেষ্ট।

—লে শালা, আমাকে তু খাবি। তার আগে তুকেই খেয়ে ফেলাবো। কামড়া উটোর শির দাঁড়াতেই। জ্যান্ত কামড়া।

দাড়িগোঁফচুলে ঢাকা অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের তিনটি মানুষ জেগে আছে অতন্দ্র প্রহরীর মত।

সংবাদপত্রের খবরগুলো—ছবি আর সম্পাদকীয় মন্তব্যে, শ্রমিক আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতির কল্পনায় বিগ বস মিঃ চ্যাটার্জি স্বয়ং আসতে বাধ্য হন কলকাতা থেকে।

অন্য একটু উদ্দেশ্যও ছিল। এবার ছোট্ট চিঠিখানা তাঁকে বিচলিত করেছে সব থেকে বেশি। দেবেশ দাঁড়িয়েছে মাথা তুলে, হাতে তার সাংঘাতিক অস্ত্র। প্রতিপক্ষও প্রস্তুত। তাছাড়া মনের মাঝে অন্য একটা সুর বাজে। নিজের চেষ্টায় এতবড় হয়েছেন মিঃ চ্যাটার্জি। তাঁর কর্মক্ষমতা উদ্যমকে শ্রদ্ধা করেন চিরকাল। একটি ক্ষুদ্র শিশু, যাকে অজ্ঞাত অন্ধকারের অতলে পরিত্যাগ করেছিলেন—অলক্ষ্য থেকে সে বলবীর্য লাভ করে আজ তাঁর প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিতে ফাটল ধরিয়েছে! তাকে দেখবার লোভও সামলাতে পারেন না।

ভিড় করে আসে বিভিন্ন কোলিয়ারির মালিক, ডিরেক্টাররা।

একা চিনতোড়ের সমস্যাই নয়, সমস্ত কোলিয়ারিতেই এই সমস্যা ব্যাপক ভাবে দেখা দিয়েছে।

মিঃ চ্যাটার্জি এসে চারিদিক দেখতে থাকেন।

ব্লেজার, ফস্টার, নিমেষকে নিয়ে তিনি কাগজপত্র তৈরি করছেন। কর্তৃপক্ষ থেকে দোষী করা হয়েছে মিঃ মিত্র, আর সার্ভেয়ার মিঃ মালেককে।

আগুন ধিকি ধিকি ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। কোলিয়ারির ভিতর থেকে ছড়িয়ে পড়ছে বাইরে।

ব্লেজার ওই স্বল্পবাক গম্ভীর লোকটিকে দেখে চুপ করে যায়। ওঁর গভীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চারিদিকে।

খাতাপত্র দেখে হিসাব নিকাশ করে বলে ওঠেন,

—ওদের সঙ্গে মীমাংসা এখুনই করা দরকার। অন্তত চটানো নিরাপদ নয়।

নিমেষ মিঃ চ্যাটার্জির কথাটা ঠিক মেনে নিতে পারে না।

—একবার প্রশ্রয় দিলে মাথায় উঠবে ওরা।

—তোমাদের দোষ অজস্র। সব বের হয়ে পড়বে। প্রতিটি কোলিয়ারির কায বন্ধ হবে, বাকি মালিকরাও সরকারের কাছে তোমার বিরুদ্ধেই লিখবে; সাক্ষী দেবে। ওই মালকাটারাও ছেড়ে কথা কইবে না। এসময় বাঁচতে গেলে তোমাকে আপোশ করতেই হবে। অন্তত ট্রাই টু কিল টাইম।

ব্লেজার চতুর লোকটির তীক্ষ্ণ দৃষ্টির তারিফ না করে পারে না, পিছনে শত্রু রাখতে চায় না এই সময়।

মিঃ চ্যাটার্জি বলে চলেন—কোলিয়ারি চালু করতে যা খরচ হবে, ওদের দাবী মিটিয়ে কায চালালে মাত্র সাত দিনেই তা উঠে যাবে; বাকি রেজিং তোমার নিট লাভ। এ্যাম আই ক্লিয়ার মিঃ ব্লেজার?

ওঁর ব্যক্তিত্বপূর্ণ গম্ভীর কণ্ঠস্বরের সামনে প্রতিবাদ করবার কিছু থাকলেও ব্লেজার, নিমেষ তা পারে না।

ব্লেজার চায় আগুন জ্বালিয়ে রাখতে। কিন্তু ওর সেই নীতি মিঃ চ্যাটার্জির তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে প্রকাশ পেয়ে গেছে বোধ হয়।

দামী হ্যাভানা চুরুটের গন্ধে ঘর ভরপুর; বলিষ্ঠ চেহারা; মাথার চুলগুলোয় পাক ধরেছে। মিঃ চ্যাটার্জি বলে ওঠেন,

—কল দেম এণ্ড সেটল ইট আপ।

নিমেষ বলে—আপনি থাকবেন না?

চুরুটের ছাই ঝেড়ে মিঃ চ্যাটার্জি ছেলের দিকে চাইলেন শুদ্ধ বিরক্তি ভরা দৃষ্টিতে। ওঁর চাহনিতে এইটাই ফুটে ওঠে যে এমনি তুচ্ছ ব্যাপারে অলক্ষ্য থেকে মাত্র পলিশি বাতলে দিয়েই তিনি সরে থাকতে চান। একটু চুপ করে থেকে বলে ওঠেন,

—তুমিও তাদের ডিরেক্টার, তাদের কাছে পপুলার হবার এই সুযোগ ছেড়ো না। আমি এই কথা তাদের সামনে বললে তোমাদের সকলের মাথা নীচু হয়েই থাকবে তাদের কাছে। দে উইল আণ্ডারমাইণ্ড ইউ! এ্যাম আই ক্লিয়ার মাই বয়?

ব্লেজার কথা বলে না, ফস্টার ওর ব্যক্তিত্বের সামনে হারিয়ে গেছে কোথায়। ব্লেজার বেশ অনুমান করে চিনতোড়ের রাজত্ব তার ফুরিয়ে এসেছে।

কফি এনেছে বেয়ারা। এষা বাবার দিকে কাপটা এগিয়ে দেয়।

কাগজপত্রগুলো দেখতে থাকেন মিঃ চ্যাটার্জি।

লালাজীর চলাফেরার সংবাদ একজন নখদর্পণে রাখে। সে ওই সৌরভী। চিনতোড়ের লাস্যময়ী চিরযৌবনা ওই স্বৈরিণী। ক'দিনই দেখেছে ওকে সিটকে নসুমামার সঙ্গে ঘোরাঘুরি করতে, সরকারের বাড়িও যায়। সেদিন নসুমামা হাটে তরকারি কিনতে এসে বলে ফেলে কথাটা—লালাজীর মত লোক হয় না। ফড়িং-এর বন্ধু। কি দুঃখই না করছিল!

সৌরভী ফস্ করে জবাব দেয়—চোখের জলে ভিজিয়ে দিলাম মাটি, সেই মাটিতে কুড়িয়ে পেলাম হারানো পিরীতি। আহা! বন্ধু! লজর কোন দিকে গো? গাছটার দিকে না গাছগুলার ফলের দিকে?

হা হা করে হাসতে থাকে।

নসুমামা ওই বাচাল মেয়েটির সামনে কেঁচো হয়ে যায়, লালাজী ধমকে ওঠে—ক্যা বোল্‌তা হায়?

—তেড়ি-মেড়ি করো না বাপু। বেল পাকলে কাকের জিবেও জল আসে তাই বলছি।

সৌরভী দাঁড়ি ধরে আলু ওজন করতে থাকে। বলিষ্ঠ সুঠাম দেহ; ধমকে ওঠে খদ্দেরকে—ওই হাঁ করে আছো যি গো। ধর কেন্নে থলিটা।

মনে মনে কি ভাবছে সে। হঠাৎ বিষ্টুকে সাইকেল রেখে বাজারে আসতে দেখে হাঁক পাড়ে—ওগো ছেলে!

এগিয়ে গেল বিষ্টু। রামনগর ইস্কুলে মাস্টারি পেয়েছে, সৌরভী হাসছে মনে মনে। লালাজীর মুখখানা ভেসে ওঠে। চাকা মত দেড় চোখো মূর্তিটা!

—একটা উব্‌কার করতে হবে ছেলে! পয়সাকড়ি যা লাগে আমিই দোব। তবে কাযটা তোমাকেই করতে হবে।

বিষ্টু ওর দিকে চাইল—কি?

—বাজার করে এসো। পরে বলবো।

নন্টুমামা ঘরদোর গুছিয়ে ফেলছে। চট বস্তায় ভর্তি করছে মালপত্র, এতদিনের সংসার দুদিনেই গুটিয়ে ফেলছে। যেন খেলাঘর—আজ শেষ হয়ে গেল। মঞ্জরী কাঁদছে! কায করবার সামর্থ্য তার নেই।

আদুই পুরছে সবকিছু। ঝাঁটা কুলো হাতুড়ি শিল নোড়া কিছুই যেন পড়ে না থাকে। লালাজী ট্রাক দিয়েছে। তাতেই পৌঁছে যাবে শিয়ারশোল লালাজীর নতুন কোলিয়ারির বাসায়। নন্টুমামার চাকরি হবে সেইখানেই।

লালাজী মাঝে এসে একবার তদারক করে যায়। ট্রাক চলে গেলে তবে নিশ্চিন্ত।

বৈকালের পরই যাবে তারা। ছটফট করছে লালাজী। কোন রকমে পাচার না করা পর্যন্ত তার স্বস্তি নেই। মালপত্র ফড়িং সরকার যেন দুহাতে লুঠ করেছিল। খাট, চেয়ার, টেবিল, আলমারি ঢের কিছু।

আদু কোথায় দেখা করতে গেছে বন্ধুদের সঙ্গে। যেখানে মানুষ হয়েছে এতদিন, আজ সেই ঠাঁই ছেড়ে যাচ্ছে কোন অপরিচিত পরিবেশে! এতদিনের বালুচরে বাঁধাঘর ঢেউএর এক ধাক্কায় নুইয়ে পড়ল নিঃশেষে।

এ বাড়ি, ও বাসা দেখা করে বের হয়ে আসছে, হঠাৎ রাস্তার ধারে বিষ্টু আর ভক্তিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এগিয়ে যায়। উস্কোখুস্কো চেহারা, আঁধারে যেন দুচোখ ওর জ্বলছে।

—দাদা!

এদিক ওদিক চেয়ে ভক্তি বলে ওঠে—শীগ্‌গির চলে আয় আমার সঙ্গে।

—কেন? কি হয়েছে? চমকে ওঠে আদু।

ভক্তি কোন কথা না বলে খপ্ করে ওর হাতটা ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলে আঁধার পথে।

—দাদা!

—পালিয়ে আয়। ওৎ পেতে আছে ওরা।

বিষ্টুর চারিদিকে সন্ধানী দৃষ্টি! পথের বাঁকে মিলিয়ে গেল তিনজনে।

লালাজীর মুখের শিকার ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল। আদু বুঝতে পারে কি একটা চক্রান্ত চলেছে তাকে নিয়ে, নস্তুমামার শিয়ালের মত ধক্‌ধকে চোখ দুটো মনে পড়ে—কানে ভাসে তখনও লালাজীর অট্টহাসি। সারা গা কাঁটা দিয়ে ওঠে।

উন্মত্ত হয়ে উঠেছে লালাজী। ট্রাক বোঝাই হয়ে গেছে মালপত্র। মঞ্জরী, নস্তুমামা ফড়িং-এর ছোট ছেলেটাকে নিয়ে গাড়িতে উঠবে। আদুর দেখা নেই।

—কাঁহা গিয়া সো লেড়কী! গর্জন করছে লালা।

—পুলিশে খবর দোব? নস্তুমামা চিৎকার করে। এখান ওখান থেকে এসে লোক জমেছে। নানা প্রশ্ন নানাজনের মুখে।

—আদু পালিয়েছে?

—কার সঙ্গে গো?

লালাজীর মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে। তার মুখের সামনে থেকে কেউ এমনি করে শিকার ছিনিয়ে নেবে তা কল্পনাও করেনি। রয়্যালটি আর ওই জ্যান্ত মাংসের নজরানা কবুল করে কোলিয়ারির স্বত্ব পেয়েছে লালাজী—প্রথম চোটেই কিস্তী খেলাপ হয়ে গেল।

—শালা লোক্‌কা ঘর সে লাও, যাঁহা মিলে ইস্ লেড়কীকো।

—কারো ঘরে ঢুকবার ক্ষমতা নাই লালাজী, ক্ষেপে আগুন হয়ে আছে। হাড় গুঁড়ো করে দেবে।

দিন বদলেছে। সেই একচ্ছত্র আধিপত্য আর চলে না।

ব্রজমোহন এসে খবর দেয়—বিষ্টুর সাথে সাদী হোবে লেড়কীর। উস্‌কো ঘর মে দেখা।

দপ্ করে জ্বলে উঠে আবার নিভে গেল লালাজী। কোথায় একান্ত অসহায় সে। কি ভাবছে অন্ধকারে। মঞ্জরীর দিকে দৃষ্টি যায়।

মাংসল দেহ!

—স্টার্ট দেও।

নস্থমামা একটু শান্ত হয়। ভরাডুবি হতে চলেছিল, কি ভেবে লালাজী গাড়ি থেকে নামিয়ে না দিয়ে শিয়ারসোলেই পাঠালো তাদের।

হাসছে মনে মনে। ভাগ্য ফিরিয়ে নেবে নস্থমামা—কালো মাটির রাজ্যে। বাইরে লাগুক না একটু কালো কষ। ক্ষতি কি!

মঞ্জরী চুপ করে কি ভাবছে।

লালাজী গুম হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গালে সজোরে কে চড় মেরেছে। নাগালের বাইরে চলে গেল শিকার; রামনগর তার এলাকার বাইরে।

আঁধারে ঘুরে বেড়ায় চিনতোড়ের স্বৈরিণী; একটা সুর ওঠে; বর্ষার শেষ—মৃত্যুর মাঝেও বাউরী পাড়ায় ভাদুপুজো হচ্ছে।

কার পায়ের শব্দে মুখ তুলে চাইল। তারাজ্বলা নিকোনো আকাশ; দূরে আবছা পর্বতসীমা। হাসির শব্দে চাইল। সৌরভী গান গাইছে—

বিদায় দিতে মন সরে না ভাদু তোমারে।
লিচ্চয় যদি যাবি গো ভাদু
ভুলিস না আমারে।
কি করিবি যেতেই হবে ভাদু—
বিধাতার লিয়ম রে

গান থামিয়ে এগিয়ে আসে লালাজীর কাছে। স্তব্ধ গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে হাত নেড়ে বলে ওঠে—ভাদু বেসজ্জন হয়ে গেল লালাজী! এ্যাঁ! কেঁদেই ফেলবে নাকি হে? আহাঃ চুঃ।

হাসিতে ফেটে পড়ে সৌরভী!

—ক্যা! লালাজী চটে ওঠে।

হাসি থামে না সৌরভীর—বয়স হয়েছে লালাজী, অনেক কামিয়েছো। এইবার ছাড় উসব।

—ভাগ্‌, কস্‌বী কাঁহাকা!

লালাজী দাঁড়াল না, হন্ হন্ করে চলে গেল বাজারের দিকে। আঁধারের বুকে তখনও হাসির শব্দ কানে আসে। তীক্ষ্ণ ছুরির ফলার মত বিঁধছে তার সর্বাঙ্গে। নিষ্ফল রাগে ফুলছে পরমেশ্বরী লালা।

গৌরী চমকে ওঠে! সব হারাবার দিনে একি এক নতুন চেতনার সাড়া পায় সে। সারা দেহের অনুপরমাণুতে নব জীবনের চেতনা, শিরায় শিরায় একি পূর্ণতার সংবাদ!

ব্যর্থ নারীত্ব আজ সাড়া পেয়ে জেগে উঠেছে। নিটোল স্তনে ক্ষীণ কালো আভা গাঢ়তর হয়ে উঠেছে, সারা শরীরে একটা ক্লান্তি ছেয়ে আসে।

যার প্রতীক্ষায় ছিল সারা জীবন—আজ সব মুকুল ঝরে যাবার বেলা সেই সুর বেজে ওঠে উদাস প্রদোষ গগনে! একটি স্তব্ধ দিনের কথা মনে পড়ে।

--রাজা!

—হাসিমাখা একটি তরুণের নিবিড় স্পর্শ; কেষ্ট মিস্ত্রী নয়! অন্যপূর্বা সে। ভক্তিকে মনে পড়ে বার বার। এই গোপনতম সত্যটুকুর রেশ বাজে মনে।

হাহাকার করে ওঠে সারা মন! সামনে তার অতলস্পর্শী খাদ। অসীম শূন্যতা ঘেরা অন্ধকার। কোলিয়ারির হিসাবের খাতায় কেষ্ট মিস্ত্রীর নামের সামনে পড়েছে লাল দাগ, মন্তব্যের ঘরে লেখা হয়েছে—ফৌত।

কোম্পানী বাসা ছেড়ে দেবার নোটিশ দিয়েছে। সাত দিনের মধ্যে বাসা ছেড়ে না দিলে জোর করে পথে ঠেলে বের করবে। একমুঠো ভাত একটু আশ্রয় আজ তার কাছে একটা প্রশ্ন! বেঁচে থাকার কথা পরে।

পথ! পথ আছে।

সৌরভী এই কাঁটাকে নির্মূল করে দিতে পারে; আবার জেগে উঠবে চিনতোড়ের লাস্যময়ী যৌবন। মালকাটা—মিস্ত্রীর বৌ; ঘর বাঁধতে মানা নেই। নোতুন ভ্রমর জুটবে—আসবে মধুমাস!

শিউরে ওঠে কল্পনা করতে।

দুচোখ ছেয়ে জল নামে।

হালকা পায়ের শব্দ! ধাওড়া জনশূন্য হয়ে গেছে। বসন্তও বাইরে কাযে ব্যস্ত। এসময় আঁধার ঠেলে ভক্তিকে আসতে দেখে চমকে ওঠে।

সারা মনে জাগে হাহাকার! যাকে ভালবাসে তার কাছে মাথা নীচু করে ভিক্ষার জন্য হাত পাতবে না। তার জন্য দায়ী সেই-ই নিজে। পথ তার নিজেই ঠিক করে নেবে।

—কথা কইছ না যে?

ভক্তি ওর দিকে চেয়ে আছে। মনে ওর আনন্দের ক্ষীণ আভাস।

—গৌরী !

কথা কইল না সে। কাঁদছে অঝোরে, লজ্জায় দুঃখে হতাশায়।

—চল এখান থেকে !

ভক্তির দিকে মুখ তুলে চাইল গৌরী। চিনতোড়ের দিন তার ফুরিয়েছে। সামনে অন্তহীন অন্ধকার পথ। তবুও একাই চলবে সে। প্রতিবাদ করে,—না।

—কোথায় যাবে তুমি? কোম্পানী নোটিশ দিয়েছে, পথে নামতে হবে এইবার।

—পথ! হোক! গৌরী তবু এড়িয়ে যেতে চায় তাকে।

—আমার ওখানে চল গৌরী, এ অবস্থায় তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি না। ইচ্ছে হয় থাকবে, না হয়, বাধা দোব না আমি। শোন।

একটু স্পর্শ! গৌরীর ব্যর্থ শূন্য মনে ঝড় তোলে। তার সব শপথ ভুলিয়ে দেয়! এ যেন নিঃশেষ আত্মসমর্পণ, এরই পথ চেয়েছিল সে। আনন্দের নিবিড় স্রোতে স্থান কাল সব বাধা ভেসে যায়।

দুটি ব্যর্থ মানুষ দুজনের মাঝে নতুন করে দেখতে পায় তাদের সত্তাকে। গৌরীর উষ্ণ নিশ্বাস পড়ে ভক্তির গালে।

বেঁচে থাকার আজ একটা লক্ষ্য, অর্থ খুঁজে পায় ভক্তি।

আদু বিষ্টু সুখী হোক; সুখী হোক চিনতোড়ের ব্যর্থ যৌবন-স্বপ্ন, শান্তি নামুক এর হাহাকার ভরা তপ্ত বুকে। মৃত্যুর মাঝে আসুক নতুন জীবন।

আকাশের সীমায় দু'একটা তারা ফুটে ওঠে ম্লান দীপ্তিতে—দামোদরের গর্জনধ্বনি তখনও জড়িয়ে আছে বাতাসে, চিনতোড়ের নিশ্বাস বায়ুর মত।

ডুংরির বাইরে মোরগলড়াই চলেছে।

কালো পালকের উপর লাল ছোপ, মাথার ঝুঁটিটা লাল টুকটুকে; ওদিকে লড়ছে সাদা ষাঁড়াটা; দুজনের পায়ে সরু সুতো দিয়ে বাঁধা ধারালো কাতান। নিপুণ তির্যক গতিতে হাউইএর মত উঠে যায় শূন্যপথে ষাঁড়াদুটো ছাড়া পেয়ে, ডানার ঝটপট শব্দ, দুজন দুজনকে আঁকড়ে ধরেছে মৃত্যু পণে, লাল মটরের মত চোখের তারা দুটো ঠেলে বের হয়; সাদা মোরগটা ছিটকে পড়ল নীচে, বুকের কাছ দিয়ে বের হচ্ছে ঝলকে ঝলকে রক্ত; সতেজ প্রাণীটা দেখতে দেখতে

নিস্তেজ প্রাণহীন হয়ে আসে। চোখের তারার উপর নামে পাতলা অস্বচ্ছ পর্দা। নেমে আসে মৃত্যুর আঁধার ঢাকা সন্ধ্যা শালবনের প্রান্তে কাঁকুর ডাঙার কাঁঠাল বাগানে। মুরগী লড়াই থেমে গেল।

অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে বুধন। মরছে। এখানেও সবাই মরছে একে একে।

অমনি মৃত্যুর যবনিকা পড়ছে একটির পর একটি জীবনে।

ন্যাপলা গেছে, গোকুল, রামপদ, শরণ সিং—স্বপ্নের ঘোরেও দেখে নিশ্চুপ মৃত্যুর পদধ্বনি।

—ঠুক্ ঠুক্ ঠুক্। একটানা শব্দটা চলেছে। হাত নাড়বার ক্ষমতা নেই। কোলিয়ারির জমাট দেওয়ালে আঘাত করে চলেছে মাখন; নিজেদের নিঃশেষিতপ্রায় জীবনীশক্তির মত ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসছে সেই শব্দ।

—জল!

জলস্তর নেমে গেছে নীচে; পাম্প শুরু হয়েছে মনে হয়; এক একটু হাওয়া মাঝে মাঝে গায়ে মাথায় ছোঁয়া বুলোয়, যেন আলোর দেশ থেকে মাঝে মাঝে প্রকৃতি তার হতভাগ্য সন্তানের জন্য কল্যাণ আশার বাণী পাঠাচ্ছে।

টিপ টিপ ঝরা জল একটা খাদে জমেছে। হামাগুড়ি টেনে চলে বুধন সেই দিকে, তুহাত দিয়ে সরাচ্ছে পাথর, কয়লার টুকরো। এত জল ছিল ক'দিনেই নেমে গেছে। তেষ্টায় বুক শুকিয়ে যায়। ভিজে পাথর, জল ঝরে নেমে যাচ্ছে নীচুর দিকে, সেই ঠাণ্ডা স্পর্শ নেয় ঠোঁট ঠেকিয়ে; সারা শরীর কুঁকড়ে ওঠে অসহ্য যন্ত্রণায়, মুখ থুবড়ে পড়ে; হাত তুটো দেহের ভার রাখতে পারছে না। গালে, জলন্ত চোখে লাগে ঠাণ্ডা স্পর্শ।

একটা অস্ফুট কান্নার মত শব্দ বের হয়, কাঁদছে ওর প্রেতাত্মা।

আঙ্গুলটা দিয়ে তরল জলের মত কি বের হচ্ছে, কেষ্ট পাথর ঠোকা বন্ধ রেখে আঙ্গুলটা মুখে পোরে, শুকনো জিবে নোনতা আস্বাদ ঠেকে। চুষছে, ঠোঁটের ফাটা চামড়াটায় আঙ্গুল ঠেকে যন্ত্রণা হচ্ছে; নড়াতে পারে না ঠোঁট, ফুলে ফেটে উঠেছে; দগদগে ঘা হয়েছে ঠোঁটের তু পাশে।

মাখন ক্রমাগত শব্দ করে চলেছে কয়লার স্তরে ঘা মেরে, যদি কেউ নামে হয়তো সাড়া পাবে। নিষ্ফল সেই চেষ্টা। জল নেই, খাবার নেই, নেই আলো। অতলান্ত অন্ধকারে পড়ে পড়ে মৃত্যুর পদধ্বনি গোনা!

একটা শব্দ! বিজাতীয় শব্দ!

কেষ্ট ক্ষীণ চেষ্টা করে, জল শুকিয়েছে, যদি এগোন যায়! কেউ সাড়া দেবার নেই। হাঁটবার ক্ষমতা নেই কারও।

সারি সারি ন্যাপলা, গোকুল, শরণ সিংএর চোখগুলো যেন ধক ধক করে জ্বলছে, এগিয়ে আস্ছে সেই দৃষ্টি তাদের দিকে; কাশছে ন্যাপলা, স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ওদের দিকে। অশরীরীর তীব্রজ্বালা ওর চোখে।

একটা তীব্র চিৎকার! শেষ জীবনীশক্তিটুকু সংগ্রহ করে কেষ্ট উঠে দাঁড়িয়েছে। হ্যাঁ, এখনো সে বেঁচে আছে।

শেষ চেষ্টা করে দেখবে!

শুষ্ক শীর্ণ কাঠি কাঠি হাত হিম স্পর্শে এগিয়ে আসছে এই দিকে। যেন কণ্ঠনালী টিপে ধরে নিশ্বাসটুকুও নিঃশেষ করে দেবে।···আলো!···বাঁচবে সে। ···না—না।

সমস্ত শক্তি একত্রিত করে দাঁড়িয়ে উঠে চিৎকার করে—বিকৃত আর্তনাদে কেঁপে ওঠে নীরব অন্ধকার পুরী। চোখগুলো এগিয়ে আসছে। কাছে—আরও কাছে!

পরিত্যক্ত গ্যালারির জমাট অন্ধকারে ছুটছে কেষ্ট।

কেষ্ট ছুটতে থাকে, বেবশ পা দুটো কাঁপছে থর থর করে। পড়ে যাবে, তবু কোথায় তার এত শক্তি সংগৃহীত ছিল জানে না, দৌড়চ্ছে! পিছনে পড়ে রইল ওই মৃতের দল—মাখন, বুধনের মুমূর্ষু দেহ।

কেষ্ট বাঁচবে! দৌড়চ্ছে। কলকল—ঝর ঝর শব্দ! একফালি আলো কোত্থেকে আসছে! শুষ্ক শিরাতন্ত্রীগুলো কেঁপে ওঠে, জল!! নয়ানজুলিতে উপুড় হয়ে পড়ে মুখে মাথায় জল দিতে থাকে!

একটা পরিত্যক্ত সুঁদের মধ্যে এসে ঠেকেছে, আলো হাওয়া আছে এখানে। বাতাসের গতি লক্ষ্য করে এগিয়ে চলে গ্যালারির দেওয়াল ধরে। অদম্য উৎসাহ, প্রাণশক্তি আর আশা তাকে পথ দেখায়।

কোথায় কোন দিকে চলেছে জানে না; বাতাসের বেগ ক্রমশ বাড়ছে। দুর্গন্ধময় বাতাস এ নয়; সুঁদটা উপরের দিকে উঠে চলেছে। দিক ঠিক করতে পারে না। তবু মনে হয় নিশ্চিত মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়ে পালাতে পেরেছে সে।

হঠাৎ একটা জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল।

মাথায় মুখে সর্বাঙ্গে এক ঝলক হাওয়া ; মাথার উপরে নীল তারার চুমকি বসানো আকাশ।

অস্ফুট আর্তনাদ করে কেষ্ট! জীবনের পরিচয়! উন্মাদ কেষ্ট চেঁচাচ্ছে! বেঁচে আছে সে—আলো বাতাসের এই পৃথিবীর মাটির শরিকান হয়ে মানুষের মাঝে মানুষের সমাজে।

কোথায় এসে পড়েছে ঠিক ঠাওর করতে পারে না ; মনে হয় চিনতোড় থেকে মাইল পাঁচেক দূরে কাঁটাডির ধ্বসা খাদে এসে পড়েছে।

চেনা পথ, দিনের আলোয় পথ খুঁজে নেবে ঘন আটাড়ি আর বনতুলসীর বন ভেদ করে।

ক্লান্ত পরিশ্রান্ত কেষ্ট পাথরের উপর বসে হাঁপাচ্ছে মুক্ত তারাজ্বলা আকাশের নীচে। চিনতোড় খাদ তাকে মারতে পারে নি। মরে নি সে!

কদিন ধরে ডজন খানেক পাম্প জল তুলছে কোলিয়ারি থেকে।

গেরুয়া জল থিতিয়ে কয়লার কালিতে মিশে কালো বর্ণ হয়ে অল্প অল্প উঠছে পাম্পগুলো থেকে। দুর্গন্ধময় জল। সারি সারি বৃহৎ কয়েকটা টারবাইন পাম্প চলেছে পাঁচশো ঘোড়ার। নীচেকার জল প্রবলবেগে গিয়ে পড়ছে পাহাড়ী ঝর্নার খাদে। দুকূল ছাপিয়ে চলেছে জলস্রোত। ক্রমশ ফুরিয়ে আসছে জলধারা, মন্দীভূত হয়ে যায় স্রোত।

তোড়জোড় চলেছে নীচে নামবার। উপরের চূর্ণ দোমড়ানো ষ্টিল ফ্রেমটা বদলে নতুন ফ্রেম হেডগিয়ার রং করা হয়েছে, ঝকমক করছে রোদে। নতুন ষ্টিলরোপ লাগানো হয়েছে। 'কেব্‌ল ড্রাম'টা ঘুরছে মাঝে মাঝে, ল্যাঙ্কাশায়ার বয়লারের ষ্টিমে লিফ্‌ট নীচ অবধি পৌঁছায় নি। ট্রায়াল দিচ্ছে নতুন লিফ্‌টটায়, স্যাপ্টের মুখ ঠিক আছে কি না দেখা হচ্ছে ; নীচে হতে রাশি রাশি বালির বস্তা, ভাঙ্গাপাথর, কয়লার স্তূপ, কাঠের টুকরো, তক্তা উঠে আসছে জলে ভিজে জ্যাবজেবে অবস্থায়।

কৌতূহলী জনতা বাইরে তখনও ভিড় করে আছে। ভিতর থেকে কি উঠে আসে দেখতে চায় তারা সকলেই।

মালবাবু বলে—সমুদ্র মন্থন হয়ে উঠেছিল অমৃত, এ সমুদ্দুর থেকে স্রেফ গরলই উঠবে বাবা। সময় থাকতে কেটে পড়। কোলিয়ারি তো নয় বারুদের কারখানা—কখন আবার হুড়মুড়িয়ে ধ্বস নামবে কে জানে?

কড়া পুলিশ পাহারা মোতায়েন গেটে। মালকাটা, বাইরের কেউ যেন ঢুকতে না পারে।

কোলাহল তোলে ওরা—আমরাও নামবো।

পালোয়ান সিং বলে—ক্যা মুশায়েরা হোতা হ্যায়? নাচ্‌কা মজলিস? হটো।

বদ্ধ জনতা দাবী জানায়—যারা মরেছে সব লাশ বার করতে হবেক। গুস্তি করে লুব কিন্তু।

ছাড়া পাওয়া জলস্রোতের মত এসে পিছনে ভিড় জমায় তারা। সুন্দরচক, আরবেলিয়া, দত্তপুর, কাঁটাড়ি কোলিয়ারির মালকাটাও এসে জমেছে দলে দলে।

গেটের বাইরে জমায়েত হয়ে আছে তারা।

তিন সপ্তাহ পর প্রথম মানুষ নামছে মৃত্যুপুরীতে। ব্যগ্র কৌতূহলী দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ওরা; নিমেষ, মিঃ চ্যাটার্জি, ব্লেজার—পিটহেডে দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রথম যোগাযোগ হল আবার টেলিফোনে পিট বটমের সঙ্গে।

বসন্ত নামতে যাবে; বাধা দেন মিঃ চ্যাটার্জি।

—তুমি নামবে না।

—কেন?

—রেসকিউ পার্টির লোক ছাড়া নামতে দেবার হুকুম নেই। ব্লেজার বলে ওঠে।

গেটের বাইরের পাঁচিলের মাথা গাছের ডাল থেকে কৌতূহলী উত্তেজিত জনতা চিৎকার করে—আলবৎ নামতে দিতে হবেক বসন্তকে। দেখে আসুক ভেতরের অবস্থা।

পুলিশ এসে ভিড় হঠায়; পাঁচিলের উপর থেকে, গাছের ডাল থেকে নামিয়ে দেয় তাদের। দূরে সরিয়ে দিল উত্তেজিত জনতাকে।

পিট বটম থেকে ফোন বাজছে। প্রথম অন্ধকার পুরী থেকে আসছে প্রাণের সঙ্কেত দীর্ঘ তিন সপ্তাহ পর।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে বসন্ত। মিঃ চ্যাটার্জি ফোন ধরেছেন নিজে। কি যেন রিপোর্ট করছে ওরা!

মুখ চোখের চেহারা বদলে যায় মিঃ চ্যাটার্জির। গম্ভীর অন্ধকারময় হয়ে ওঠে ললাট! কি বলে আস্তে আস্তে ফোনটা নামালেন।

বসন্ত স্থির দৃষ্টিতে ওঁর দিকে চেয়ে আছে।

রেসকিউ পার্টির অধিনায়ক ফস্টার চমকে ওঠে নীচে নেমে। জীবনে এই দৃশ্য দেখেনি সে।

ধ্বংসপুরী; জলস্রোতে কয়লা, পাথরগুলো ধারাল দাঁত বের করে চেয়ে রয়েছে। তখনও কোথাও জমাট ধোঁয়া বাতাসে ঘন কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে। ভাপসা বদগন্ধ; পচা মাংস আর কঙ্কালের স্তূপ। একজন কে তখনও কয়লার স্তরে ড্রিলিং মেসিনটা চেপে ধরে রয়েছে। অতর্কিতে মৃত্যু এসে হানা দিয়েছিল তাকে। পুড়ে, জলে পচে মাংসগুলো খসে খসে পড়েছে, দাঁড়িয়ে আছে কঙ্কালটা। কোথাও বিস্ফোরণের সময় আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে তারা এসে জমায়েত হয়েছিল, একঠাঁই দাঁড়িয়ে দমবন্ধ হয়ে পুড়ে মরেছে তারা! গড়াগড়ি পড়ে আছে কঙ্কালের রাশ!

স্যাপ্টের কাছে কয়েকটা দেহ তাল গোল পাকিয়ে পড়ে আছে; প্রচণ্ড আঘাতে বোধহয় ছিটকে ফেলেছিল তাদের—হাড়গোড় ভেঙ্গে টুকরো হয়ে গেছে। প্রচণ্ড বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে আগুন বাতাসের প্রবল চাপ স্যাপ্ট দিয়ে তীব্র বেগে বের হবার মুখে ওদের ছুঁড়ে ছিটকে ফেলেছে প্রচণ্ড শক্তিতে, ঝলসে দিয়েছে।

এখানে ওখানে ছড়ানো মৃত কঙ্কাল—কোথায় জমাট কঙ্কালের স্তূপ। পথ চলতে পায়ে ঠেকে পচা মাংস, কারো হাড়, কঙ্কাল আর বাতিগুলো। —লিভ দেম অ্যাজ ইট ইজ! চাপা থাকে সব সংবাদ। মাত্র আশি পঁচাশি জনকে তোলা হবে, রিপোর্ট করছে বসকে। বাকি তেমনিই থাকবে জড় করা এই অতলে।

দু'নম্বর থেকে তিন নম্বরের রুদ্ধ পথটা দিয়ে চলেছে তারা; গেট ভেঙ্গে ঢুকেছে জলরাশি; কাঠ, প্রপের টুকরো ছড়ানো সুড়ঙ্গ। হঠাৎ কান পেতে শুনতে পায় সুড়ঙ্গের স্তরে; ঠুক ঠুক ঠুক।

ক্ষীণ—অতি ক্ষীণ শব্দ।

নিস্তব্ধ অন্ধকার মৃত্যুপুরীতে জীবনের ক্ষীণতম স্পন্দনের মত ধ্বনিত হচ্ছে ওই মৃদু শব্দ। এরাও গাঁইতির বাঁট দিয়ে শব্দটা করে—জোরে।

হ্যাঁ—ওদিক থেকে শোনা যায় শব্দটা ; জোরে নয় আস্তেই। হয়তো দূরে কোন অন্ধকার সুঁদে মুমূর্ষু নিঃশেষিতআয়ু মালকাটার শেষ নিশ্বাস মিশে আছে ওইখানে। উপরের সিঁড়ি বয়ে উঠতে থাকে তারা।

মাথার আলোগুলো জ্বলছে—গ্যালারির মুখে পা দিতেই একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনে চমকে ওঠে—আবছা আলোয় দেখা যায় দাড়ি-গোঁফের জঙ্গলে ঢাকা অর্ধনগ্ন কয়েকটা প্রেতাত্মা ওদের দিকে গড়িয়ে গড়িয়ে এগিয়ে আসবার চেষ্টা করে।

—মাই গড!

—বেঁচে আছে! দীর্ঘ তিন সপ্তাহ এই অবস্থায় থেকেও বেঁচে আছে।

রেসকিউ পার্টির লোকজন ওদের ধরে ফেলে। দুজন পাশে পড়ে আছে, আরও ক'টা বিকৃত পচা মৃতদেহ!

মাত্র বেঁচে আছে! কে—কিই বা নাম, চেনাও যায় না তাদের। চোখ দুটো অন্ধকার কোটরে ঢুকে গেছে, বুজে গেছে পিঁচুটিতে। মুখে ঠোঁটে হাতের ডগায় দগদগে ঘা ; পেট পিঠ এক হয়ে গেছে। গায়ে গন্ধ—বন্য আদিম মানুষের কোন পূর্ব পুরুষকে গুহার অতল থেকে উদ্ধার করে আনছে তারা।

কোলিয়ারি আপিসের সামনের পথে বাগানে সারি সারি মৃতদেহ তোলা হয়েছে। তিরপল চাপানো। ফটো নেওয়া হল কাগজের তরফ থেকে—মাইন্‌স বোর্ডের লোক আসে ; তদন্তকারীর দলও দেখে গেলেন সেই দৃশ্য। একশোর বেশি নয়। নারকুলিয়া গুনতি ক'রে হিসাব রাখে।

বাইরে উত্তেজিত জনতা চিৎকার করে—আর কই ? আরও ঢের রইছে। পুলিশ ওদের সরিয়ে রাখে গেট থেকে—হট্‌ যাও।

নিমেষ, মিঃ চ্যাটার্জি, ব্লেজার বসন্তকে ডেকে এনেছে অফিসে ; সঙ্গে যদু মাহাতো, বনমালী, আসানসোলের নৃপেন বাবু, আর তালকুই-এর মেজবাবু। মেজবাবু টেবিলের উপর রাখা স্টেট এক্সপ্রেসের খোলা টিন থেকে সিগারেটের পর সিগারেট ধরাচ্ছেন।

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে বসন্ত, যদু মাহাতো। মাত্র পঁচাশিজনকে পাওয়া গেছে। বাকি ?

বসন্ত এর জবাব খুঁজে পায় না। মিঃ চ্যাটার্জি নাকে রুমাল দিয়ে বারান্দা থেকে দাঁড়িয়ে একবার বসন্তকে যেন বিদ্রূপের সুরেই বলে ওঠেন,

—হিসাব মিলেছে এইবার?

কথা বললো না বসন্ত।

গেটের বাইরে কয়েকশো উত্তেজিত মালকাটা, কত মৃতের স্বজন, একটি পয়সাও তারা পায় নি। বেহিসেবী মৃত্যু! বুভুক্ষু উপবাসী মজুর, ছেলেপুলে স্ত্রী নিয়ে এখানে ওখানে ক্ষেত মজুরী করে ফিরছে দুবেলা বেঁচে থাকার জন্য।

তাদের সমস্যা—যারা মরে গেছে বেহিসেবী, তাদের কিনারা কিছুই হবে না। জিতে যাবে কোম্পানী এতবড় অপরাধ করেও! চুপ হয়ে আসে কলরব।

মিঃ চ্যাটার্জি হাসছেন মৃদু মৃদু—তাহলে কাযে লাগবার ব্যবস্থা কর কাল থেকে। সব প্রতিশ্রুতিই আমি মানবো। আই এম এ ম্যান অব ওআর্ড!

পিতা পরিচয় দিচ্ছে পুত্রের কাছে নতুন করে। বসন্ত মুখ তুলে চাইল কৈফিয়তের দৃষ্টিতে। বাবার কাছে যেন কৈফিয়ৎ চাইছে সে—তার মায়ের প্রতি, তার প্রতি অবিচারের কৈফিয়ৎ!

হঠাৎ কোনদিক থেকে সব বদলে গেল। একটা কলরোল! গেটের উপর উঠে পড়েছে লোকজন! পুলিশ বাধা দিয়ে ঠেকাতে পারে না। দমা-দম্ লাঠি চালাচ্ছে।

—বেঁচে আছে?

—পিট থেকে তেইশ দিন পর তুলেছে দুজন মালকাটাকে।

বসন্ত ছুটে যায়; নিমেষ, মিঃ চ্যাটার্জি, ম্নেজারও! ফস্টার সবিস্তারে বর্ণনা করে চলেছে রেসকিউ এর কাহিনী।

বসন্ত চিনতে পারে, দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল ঢাকা দুটি প্রাগ্ঐতিহাসিক গুহামানব। দীর্ঘ তেইশ দিন সংগ্রাম করে বেঁচেছে। মাখন আর বুধন! গলার কাছে ঢালছে অল্প অল্প জল।

—মাখন!

পিঁচুটি বোজা চোখ অল্প অল্প নড়ছে; ফাটা, ফুলে ওঠা ঠোঁটে ক্ষীণ ভাষা।
—একপালি, পুরোপালি খতম! পুরো পালি—

চমকে ওঠে বসন্ত।

মিঃ চ্যাটার্জি ধমকে ওঠেন—হাসপাতালে নিয়ে যাও। এক্ষুণি! ক্লিয়ার আপ! জোর করে ওদের সরিয়ে গাড়িতে তুলল!

কলরব জাগে বাইরে—উন্মত্ত জলকল্লোলের মত কলরব। পুলিশের লাঠি অগ্রাহ্য করে চেঁচাচ্ছে তারা!

মানুষ বলে চেনা যায় না ওদের; জানোয়ারে পরিণত করেছে ওই মৃত্যুপুরী!

বসন্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, যদু মাহাতোও শুনেছে কথাটা। রাগে ফুলছে মনে মনে। মিঃ চ্যাটার্জির কথায় চাইল বসন্ত—দেন?

বসন্ত বলে ওঠে—পুরো তিনশো লোকই মরেছে পিটে; তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

—দেবেশ! মিঃ চ্যাটার্জি ফেটে পড়েন।

বসন্ত দাঁড়াল না; বের হয়ে গেল গেট দিয়ে জনতার মধ্যে।

মিঃ চ্যাটার্জি সিগারের ধোঁয়া ছাড়ছেন একমনে! ব্যাপারটা কেমন সব তালগোল পাকিয়ে গেল আবার।

এককালে পিট ছিল। পিলার কাটিং করে কয়লা তোলার পর উপরের চালটা সম্পূর্ণ ধ্বসে গিয়ে গভীর খাদের সৃষ্টি করেছে। কেষ্ট রাতের অন্ধকারেই উঠে আসে।

মাটি, আকাশ আর চাঁদের আবছা আলো। বহুদিন পর পৃথিবী আবার তাকে বুকে টেনে নিয়েছে। রাস্তার ধারে মকাইএর ক্ষেত। আবছা চাঁদের আলোয় দেখা যায় নধর সবুজ গাছের গাঁটে গাঁটে লম্বা ফলগুলো ধরেছে, ডগায় ঝুলছে রেশমের ঝুঁটির মত কেশরগুলো। কচি কচি দু'একটা মকাই চিবুতে থাকে। তরল দুধের মত একটা আস্বাদ। চিবুচ্ছে কেষ্ট!

রাস্তায় কার পায়ের শব্দ, টুকরো কথার আওয়াজ কানে আসে। মানুষ! পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় রাস্তার ধারে।

কানিকুড়ো আর সুন্দরচকের মনোহর পাত্র যাচ্ছে। কোলিয়ারিতে মরেছে বহুলোক তাদের কথাই আলোচনা করছে। বাতাসে ভেসে আসে ওদের কথাগুলো। মদশাল থেকে ফিরছে, রাত হয়েছে অনেক।

—মাংস! পোড়া মাংস আর হাড় ছেতরে গেছে! ওদের গতি হবে না কোনকালে। চাঁদের আলোয় দেখা যায় ওদের হাতের থলিতে কি যেন খাবার বাঁধা। তেলেভাজা চপ, মদের স্বাদ মৃতপ্রায় নির্জীব তন্ত্রীগুলোকে রসসিক্ত করে তোলে। খিদেয় পেটের মধ্যে দুর্বার একটা চেতনা জেগে ওঠে।

এগিয়ে যায়; বলে ওঠে কেষ্ট,

—আছে কিছু? দে না!

একটি মুহূর্ত! গনগনে রাত; আবছা চাঁদের আলো ঢাকা নির্জন পথ, শনশন বইছে রাতের হাওয়া। অতৃপ্ত মৃত আত্মাই আসে এই সময় মানুষের রূপ ধরে। বাতাসে বাতাসে হাজারো মালকাটার অশরীরী আত্মার সঞ্চরণ, বহু কষ্টের মৃত্যু। তবু জীবনকে ভোলে না তারা।

কেষ্ট তাদেরই একজন। দাড়িগোঁফের জঙ্গলের ভিতর থেকে জ্বল জ্বল করে চলিষ্ণু কঙ্কালের দুটো নীলাভ চোখ; জীর্ণ কাঠির মত হাতগুলো এগিয়ে আসে, পরনে ছেঁড়া একটা ট্যানার মত কি! মিশকালো সর্বাঙ্গ।

আঁতকে ওঠে কানিকুড়ো! কেষ্ট বলবার চেষ্টা করে ফ্যাঁসফ্যাসে গলায়,

—আমি কেষ্ট মিস্ত্রী, নামো ধাওড়ার কেষ্ট।

কানিকুড়ো কাঁপছে। মুখে ওর শব্দ—বু—বু—বু—

মনোহর রাম নাম করছে—আর দৌড়চ্ছে; পড়ে রইল হাতের পুঁটুলিটা, বিড়ি দেশলাই। কানিকুড়ো কাঁপতে কাঁপতে দৌড়চ্ছে ওর পিছু পিছু।

একটি মুহূর্ত! সামনে ওদের পরিত্যক্ত সম্পদ। তবু কেমন হাত সরে না। একটা অনুভূতি তার সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করেছে! মানুষের জগতে সে আজ প্রাণহীন, মৃত বলেই পরিচিত, বিস্মরিত একটি নাম।

তবু আশা আছে! গৌরীকে খুঁজে পাবে। আবার বাঁচবে সে। এ মাটি ছেড়ে চলে যাবে অন্যত্র। ঘর বাঁধবে।

হাসি আসে। খাবারগুলো তুলে নিয়ে আবার পরিত্যক্ত সুঁদের দিকে ফিরে যায় কেষ্ট। রাত শেষ হয়ে আসছে। আকাশের পশ্চিম প্রান্তে ফুটে ওঠে ভোরের তারা, ম্লান নীলাভ চাহনিতে চেয়ে আছে স্তব্ধ ঘুমঢাকা পৃথিবীর দিকে।

মীমাংসার পথ বন্ধ। বুধন আর মাখনের অর্ধমৃত দেহ—ওদের কাতর কান্না, ছিন্নভিন্ন দেহগুলির দৃশ্য মালকাটাদের মনে এনেছে দুর্বার প্রতিবাদের

স্বর। মানুষের দাবীতে মানুষের মত বাঁচতে চায় তারাও। মিথ্যার মুখোস খুলে দেবে।

বড় রাস্তা থেকে ধাওড়ায় আসবার পথ বলতে কিছুই নেই। খোলা পচা নর্দমায় থিক থিক করে কাদা-ময়লা, আর পোকা। উপরে প্রবহমান একটু জলের দুপাশে গজিয়েছে কচু ঝোপ, পায়ে পায়ে কর্দমাক্ত হয়ে উঠেছে পথটা। হাঁটুভোর কাদা। হঠাৎ ট্রাক বোঝাই ইট, বালি বয়লারের পোড়া ছাই ঢালা হয় পথে, নর্দমার উপর উঠলো লোহার চাদর বিছানো একটা সাঁকো।

বলা কওয়া করে অনেকে—ঐ কি হচ্ছে রে? বাংলো হবেক নাকি ইবার?

—দেখ ইবার কুথাকে ভাসাই দেয় তুদের।

বসন্ত সেদিন অবাক হয়। রাস্তায় এসে দাঁড়াল ঝকঝকে মার্সেডিজবেঞ্জে কার। উর্দিপরা ড্রাইভার নেমে গাড়ির পিছনের দরজাটা খুলে স্যালুট করে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে নামছেন মিঃ চ্যাটার্জি স্বয়ং। মুখে হাভানা চুরুট, পরনে দামী কর্ডুরয়ের প্যান্ট, সিল্কের শার্ট, টাইপিনে একটা মুক্তার দানা আলোয় ঝকমক করছে। চেরি কাঠের ছড়ি হাতে নামলেন। মাথার মধ্যখানের টাক ঘিরে কয়েক গাছি কাঁচা পাকা চুল সৌম্য চেহারায় একটা গাম্ভীর্য এনেছে। বয়সের ছাপ ওঁর হাঁটা চলার কোথাও ফুটে ওঠে না।

কয়েক বৎসর আগেকার একটা ছবি ভেসে ওঠে বসন্তের চোখের সামনে।

মা মৃত্যুশয্যায়, ব্যাকুল কণ্ঠে আবেদন জানায় মৃত্যুপথযাত্রী নারী —একটিবার দেখা পাবো না? তুই গিয়ে বলগে দেবু, তিনি খবর পেলে নিশ্চয়ই আসবেন। শুধু প্রশ্ন করবো, কি আমার অপরাধ?

বার বার দেখা করতে গিয়েও দেখা পায় নি। সর্বদাই ব্যস্ত মিঃ চ্যাটার্জি, শেষবার গিয়ে দেখে গাড়ি বারান্দায় তিনি দাঁড়িয়ে কি একটা জরুরি নির্দেশ দিয়ে গাড়িতে উঠছেন।

সামনে বসন্তকে দেখে একটু বিরক্তিভরা চাহনিতে চাইলেন মাত্র।

মলিন বেশবাস। দেবেশের চোখেমুখে একটা দুঃখ ক্লান্তির ছায়া। মিঃ চ্যাটার্জি প্রশ্ন করেন কঠিন কণ্ঠে—কি চাই?

বড়লোকের কাছে কিসের জন্য অন্য কেউ আসতে পারে তা জানেন তিনি। তবুও দেবেশ বলে ওঠে ব্যাকুলকণ্ঠে,

—মায়ের অসুখ, খুবই বাড়াবাড়ি। একবার যদি যেতেন—মাও একটি-বার দেখতে চাইছেন আপনাকে।

একটি মুহূর্ত—কঠিন দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে থেকে মিঃ চ্যাটার্জি বলেন নিস্পৃহ কণ্ঠে,

—ভালো ডাক্তার দেখাও গে। কায হবে। আমি ডাক্তার নই। টাকার দরকার থাকে—মিঃ দত্ত, একে পাঁচ শো টাকা দিয়ে দিন। হ্যাঁ এরোড্রামে ফোন করে দেখে রাখুন প্লেনের টাইমিং।

দেবেশ কি বলতে যায়।

তাকে কথার জবাব দেবার অবকাশ না দিয়ে উনি গাড়িতে উঠলেন একরাশ পেট্রোলের পোড়া ধোঁয়া ছেড়ে।

ক্ষুব্ধ অপমানিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দেবেশ; কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল জানে না; চমক ভাঙ্গে পি-এর কথা শুনে।

—তোমার টাকাটা চেকে দোব? না ক্যাস চাই?

—টাকা! দেবেশ অবাক হয়ে চেয়ে থাকে ওর দিকে। টাকার জন্য আসে নি ভিখিরির মত হাত পাততে। মায়ের কাতর মুখখানা মনে পড়ে।

মায়ের চোখের জলেই এসেছিল সে। নইলে বার বার প্রত্যাখ্যাত হয়ে কখনও আসতো না সে। সেক্রেটারির কথায় ওর মুখের দিকে চেয়ে বলে ওঠে দেবেশ,

—টাকাটা তাঁকেই ফেরৎ দেবেন। টাকার দরকার নেই। ওকে কোন কথা বলবার অবকাশ না দিয়েই নেমে আসে দেবেশ। সেই শেষ দেখা।

আজ দীর্ঘ দশ বছর পর হঠাৎ কি কারণে খুঁজে খুঁজে মিঃ চ্যাটার্জি নিজেই এই ধাওড়ায় আসতে পারেন ভাবতে পারে না বসন্ত। সেদিন শত ডাকেও যাঁকে পাওয়া যায় নি আজ অযাচিতভাবে তাঁকে আসতে দেখে মনে মনে কিছু আঁচ করে নেয়। মুখ চোখে ফুটে ওঠে কঠোর কাঠিন্য।

সমবেত ক'জন উঠে দাঁড়াল ওঁকে আসতে দেখে; মিঃ চ্যাটার্জি চারিদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে পরিবেশটা আঁচ করে নেন। দড়ির আলনায় কয়েকটা কাপড়, গামছা, কালিমাখা প্যাণ্ট; খাটিয়ার নীচে রাখা মাইনার্স হাফ বুট; একজোড়া

ছেঁড়া কেডস জুতো; একটা শাল রোলার তৈরি বাবুই দড়ির খাটিয়া পাতা। বলে ওঠেন,

—বসি কোথায় হে? লিডার হয়েছো টেবিল চেয়ার রাখ নি? এরা কি তোমার লেফ টন্যান্ট?

বসন্ত কথা কয় না, মিঃ চ্যাটার্জির কণ্ঠে বিদ্রূপের সুর। বসন্ত চুপ করে থাকে।

কে একটা টুল এনে দেয়। রুমাল দিয়ে ঝেড়ে পুঁছে বসতে বসতে মিঃ. চ্যাটার্জি বলেন,

—তা হলে বেশ আছো? পলিটিকস্‌টা ব্যবসা হিসাবে মন্দ নয়। পেয়িং। কিছুদিন এই ফিল্ডে ঘোরাঘুরি করে ইলেকশনে দাঁড়িয়ে যাও; যদি রিটার্নড হও —চেষ্টা করবো একটা চান্সের জন্য। ইট ইজ অলসো অ্যান্ অ্যারিস্টোক্রেসি।

বসন্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, ওর কথাগুলো বিদ্রূপ না আন্তরিকতাপূর্ণ ঠিক বুঝতে পারে না। বসন্ত বলে ওঠে,

—হঠাৎ আপনি এলেন, ডেকে পাঠালেই যেতাম ওখানে।

—উঁহু! বন্যরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে। লেবার লিডারও তেমনি তার ডেরায় থাকে ফুল ফর্মে। তা এখানের ব্যাপারে একটা মীমাংসায় এসে হঠাৎ আবার গোলমাল বাধালে কেন? ওআর্ড অব অনারও মানো না?

বসন্ত এতক্ষণে যেন বলবার মত কথা পায়; কঠিন স্বরেই বলে ওঠে,

—শর্ত আপনারাই মানেন নি। পুরো সিপটের লোক—ওই দুটি ছাড়া ওঠে নি। সকলেরই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে; এবং বেকার মজুরদের তিন সপ্তাহের মাইনে। আপনারা ক্ষতিপূরণ দিয়েছেন মাত্র পঁচাশি জনের; এদের তিন সপ্তাহের জায়গায় মাইনে দিয়েছেন মাত্র এক সপ্তাহের। শর্ত ভঙ্গ করেছে কে?

—মৃতের সংখ্যা মাত্র পঁচাশি জনই।

—মিথ্যা হিসাব আমি মানি না। বসন্ত জবাব দেয়।

মিঃ চ্যাটার্জি স্থির কণ্ঠে জবাব দেন,

—আমরা মানি। আইনও তাই মানবে। দ্বিতীয়ত তিন সপ্তাহের মজুরী পাবে তারা, কিন্তু শর্তে কবে পাবে তা পরিষ্কার লেখা নেই। কোম্পানীর দেবার মত অবস্থা আসলে তারা নিশ্চয়ই সেটা পাবে।

বসন্ত যেন ফাঁকে পড়ে গেছে। মিঃ চ্যাটার্জি মৃদু মৃদু হাসছেন, বাতাসে উড়ছে দামী হাভানা সিগারের ধোঁয়া, ঘরের চিমসে গন্ধ ঢেকে গেছে তাঁর ধারাল গোঁফ থেকে বেরুনো ইভনিং ইন প্যারিসের সুগন্ধে; চাপা মিষ্টি সুবাস সিগারের সঙ্গে মিশে তাঁর ব্যক্তিত্বকে প্রকট করে তুলেছে। বসন্ত যেন কোণ ঠাসা হয়ে আসছে। মিঃ চ্যাটার্জি প্রশ্ন করেন—আর কিছু অভিযোগ আছে?

বসন্ত জবাব দেয় না; নীরবতা ভঙ্গ হয় মিঃ চ্যাটার্জির কণ্ঠস্বরে।

—দেন, ইউ সুড অ্যাবাইড বাই দি ডিসিশন!

উল্টো চাপ। বসন্ত বলে ওঠে—মীমাংসার সময় এ কথার ফাঁক আপনারাই রেখেছিলেন ভবিষ্যতে গোলমাল পাকাবার জন্য।

—এবং সে সুযোগ তুমিই দিয়েছিলে।

সিগারের ছাই ঝেড়ে একটু স্বর নামিয়ে ইংরাজিতে কথাটা বলেন, বেশ দ্ব্যর্থ বাচক কথা—পাকা ইউনিয়নিস্টের মত কাযই করছো। মীমাংসার পথ খোলা আছে এবং ইফ ইউ ওয়াণ্ট—অভ কোর্স এ পারসোনাল ফেভার!

মিঃ চ্যাটার্জি একটু থামলেন। ইঙ্গিতটা পরিষ্কার বুঝতে পারে বসন্ত; দলে ফেরাবার ইশারা; বসন্তকে এখনও চেনেন নি, চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে চাপা রাগে। পরিষ্কার বলে ওঠে বসন্ত,

—তাহলে অনেক আগেই ও পথে এগোতাম। ও শর্ত তালরুই-এর মেজবাবু মানবেন। তাঁকেই বলবেন কথাটা। আমাকে নয়।

মিঃ চ্যাটার্জি বেশ হতাশ স্বরেই বলেন—তুমি ট্যাক্টলেশ ফুল। চ্যাটার্জি বংশের রক্ত তোমার শরীরে আছে কিনা সন্দেহ হয়। আই ডাউট!

মিঃ চ্যাটার্জি চাপা উত্তেজনায় কাঁপছেন।

দপ্ করে জ্বলে ওঠে বসন্ত, এতক্ষণ সমস্ত হীন মন্তব্য, ওই প্রলোভন সবই সহ্য করেছিল; স্বর্গগত মায়ের নামে এই ইঙ্গিতটুকুই তার এতদিনের সঞ্চিত বিক্ষোভের বারুদ স্তূপে আগুন ধরাতে যথেষ্ট। সেও সোজা দাঁড়িয়ে ওঠে খাটিয়া ছেড়ে।

চোখমুখে ফুটে ওঠে কাঠিন্য; নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করছে সে।

মিঃ চ্যাটার্জিও ওর দিকে চেয়ে চমকে উঠেছেন। বসন্ত গম্ভীর স্বরে বলে ওঠে রাগ চেপে,

—এ সম্বন্ধে আপনার কাছ থেকে কোন মন্তব্য আমি আশা করি নি।

যে বিষয় নিয়ে কথা বলছিলেন, তাতে আমাদের আপত্তি কোনখানে তা জানিয়েছি। এর বেশি কিছু বলবার আমাদের নেই। প্রমাণ সমেতই এবার কথা বলবো। তার আগে কোন আলোচনা আর হবে না।

—ইউ আর এক্সাইটেড মাই বয়। শান্ত কণ্ঠে বলেন মিঃ চ্যাটার্জি।

বসন্ত কথা বলে না, চুপ করে থাকে।

কি ভেবে উঠে পড়লেন মিঃ চ্যাটার্জি ; চেরি কাঠের ছড়ি, টুপিটা নিয়ে বসন্ত নিজেই এগিয়ে যায় তাঁর সঙ্গে গাড়ি অবধি। গাড়ির দরজা খুলে ধরে সে-ই।

—থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ !

মিঃ চ্যাটার্জি গম্ভীর মুখে গাড়িতে উঠে বসলেন মৌখিক ভদ্রতাটুকু সেরে। নীচে দাঁড়িয়ে আছে বসন্ত, মাঝখানে গাড়ির কাঁচটা। দুই মতবাদ ; বিরুদ্ধ তাদের পথ, স্বরূপ। দুজনেই অচল, অটল।

গাড়ি স্টার্ট নিয়ে বের হয়ে গেল। মিঃ চ্যাটার্জি দূর থেকে বসন্তের দিকে চেয়ে আছেন। পাথরের মতই শক্ত অনমনীয় ও। কোথায় নিজের উপরই রাগ হয় তাঁর। কথাটা বলতে চান নি—ফস্ করে বের হয়ে গেছে। দেবেশকে এ আঘাত দেবার ইচ্ছে তাঁর ছিল না। রাগলে কেমন সব একাকার হয়ে যায়। বয়স হচ্ছে এটা তিনি অনুমান করতে পারেন।

বাংলোর দিকে চলেছে গাড়িটা—চড়াই বেয়ে টপ গিয়ারে চাপা গুঞ্জরণ তুলে রাজহাঁসের মত মন্থর গতিতে চলেছে।

রাত্রির আঁধার জমাট বেঁধে আছে ছোট রাস্তার উপর, গাছে গাছে জোনাকির আভা। রাস্তাটা চড়াই থেকে নিচুতে নেমে একটা পাক খেয়ে আবার উৎরাই-এর থেকে চড়াইএ উঠেছে। উপত্যকাটুকুর পরিসীমা সামান্যই। চারিদিকে ওর কোলিয়ারির ধ্বস নামা ভূপৃষ্ঠ ভঙ্গিল, বন্ধুর। বর্ষার জলে রাস্তার দুপাশে লাগানো সেগুন গাছগুলো লকলকে হয়ে উঠেছে। ছোট একটা পাহাড়ী ঝর্নার উপর সাঁকোটা। নীচে গভীর খাদ—পাথরে পাথরে ঘা খেয়ে জলধারা বয়ে চলেছে দামোদরের দিকে। আঁধার ঘেরা পথ—গাছে গাছে থমথমে স্তব্ধতা ; কোথায় ডাকে রাতজাগা পাখি ডানা ঝটপট করে—আবার ঘিরে আসে অন্তহীন নিঃশব্দতা।

সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছে ক'টি ছায়ামূর্তি।

আবছা অন্ধকারে বিড়ি ধরাবার জন্য দেশালাই জ্বালাতেই যদু মাহাতো ধমক দিয়ে ওঠে—মলো শালা, প্যাট ফেঁপে উঠেছে। পরে খাবি। নিভো আগুনটো।

ক্যালভার্ট-এর গায়ে আগুনটা ঘষে নিভিয়ে বসে থাকে ওরা। রাতের দমকা ঝড়ো হাওয়া শন শন হাঁকে ; আবছা তারার আলোয় দেখা যায় ওদের মুখগুলো, আটদশ জন হবে ; বনমালী, যদু মাহাতো, গগন মাঝি—আরও কে কে রয়েছে। বসন্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছে রাস্তার উপর দিকে ; কে শিশু গাছের নিচু ডাল থেকে ঝুপ করে লাফ দিয়ে পড়ে—নিতাই।

—আসছে আসছে। কুলতোড়ের চড়ির মাথায়। দুখানা গাড়ি আগে পিছে।

ওরা রাস্তার দুধারের ঘন আটাড়ি বনে গা ঢাকা দিয়ে বসে পড়ে।

রাতের নিস্তব্ধ বাতাসে ভেসে আসে ইঞ্জিনের গুরু গুরু শব্দ ; চড়াই থেকে নেমে আসছে গাড়ি দুখানা, হেড লাইটের আভায় গাছ গাছালির মাথা ঝলসে উঠেছে। হঠাৎ ক্যালভার্টের মুখে এসে সশব্দে ব্রেক কসে দাঁড়াল লরি দুখানা। তেরপল ঢাকা মস্ত লরি, নতুন টাটা বেনজের পাঁচ টন গাড়ি।

—ক্যা হুয়া ?

গালকাটা উঁচু সিট থেকে টপকে লাফ দিয়ে নামে ; ওদিক থেকে ড্রাইভার দুজনও নেমে এগিয়ে আসছে। কণ্ঠে ওদের চাপা বিস্ময়,

—মুড়োমুড়ি একটা সায়া ডাল যি গো। ঝড় নাই, বাতাস নাই ভাঙল কি করে ?

—ভূত পেরেতের ব্যাপার লয় তো ?

—ধ্যাৎ ! গালকাটা ধমকে ওঠে।

হঠাৎ অতর্কিতে ওরা বের হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওদের উপর ; গালকাটা আগে থেকেই কিছুটা অনুমান করতে পেরেছিল। বুলডগের মত সন্ধানী আর হিংস্র সে। আবছা আলোয় লাফ দিয়ে পড়ে বসন্তের উপর। সেদিনের আক্রমণের কথা আজও ভোলেনি সে।

বসন্ত চেষ্টা করে কোন রকমে ওরা যেন গাড়িতে উঠতে না পারে—পিছনের গাড়ির চাকার এয়ার 'কি' টা খুঁজতে থাকে। হাওয়া বের করে দিতে পারলে অচল হয়ে পড়বে গাড়ি।

বনমালী স্প্যানার রেঞ্চ দিয়ে গাড়ির ডায়নামোর উপর ঘা মারছে অন্ধকারে ; ব্লেড—লোহার রডে লাগছে আঘাতটা, ঠিক জায়গায় পৌঁছে না। আবছা অন্ধকারে পিছন দিক থেকে মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে ছিটকে পড়ে বসন্ত। অসহ্য যন্ত্রণায় মুচড়ে আসে দেহটা।

লাফ দিয়ে সিটে উঠেছে ওরা, বিশাল গাড়ি দুটো গর্জন করছে। মুহূর্ত্ত মধ্যে ওদের সমস্ত বাধা ব্যর্থ করে দিয়ে বের হয়ে গেল তারা। পিছনে পড়ে রইল আঁধারে কয়েকটি প্রাণী।

—রক্ত! যদু মাহাতো বসন্তের অচেতন দেহটা তোলবার চেষ্টা করে।

ব্যর্থতায় স্তম্ভিত হয়ে উঠেছে তারা ; ওই গাড়িতে করে উধাও হয়ে গেল ওদের অপরাধের শেষ চিহ্ন। আর ধরা যাবে না। ব্যর্থ হয়ে গেল সব চেষ্টা।

যদু মাহাতো মাথার গামছা দিয়ে বসন্তের ঘা মুখটা বাঁধবার চেষ্টা করে।

— হাসপাতালে ?

—না ; বেগুনিয়ায় গিয়ে একটা এক্কা কর, কুলটি না হয় আসানসোল হাসপাতালে যেতে হবেক। এখুনি।

চলমান জনস্রোত। বাস ট্রাক লোকজন থেমে যায় জি-টি রোডের উপর। একটা পুরোনো আমলের ক্যালভার্ট, এককালে জল যাবার পথ ছিল, এখন বুজে গেছে, তারই আশপাশ ছেয়ে গেছে শকুন আর কুকুরের ভিড়ে। কেঁউ কেঁউ শব্দে কুকুর ছুটছে—পিছু পিছু তাড়া করেছে একটা শকুন ; ধারাল লম্বা ঠোঁট উঁচিয়ে লম্বা ডানা মেলে মাঠের উপর দিয়ে শন শন শব্দে ছুটছে। মাঝে মাঝে দম নেয়—আবার তাড়া করে ; কুকুরের পাল ল্যাজ গুটিয়ে পালাচ্ছে সোজা।

কঙ্কালের স্তূপ—শক্ত ঠোঁটের আঘাতে খণ্ড বিখণ্ডিত করে মাংসকণার সন্ধান করছে। স্তব্ধ জনতা দূর থেকে কালো কয়লা রং-এর কঙ্কাল স্তূপের দিকে চেয়ে শিউরে ওঠে।

কতকগুলো টবের খালি বাক্সে, ছেঁড়া চট জড়ানো অবস্থায়, কতক এমনিই পড়ে আছে মাঠে বুজে আসা সাঁকোর নীচে স্তূপ হয়ে।

পাশের থানা থেকে লোকজন আসে। কিন্তু মৃতদেহগুলো সনাক্ত করবার কোন পথই নেই, চেনাও যায় না—চূর্ণ কঙ্কাল মাত্র। স্তূপীকৃত কঙ্কালের ভিড়।

—বাপরে খেটো! আঁৎকে ওঠে পথচারি।

—কোথেকে এল রে? প্রশ্ন করে উৎকণ্ঠিত জনতা।

কে বলে—যমপুরি হতে! দেখছিস না পোড়ানো হাড়গোড়। গুঁড়ো করে দিলেই ভালো হতো বাবা, মাঠময় ছিটিয়ে লাঙল দিয়ে দিতাম। মিন পয়সার 'বোন ডার্স্ট' সার হয়ে যেতো। খাসা সার! লকলকিয়ে উঠতো ধান চারা!

দূর পথের একপ্রান্তে অজ্ঞাত অপরিচিত কঙ্কালের স্তূপ বালিচাপা দিয়ে ঢাকা রইল। সব প্রশ্ন—অনুসন্ধিৎস্যাও চাপা পড়ল সেই সঙ্গে বিস্মৃতির অতলে। আবার গাড়ি বাস ট্রাক ছোটে পথ দিয়ে। চলে জনস্রোত—কোথাও কোন গোলমাল ঘটেনি। শাহীশড়ক, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুখ বুজে দেখে এসেছে রাজ্য ভাঙ্গাগড়া, মানুষের ভাগ্য বিবর্তন। এমন দৃশ্য এর আগে কখনও দেখেনি সে। স্তব্ধ হয়ে পড়ে থাকে দিগন্ত জুড়ে নীরব নিস্তব্ধ হয়ে।

এ নিয়ে আর গোলমাল ঘটেনি চিনতোড়ের জীবনেও। হাসপাতালে সেরে উঠেছে বুধন মাখন। ধ্বংস যজ্ঞের দুটি বাতিল প্রাণী; লালমাটির টংরা সাঁওতাল। পাথরের মত কঠিন ওদের হাড়—অর্জুন গাছের চেয়ে চিমড়ে ওদের পরান।

পাথরের ফাঁকে শিকড় বসিয়ে অর্জুন গাছ বাঁচবার মত রস আহরণ করে। সাঁওতাল সেই অর্জুন গাছের জাত।

—কি হল রে? বুধন চুপ করে ভাবছে, ডাক্তারবাবুর ডাকে মুখ তুলে চাইল।

ছাড়া পেয়েই চলে যাবে ডুংরিতে; কোম্পানী কিছু টাকা দেবে—তাই নিয়ে এখানে আর থাকবে না। ঘর বাঁধবে গিয়ে ফুল ডুংরির কোলে পাহাড়ী ঝর্নার ধারে।

এই মৃত্যুপুরীতে আর নয়।

মাখন স্তব্ধ হয়ে গেছে। কথা বার্তা সে বলে না। মৃত্যুর জগৎ থেকে ফিরে এসেছে কিন্তু আমূল বদলে গেছে বুড়ো। মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করে সে জীবনকে ভুলে গেছে। অন্য স্বপ্নে বিভোর।

—কি রে ঘর যাবি নাই? ডাক্তার বাবু ওর নাড়িটা দেখে প্রশ্ন করেন। সুস্থ হয়ে উঠেছে। কিন্তু কোথায় যেন একটা বিপ্লব ঘটে গেছে ওর মনে। শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ডাক্তারবাবুর দিকে। হঠাৎ প্রশ্ন করে মাখন,

—ঘর কুথাকে বটে?

ঠিকানা ভুলে গেছে মাখন সর্দার—ঘরের ঠিকানা।

ডাক্তার ওর স্ত্রীর দিকে চেয়ে থাকে; মাখন তাকেও ঠিক চিনতে পারে না।

—এই যে নিতে এসেছে তোকে?

ডাক্তার বাবুর কথায় উত্তেজিত কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে বুড়ো।

—না! যাবো নাই। বিছানায় উঠে বসে বুড়ো, শূন্য দৃষ্টিতে আসে চাঞ্চল্য; শক্ত মুঠি পাকিয়ে গর্জন করে—খাদে নামাই দিবেক; আঁধার আর জল! থই থই জল। না-না।

শিউরে ওঠে ওর সর্বাঙ্গ।

ধক্ ধক্ করে জ্বলছে ওর দুটো চোখ। হাতটা বিছানায় নামিয়ে রেখে চলে গেলেন ডাক্তারবাবু, বুড়ী দরজায় বসে কাঁদছে। ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করে ব্যাকুল কণ্ঠে,

—কি হইছে উয়ার গো?

ডাক্তারবাবু ইশারায় তাকে সরে যেতে বলেন—ভাল হয়ে যাবে। এখন যা তুই। বৃদ্ধের ক্লান্ত শিরা তন্ত্রীগুলো, দীর্ঘদিনের ওই লড়াই-এর ফলে নিস্তেজ অকর্মণ্য হয়ে আসছে।

নতুন কিছু ভাববার ক্ষমতা তার নেই। কোলিয়ারির অন্তরের মতই ওর বুকের ভিতর সব কিছু সেই ধ্বংসের আগুনে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। চিৎকার করছে মাখন।

—এক ঘন্টি। বন্ করো।

—দো ঘন্টি—ধীরসে চালু করো।

—চার ঘন্টি—আরিয়া মারো—পিট বটম্ আগিয়া।

ব্যস !

বিছানায় ক্লান্ত হয়ে পড়ে পড়ে চাইছে আশমানের দিকে ; কড়িকাঠ—বদ্ধঘর ; আকাশ, নীল আকাশ দেখা যায় না। হাঁফাচ্ছে পড়ে পড়ে। অস্ফুট আর্তনাদ করে মাখন সর্দার—আলো ! আলো কুথায় রে ?

মিঃ চ্যাটার্জি কাষ সব শেষ করে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। নির্বিঘ্নে কোলিয়ারি চালু হয়েছে। প্রমাণও পাচার করেছেন অন্ধকার রাত্রেই ; এষা-নমিতাকে নিয়ে কলকাতা ফিরবেন গাড়িতে। সব প্রমাণ তিনি সরিয়ে ফেলেছেন, দেবেশকে মীমাংসা করতেই হবে এইবার।

হঠাৎ এমন সময় খবরটা আসে। গালকাটা কাষ সেরে ফিরে এসেছে। নিমেষকে বলে চলেছে সে —একদম মামড়া জঙ্গলকা বীচমে ফেক্‌কে আয়া ; লেকিন রাস্তামে উলোক রুখনেকে কোশিস কিয়া !

নিমেষ গোপনেই ওকাষ সারতে চেয়েছিল। বাড়তি ওই কঙ্কালস্তূপ নজরে যাতে কারও না পড়ে তার জন্য এই ব্যবস্থা করেছিল। শুধু গুনতি নয়—যদি ধরতে পারে ওরা তাহ'লে সমস্ত প্রমাণই—ওদের লগ বুক, হাজিরা খাতা, বাতির হিসাবই স্রেফ্ মিথ্যা বলে প্রমাণিত হবে। প্রচুর টাকা দিতে হবে ক্ষতিপূরন বাবদ। তারপর নানা কৈফিয়ৎ। এছাড়াও দুর্ঘটনার কারণও যে তারা জানতো, হয়তো এই বিপদ এড়ানো যেত সময়মত সাবধান হলে, এটাও প্রকাশ পাবে দিনের আলোর মত সকলেরই সামনে। এই অসাবধানতার জন্য সরকার থেকে সাজা হয়ে যেতে পারতো। তাই সাগ্রহে প্রশ্ন করে,

—কারা বাধা দিয়েছিল ? জানতে পেরেছিস্ কিছু তোরা ?

গালকাটা সদর্পে ঘোষণা করে,

—নেহি ; লেকিন দু একটা লাশ দাখিল হো গিয়া।

ফৌজদারী বিশারদ ঘুঘুর কথা ; লাশ দাখিল হয়ে গেছে অর্থাৎ বোধহয় খুনখারাপিই বাধিয়েছে আবার। কথাটা শুনে মিঃ চ্যাটার্জি নীচে নেমে আসেন। স্লিপিং গাউন পরা দীর্ঘ দেহ—সিগারেটের আগুনটা জ্বলছে। গালকাটা আভূমি নত হয়ে সেলাম করে বেশ বিস্তারিতভাবেই নিজের কৃতিত্বের কথা বলে চলেছে।

—বসন্ত, আউর পাঁচ সাতজন তিলবাগান ডাউনমে রুখ দিয়া গাড়ি ; চাক্কাসে হাওয়া নিকালনে লাগা ; হম্ ভি হাত্তিল সে উসকে শিরমে দো তিন

দকে টাইট লাগায়া। শালা শূয়ারকা বাচ্চা একদম ? ক্যায়া মালুম খতম হো গিয়া হোগা। হমভি সিধা নিকাল গিয়া গাড়ি লেকে। হারামীকা বাচ্চা ! রুকেগা হম্‌কো ?

সেই রাত্রের পরাজয়ের শোধ তুলেছে গালকাটা, তারই আনন্দে হাসছে। রক্তের নেশায় মেতে ওঠা বুলডগের মত কুতকুত করছে চোখ দুটো, কপাল থেকে গালের নীচে পর্যন্ত গভীর কাটার লালচে দাগ। হঠাৎ থেমে গেল সে, চমকে উঠেছে ! মিঃ চ্যাটার্জির মত স্তব্ধ গম্ভীর প্রকৃতির লোক এগিয়ে এসে তার গালে প্রচণ্ড এক চড় মেরে বসেন। রাগে কাঁপছেন তিনি ; বাঁ হাতে সিগারটা ধরা, নিমেষ অবাক হয়ে গেছে। বাবাকে এভাবে ধৈর্য হারাতে বিশেষ দেখেনি সে। এবা দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। গর্জন করছেন মিঃ চ্যাটার্জি।

—বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

মুখ নীচু করে গালকাটা গজগজ করছে—ক্যা কশুর হুজুর ?

মিঃ চ্যাটার্জি যেন ওই বীভৎস চেহারার লোকটাকে তিলমাত্র সইতে পারছেন না। নিমেষ গালকাটাকে চলে যেতে ইঙ্গিত করে। ক্ষুণ্ণ হয়ে গালে হাত বোলাতে বোলাতে বের হয়ে আসে সে। চড়টা বেশ জোরেই অতর্কিতে জমেছে। জান দিয়ে কায করে এমনি পুরস্কার পাবে ভাবতে পারেনি সে।

একটা কোচে স্তব্ধ হয়ে বসেছেন মিঃ চ্যাটার্জি। সারা শরীর চাপা রাগে কাঁপছে। কার উপর রাগটা ? নিজের উপর, না ওই বেবশ দেবেশের উপর, না ওই শয়তান গালকাটার উপর, ঠিক বুঝতে পারেন না। তবে কোথায় নিজের অস্ত্রেই নিজের কাছেই পরাজিত হয়েছেন তিনি।

—বাপি !

মুখ তুলে চাইলেন মিঃ চ্যাটার্জি। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত একটি মানুষ। চোখের কোলে জমেছে সেই ক্লান্তির নিবিড় কালো ছায়া ; একদিন যাকে অবজ্ঞাত অবহেলিত করে দূরে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন দ্বিতীয়া স্ত্রীর অর্থ আর রূপের মোহে, সেই অবহেলিত সন্তান অন্তরাল থেকে কি প্রচণ্ড শক্তি সংগ্রহ করে করে আজ প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর মত সামনে এসে দাঁড়িয়েছে—মুখোমুখি।

একদিকে মতবাদের সংগ্রাম, মিঃ চ্যাটার্জি একটি শ্রেণীর, মতের ধারক,

বাহক এবং পৃষ্ঠপোষক ; বারবার ওই দেবেশের ক্ষুরধার বুদ্ধি আর নিঃস্বার্থ ত্যাগের ঋজুতার কাছে পরাজিত হয়েছেন, অন্যদিকে ব্যর্থ বঞ্চিত পিতৃ হৃদয় নিঃশেষ ভালবাসার অর্ঘ্য নিয়ে এগিয়ে যেতে চেয়েছে—সম্মান, বংশমর্যাদা আর সম্পদের মোহ তার পথ আটকে দাঁড়িয়েছে। বাইরের আর অন্তরের মাঝে চলেছে এমনি সংগ্রাম ; রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম।

কোথাও কোন সন্ধির শ্বেত শুভ্রতার স্পর্শ নেই। রক্ত-লাল এ জীবন। ক্লান্ত পরাজিত হয়েছেন মিঃ চ্যাটার্জি।

এষার ডাকে মুখ তুলে চাইলেন। এষা বাপির হাত ধরে বলে ওঠে,

—চল, শোবে না। রাত অনেক হয়েছে।

—ও! হ্যাঁ। চিন্তার পাথর মন থেকে সরিয়ে ফেলবার চেষ্টা করেন। তবু কালোছায়া স্তব্ধ আতঙ্কের মত সারা মনের প্রফুল্লতার আলো ঢেকে দেয়। কি ভেবে বলেন,

—হ্যাঁরে, তু একটা জায়গায় ফোন কর না।

এষা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে ওই স্বল্পবাক লোকটির দিকে ; এতদিন পরম সঙ্গোপনে যে ব্যথা লুকিয়ে রেখেছিলেন যৌবন আর সম্মানের কঠিন আবরণে, আজ বার্ধক্যের প্রান্তে সেই আবরণ জীর্ণ হয়ে খসে পড়েছে।

এষা জবাব দেয়,

—দত্ত সাহেব ফোন করেছেন, লোকও চলে গেছে গাড়ি নিয়ে চারিদিকে, একটা খবর আসবেই।

এষা নিজেই ব্যবস্থা করছে। ওর কাঁধে ভর দিয়ে মিঃ চ্যাটার্জি উপরে উঠছেন, একটা কথা বারবার মনে পড়ে, হয় তো এই পার্থক্য গড়ে উঠত না সমুদ্রের মত গভীরতা নিয়ে। ওদের মাঝে আজ সম্পদের কঠিন পাঁচিল সব সম্পর্ককে ঠেকিয়ে বাইরে দূর করে দিয়েছে। সেই সম্পদকে বজায় রাখতে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন মতবাদের পাহারা বসানো গেট।

—জানলাগুলো সব খুলে দে এষা।

ঝড়ো হাওয়া বইছে প্যানচোত পাহাড় থেকে ; দামোদরের জলে আছড়ে পড়ে কুর্চি ফুলের গন্ধস্নাত বাতাস ; বাংলোর ঝাউ পপলার গাছগুলোয় এক ঝিলিক আলো পড়েছে—কোন বিদেশী এনে পুঁতেছিল উইপিং উইলোর

গাছগুলো; ক্রমনিম্ন চকচকে পাতার ভারে পুঞ্জিত দুঃখের ম্রিয়মাণ তন্ময়তা ঘনতর হয়ে উঠেছে।

মিঃ চ্যাটার্জির ঘুম আসে না। বাতাসে গাছ-গাছালির পাতার গুঞ্জরণ; উইপিং উইলো গাছগুলোর দিকে চেয়ে মনে পড়ে অতীতের কথা—বীণাকে।

মনে হয়েছিল ওকে ভুলতেই চেয়েছিলেন তিনি, ভেবেছিলেন ভুলেই গেছেন। কিন্তু স্মরণের পথে নিত্য তার আনাগোনা, অবগুণ্ঠিতা সেই নারী আজ যেন ঘোমটা খুলে চকিতের জন্য তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে; চোখে তার নীরব প্রশ্ন!

সুলতার বাবা ছিলেন মস্ত ইঞ্জিনিয়ার; তিনি একমাত্র মেয়ের জন্য রেখে যান প্রচুর অর্থ—এদিকের জমিদারী; চালু ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম, সারা ভারতে তার কনট্রাক্টের কায। মধ্যবিত্ত দরিদ্র নৃপেন চ্যাটার্জিরই গোত্রান্তর ঘটেছিল, সুলতার নয়।

পিছনের পরিচয়, সেই ভালবাসা কর্তব্য সব ভুলেছিলেন তিনি। বিষাক্ত ক্ষতের মত দগদগে মনের বেদনাটাকে চাপবার জন্যই মেতে উঠেছিলেন সম্পদের নেশায়, দুহাতে কুড়িয়েছেন অর্থ।

কিন্তু আজ মনে হয় ভূরি ভোজের ব্যাপারে সকলের জন্যই আয়োজন করেছেন—গুনতির মধ্যে শুধু নিজেকেই ধরেন নি। ভুলেছিলেন। আজ তাই সকলের জন্য প্রচুর সম্পদ, কেবল মাত্র নিজেই বঞ্চিত—ব্যর্থ হয়ে রয়ে গেছেন।

বসন্তও তৃপ্ত, সব হারিয়েও সব পেয়েছে সে। একটি মুক্ত অবাধ—সংগ্রাম-মুখর কর্মব্যস্ত জীবন। অতৃপ্তি তার নেই—থাকলে সবাইকে এমনি করে ভালোবাসতে সে পারতো না। ওর চোখে দেখেছেন সেই প্রীতির আলো।

শুধু তাঁর জন্যই জীবন আজ শেষপ্রান্তে রেখেছে বঞ্চনা, আর ব্যর্থতা। এত টাকা দিয়েও সেই শান্তি আর ফিরিয়ে আনা যায় না—অসম্ভব।

হিম বাতাস এসে জানলার গায়ে আছড়ে পড়ে, স্তব্ধ রাত্রির মধ্যযাম। আঁধার আকাশে সাদা স্টিমটা উঠছে—বয়লারের চাপ চাপ ধোঁয়া লালচে ছাপ এঁকে আকাশ সীমায় মিশে গেল মহানিশ্বাসের মত।

বাংলোর বাগানে ডাকছে রাতজাগা পাখি, মিষ্টি সুরে।

মিঃ চ্যাটার্জি ভোরের তারার দিকে চেয়ে বসে আছেন—যেন অন্যমানুষ। অসহায় ক্লান্ত একা একটি মানুষ। জীবনযুদ্ধে বিপর্যস্ত—ক্ষত বিক্ষত তাঁর মন।

আর জেগে আছে নমিতা। অকস্মাৎ সেও আবিষ্কার করেছে মনের গহনে অসীম শূন্যতার কথা। কোথাও তারার আলোজ্বলা ইশারা নেই। নিমেষকে দেখেছে—সে চেয়েছিল জীবনে ভোগ তৃপ্তি প্রাচুর্য। তাই নিমেষের ডাকে সাড়া দিয়েছিল নমিতা।

কিন্তু কি সে পেয়েছে? যাকে পেয়েছে সে একটা অর্থ পিশাচ, টাকা আর সম্পত্তির নেশায় মত্ত, অন্য যে আর কোন কর্তব্য আছে তার খবর রাখে না। সোনার হরিণের পিছনেই দৌড়চ্ছে সীতাকে ফেলে এই জগতের মানুষও।

ঘুমের ঘোরে নিমেষ পাশ ফিরলো, স্বার্থপর অহঙ্কারী একটা লোক, ঘুমের মধ্যে মানুষের নিজস্ব সত্তা সমস্ত আবরণ ভেদ করে নিজের রূপ নিয়ে ফুটে ওঠে। নিমেষের সেই নগ্ন সত্তাকে সারা মন দিয়ে ঘৃণা করে নমিতা, মেনে নিতে পারে না আজ।

এষা প্রথমে একদিন প্রশ্ন করেছিল,

—দাদাকে খুব ভালোবাসিস?

—কেন?

নমিতা ঠিক বুঝতে পারেনি ওর কথার অর্থ। একমাত্র এষা জানতো নমিতার আগেকার ইতিহাস। দেবেশকে ভালবাসতো সে। নমিতার মা যেদিন জানতে পারলো দেবেশের সামাজিক অবস্থাটা—সেদিন পরিষ্কার বলেছিলেন তিনি নমিতাকে,

—মাকাল ফল দেখে ভুলিস না, নমি। দেবেশ সম্পত্তির এক কণাও পাবে না।

—বিষয় টাকাকড়ি দেখে ওর সঙ্গে পরিচয় করিনি মা।

—তবে?

মায়ের চোখে মুখে বিরক্তির কালো ছায়া।

হয়তো দেবেশও কিছু টের পেয়েছিল নমিতার মায়ের মনের কথা; এর কিছুদিন পরই দেবেশও হারিয়ে যায়। নমিতা ধরতে পারতো সেই ঘরছাড়াকে কিন্তু ধরেনি। ধরা দেবার জন্য এগিয়ে যায় না দেবেশের মত ছেলেরা; ওরা চিরদিনই ঘর-পালানো—বেবশ।

তার সামনে অর্থ—সম্পদ—প্রাচুর্য নিয়ে এসেছিল নিমেষ। ধরা দেবার জন্যই। নমিতার মা খুশি হয়, নমিতাও ভুলে গিয়েছিল দেবেশকে। দূর

পথের মাথায় ক্ষীণ একটি অধরা দিগন্ত রেখা—তার অস্তিত্ব থাকলেও তা স্পর্শাতীত। দেবেশও সেই দূর দিগন্ত রেখা; নিমেষ তার ঘরের সীমানা। ওকে ধরা যায়, বাস করা যায় তার সান্নিধ্যে, ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে।

দেবেশের পৃথিবীর বিস্তৃত বুকে রুক্ষ বন্ধুর প্রান্তর, কোথাও সবুজ গাছ ভরা নদীর ক্ষীর ধারা দেখা যায়—ধরা যায় না, নিজেকে নিঃশেষে ওই অসীমে হারিয়ে দিয়েই আনন্দ।

সেই চার দেওয়াল আজ তার কাছে কারাগার হয়ে উঠেছে। দেবেশকে হঠাৎ সেদিন দেখে চমকে উঠেছিল, অপরিচিত একটি মানুষ, কঠিন জীবনের স্পর্শ ওর দেহে, চোখে অন্তলের উত্তাপ আনা দীপ্তি, ঋজু শপথের মত বলিষ্ঠ একটি মানবসত্তা; নিঃস্ব নিরাভরণ একটি মানুষ নিমেষ এত সম্পদ অর্থ নিয়েও ওর সামনে যেন কুঁকড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

অতীতের জন্য কিছুমাত্র ক্ষোভ নেই। অন্য কি সম্পদের সন্ধান সে পেয়েছে যার কাছে নিমেষও কাঙ্গাল।

—জেগে বসে আছো? নিমেষের ঘুম ভেঙ্গে গেছে। সিগারেট ধরিয়ে বিছানায় চিৎ হয়ে পড়ে টানছে চোখ বুজে। হঠাৎ ধোঁয়া ছেড়ে বলে ওঠে,

—বাড়ির কারও চোখে দেখছি ঘুম নেই।

চমকে ওঠে নমিতা, কথাটার অর্থ আজ বুঝতে পারে সে। একটু ক্ষুণ্ণ হয়েই জবাব দেয়,

—কেন, তুমি তো ঘুমুচ্ছো?

জবাব দিতে গিয়ে থেমে গেল নিমেষ; সিগারেটটা ফেলে দিয়ে বেড স্যুইচটা নিভিয়ে দেয়, নমিতা চেয়ে আছে ওর দিকে। এক:মুহূর্তের মধ্যে কি একটা পরম সত্য তার চোখের তারায় ফুটে উঠেছিল। ঘৃণা করে সে ওদের স্বভাব-জাত স্বার্থপর কাঠিন্যকে। তাই বোধ হয় আলোটা নিভিয়ে নিজেকে আড়ালে সরিয়ে নিল। অন্ধকারের আড়ালে।

নমিতা চুপ করে বসে আছে ডেক চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে, ঘুম আসছে না। দপ্ দপ্ করছে মাথার রগ দুদিকে।

ডাক্তার বলে সে নাকি বেশ মোটা হয়ে উঠছে—সম্পদ প্রাচুর্যের অভিশাপ লেগেছে।

তৃপ্তি পেয়েছে গৌরী। বহু বিক্ষুব্ধ বঞ্চিত জীবনে সব হারিয়ে সে আবার ঘর বেঁধেছে। দুজনের নিঃশেষ ভালবাসায় সার্থক হয়েছে দুজনে। সে আর ভক্তি! ছোট একটি স্বপ্ন-নীড়।

সন্ধ্যার অন্ধকারে মিটি মিটি জ্বলছে সন্ধ্যাদীপ। বাসাটা বসতির বাইরে; চারিদিকে সবুজ কলাগাছ তালগাছের প্রহরা। কোথায় বকুলগাছের মিশকালো পাতায় আঁধার নেমেছে—বকুলগন্ধস্নাত বাতাস। দূর থেকে ভেসে আসে যাত্রার দলের আখড়াঘর থেকে বেহালার সুর!

সীতা প্লে হবে—তারই তোড়যোড় চলেছে! ভক্তিও রয়েছে ওইখানে। একা ঘরে বসে গৌরী নিভু নিভু প্রদীপের সামনে একটা কি বুনছে।

হঠাৎ কার পায়ের শব্দে চমকে উঠলো!

চিনতোড়ের দুঃস্বপ্নের দিনগুলো চোখের সামনে ভেসে ওঠে! একটা কঙ্কালের দাড়ি গোঁফের জঙ্গল থেকে শ্বাপদ লালসায় চোখদুটো জ্বলছে ধক ধক করে; এগিয়ে আসছে এই দিকেই।

বিকৃত নাকি সুরে বলে ওঠে ছায়ামূর্তি—গৌরী! গৌরী! আমি বেঁচে উঠেছি! কিঁছু খেঁতে দিঁবি?

সমস্ত আকাশ যেন ঝড়ে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। চোখ ঝলসে বাজ পড়লো কোথায়। আর্তনাদ করে ওঠে গৌরী, ছুটে গিয়ে ঘরে খিল দিয়ে চিৎকার করছে।

স্তম্ভিত হয়ে যায় কেষ্ট! খুঁজে খুঁজে এসেছে গৌরীর কাছে। সে আশ্রয় পাবে, ভালবাসা পাবে; আবার বাঁচবে মানুষের সমাজে মানুষের পরিচয়ে।

কিন্তু!

অন্ধকারে ওর আর্তনাদ জেগে উঠছে! করুণ অন্তিম আর্তনাদ!

ভয়ে চিৎকার করছে গৌরী! চারিদিক থেকে কারা ছুটে আসছে। কেষ্টর সারা মনে একটা জমাট আতঙ্ক! পিছনের দরজা দিয়ে বুক ভোর আঁটাড়ির জঙ্গলে ঢুকে পড়ে ছুটতে থাকে তাড়া খাওয়া জানোয়ারের মত।

খানিক দূর এসে থমকে দাঁড়াল। স্তব্ধ নির্জন ঠাঁই।

একটা শিয়াল নীল চোখ মেলে ওর দিকে চেয়ে আছে স্তব্ধ বিস্ময়ে; যেন ওরই জাতের কোন জানোয়ার। মুখে ওর ঝুলছে রক্তাক্ত সদ্য ধরে আনা

একটা হাঁস ; তখনও ডানাগুলো ঝাপটাচ্ছে। বাধা পেয়ে মুখের শিকার ফেলে দিয়েই দৌড়ে পালাল।

তাজা নরম মাংস!

একটা স্বাদ! কোলিয়ারির অন্ধ অতলের সেই স্মৃতি! বেদনাদায়ক এক করুণ স্মৃতির অসহ্য দহন! কাঁচা মাংসটাই চিবুচ্ছে বুভুক্ষু মানব—পরিত্যক্ত একটি প্রাগ্‌ঐতিহাসিক জীব!

গৌরীর কথা মনে পড়ে! বাড়ন্ত সুন্দর গড়ন। সারা দেহে একটা শান্ত শ্রী। আজ তাকেও চেনে না গৌরী। কেষ্ট একটি মৃত আত্মা!

ও একটা আতঙ্ক! বন্ধু বান্ধব চেনে না আর। মানুষের কাছে সে প্রেতাত্মার অভিশাপ! গৌরী! একটু ঘর—এতটুকু ভালবাসার স্বপ্ন সব হারিয়ে গেছে তার। চিনতোড় তার সবকিছু কেড়ে নিয়েছে। ছিনিয়ে নিয়েছে তার বাঁচবার অধিকার—মানবিক পরিচয়।

কাঁদছে! অনুভব করে কেষ্ট, তার কোটরাগত দুচোখ থেকে জল ঝরছে বাঁধনহারা!

তাজা কাঁচা মাংসের গন্ধ পেয়ে আঁধার রাতে নীল চোখ জলা শিয়ালটা আবার ফিরে এসেছে—ওর পাশ থেকে আধখানা হাঁসের দাবনা তুলে নিয়ে চিবুচ্ছে কচমচ করে।

—খা! খা তুই।

কেষ্ট মিস্ত্রীর গায়ের চিমড়ে বিটকেল গন্ধ! শিয়ালটা সরে যায় না। ঝোপের ভিতরেই পাশাপাশি দুটি জীব বসে রয়েছে রাতের অন্ধকারে।

নিমেষ সকাল থেকেই কাষ নিয়ে ব্যস্ত। মিঃ ব্লেজারের টার্ম শেষ হয়ে গেছে। এনকোয়ারির রিপোর্ট বের হবার পরদিনই রেজিগনেশন দিয়েছে সে। বিলেত থেকে মেসিনপত্রও সিপ্‌মেন্ট হয়ে গেছে। দু'একদিনের মধ্যেই এসে পড়বে সব কিছু।

ব্লেজার চার্জ্জ বুঝিয়ে দিয়ে আসানসোলে গিয়ে আপিস খুলেছে। ব্লেজার-এণ্ড কোম্পানী। চালু ফলাও কারবার। ইতিমধ্যেই কোলমাইনস্ স্টোরিং বোর্ড থেকে বড় বড় স্যাণ্ডপ্যাকিং-এর ঠিকে পেয়েছে। বালি তুলে

কোলিয়ারির অতলে বোঝাই করবে, লাখো লাখো টন বালি দামোদর থেকে ; টন প্রতি রয়ালটি তার।

জেনি স্বামীর উর্বর মস্তিষ্ককে প্রশংসা না করে পারে না। ব্রেজারের শেষ প্যাঁচ এখনও বাকি।

নিমেষ তার জের টানবে। রাশি রাশি প্যাকিং কেস আসছে বিলেত থেকে। কোলিয়ারির আধুনিক যন্ত্রপাতি। মেকানাইজড করবার ব্যবস্থা করেছে সে।

ব্রেজার মনে মনে হাসে। প্যাকিং কেশ থেকে বের হবে পুরোনো অকেজো যন্ত্রের স্তূপ—ট্র্যাশ।

নিমেষ জানে না অলক্ষ্য সেই হাসির মর্ম।

তদন্তের রিপোর্টে মিত্র সাহেবের চরম শাস্তি হয়েছে। সার্ভেয়ার মালিক আর মিঃ মিত্রই দায়ী এই অ্যাকসিডেন্টের জন্য। তাদের লাইসেন্স বাতিল হয়ে গেছে। পরিষ্কার বের হয়ে গেছে ফস্টার। নিমেষকে নিয়ে সে ব্যস্ত।

নমিতাও ব্যস্ত।

এষার ডাকে ফিরে চাইল—একবার দেখতেও যাবি না নমি ?

—কাকে ?

নমিতা যেন কিছুই জানে না। এষা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। এতবড় ঘটনাটা তার মনে রেখাপাত করে না। আশ্চর্য ওই নমিতা!

কথা কইল না এষা।

নীচে নেমে গেল সে মিঃ চ্যাটার্জিকে নিয়ে।

নমিতা বলে চলেছে—শরীরটা ভাল নেই এষা। উনিও ফিরবেন অফিস থেকে।

এষার কানে কথাগুলো ঠিক পৌছে না, অন্য চিন্তায় সে মগ্ন। বাবাকে নিয়ে সে গাড়িতে উঠলো।

নমিতা প্রাণপণে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করে। অভিনয় আর বঞ্চনা। এই সমাজের দুটোকেই সে আয়ত্ত করবার চেষ্টা করছে। তবুও চোখ ফেটে যেন জল আসে, মন ভারি হয়ে ওঠে ব্যাকুল দুশ্চিন্তায়। দেবেশকে আজও ভোলেনি। ভুলতে পারে নি সে।

রাস্তাটা নীচু হয়ে উৎরাইএর বুকে মিশেছে, দুপাশে তেঁতুল গাছের জটলা ;

সামনে একটু রেলিং ঘেরা জায়গায় বাগানের প্রচেষ্টা ; পাতাবাহার কয়েকটা ন্যাড়া পাম গাছ কুঁকড়ে রয়েছে কাঁকুরে মাটিতে ; দু'একটা ইউক্যালিপটাস গাছ চিরল পাতা মিলে বাতাসের ছোঁয়া নিচ্ছে সর্বাঙ্গে। ছোট একতলা বাড়ি। কারখানার হাসপাতালে এনে তুলেছে ওরা বসন্তকে অচেতন অবস্থায়। বেসরকারী হাসপাতাল—নেহাৎ দয়া করেই বাইরের লোকের চিকিৎসা করে তারা। এমনতর ঘটনা এখানে প্রায়ই ঘটে ; গাড়ি চাপা, খুন, জখম, রাহাজানি লেগেই আছে। ডাক্তার কর্মচারীরাও জানে। পুলিশ ডায়েরি নিয়ে যায় বহু খাহাতো, বনমালীর। ব্যাপারটা সেইখানেই চাপা পড়ে।

কিন্তু হঠাৎ সেদিন হাসপাতালের বাইরে ইস্টার্ণ কোল কনসার্নের ম্যানেজিং ডিরেক্টারের ঝকঝকে মার্সেডিজ বেঞ্জখানা আসতে একটু অবাক হয় তারা। বসন্ত মাথার ব্যাণ্ডেজ নিয়ে পড়ে আছে। হাতে পিঠেও আঘাত লেগেছে। প্লাস্টার করা হাত ; মিঃ চ্যাটার্জিকে আসতে দেখে চোখ মেলে চাইল বসন্ত ; মুখ ফুলে উঠেছে। জ্বরও রয়েছে বেশ।

নার্স মিঃ চ্যাটার্জির সঙ্গে এখাকে দেখে কয়েকটা টুল এগিয়ে দেয়।

মিঃ চ্যাটার্জি বসেন না, চারিদিক দেখছেন। একটা হলঘরে গোটা আষ্টেক খাট। রংচটা লোহার হাসপাতাল খাট ; মাঝখানে নামে মাত্র একটা পাখা ঘুরছে। কয়েকজন রোগী যারা আছে তারা যে কোন শ্রেণীর লোক তা দেখেই বোঝা যায়। কয়েকজন রোগী বিছানা থেকেই লুব্ধ দৃষ্টিতে এধার দিকে চেয়ে আছে। চোখে ওদের বুভুক্ষু লালসা। ওদিকে কে গোঙাচ্ছে— কাতরাচ্ছে যন্ত্রণায়। ঘরটায় ফেনাইল আর লাইজলের তীব্র গন্ধ।

—কেমন আছো? মিঃ চ্যাটার্জি বসন্তের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করেন।

ঘাড় নাড়ে বসন্ত, মুখে হাসির আভা ফোটাবার চেষ্টা করে ; অসহ্য যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে ওঠে ওর মুখ। তবু প্রকাশ নেই এতটুকু।

মিঃ চ্যাটার্জি পকেট হাতড়াচ্ছেন। চুরুট! চুরুট নাহলে ঠিক যেন তিনি সবকিছু সহ্য করতে পারছেন না, পরক্ষণে কি ভেবে থামলেন। হাস-পাতালের ভিতর চুরুট ধরানোটা বন্ধ করলেন আপাতত।

চুপ করে বসন্তের দিকে চেয়ে আছে, ছল ছল করে ওঠে এধার গোধাচ কথা বলবার ক্ষমতা ওর নেই ; যন্ত্রণায় নড়ে উঠছে ঠোঁট।

গা পুড়ে যাচ্ছে জ্বরের তাপে।

মেডিক্যাল অফিসারও এসে হাজির হয়েছেন বাংলো থেকে মিঃ চ্যাটার্জির আমার খবর পেয়ে। এ অঞ্চলের বিখ্যাত লোক— কোটিপতি। এক নাগাড়ে কয়েকটা কোলিয়ারির মালিক।

মিঃ চ্যাটার্জি করিডরে দাঁড়িয়ে সিগার টানছেন, ভিতরের ওই দৃশ্য সহ্য করতে পারেন না। অসহায়ের মত একজনকে কষ্ট পেতে দেখতে তিনি চান না—ওই দৃশ্য এড়িয়ে যেতে পারলেই যেন বাঁচেন।

—কেবিনের ব্যবস্থা করতে পারেন না? একজন করে নার্স, অবশ্য চার্জ যা হবে বিল করবেন কোম্পানীর নামে।

—নিশ্চয়ই স্যার। সি-এম-ওর কাছে এটা অতি সামান্য কায। বলে চলেন তিনি, অবশ্য এ সময় বেশি নড়াচড়া করা ঠিক হবে না, হার্ট খুব উইক। পরিশ্রম আর ম্যালনিউট্রিশন, বুঝতেই পারছেন স্যার, ব্যাটারা মাইনে পায় কম নয়—শুধু মদ খেয়ে আর জুয়াতেই সব দিয়ে ফতুর। ওদের ভালো করতে পারবেন না— তুপুরুষ তিন পুরুষে মালকাটা, খোঁজ নিন্—দেখবেন ওর বাপও বোধ হয় এমনি করেই মরেছিল।

অস্থির হয়ে ওঠেন মিঃ চ্যাটার্জি। নিজের মনের কোমলতম একটা জায়গাকে অতি সাধারণ লোকের কাছে এমন ভাবে প্রকাশ করে ফেলেছেন, যেখানে আঘাত পেতেই চমকে ওঠেন তিনি। সি-এম-ও বলছেন,

—তবু আপনার মত বস ক'জন পায়? নিজে সামান্য একজন মাল-কাটাকে দেখতে এসেছেন! চুপ করে ধোঁয়া ছাড়ছেন তিনি। এ প্রসঙ্গ অসহ্য হয়ে উঠেছে তাঁর কাছে।

বসন্ত আবার যেন স্বপ্নের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। জীবনীশক্তি ক্রমশ যেন ফুরিয়ে আসছে। নিভু নিভু প্রদীপের ম্লান শিখা—হাওয়ায় কেঁপে উঠছে থেকে থেকে।

সকালের গিনিগলা রোদে প্যানচোতের শালবন ঢাকা পড়াতে মেঘরৌদ্রের পালাগান জোড়ে; দূরে দূরে ঘুরছে এক একটা মোষ; ক্লান্ত বাঁশীর সুর। বুধনকে মনে পড়ে। অর্ধমৃত ছেলেটা এতদিন যুদ্ধ করে ওই মৃত্যুপুরীর মধ্যেও বেঁচে ছিল নতুন জীবনের স্বপ্নে। ভালবাসার স্বাদ তাকে মৃত্যুর দ্বার হ'তে ফিরিয়ে এনেছে। আরও কারা ভিড় করে আসে চোখের সামনে। কোলিয়ারির অতলে সেই মালুর কথা; ব্যর্থ বঞ্চিত জীবন—চোরের মত আত্মপরিচয় গোপন

করেই কাটিয়ে গেল, রেখে গেল সেই পরিচয় অতলেই সমাধিস্থ করে। ফকির বুড়ো যেদিন নিঃস্ব হয়ে ফিরে এসেছিল তার স্ত্রীকে খুঁজতে গিয়ে, সেদিন চমকে উঠেছিল বসন্ত। যে প্রেম জীবনকে সুন্দর করে তোলে, সেই প্রেম আবার ব্যর্থ করে দিতে পারে জীবন। তাই হয়তো ফকির স্বেচ্ছায় ওই মৃত্যুর মাঝেই এগিয়ে গিয়েছিল।

ভিড় করে আসে সৌরভী-মাখন-যদু মাহাতো-পাচু নিকিরি-পালোয়ান সিং-নারকুলিয়া-মেজবাবু—আরও কত মুখ; কেউ ভালবাসায়, কেউ ঘৃণায় ভরে তুলেছে ওর বুক। সব নিয়েই তো জীবন—আলো আর ছায়ার সহঅস্তিত্বের মত; একটাকে ছেড়ে অন্যটাকে নয়; পরস্পর অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত।

মিত্র সাহেবের হেলমেটপরা দীর্ঘ দেহটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে; হাসিভরা কর্তব্যনিষ্ঠ একজন বিশেষজ্ঞ। কিন্তু তাকেও এরা কি নোংরামির মধ্যে ফেলেছে! তদন্ত কমিশনের সামনে ওঁর প্রতিবাদপত্র, লগবুক রিপোর্ট, পদত্যাগপত্র, সবই অস্বীকার করে গেছে ওই শয়তান রেজার-ফস্টারের দল। নিমেষও সাধু সেজেছে। সমস্ত দায়িত্ব পড়েছে তাঁর উপর; এতবড় দুর্ঘটনার জন্য তিনি কর্তৃপক্ষের থেকে দোষী।

তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করবার জন্যই ওরা রাতের অন্ধকারে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল ওই কঙ্কাল পাচারের গোপন প্রচেষ্টায়; ওদের মুখোস খুলে ধরবে। সকলেই জানুক ওদের কীর্তিকলাপ।

কিন্তু! বসন্ত ব্যর্থ হয়েছে। ওদের বিজয় রথের চাকা দলিত মথিত করে দিয়েছে তাদের প্রচেষ্টা, ওর সর্বাঙ্গ। তবু যদু মাহাতো, বনমালী, কিংশুকের দল বেঁচে আছে আজও। রক্তবীজের মত বেঁচে আছে, মানুষ আজও পশু হয় নি। তাই প্রতিবাদ করে—করবেও।

একটা ক্ষীণ স্বর, কে যেন ডাকছে তাকে। মিষ্টি সেই স্বর; অতীতের ফেলে আসা সেই মধুগন্ধভরা দিন। মায়ের হাসি কানে আসে; এত দুঃখেও মাকে মুষড়ে পড়তে দেখেনি। মা—নীল আকাশের বুকে একফালি মেঘ ভাঙা আলোর মত মিষ্টি একটা জগতের পথ-রেখা।

—দেবুদা!

একটু হিম শীতল—কোমল সুরভিত স্পর্শ; অতীতের স্বর্ণ রৌদ্রভরা দিন তাকে হাতছানি দেয়। চোখ মেলে সাড়া দেবার চেষ্টা করে বসন্ত।

দূরে—আরও দূরে অথবা থেকেই ভেসে আসে সেই আহ্বান—দেবু তাকে খুঁজছে ; ব্যর্থ সে অনুসন্ধান।

—দেবু!

মিঃ চ্যাটার্জির ডাকে চোখ মেলে চাইল সে। সেলফ্রেমের পুরু চশমার ফাঁক থেকে কার কারুণ্যমাখা চাহনি ফুটে ওঠে ; স্নেহের স্পর্শ তাতে নেই, আছে কারুণ্য আর দয়ার ম্লান আভা। দূর থেকে সেই অপরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে আসে,

—কলকাতায় যাবে ?

শূন্য ঘোলাটে দৃষ্টিতে চেয়ে আছে দেবেশ। বন্ধুবিহীন বন্ধুর পথে আজ সে একা যাত্রী। সেই জনসমুদ্রে আপনজন কেউ নেই। একা—অসহায় সেখানে।

এই তার ঠাঁই। হাজারো দরিদ্র মালকাটার ধাওড়ার এককোণে বন-শিমূলের পত্রহীন কাঁটা গাছের নীচে তার বসতি—ময়লা জলভরা সবুজ নর্দমার ধারে। ওই অর্ধনগ্ন বুভুক্ষু জনতা তার বন্ধু, সুহৃদ—আপনজন।

হঠাৎ এক ঝলক আলো কেঁপে ওঠে চোখের সামনে! নীল হালকা মেঘ ভাঙা আলো।

—দেবুদা!

এষা চমকে ওঠে ; সি-এম-ও এগিয়ে আসেন ব্যস্ত হয়ে!

মুখচোখে হতাশা ফুটে ওঠে।

স্তব্ধ নিশ্চুপ মৃত্যুর পদধ্বনি ওঠে আকাশে আকাশে।

—বাপি। এষা মিঃ চ্যাটার্জির দিকে চেয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে।

কঠিন একটি মানুষ। মুখে চোখে থমথমে ভাব। এষাকে নিয়ে গাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালেন। ফুলভরা সোঁদাল গাছের নীচে বসে আছে কয়েকজন মালকাটা, কয়লামাখা ছিন্ন পোশাক, নাকের কানের ভাঁজে দীর্ঘদিনের কালো কয়লার কষ ; দেবেশের ওখানে সেদিনের দেখা কয়েকজনও রয়েছে।

সেই বুড়ো যদু মাহাতো—গামছার খুঁটে চোখের জল মোছে, হাউ হাউ করে কাঁদে বনমালী রায়। ওরা কাঁদে অপরিচিত অনাত্মীয় ওই বসন্তের জন্য।

মিঃ চ্যাটার্জির আভিজাত্যে বাধে দুর্বলতার ওই স্বাভাবিক চিরন্তন প্রকাশে। কার জন্য কে চোখ মোছে!

—বাপি!

এবার ডাকে মিঃ চ্যাটার্জি গাড়িতে উঠলেন। ড্রাইভার দরজাটা বন্ধ করে যন্ত্র চালিতের মত সেলাম জানিয়ে গাড়িতে স্টার্ট দেয়।

গাড়ির দুপাশে এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে ডাক্তার, কর্মচারীরা। হাতযোড় করে নমস্কার জানাচ্ছে; মিঃ চ্যাটার্জি আজ যেন ওদের দেখতে পান না; দেখতে চান না পথের দুপাশের ওই পোশাকী সম্মানের অসার শূন্যতা। সোঁদাল গাছের নীচে বসা ওই মালকাটার চোখের একবিন্দু জল বোধ হয় এদের পোশাকী বিনয়ের তুলনায় বহুগুণে সত্য, মুক্তোর চেয়ে দামী।

রুমাল দিয়ে চশমাটা মোছেন তিনি।

এরা কাঁদছে!

বাতাসে বাতাসে দীর্ঘশ্বাস! হু হু দীর্ঘশ্বাস!

নিমেষের সময় নেই একটুও। কয়েক লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি মেশিনারি এসেছে। প্যাক খুলিয়ে কাজে লাগাবার ব্যবস্থা করতে চায় নিমেষ।

ইঞ্জিনিয়ার রবার্টস, ফস্টার, আরও দুচার জন আছে। বড় বড় পাইন কাঠের বাক্সে টুকরো টুকরো হয়ে রকমারি মাইনিং মেশিনারি চালান এসেছে। সেগুলো এখানে ফিট করা হবে।

স্তব্ধ স্তম্ভিত হয়ে যায় নিমেষ; বাক্স বোঝাই হয়ে এসেছে সারা ইংল্যাণ্ডের পুরানো বাতিল করা মেশিনারির ভাঙ্গা টুকরোই বেশি; তার সঙ্গে এক আধটা নতুন বা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড কিছু। বাকি সবই অব্যবহার্য। কোন রকমে মেরামত করেও কাযে লাগানো যাবে না, বাতিল স্ক্র্যাপ হিসেবে বিক্রি করা ছাড়া অন্যপথ নেই। লাখো লাখো টাকার ইনডেণ্ট এসেছে ব্লেজারেরই কোন বন্ধুর ফার্ম থেকে এবং বর্তমানে সেই ফার্মের কোন অস্তিত্বও খুঁজে পাওয়া যায় না।

পাওয়া যায় শুধু ব্লেজারকে—তাও সে এখন বেনামী ফার্ম জেনি ব্লেজার

অ্যাণ্ড কোম্পানীর কর্মচারী মাত্র। চতুর ধূর্ত লোকটা—একেবারে ধ্বসিয়ে দিয়ে গেছে। এতবড় কোলিয়ারি এ্যাকসিডেণ্ট যা করতে পারেনি, যে আঘাত দিতে পারেনি হাজারো মালকাটার সমবেত চেষ্টা, একা ব্লেজার তার চেয়ে ঢের বেশি আঘাত দিয়ে গেছে।

সকালের আলোয় রাশিকৃত প্যাকিং বাক্সের খোল আর মরচে পড়া ওই বাতিল লোহা লক্কড়ের স্তূপের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে নিমেষ। ব্লেজারের ধূর্ত নীল চোখের চাহনি ভেসে ওঠে; একটি লোক তাকে চিনেছিল।

দেবেশের কথাগুলো মনে পড়ে—তোমার জন্য কুসুম শয্যা পেতে রাখেনি ওরা, বারুদের স্তূপের উপর এনে দাঁড় করিয়েছে তোমায়।

আজ মনে হয় কথাটা সত্যি। ধূর্ত শয়তান ব্লেজারকে এর জবাব দেবে নিমেষ। নিষ্ফল রাগে ঠোঁট কেঁপে ওঠে। ফস্টার মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে, রবার্টসও। তাদেরই একজন স্বদেশবাসীর কায দেখে এত বড় নির্বোধ পাষণ্ডরাও শিউরে উঠেছে।

একা চিনতোড়কেই নয়; বিদেশের সেই প্রতিষ্ঠান এই এলাকার বহু কোলিয়ারিকেই বঞ্চনা করেছে।

উত্তেজিত অবস্থায় নিমেষ বাংলোয় ফিরে গিয়ে মিঃ চ্যাটার্জিকে দেখে যেন রাগে ফেটে পড়ে; সমস্ত ব্যাপারটা বর্ণনা করে চলেছে।

প্রতারিত হয়েছে মাল নিয়ে, এ রকম চিটকে শাস্তি দেওয়া দরকার। কঠিন শাস্তি।

নিথর মধ্যাহ্ন রোদ শালবন সীমায় প্যানচোত পর্বতের ছায়াঘন বুকে নীলাঞ্জন মাখা স্বপ্ন আনে। মিঃ চ্যাটার্জিও যেন বিস্মৃত কোন অতীতের পথে যৌবনের হারানো দিনের ব্যর্থ সন্ধান করেন। উষর বন্ধুর সেই পথ, শুধু ঝাঁ ঝাঁ রোদ পোড়া তামাটে মাটি, কোথাও সবুজের নিশানা নেই।

বঞ্চনা আর দুঃখের জমাট বীভৎসতা! বীণা গেছে। গেল দেবেশও।

পৃথিবী তাদের রাখেনি, জীবনস্রোতের অফুরান প্রবাহ সব বাধা চূর্ণ করে মহাপ্রবাহের স্রোতে মিশে গেল।

টিকে রইলো তারাই, জীবনের পথে পথে যাদের সম্পদসম্ভার আর লোভের পর্বত প্রমাণ বেড়া। জীবনীশক্তিকে তারাই সীমিত করে কৃপণের ধনের মত আঁকড়ে পড়ে আছে

নিমেষের কথাগুলো কানে যেতে বিরক্ত হয়ে তিনি চাইলেন ওর দিকে। গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করেন মিঃ চ্যাটার্জি,

—কত টাকা ঠকিয়েছে ব্লেজার ?

উত্তেজিত কণ্ঠে জবাব দেয় নিমেষ—প্রায় দুলাখ টাকা।

একটি মুহূর্ত ; স্থির স্বরে জানতে চান মিঃ চ্যাটার্জি—কোলিয়ারির মালকাটারা কত চেয়েছিল ?

—তা প্রায় সত্তর হাজার টাকা।

অজানা অচেনা এক ধূর্ত শয়তান নিরাপদে ঠকিয়ে গেল কয়েক লক্ষ টাকা, ন্যায্য দাবী করেছিল দেবেশ ওই মালকাটাদের জন্য মাত্র সত্তর হাজার টাকা।

তাঁর নিজেরই সন্তান সে। সেই দাবী পেশ করার জন্য নিষ্ঠুর হাতে ওরা তাকে—

শিউরে ওঠেন মিঃ চ্যাটার্জি! হাসপাতালে দেবেশের যন্ত্রণানীল মুখখানা ভেসে ওঠে, অসহ্য বেদনায় কুঁকড়ে মুচড়ে উঠেছিল তার সারা দেহ! এই তার অপরাধ।

মিঃ চ্যাটার্জি নিমেষের দিকে চেয়ে স্থির কণ্ঠে বলে ওঠেন,

—আজ সকালেই দেবেশ হাসপাতালে মারা গেছে।

নিমেষ কথা কইলো না। বাবার দিকে চেয়ে থাকে। ব্লেজারের এই ঠকানোর সঙ্গে দেবেশের মৃত্যুর কোথায় যোগাযোগ আছে তা বুঝতে পারে না। আরও কি বলবার চেষ্টা করে নিমেষ—মিঃ চ্যাটার্জি ডেক চেয়ার ছেড়ে উঠে গেলেন বাগানের দিকে। ওর কথায় কান দেবার মত মানসিক অবস্থা তাঁর নেই। কোথায় নিদারুণ আঘাত পেয়েছেন তিনি।

হতাশ হয়ে মনের ক্ষোভ চেপে উঠে গেল নিমেষ। সারা মনে তোলপাড় করছে ব্লেজারের কথা ; দেবেশের এই মৃত্যু সংবাদ তাকে বিন্দুমাত্রও কোথাও স্পর্শ করেনি, উপরন্তু একটা ক্ষীণ দুশ্চিন্তার কালো মেঘকেই যেন উড়িয়ে দিয়েছে মনের কোণ থেকে।

নমিতা পিয়ানোর টুলে বসে টুং টাং আঘাত করছিল, নিমেষের ডাকে ঘাড় ফিরিয়ে চোখ দুটো অকারণেই নাচিয়ে চটুল ছন্দে সাড়া দেয়।

ক্লান্ত হতাশ নিমেষের উত্তেজনায় আক্ষেপ থেমে গেছে। সারা শরীরে একটা ক্লান্তি বোধ করে। গুনগুন করে সুর তুলেছে নমিতা. পিয়ানোর গুরু গম্ভীর সুরেলা আঘাতগুলো ছন্দ আর সুরের ঝরনা তোলে।

এষা চমকে ওঠে।

এ বাড়ির সে কেউ নয়, সত্যিই কেউ নয়। দেবেশ এখানের পরিবেশে অপরিচিত। নইলে নমিতা একদিন যে তাকে ভালবেসেছিল, সেই নমিতাও আজ সুর তোলে—গান গায়! আর নিমেষ ভাবছে ব্যবসায়ের পার্টনারকে কেমন করে ঠকানোর দায়ে আদালতে টেনে হাজির করা যায়।

নিজেরাও ওদের ঠকিয়ে চলেছে দিনরাত, কিন্তু সেই প্রতারণার জন্য কোন শাস্তির বিধান নেই কোথাও।

নমিতার কণ্ঠে সুরটা ওঠে; অতি পরিচিত একটি গান। অতীতের একদিন একটি কুমারীকে ওই গান গাইতে দেখেছিল সে দেবেশের সামনে। আজ?

আজও সেই গানই গাইছে নমিতা—সেই কামনা ব্যাকুল সুরে, সামনে অন্য জন—অন্য মন।

ঘৃণা আর রাগ হয় এষার।

ঘরের মধ্যে ঝুঁকে পড়ে পর্দা সরিয়ে বলে ওঠে—আজকের দিনটা অন্তত চুপ কর নমিতা।

নিমেষ প্রশ্ন করে—কেন? দেবেশের মৃত্যু-তিথি? তা সত্যি, অনারেবল ডেথ অব এ শহীদ।

হাসবার চেষ্টা করে নমিতা! সারা গা হাত পা কাঁপছে। কেমন যেন ঝড় ওঠে তার দুচোখে, মনে। নিমেষ চেয়ে আছে তার দিকে স্তব্ধ সন্ধানী দৃষ্টিতে। এত পাওয়া এ সম্পদের নেশায় মত্ত নমিতা অতীতের হারানো কুমারী সত্তাকে টুঁটি টিপে ধরেছে! শেষ হোক—শেষ হয়ে যাক তার সব কিছু।

পিয়ানোয় ঝড় উঠেছে—সুরের ঝড়! হাসছে নমিতা—ব্যাকুল উন্মাদের মত হাসি!

এরা চমকে ওঠে ওর এই বিচিত্র ব্যবহারে।

এলোপাথাড়ি ঘা মেরে চলেছে পিয়ানোতে। আর্তনাদ করে উদ্দাম স্বর—ঊর্ধগগনে কোন পাখিকে যেন তাড়া করেছে তীক্ষ্ণ নখ দন্ত বিস্তার করে লুব্ধ বাজ পাখি; পালাচ্ছে সেই ভয়ে পারাবত; আকাশ ভরে উঠেছে বাজপাখির তীক্ষ্ণ চিৎকারে!

কাঁপছে দূর ক্রন্দসী মৃত্যুর জমাট আতঙ্কে।

নিশ্চুপ নীরব রাত্রি, সারা বাংলো ঘিরে নেমেছে অখণ্ড স্তব্ধতা; আঁধারে সতর্ক প্রহরীর মত জেগে আছে দু একটা আলো।

আর জেগে আছে রাতের বাতাসে বিক্ষুব্ধ দামোদর, আকাশে তারই মত্ত গর্জন গুমরে ওঠে। মিঃ চ্যাটার্জি চুপ করে বসে আছেন—জীবনে এভাবে পরাজিত তিনি হন নি। দেবেশ তাঁকে পরাজিত করেছে নিদারুণ ভাবে। প্রত্যাখ্যান করেছে তাঁর দান—পরিচয়; দৃপ্ত ভঙ্গীতে সে তাঁর সমস্ত কঠিন নীতির মুখের উপর দাঁড়িয়ে তাঁকে অগ্রাহ্য করে গেল।

বুভুক্ষু পিতৃহৃদয় ক্ষণিকের জন্য হাহাকার করে ওঠে। রাতের অন্ধকারে এই চরম দুর্বলতা কেউ দেখবে না, সন্ধানও পাবে না। বারান্দার দিকে চেয়ারটায় বসে হু হু কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন মিঃ চ্যাটার্জি। বীণা—দেবেশ! অন্তরের সুপ্ত একটা বেদনা তীব্রতর হয়ে ওঠে—চোখের জলে যেন সেই জ্বালা মুছে আসে ধীরে ধীরে। কোটি টাকার সম্পদও তাঁর মনের অসীম শূন্যতা পূর্ণ করে দিতে পারে নি—এই নির্মম সত্যটা আজ অনুভব করেন তিনি।

কিসের শব্দ! কে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, আঁধারের কালোচুলে মুখ ঢেকে নিঃশব্দ ক্রন্দনে! এগিয়ে যান মিঃ চ্যাটার্জি। অবাক হয়ে গেছেন তিনি।

—তুমি!

দুজনে দুজনের দিকে চাইল। কাঁদছে নমিতা। মিঃ চ্যাটার্জি নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করেন ওপাশে সরে গিয়ে। রাত নির্জনে আজ একজন ক্ষণিকের জন্য বিসর্জন দিয়েছে তার বর্তমানের পরিচয়—অন্য জন খুলে দিয়েছে তার ব্যক্তিত্বের, নীতির কঠিন আবরণ। মনের অতলে অন্যমন কাঁদে, কাঁদে

মানুষ অন্য মানুষের বিয়োগ ব্যথায়। এ তাদেরই আত্মার আংশিক মৃত্যু। একটা দিক কোথায় শূন্য হয়ে গেল।

আজ মিঃ চ্যাটার্জি জীবনের একটি কঠিন নির্মম সত্যের মুখোমুখি হয়েছেন। সম্পদ আর অর্থের কঠিন নির্মোক ফেলে উঠে দাঁড়াতে চায় স্বাভাবিক একটি মানুষ। যার অন্তর আছে—দুঃখ বেদনাবোধ আছে।

নমিতাও কেমন বদলে গেছে। বলে ওঠে,

—অন্যায় করেছিলেন আপনিই।

যেন অভিযোগ করছে নমিতা, মিঃ চ্যাটার্জি চমকে ওঠেন। অপরাধীর মত জবাব দেন,

—সত্যিই, অন্যায় আমি তুমি সবাই করেছি; তার জন্য দুঃখও কম পাই নি নমিতা! আজ দিনের আলোয় পারো তুমি সেই কথা স্বীকার করতে? হাসিমুখে ঘুরে বেড়াও, গান গাও। নিজেকে ভুলতে চেষ্টা করো। তোমার বর্তমান জীবনে সেই স্মৃতি যেন একটা অভিশাপ—যন্ত্রণা। সেই অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করতে গিয়ে আমিও আজ হিপোক্রিট, ভণ্ড। নিজের অন্তরকে বঞ্চনা করে আভিজাত্য আর সম্পদের পাহারাদার হয়ে বসে আছি, যেন এই গজদন্তমিনার ভাঙবার ক্ষমতা তোমার আমার কারও নেই।

উত্তেজিত হয়ে পায়চারি করছেন তিনি। অসহায় মানুষটির প্রকৃত পরিচয় আজ কিছুটা পায় নমিতা। আগ্নেয়গিরির জ্বালা বুকে চেপে উপরে স্থির গম্ভীর হয়ে আছেন। মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে যেন অতলের আগুন—মাটি ফাটিয়ে বের হতে চায় ওই দৃপ্ত তেজ—প্রতিবাদের দৃঢ় কাঠিন্যে।

বলে চলেছেন।

—ওদের চিতা একদিনেই নিভে যাবে। কিছুদিন হয়ত মনে রাখবে দু চারজন তার নাম, তারপর আরও নতুন লোক আসবে। তারা কেউ জানবে না, চিনবে না তাকে! কিন্তু তোমার আমার বুকে রাবণের চিতার আগুন কোনদিনই নিভবে না। অভিশাপের মত জ্বলবে, তবু মুখে দিব্যি হাসি এনে কাষ করবে তুমি, আমিও। এই ভণ্ডামী আজ অসহ্য হয়ে উঠেছে আমার কাছে।

নমিতা কাঁদছে—অসহায় কান্না। মিঃ চ্যাটার্জি আজ তাঁর মস্ত বড় অন্যায়ের সামনে দাঁড়িয়েছেন—অপরাধী যেন বিচারকের সামনে এসে হাজির

হয়েছে শাস্তির প্রতীক্ষায়। নমিতাও যেন রাতের আঁধারে সেই অদৃশ্য বিচারককে সামনে দেখে শিউরে উঠেছে—কাঁদছে অসহায় আতঙ্কে।

জাগর রাত্রির প্রহর ঘোষণা করে অফিসের পেটা ঘণ্টায়—বিনিদ্র পাহারাদার। মহাকালের বুকে একটি শাশ্বত প্রহর নিবিড় দাগ কেটে চলে গেল ; দামোদরের প্রবহমান জলস্রোত কোন দিগন্তে ভাসিয়ে নিয়ে গেল গাছ থেকে ঝরে পড়া শেষ বাদলের একটি দুটি কদম ফুল।

পিট হেড গিয়ারের চাকাটা মসৃণ গতিতে ঘুরছে। চিনতোড় কোলিয়ারির পোড়া খাদ থেকে আবার কালামাটি উঠছে—চাকাটা একদিনের জন্য থেমে গেল অকস্মাৎ। বসন্তের মৃতদেহটা বয়ে এনেছে ওরা হাসপাতাল থেকে। একটা সস্তা খাটিয়ায় ফুলে ফুলে ছেয়ে দিয়েছে তাকে ; পথের দুপাশের কোলিয়ারি থেকে ক্ষুদ্র জনস্রোত মিশে জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছে। স্তব্ধ জনতা ; যেন এক পরম আত্মীয়কে হারিয়ে তারা শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছে—এগিয়ে চলেছে দামোদরের ধারে কোলিয়ারির অফিসের সামনের পথটা দিয়ে।

বাংলোর জানলা থেকে চেয়ে থাকেন মিঃ চ্যাটার্জি। এবার দুচোখ জলে ভরে আসে। দেবেশের মুখখানাও দেখা যায় না ; নীরব স্পর্শে বাতাস শেষ ছোঁয়া ছুঁয়ে গেল তার সর্বাঙ্গে। কোলিয়ারি থেকে বের হয়ে আসে অনেকেই। ওরা নদীর দিকে এগিয়ে গেল।

বালিয়াড়িতে ধিকি ধিকি জ্বলে ওঠে আগুন, বাতাসে কাঁপছে তার চঞ্চল শিখা।

মিঃ চ্যাটার্জি যেন স্বপ্ন দেখছেন। কেমন সব আবছা নীল হয়ে আসে। দূর ছায়াঘন স্তব্ধ পাহাড়সীমা কেঁপে উঠছে।

—কে ? নিমেষ প্রশ্ন করে ওঠে।

কাদের নিয়ে সেক্রেটারি মিঃ দত্ত এগিয়ে এসে সংবাদটা জানায়।

—এরা আপিসের মাঠে একটা শোকসভা করতে চায়। আপনাকে জানাতে এসেছে—আপনি যদি যান একবার !

মিঃ চ্যাটার্জি ওদের দিকে চেয়ে থাকেন।

দরজার কাছে বসে সেইদিন দুপুরে হাসপাতালের বাইরে দেখা কয়েকজন লোক—বুড়ো যদু মাহাতো চুপ করে বসে ময়লা গামছার খুঁট দিয়ে চোখ মুছছে, বনমালী স্তব্ধ হয়ে মাথা নামিয়ে রয়েছে।

হঠাৎ চমকে ওঠেন মিঃ চ্যাটার্জি! ওই ভাবে বজ্রাহত তালগাছের মত মুঁকড়ে পড়া উচিত ছিল তাঁরই; কিন্তু কই; তাঁকে যেন এই আঘাত স্পর্শই করে নি! সব হারিয়েছে ওরা। যে ওদের বিপদে দাঁড়াত পাশে—দুঃখে দিয়েছে সান্ত্বনা, এক সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল প্রতিরোধের কাযে। সেই দেবেশই ছিল তাদের আত্মীয়, বন্ধু, সুহৃদ, আপনার জন।

তাই কাঁদে ওরা; মিঃ চ্যাটার্জি চুপ করে কি ভাবছেন—ওরা যেন মানুষ আর অমানুষের মধ্যে একটা সীমারেখা গড়ে তুলেছে। আজ নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে করেন তিনি। পরাজিত হয়েছেন এই মালকাটাদের কাছে। সব ছাপিয়ে মনের একটা অপরিসীম দৈন্য ফুটে ওঠে।

নিমেষই জবাব দেয় কঠিন সুরে—আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। ওদের জানিয়ে দিন মিঃ দত্ত, আমাদের পক্ষে অফিস এলাকায় শোকসভা করবার অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয়। একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করেছে পুলিশ। অন্য কোথাও তারা শোকসভা করুক—আমাদের আপত্তি নেই।

চমকে ওঠে যদু মাহাতো, বনমালী রায়। আধপাকা আধকাঁচা মাথার চুলগুলো ধূলিমলিন। জ্বলছে চোখ দুটো! যেন ছাইএর ভিতর থেকে ধিকি ধিকি জ্বলছে আগুন। কি বলতে যাচ্ছিল যদু মাহাতো, বনমালী থামিয়ে দেয় তাকে।

—আজ থাক যদু, এসব কথা পরে হবে। চলো—

চুপ করে উঠে পড়ল তারা। এদের হাজারো জনতার জমায়েতে ওরা ভয় পেয়েছে। তাই এড়িয়ে গেল।

—দাঁড়াও!

হঠাৎ মিঃ চ্যাটার্জিকে এগিয়ে আসতে দেখে ওরা দাঁড়াল।

—আমার বাংলোর ময়দানে সভা করা যেতে পারে অবশ্য তোমাদের যদি আপত্তি না থাকে।

চমকে ওঠে নিমেষ! অবাক হয়ে গেছে যদু মাহাতো, বনমালী।

—আয়োজন করো। আমিও থাকবো।

মিঃ চ্যাটার্জি যেন বদলে গেছেন। নিমেষ ওঁর দিকে চেয়ে থাকে। কঠিন কঠোর একটি মানুষ ক'দিনেই ভেঙে পড়েছে, মুখে ফুটেছে কুঞ্চন রেখা, চোখের কোলে কালির ম্লান দাগ। ওই মানুষটিকে যেন চেনে না নিমেষ।

ওরা শোকসভার আয়োজন করছে। হাজারো মালকাটার ভিড়ে ভরে উঠেছে বাংলোর চারিদিক। দামী ফুল গাছগুলো বোহধয় দলে পিষে নষ্ট করে দেবে। তাছাড়া ওই জনতা আজ যেন জোর করেই এসে দখল করেছে বাংলোর আকাশস্পর্শী ব্যবধান আর সম্ভ্রমপূর্ণ আভিজাত্য, সেই গজদন্ত মিনারকে টেনে এনে ধুলোয় নামিয়েছে ওরা।

—কাযটা কি ঠিক হল? নিমেষ বেশ উত্তেজিত স্বরেই প্রশ্ন করে।

ওর দিকে মুখ তুলে চাইলেন মিঃ চ্যাটার্জি। অবাক হয়ে গেছেন তিনি। কৈফিয়ৎ চাইছে নিমেষ, তাঁরই কাযের কৈফিয়ৎ। নিমেষ বলে চলেছে,

—এ ভাবে প্রশ্রয় দিলে ওরা পেয়ে বসবে। অন্যায় দাবী মানতে রাজি নই আমরা।

মিঃ চ্যাটার্জি স্তব্ধ দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে আছেন। আজ তিনি যেন অত্যন্ত অসহায়। বাইরে থেকে কোলাহল শোনা যায়। একদিকে ওই ভবিষ্যৎ উত্তরপুরুষ—অন্য দিকে বঞ্চিত মানুষের জনতা। মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি। পরাজিত ক্লান্ত একটি মানব।

—বাপি! এষার ডাকে চমক ভাঙে—তোমার শরীর খারাপ?

মিঃ চ্যাটার্জির সামনে আজ পৃথিবীর রূপ বদলে গেছে। নিমেষ আজ তাঁর সামনে স ানে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে উদ্ধত দৃপ্ত ভঙ্গীতে। নিষ্ফল অভিমান করেন মাত্র আজ অসহায় মিঃ চ্যাটার্জি।

—না মা, ভালোই আছি। ভাবছি আজ রাত্রেই কলকাতা ফিরে যাবো নিমেষ।

নিমেষও জবাব দেয়—হ্যাঁ, সেই ভালো। আপনার চলে যাওয়াই উচিত। শরীর খারাপ—কিছুদিন বিশ্রাম দরকার।

মিঃ চ্যাটার্জি নির্বাক দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছেন নিমেষের দিকে। আজ যেন তাঁর দিন শেষ হয়ে আসছে। এই সম্পদের পাহারাদারী করবার মত

নিষ্ঠুর নির্মমতা আর তাঁর নেই। তাই এদের জগতের খতিয়ান থেকে তিনি বাতিল একটি জীব। মনের অতলে জলছে হু হু আগুন। সব পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। ভেঙ্গে পড়ছে দৃঢ়তার প্রাচীর।

এরা ওঁকে ধরে একটা ডেক চেয়ারে বসিয়ে দেয়। নীল পাহাড়ের দিকে চেয়ে স্বপ্ন দেখছেন তিনি—অতীতের বিস্মৃত ক্ষীণ স্বপ্ন। পলাশের রং লেগেছে বনে বনে। লাল—গাঢ় লাল রং। বাতাসে আমের বোলের মিষ্টি উদাস সৌরভ। কোথায় পাখি ডাকছে। শান্ত স্তব্ধ জগৎ। অন্য চোখে আজ মুক্ত উদার দিগন্তকে এই প্রথম দেখলেন তিনি।

হাটতলার ধারে বটগাছের নীচে বসে আছে মাখন বুড়ো। পায়ে ছেঁড়া হাফবুট, কোমরে চামড়ার বেল্ট, একটা দড়িতে ফুটো ক্যানাস্তারার টিন ঝুলছে গাছের ডাল থেকে।

হাঁকছে আপন মনে—এক ঘন্টি—লিফ্ট বন্ করো—

দো ঘন্টি—ধীরসে নামাও—

তিন ঘন্টি—বোঝাই উতরো—

চার—উঠাও। অব্ উপর যাতা হ্যায় ডোলি।

দাঁতগুলো পড়ে গেছে, লাল মাড়ির মাংস দেখা যায় হাসির সঙ্গে। অট্টহাসি হাসে থেকে থেকে। হাঃ হাঃ হাঃ—

—মরেগা? কিউ মরেগা? সব জিন্দা হ্যায়। বিলকুল!

—এ্যাই সর্দার। কে যেন ডেকে ওঠে।

মাখন তার দিকে চেয়ে থাকে, স্মরণ করবার চেষ্টা করে মাখন, ব্যর্থ সে প্রচেষ্টা।

হাসিতে ফেটে পড়ে মাখন, ক্যানাস্তারার টিনটা ডালে লেগে শব্দ ওঠে—ঢং ঢং ঢং।

—ধীরসে চলো।

আবার তার ডুলি উঠছে অন্ধকার থেকে আলোর দেশে।

মাখন ক্ষেপে গেছে—বদ্ধ উন্মাদ।

লোকে হাসে ওর কাণ্ড দেখে। বুধন চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, সঙ্গে ওর বুধনী। ডাগর পুরুষ্ট গড়ন, হলদে রাঙা কাপড় পেঁচিয়ে অফুরান যৌবন প্রবাহকে বন্দী করবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে।

একসঙ্গে মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধ করেছে তারা তেইশ দিন। বুধন বেঁচে গেছে, চোখে ওর বুধনীর নেশা; ভালবাসার স্বপ্নই তাকে বাঁচিয়েছে, ফিরে এসেছে আবার এই দেশেই, দুজনে ঘর বেঁধেছে নামো বস্তিতে।

—চল। বুধনী ডাকে বুধনকে।

হাটের জিনিসপত্র নিয়ে চলেছে তারা। আবছা অন্ধকার ঘনিয়ে আসে, গাছে গাছে সন্ধ্যেফেরা পাখির কাকলি।

বৃষ্টিধোয়া শরতের আকাশে একফালি চাঁদ জেগে ওঠে।

বাঁশীটায় ফুঁ দেয় বুধন।

সুর। বিচিত্র সে সুর। অন্ধকার অতলে এই সুরই তাকে জাগিয়ে রেখেছিল মৃত্যুর নিবিড় ঘুম থেকে, মাটি আর ভালবাসার স্পর্শ মাখানো সেই মৃত্যুঞ্জয়ী সুর। বুধনী গান গাইছে গুনগুন করে।

পুরোদমে চালু হয়েছে কোলিয়ারি। ভুলে গেছে মানুষ এই অতলে কোনদিন কোন ধ্বংসযজ্ঞ ঘটেছিল।

সহজ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে জীবন-যাত্রা। আবার হাটে সবজীর দোকান সাজিয়ে বসেছে সৌরভী—চিনতোড়ের স্থির যৌবনা লাস্যময়ী নারী, হাজারো নতুন মুখের ভিড়ে ভরে গেছে চিনতোড়। তেমনি নীল আকাশ কোলে গাছ গাছালির ফাঁকে ঘোরে কালো হেডগিয়ারের চাকা—মন্থরগতিতে। খেয়া চলেছে আঁধার আর আলোর জগতে।

আঁধার ঢাকা দামোদরের বালিচরে যাত্রী বসে থাকে খেয়াপারের আশায়। ওপারের শালবনে আজও নামে রক্তসন্ধ্যা—ডেকে যায় মানিকজোড় পাখি; চখা ডাকে চখীকে, নদীর ওকূল থেকে একূলে ভেসে আসে সেই ডাক।

এমনি বেলায় সৌরভীর মনে পড়ে একজনকে। ভোলেনি সে।

বলিষ্ঠ দীর্ঘ একটি যুবক, ভিড়ে আজ কোথায় সে হারিয়ে গেছে, চলে গেছে অজানাদেশে, যেখান থেকে কেউ ফেরে নাই কোনদিন।

তবুও বেঁচে আছে সে; ওই কয়লার কালিমাখা হাজারো মুখ সেই দৃষ্টির সামনে! সে মরেনি। নতুন রূপ ধরে এসেছে মাত্র।

বসন্তও আসে।

পত্রহীন ডালে ডালে রক্তলাল পলাশের আভায়—ওপারের বনে দোয়েল পাপিয়ার ডাকে তার আগমনী।

দেবেশ নেই! তবু বসন্ত—সে অক্ষয়! বার বার ফিরে আসে এই রুক্ষ বন্ধুর মাটিতে—মানুষের জীবনে।

একটা বাঁশীর সুর উঠছে কেঁপে কেঁপে! বুধন বাঁশী বাজাচ্ছে। মৃত্যু জয় করা ওই বাঁশীর সুর।

———